ব্যাঘ্রকেতন

ব্যাঘ্রকেতন

॥ সুভাষচন্দ্র বসুর কর্ম ও জীবন ॥

হিউ টয়

॥ অনুবাদক ॥

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ফিলিপ মেসন লিখিত ভূমিকা সম্বলিত

এলাইড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
বোম্বাই :: কলিকাতা :: নয়া দিল্লী

প্রথম প্রকাশ ॥ শকাব্দ ১৮৮২
সন ১৩৬৭ সাল

প্রকাশক ॥ শ্রীরামানন্দ সাচ্‌দেব
এলাইড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৭ চিত্তরঞ্জন এভেন্যু, কলিকাতা ১৩

মুদ্রক ॥ দেবদাস নাথ এম-এ, বি-এল
সাধনা প্রেস প্রাঃ লিমিটেড
৭৬ বিপিন গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১২

প্রচ্ছদপট ॥ শ্রীখালেদ চৌধুরী

ভূমিকা

মালয়ে বৃটিশের সৈন্যবল পঁচাশী হাজারে এসে ঠেকেছিল, ১৯৪২-এর ১৫ই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুরে তারা জাপানীদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এর আগে হয় নিহত হয়েছিল, নয় ধরা পড়েছিল আরও হাজার কুড়ি। আত্মসমর্পণের ভেতর দিয়ে নাটকীয় বিপর্যয়ের ষোলকলা পূর্ণ হল, দুনিয়ার খুব কম জায়গাতেই বৃটিশ সামরিক শক্তি এত বড় ঘা খেয়েছে। ঠিক একশো বছর আগে কাবুল নদীর গিরিখাতে একটি বৃটিশ বাহিনী বিলুপ্ত হয়েছিল, তারপর প্রাচ্যে এ ঘটনা এই প্রথম। জাপানীদের হাতে ধৃত বন্দীদের অর্ধেকেরও বেশি ছিল ভারতীয়—সব মিলিয়ে প্রায় ষাট হাজার; তার অর্ধেকেরও কম—প্রায় হাজার পঁচিশ ভারতীয় দল ত্যাগ ক'রে, আজাদ হিন্দ ফৌজে গিয়ে জুটেছিল। বাহিনীটি ছিল 'আজাদ হিন্দ' নামে 'অস্থায়ী সরকারে'র—যাঁকে নিয়ে এই গ্রন্থ, সেই সুভাষচন্দ্র বসুকে সামনে রেখে এই সরকার জাপানীদের সঙ্গে মিত্রতাবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্র ব'লে নিজেকে জাহির করেছিল। সুতরাং বিদ্রোহ, দলত্যাগ ও রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ—সামরিক আইনভুক্ত এইসব অপরাধে তারা অপরাধী।

কিন্তু অর্ধেকের বেশি ভারতীয়—সংখ্যায় তারা হাজার পঁয়ত্রিশ হবে—উপর্যুপরি দুঃখকষ্ট সহ্য ক'রেও কখনও কখনও যমযন্ত্রণা ও নিশ্চিন্ত মৃত্যু সত্ত্বেও আনুগত্যে অটল ছিল—কিছুতেই তারা নেমকহারামি করেনি এবং সৈন্যবাহিনীতে প্রবেশকালীন প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করেনি। একই রেজিমেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাটালিয়ানভুক্ত যারা তাদেরই সগোত্র, একই ঐতিহ্যে মানুষ সেইসব সঙ্গীসাথীরা যুগপৎ উত্তর আফ্রিকায়, ইতালিতে আর বর্মার যুদ্ধ ক'রে বাহিনীর মুখোজ্জ্বল করেছে এবং বৃটিশ, মার্কিন, জার্মান নির্বিশেষে সব সহযোদ্ধার কাছ থেকেই সুনাম কিনেছে। কেন তবে এদেরই একটা অংশ শত্রুপক্ষে চলে গিয়েছিল? বেশির ভাগ বৃটিশ সৈন্যের ধারণায় ওরা যা করেছে, তা স্রেফ বিশ্বাসঘাতকতা। সত্যিই কি তাই? আবার অন্যদিকে বেশির ভাগ

ভারতবাসী রীতিমতভাবে বিশ্বাস করেছিল যে, ওদের আচরণে প্রকাশ পেয়েছে জাতীয়তাবাদী আবেগ। সেটাও কি ঠিক?

মানুষের আচরণের উদ্দেশ্য নিয়ে যারাই মাথা ঘামায়, এই একটি প্রশ্নে তারা সকলেই আগ্রহবোধ করবে। দ্বিতীয় প্রশ্ন হল: যুদ্ধশেষে এইসব লোকজনের প্রতি কি রকমের ব্যবহার করা হয়েছে? এ ব্যাপারে যেসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল, সে সম্পর্কে নানামহল থেকে চুটিয়ে সমালোচনা করা হয়েছে। একটা জিনিস ঘটে যাবার পর সে সম্বন্ধে সমালোচনা করা সহজ, কিন্তু তখনকার অবস্থায় অন্য কোন মূলনীতি গ্রহণ করা যেত ব'লে আমি মনে করি না। অবশ্য আমার মনে আছে সে সময়ে প্রত্যেকটি সম্ভাব্য কর্মপন্থার গুরুতর—ও বাস্তব—বিপদ্ দেখিয়ে বেশ কয়েকটি বিবৃতি বেরিয়েছিল; কিন্তু এমন কোন গঠনমূলক বিকল্প প্রস্তাব এসেছিল ব'লে আমি জানি না যা সে সময়ে নাকচ করা হয়েছিল।

এ ব্যাপারে আগাগোড়া সুভাষচন্দ্র বসুর ব্যক্তিত্বের একটা প্রধান ভূমিকা রয়েছে; মিঃ টয় তাঁর বইতে সে বিষয়ে লিখেছেন। এখানে তাঁর বইয়ের ভূমিকা প্রসঙ্গে অন্য একটা দিক থেকে খুব মোটামুটি কয়েকটা কথা বলা হচ্ছে। বিদ্রোহের অপরাধে আনুষ্ঠানিকভাবে অপরাধী পঁচিশ হাজার লোকের মধ্যে কার দোষ ঠিক কতখানি—তা বলা সম্ভব নয়, তবে মনোভাবের দিক দিয়ে তাদের চারটি কোঠায় ভাগ করা যায়। কিন্তু লোক এই ভেবে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়েছিল যে, সুবিধে পেলেই তারা বৃটিশ ফৌজে আবার ফিরে যাবে—এদের সংখ্যা খুবই কম ছিল ব'লে আমি মনে করি। কিন্তু লোক—আমার মতে, তারাই সংখ্যায় বেশী—কী করবে ঠিক করতে না পেরে ভুল ধারণার বশে বিপথগামী হয়েছিল এবং তারা মোটামুটিভাবে বিশ্বাস করত যে তাদের সামনে মোটামুটিভাবে একটি পথই খোলা আছে। অন্যেরা ছিল খোলাখুলিভাবে সুবিধাবাদী; কিছু লোকের মধ্যে ছিল সত্যিকারের জাতীয়তাবাদী আবেগ। আমার মনে হয়, দ্বিতীয় দলে যত লোক তার চেয়ে ঢের কম লোক ছিল শেষের দুই দলে। অবশ্যই এই বিভাগগুলো খুব ধরাবাঁধা ছিল না; অনেকে ছিল যাদের মনোভাব একেবারেই পাঁচমেশালি ধরণের এবং প্রায় সকলেরই মনোভাবে মেশাল ছিল।

যুদ্ধের সময়ে যখন সৈন্যসংখ্যা বেড়ে পঁচিশ লক্ষ হয়েছিল—তখনও ভারতীয় সেনাবাহিনীতে লোকে স্বেচ্ছায় আসত। ভারতীয় জীবনযাত্রার মান অনুযায়ী পল্টনের বেতন ও খাওয়া-পরা বেশ ভাল, কতকটা সেই কারণে এবং কতকটা ভারতে সৈনিকবৃত্তির বরাবরই মান-ইজ্জত আছে ব'লে লোকে পল্টনে নাম লেখাত। সাধারণ সেপাই হিসেবে ঢুকে পরে যারা অফিসার হত, তারা প্লেটুন কিংবা দরকার পড়লে কোম্পানিও চালনা করত এবং তারা হত বড়লাটের স্বাক্ষরযুক্ত অধস্তন কমিশনভুক্ত অফিসার—দেড়শ বছর ধ'রে এই ব্যবস্থাই চলে এসেছে, কিংস্ কমিশনপ্রাপ্ত উচ্চতন অফিসার বলতে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত সকলেই ছিল বৃটিশ। সাধারণ নিয়মে অথবা জরুরী অবস্থায় কমিশনপ্রাপ্ত অফিসারদের মধ্যে সিঙ্গাপুরের ঘটনা ঘটবার সময় নাগাদ—বোধ করি পাঁচজনে একজন ছিল ভারতীয়।

সেপাইরা ধরা পড়লে ওপরওয়ালা অফিসারদের কাছ থেকে তাদের সরিয়ে ফেলা হত। যেটুকু খবরাখবর তারা পেত, সবই প্রায় জাপানীদের মারফত। বলা হত বৃটেন যুদ্ধে হেরে গেছে, লড়াই ফতে। এইরকম একটি ব্যাটালিয়ানের লোকজনদের আর নিম্নপদস্থ অফিসারদের আমি বিলক্ষণ চিনতাম। অ্যাডজুট্যান্ট আর সার্জেন্ট-মেজরদের মধ্যবর্তী তাদের সুবাদার-মেজরকে আমার মনে আছে, ছোটখাটো সরলপ্রকৃতির সেই মানুষটির বাড়ি দূর পাহাড় এলাকায়। হিমালয়ের চাষীবাসী মানুষ ওরা, লোকের কথায় সহজেই কান দেয়—পাহাড়ের ওপারে যে জগৎ, সে জগৎটার দিকে তারা হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকে। জবরদস্ত সেনাপতির অধীনে ওরা চমৎকার লড়াই করে; কিন্তু মাথার ওপর কেউ দেখবার না থাকলে নিজেদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাব সম্বন্ধে ওরা এত বেশী সচেতন হয়ে পড়ে যে, তখন সহজেই অন্যের প্রচারের ফাঁদে পা দেয়। এই ব্যাটালিয়ানে কিংস্ কমিশনপ্রাপ্ত একজন ভারতীয়কে পাঠানো হয়; আত্মসমর্পণের অল্প আগে কিছুদিন সে এই সেনাদলে কাজ করেছিল। ব্যাটালিয়ানের লোকজনদের সে ব'লে বেড়ায়, যুদ্ধ খতম, এখন তারা ঠিক করুক জাপানীদের জন্যে পায়খানা খুঁড়বে, না আবার ফিরে পল্টন হবে—অবশ্য এবার তারা লড়বে স্বাধীন ভারতের পক্ষ নিয়ে। তারা পল্টন হওয়ার পথই বেছে নিল।

আমার ধারণা, বহু ব্যাটালিয়ানের অবস্থাই এই একটি ব্যাটালিয়ানের

ধরনধারন থেকে আঁচ করা যাবে। স্বাদেশিকতার ভাব তার মধ্যে নিশ্চয়ই ছিল; ভারতবর্ষ ধাপে ধাপে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে চলেছে বহু আগে থেকেই তারা জানত; সে-সম্বন্ধে একটা অনির্দিষ্ট আবেগসর্বস্ব স্বাভাবিক সহানুভূতি থাকলেও তার জোর এত ছিল না, যাতে সৈন্যবাহিনীর প্রভাব কাটানো যায়—সামরিক বাহিনীব প্রভাব বলতে তার নিয়মশৃঙ্খলা, রেজিমেণ্টগত গর্ববোধ, ব্যক্তিগত ভাবে অফিসারদের প্রতি ভক্তি, ভাল খাবাব আর যথাবিহিত ব্যবহাব। কিন্তু এখন তারা সক্রিয়ভাবে বিপথে চালিত হচ্ছিল এবং এই শ্রেণীর যে সব লোকজন—আমার বিশ্বাস পঁচিশ হাজার সৈন্যের মধ্যে তারাই অধিকাংশ—পূর্বতন সঙ্গীসাথীদের বিরুদ্ধে লড়তে হতে পারে এটা তারা ঠিক ভাবতে পারেনি। আজাদ হিন্দ ফৌজ থেকে এই ধরনের লোক হয় তাড়াতাড়ি ভেগে গিয়েছিল, নয় ধরা দিয়েছিল।

সঙ্গী বৃটিশ অফিসাররা যাকে বেইমানি বলছে, ভারতীয় বন্ধুরা তারই নাম দিচ্ছে দেশপ্রেম—শিক্ষিত কিংস্ কমিশন প্রাপ্ত অফিসাররা এ জিনিস অনবরত শুনছে, তাই তাদেব মধ্যে এই দুই বিপরীত মূল্যবোধজাত অন্তর্বিরোধ আরও বেশি ক'রে লেগে থাকত। তা সত্ত্বেও তারা কিংস্ কমিশন ছাড়েনি এবং তার সুখসুবিধেগুলো রীতিমতভাবে ভোগ করেছে; তারা জানত ভারতীয়দের মধ্যে কেউ কেউ—এবং নিঃসন্দেহে কখনও কখনও তাদের নিজেদেরও মন বলেছে যে, তারা বিশ্বাসঘাতক। সুভাষচন্দ্র বসুর মত লোককে শ্রদ্ধা না ক'রে পারা যায় না; ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে থাকা তাঁর দিক থেকে অকর্তব্য—এটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস ক'রে তিনি পদত্যাগ করেছিলেন। যারা দুদিনে দল বদলেছিল এবং দ্বিতীয় বারেও যারা আরামের পথই বেছে নিয়েছিল—তাদের সবাইকে শ্রদ্ধা করা যায় না। কিন্তু এ কথা ভাবলে ভুল হবে যে, একমাত্র সুবিধাবাদী মনোভাবই ছিল। মোহন সিং-এর কাহিনী এ বইতে বলা হয়েছে; মোহন সিং ছিলেন এমন একজন অফিসার, যিনি সত্যিকার বিশ্বাস থেকে নিজের পথ বেছে নিয়েছিলেন এবং শত নির্যাতনেও তাঁকে টলানো যায় নি। তাছাড়া অনেকের কাছে সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণও ছিল দুর্নিবার।

জাপানীরা বড় বেশী বাড় বেড়েছিল এবং ইম্ফলের দীর্ঘ নাছোড়বান্দা যুদ্ধে তাবা পরাস্ত হয়। জেনারেল শ্লিম-এর বিজয়ী বাহিনী বর্মা

ভেদ ক'রে দক্ষিণ মুখে হু হু করে এগিয়ে যায়; আশাভঙ্গ হয়ে অনশনক্লিষ্ট ছিন্নবাস পরিহিত পর্যুদস্ত আই-এন-এ সৈন্যেরা গোড়ায় দুজনে, তিনজনে, তারপর প্লেটুনকে প্লেটুন, ব্যাটালিয়ানকে ব্যাটালিয়ান বুকে হেঁটে এসে আত্মসমর্পণ করতে লাগল। আন্তর্জাতিক ও সামরিক আইন অনুসারে বিদ্রোহ ও দলত্যাগের অভিযোগের সামরিক আদালতে তাদের বিচার হতে পারত এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের গুলি ক'রে মারা যেতে পারত। কিন্তু রাজনৈতিক তাৎপর্য থাকায় সমস্যাটা স্পষ্টতই খুব গুরুতর ছিল; তখন সমস্যাটি ধামাচাপা দেওয়া হল—হাতে তখন অনেক কাজ—এবং এমনভাবে তাদের ভারতবর্ষে ফেরত পাঠানো হল যেন তারা যুদ্ধবন্দী। ভারতীয় জনসাধারণ তখনও তাদের অস্তিত্বের খবর জানত না। কিন্তু জাপানের সঙ্গে অতর্কিতে যুদ্ধ শেষ হতেই সমস্যাটি আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না। আই-এন-এ সম্বন্ধে দেশের লোককে জানাতে হল এবং তাদের সম্বন্ধে কী করা হবে না হবে সে বিষয়ে সরকারকে মনস্থির করতে হল।

তাদের যা অপরাধ আইনত তার শাস্তি প্রাণদণ্ড। অবশ্য পঁচিশ হাজার লোককে প্রাণদণ্ড দেবার কথাই ওঠে না। এ ক্ষেত্রে প্রাণদণ্ডটা হবে নৃশংস, অন্যায় ও হটকারী। অন্যদিকে আবার বিদ্রোহ ও দলত্যাগের অপরাধও কখনও মার্জনা করা চলে না—নিছক ন্যায়বিচারের ভাবনা ভেবে নয়, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ভবিষ্যৎ ভেবে। এই বাহিনী যদি তার শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারে, তাহলে নব ভারতের পক্ষে তা হবে মূল্যবান সম্পদ; নিয়মশৃঙ্খলা ঘুচে গেলে সেটা হবে ভয়ের ব্যাপার। ঠিক হল: শাদা, ধূসর ও কালো—আই-এন-এ'র লোকদের এই তিন দলে ভাগ করা হবে। পালাবার উদ্দেশ্য নিয়ে যারা আই-এন-এ'তে যোগ দিয়েছিল, তাদের ফেলা হবে প্রথম দলে; তারা পূর্বেকার সুযোগ সুবিধা ফিরে পাবে। পাল্লায় প'ড়ে যারা বিপথগামী হয়েছিল তারা পড়বে দ্বিতীয় দলে; অবিলম্বে বিচার শেষ ক'রে পল্টন থেকে নাম কাটিয়ে তাদের খালাস দেওয়া হবে। শেষের দলে যাদের ফেলা হবে, তারাই শুধু থেকে যাবে; এরা যা কিছু করেছে সজ্ঞানে। যারা তাদের মধ্যে বড় অপরাধী তারা অনেকেই আগে দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ছিল; আই-এন-এ'তে ভর্তি করাবার জন্যে কিংবা যোগ দেবার পর পালাবার চেষ্টার জন্যে এরা অনেকেই এদের সহযোদ্ধাদের যমযন্ত্রণা দিয়েছে, বেত

মেরেছে অথবা খুন করেছে। এদের মধ্যে পয়লা নম্বরের অপরাধীরা যথাবিহিত সাজা পাবে; যাদের অপরাধ কিছুটা কম, প্রাণদণ্ডের বদলে বিভিন্ন মেয়াদে তাদের কারাদণ্ড হবে—বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কারাদণ্ডের মেয়াদ হবে কম।

জাপানের সঙ্গে সন্ধি হবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; মানবিকতা সম্পন্ন ও দায়িত্বশীল কারো পক্ষে এ ছাড়া দ্বিতীয় কোন কর্মপন্থা গ্রহণ করা যে সম্ভবপর ছিল এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত। ১৯৪৬ সালে দিল্লীর আইন-সভায় আমি এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করি এবং আজও তা করব। কিন্তু ঘটনা এত দ্রুত ঘটতে থাকে যে তার সঙ্গে তাল রাখা সম্ভব হয়নি; এমন যে হবে আগে থেকে তা আন্দজও করা যায়নি। আমি এও স্বীকার করি যে ঘটনার পরিণতি কী হবে যদি জানা যেত তাহলে দেশের লোকের কথা ভেবে অন্য ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ঢের ভাল হত। উচিত ছিল পয়লা নম্বরের জনকয়েক অপরাধীকে বেছে নিয়ে খুব চটপট তাদের বিচারের পাট চুকিয়ে ফেলা, আরও কয়েক সপ্তাহ আই-এন-এ'র অস্তিত্বের কথা লোককে না জানানো, বিচার যতক্ষণ না শেষ হয় ততক্ষণ খবরটা চেপে রাখা এবং তারপর বাকি সকলের দণ্ড মকুব করার নীতি ঘোষণা করা। কাজটা খুব সহজ হত না; মামলার নথিপত্র তৈরির জন্যে আইনজীবীদের সময়ের দরকার, বিপুলপরিমান তথ্য ঘাঁটতে হবে, তার মধ্যে কিছু তিন বছরের পুরনো। তাছাড়া খবর গোপন রাখাও সহজ কর্ম নয়। তাহলেও তখন কারো মাথায় এলে—হয়ত করা যেতে পারত। কিন্তু কারো মাথায়ই আসেনি।

নীতি ঠিকই ছিল; প্রকাশ্যে সব কিছু হতে দিয়ে—পরে যা দাঁড়াল—গুরুতর রকমের ভুল করা হল। দুটো ধারনা থেকে তা করা হয়েছিল: প্রথমত, প্রস্তাবিত ব্যবস্থা যে ন্যায়সঙ্গত ও যথার্থই অনুকম্পামূলক, তা ভারতীয় জনসাধারণের নজরে আসবে; দ্বিতীয়ত, জনমত হঠাৎ কয়েক সপ্তাহের মধ্যে উল্টোদিকে ঘুরে যাবে না। প্রথম ধারণাটি ঠিক ছিল; সংবাদপত্রের স্তম্ভে নীতি ঘোষণা করা হল—তার খসড়া আমিই তৈরি করেছিলাম; এমন কি কংগ্রেস নেতাদের মহলও গোড়ায় খুশি হয়ে তাতে সমর্থন জানালেন। ভারতীয়দের মধ্যে খুব কম লোকই এ যুদ্ধকে নিজেদের যুদ্ধ ব'লে মনে করেছিল, খুব কম লোকই চেয়েছিল এ যুদ্ধে আমরা

জিতি। তা সত্ত্বেও জাপানী বোমার ভয় দূর হওয়ায় লোকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, ভুল আশা জাগল এবার বুঝি জিনিসপত্রের দাম কমবে, নিয়মতান্ত্রিক অগ্রগতির আশায় লোকে চঞ্চল হয়ে উঠল এবং ভারতীয়দের বিরুদ্ধে লড়াবার জন্যে ভারতীয়েরা ভারতীয়দের যমযন্ত্রণা দিচ্ছে, এ খবরে তারা খুশি হয়নি।

কিন্তু সপ্তাহ কয়েকের মধ্যে একেবারে ভোল বদ্‌লে গেল। স্বদেশী ভাবের জোয়ারে আজাদ হিন্দ ফৌজকে ভারতের বীর মুক্তিযোদ্ধা ব'লে অভিনন্দন জানানো হল; নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবেন এমন কোন রাজনৈতিক নেতাই নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলেন না—সবাই ছুটে এলেন নিপীড়িত বীরদের উদ্ধার করতে। আই-এন-এ বন্দীদের সাহায্যে তহবিল খোলা হল, আই-এন-এ পতাকা-দিবস পালিত হল। তখন অবস্থা এই যে, আই-এন-এ'র বিরুদ্ধে কোন তথ্য প্রমাণই কেউ বিশ্বাস করে না; আই-এন-এ'র কারো অকিঞ্চিৎকর কার্যকলাপেও যদি কেউ ভক্তিতে গদ্‌গদ্‌ না হয় তাহলে তা দেশদ্রোহিতা ব'লে গণ্য হয়। জনসাধারণের এই ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ আবেগে—যাতে বৃটিশের মত কংগ্রেস নেতারাও আড়ালে বিচলিত বোধ করেছিলেন—গোড়াকার নীতি পরিবর্তিত হল; স্বাধীনতা যখন ভারতবর্ষের দ্বারে, যখন এমনিতেই ভারতীয় রাষ্ট্র তার পুরনো আনুগত্য বিসর্জন দিতে চ'লেছে -তখনও সেই আনুগত্য ত্যাগ করার জন্যে লোককে শাস্তি দেওয়া সাজে না। তাতে বিক্ষোভের এমন আগুন জ্বলে উঠবে, যার ফলে বৃটেন ও ভারতের মধ্যে গোটা আপস ব্যবস্থাই পুড়ে ছারখার হবে।

সকলেরই বিচার হোক এবং সবাই দোষী সাব্যস্ত হোক—কিন্তু রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রচেষ্টার অপরাধে শাস্তি হোক কর্মচ্যুতি: এই মর্মে আরেকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। দেশপ্রেমের প্রেরণায় আই-এন-এ যুদ্ধ করেছে, এই দাবি বাহ্যত মেনে নেওয়া হবে এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের সঙ্গে যুদ্ধবন্দীসুলভ ব্যবহার করা হবে। কেবল যারা নৃশংসতার অপরাধে অপরাধী, তাদের হয় প্রাণদণ্ড, নয় কারাদণ্ড হবে। বহু ইংরেজ মনে করেছিলেন যে, এই সিদ্ধান্তের ফলে পঁচিশ হাজার অচঞ্চলচিত্ত সৈনিকের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হল, আর সেই সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হল যুদ্ধজয়ী ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর প্রতি। একদিক থেকে বিশ্বাসঘাতকতা তো বটেই। এর ফলে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ভিৎসুদ্ধ নড়ে উঠল;

আই-এন-এ'র লোকজন গ্রামাঞ্চলে যেখানে যেখানে গেল সেখানেই গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠল। ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারীর নৌবিদ্রোহেও এর খানিকটা প্রভাব পড়েছিল। তা সত্ত্বেও, "আমি মনে করি সে সময়কার অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে যে দুটি অবাঞ্ছিত রাস্তা খোলা ছিল, তার মধ্যে ঠিক পথই বাছা হয়েছিল। পুরনো নীতি আঁকড়ে ব'সে থাকলে তা হত ভারতে বৃটেনের প্রকৃত উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।

বিষয়টা খুবই বিতর্কমূলক এবং এখানে অল্পের মধ্যে সব কথা বলতে হল। কাজেই বিচারের একটি গলদ ও একটি মারাত্মক ভুলের ব্যাপারে এই সঙ্গে একটা পুনশ্চ জোড়া দরকার। সাবেকী পরিকল্পনায় প্রথম যে বন্দীর বিচার করা হবে ব'লে ঠিক হয়, সে ছিল কিংস্ কমিশনভুক্ত একজন অফিসার, তার বিরুদ্ধে সরকার পক্ষের অভিযোগ যে, সে দু'জন সম্ভাব্য দলত্যাগীকে হাত বেঁধে ঝুলিয়ে রেখে গোটা ব্যাটালিয়নকে দিয়ে বেত মারবার হুকুম দেয়; পরে দেখা যায় দু'জনের মধ্যে একজন মরে গেছে। গোড়ায় ঠিক ছিল যাতে খুব বেশী লোকের নজরে না পড়ে, তার জন্যে খুব দূরে কোথাও বিচার হবে, এদিকে ফিল্ড-মার্শাল অকিনলেক ধরেই নিয়েছিলেন যে, এ মামলার বিবরণ শুনে ভারতীয় জনসাধারণ স্তম্ভিত হবে—কাজেই তিনি হুকুম দিলেন এমন কোথাও বিচার হোক লোকে যেখানে সহজেই যেতে পারে। রাজধানীর কাছে ব'লে, সংবাদপত্রের লোক ও নির্দিষ্টসংখ্যক কিছু বেসরকারী লোকজন যেতে পারবে ব'লে দিল্লীর লালকেল্লা বেছে নেওয়া হল। কিন্তু আই-এন-এ'র রণধ্বনিতে লালকেল্লা ছিল সেই জায়গা যেখানে নব ভারতের ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলিত হবে। লোকে ভাবল বুঝি ইচ্ছে ক'রে ঠাট্টা করবার জন্যে, বিজিতদের ওপর গায়ের ঝাল ঝাড়বার কু-অভিপ্রায়ে এ জায়গা বাছা হয়েছে। ফলে প্রতিপক্ষ তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল এবং আই-এন-এ বন্দীদের বিচার ভারতের পক্ষে জাতীয় মান রক্ষার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল।

এইখানেই হয়েছিল ভুল হিসেব। এর পর শেষ মুহূর্তে বেত মারবার মামলায় আইনের একটা ফ্যাকড়া উঠল; ফলে মামলটা স্থগিত রইল। সে জায়গায় অন্য তিনজন আসামীর বিচার শুরু হ'ল। বলা হ'ল, এ তিনজনের অপরাধও কম নৃশংস নয়, কিন্তু তা ঠিক নয়। আই এন এ'কে যুধ্যমান সৈন্যদল ব'লে একবার যখন মেনে নেওয়া হয়েছে, তখন এদের প্রত্যেকের

আচরণই সাধারণ যুদ্ধরীতিসম্মত। যেমন: ওদের মধ্যে একজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, দলত্যাগকালে জনকয়েককে ধ'রে সে সামরিক আদালতে চালান দেয় এবং আন্তর্জাতিক প্রথা অনুযায়ী আদালতে প্রাণদণ্ড হলে সে তা অনুমোদন করে। বেত মেরে একজনকে মেরে ফেলা কিংবা যমযন্ত্রণা দেওয়ার সঙ্গে তফাৎ আছে। আগে সিদ্ধান্তই ছিল, সুতরাং তাদের ছেড়ে দেওয়া ঠিক কাজই হয়েছিল, আমার বিশ্বাস, ফিল্ড-মার্শাল অকিনলেক যদি একটা কঠোর সিদ্ধান্ত নিতেন তাহলে বৃটেন ও ভারতের তাতে উপকার হত। তবে ঠিক ঐ পর্যায় ও ঠিক ঐভাবে আসামীদের আদালতে আনা ঠিক হয়নি। হয়ত তার বদলে প্রথম মামলাটি আদালতে উঠলেও খুব কিছু ইতরবিশেষ হত না, কেননা তৎকালীন উত্তেজনাকর অবস্থায় বেত মারার সাক্ষ্যপ্রমাণ লোকে কানে তুলত না। তবে মারাত্মক ভুল যে হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই এবং আমার বিবেচনায় কে দায়ী সে কথা না তুলেও বলতে পারি যে, কমাণ্ডার-ইন-চীফের এ ব্যাপারে কোন দোষ ছিল না।

আজাদ হিন্দ ফৌজ সংক্রান্ত বিষয়ের দুটো দিক সম্পর্কে আমি সংক্ষেপে আমার সুদৃঢ় মত ব্যক্ত করলাম। যারা শত্রুপক্ষে চলে গিয়েছিল তাদের আচরণ এবং তাদের স্বপক্ষে ভারতীয় জনমত উত্তাল হওয়া—এর পেছনে আরও একটা কারণ ছিল। তা হল সুভাষচন্দ্র বসুর ব্যক্তিত্ব। এ সম্পর্কে ইচ্ছে ক'রেই আমি কিছু বলিনি। 'একজন বিপ্লবীর জীবনচরিতে' মিঃ টয় বৃটিশপক্ষ থেকে এই প্রথম এই মানুষটির চরিত্র খতিয়ে দেখবার ও তাঁর জীবনের ঘটনাবলী বিবৃত করবার চেষ্টা করেছেন। কাহিনীটি চিত্তাকর্ষক। সুভাষচন্দ্রের স্বভাবের কিছু জিনিস ইংরেজ পাঠকের একেবারেই বরদাস্ত হবে না—তার সেই একগুঁয়ে প্রকৃতি আর আপসহীন মনোভাব, 'লোকের দুঃখ যার কাছে দুঃসহ' তিনিই আবার স্বনির্বাচিত পন্থায় মুক্তি অর্জনের জন্যে বলেন 'রক্ত উৎসর্গ করো'। তাঁর মধ্যে বাস্তববোধের অবিশ্বাস্য রকমের অভাব ছিল, নইলে ইতালি আক্রমণ ও নরম্যাণ্ডি উপকূলে সৈন্যাবতরণের ব্যাপারগুলো কেউ ওভাবে উড়িয়ে দিতে পারে? তবু এই অন্ধ উন্মাদনাই আবার তাঁর নেতৃত্বের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। ক্ষমতা তাঁকে নষ্ট করেছিল, ফলে তিনি আরও একগুঁয়ে, আরও অসহিষ্ণু, আরও অন্ধ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এই মানুষটির বিরাট ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিবৃত্তি ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা সম্বন্ধে কারো

কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না। গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারী হিসেবে মাসের পর মাস সাক্ষ্যপ্রমাণ ঘেঁটে কাজ করবার পর লেখক এই বই লেখায় হাত দেন; একথা কল্পনা করলে বোধ হয় খুব ভুল হবে না যে, শিকার বানবিদ্ধ করতে গিয়ে তার সঙ্গে তিনিও মজে গিয়েছিলেন—শতাধিক বছর আগে ঠগদের নিয়ে লিখতে গিয়ে শ্রীম্যান-এর যে দশা হয়েছিল। কিন্তু এই মগ্নতার ফলে স্থভাষচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর মধ্যে সতর্ক অথচ একটা গভীর শ্রদ্ধা এবং ভারতের বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে সহানুভূতি জেগেছে; তাঁর বইয়ের শেষ অধ্যায়টি বার বার প'ড়েও আমি তাঁর বিশ্লেষণ সম্পর্কে একমত না হয়ে পারিনি। অবশ্য একটা বিষয়ে এখনও আমি নিঃসন্দেহ নই আই-এন-এ মামলার ফলে সত্যিই কি কংগ্রেসের স্থবিধে হয়েছে? এই মামলার ফলে স্বাধীনতার দিন ক্ষণ ও চেহারার সত্যিই কি কিছু উনিশবিশ হয়েছে? মিঃ টয়-এর এই বই ভারতের ইতিহাসের দিক দিয়ে মূল্যবান হবে; আই-এন-এ ও তার প্রতি ব্যবহারের গুণাগুণ নিয়ে যিনি যত তীব্র মতই পোষণ করুন না কেন, এ বই হবে তাঁর পক্ষে অপরিহার্য।

ফিলিপ মেশন

লেখকের কথা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মান ও জাপানীদের পৃষ্ঠপোষকতায় যে ভারতীয় মুক্তি আন্দোলন বিকাশ লাভ করে, তার একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্যমূলক বিবরণ লেখবার কাজ ১৯৪৯ সালে আমি শুরু করি। কাজটা শেষ করতে পাঁচ বছর লাগে। আমি গুহাবাসী মানুষ আখ্যা পাই এবং লেখাটা হয় রীতিমত অপাঠ্য। এখানে সেই একই কাহিনী আমি বলবার চেষ্টা করেছি সুভাষচন্দ্র বসুর চরিতকথার ভেতর দিয়ে—ভারতীয় বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী হিসাবে এই পুরো ব্যাপারটাতে যাঁর ভূমিকা ছিল প্রধান।

পাশ্চাত্য জগতে এ-কাহিনী অজ্ঞাত বললেই হয়, এবং এমন কি ভারতবর্ষেও এ সম্পর্কে খণ্ড বিক্ষিপ্তভাবে সামান্যই বলা হয়েছে। ১৯৪১-এর জানুয়ারী মাসে কলকাতায় পুলিশ প্রহরাধীন অবস্থায় সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান ও দু'মাস পরে বার্লিনে তাঁর আত্মপ্রকাশ থেকে এই ব্যাপারের শুরু বলা যায়। অনতিবিলম্বে নাৎসীদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় এসে পাশ্চাত্যে ধৃত যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে সুভাষচন্দ্র এই ভেবে একটি ভারতীয় স্বেচ্ছাবাহিনী গড়ে তুললেন যে, একদিন সেই বাহিনী জার্মান সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে ভারতবর্ষে প্রবেশ করবে। ১৯৪২ সালে স্তালিনগ্রাদ ও এল্ এলামিনের ঘটনার পর সে আশায় ছাই পড়ল, কিন্তু জাপানীরা সেই সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সম্প্রদায়কে বাগে আনবার জন্যে সুভাষচন্দ্রের সাহায্যপ্রার্থী হল; জাপানীরা তার আগেই মালয়ে একটি ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ ও একটি 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গঠন করেছিল।

কাজেই ১৯৪৩ সালে সুভাষচন্দ্র দূর প্রাচ্যে রওনা হলেন। সেখানে গিয়ে তিনি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের ভার গ্রহণ করলেন, একটি 'অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার' গঠন করলেন, অর্থ ও সৈন্য সংগ্রহের জন্যে পূর্ণোদ্যমে অভিযান চালালেন এবং তাতে সফল হলেন; আর ১৯৪৪ সালে জাপানীদের সাহচর্যে আজাদ হিন্দ ফৌজের পুরোভাগে থেকে ভারতবর্ষে প্রবেশের উদ্যোগ-আয়োজন করলেন। ইম্ফল অভিযানে আজাদ হিন্দ ফৌজের ডিভিশনটি বলতে

গেলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, কিন্তু ততদিন ২নং ডিভিশন বর্মায় এসে পৌঁচেছে এবং মালয়ের বেসামরিক ভারতীয়দের ভেতর থেকে লোক নিয়ে তৈরি ৩ নং ডিভিশনকে তালিম দেওয়ার কাঁজ জোহোরে শুরু হয়েছে। ১৯৪৫-এর গোড়ার দিকে বৃটিশ ভারতীয় চতুর্দশ বাহিনী ইরাবতী অতিক্রম করবার পর ২নং ডিভিশন ছত্রভঙ্গ হল। মালয় রক্ষার জন্যে বাকি রইল ৩ নং ডিভিশন; ১৯৪৫-এর জুন মাসে সুভাষচন্দ্র মালয়ে ফিরে এসে অন্তত প্রচার যুদ্ধ চালু রাখার ব্যবস্থা করলেন। মন্ত্রিসভার সদস্যদের কাউকে কাউকে সঙ্গে নিয়ে শেষ পর্যন্ত রুশদেশের শরণার্থী হবার কথা তখনই তিনি ভাবতে শুরু করেছিলেন; দু'মাস পরে ফরমোজায় এক বিমান দুর্ঘটনায় আহত হয়ে যখন তাঁর মৃত্যু হল, তখনও সেই অভিপ্রায়ই তিনি মনে মনে পোষণ করছিলেন।

এ বিষয়ে প্রকাশিত তথ্যাবলী বর্তমানে প্রভূত। ১৯৪৫-এর নভেম্বরে দিল্লীর সামরিক আদালতে প্রদত্ত আজাদ হিন্দ ফৌজের তিন জন বিশিষ্ট সেনাপতির জবানবন্দী তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ কর্তৃক প্রকাশিত যুদ্ধকালীন বক্তৃতাবলীর তিনটি সংকলন 'অন টু ডেলহি', 'ব্লাড বাথ', 'অন উইথ দি ফাইট' থেকে এ বইতে আমি বিস্তর উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছি।

সুভাষচন্দ্র বসুর প্রকাশিত গ্রন্থাবলী থেকে যথেচ্ছ উদ্ধৃতি দেবার অনুমতির জন্যে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র কলকাতার নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর শ্রীশিশির কুমার বসুর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। 'দি সুভাষ আই নৌউ' গ্রন্থ থেকে প্রচুর অংশ উদ্ধৃত করতে হয়েছে ব'লে শ্রীদিলীপকুমার রায়-কে এবং সাক্ষাতে বহু তথ্য পেয়েছি ব'লে শ্রীকে. পি. কে. মেননকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই। ৫২ পৃষ্ঠার অবিকল প্রতিলিপির মূল পাণ্ডুলিপির অধিকারী মিঃ আলফ্রেড টিণোয়ার; শ্রীনীরদ চৌধুরী ও শ্রী শাহ্ নওয়াজ আমাকে তাঁদের লেখা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করবার অনুমতি দিয়েছেন। 'দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল্' থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করবার অনুমতি দিয়েছেন মেসার্স লরেন্স অ্যাণ্ড উইশার্ট; এঁদের সকলের কাছে আমি ঋণী। মিঃ লুই পি, লোচনার সম্পাদিত 'দি গোয়েবল্‌স ডায়েরিজ্' এবং মিঃ ম্যাল্‌কম মাগারিজ্-সম্পাদিত 'কিয়ানোজ্ ডায়েরি' ও 'কিয়ানোজ্ ডিপ্লোম্যাটিক পেপার্স' থেকে উদ্ধৃতাংশের অনুমতির জন্যে যথাক্রমে মেসার্স হ্যামিশ্ হ্যামিল্‌টন ও মেসার্স উইলিয়ম

হাইনেম্যান-এর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। অন্যান্য অপরিহার্য সূত্রের ঋণ স্বীকার গ্রন্থের মধ্যে যথাস্থানে করা হয়েছে।···

···এই গ্রন্থ রচনায় আমি বহুজনের কাছ থেকে যে সাহায্য ও উৎসাহ পেয়েছি তাতে নিজেকে আমি বন্ধুভাগ্যে ভাগ্যবান ব'লে মনে করি। এ বিষয়ে যাঁর জ্ঞান সর্বস্বীকৃত, সেই মিঃ ডেভিড এণ্ডারসন আমাকে এ বিষয়ে অকুণ্ঠভাবে লিখতে প্রবৃত্ত করেছেন, মিঃ ক্রিস্টোফার ব্ল্যাণ্ড আমাকে আবার নতুন ক'রে লিখতে শুরু করিয়েছেন; অধ্যাপক ব্রাশব্রুক উইলিয়মস্-এর অকাতর উপদেশের দরুনই গ্রন্থটি বর্তমান আকার ধারণ করেছে; মিঃ ফিলিপ মেসন এর সারগর্ভ ভূমিকা লিখে দিয়েছেন; ১৮৪ পৃষ্ঠার মানচিত্র এঁকে দিয়েছেন মিঃ এইচ. সাবোঞ্জিয়ান; মিস্ হ্যাজেল পামার এ বইয়ের দুটি খসড়াই অভাবিত ধৈর্য সহকারে ও অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে টাইপ ক'রে দিয়েছেন; বিশেষভাবে এঁদের সকলের কাছে আমি ঋণী।

সাইপ্রাস, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৫৭ **হিউ টয়**

সূচীপত্র

মানচিত্র

১

যারা ছিল নির্বাসনে

১৯৪১ সাল। বর্ষণসিক্ত ডিসেম্বরের একটি দিন। ঘনায়মান সন্ধ্যায় বনের উপকণ্ঠে প্রতীক্ষমান একদল ভারতীয় সৈনিক। অদূরে উত্তর মালয়ের এক গ্রাম। সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে, পেটে খিধে, পরণে উলিঝুলি পোশাক, গায়ে প্যাচ প্যাচ করছে কাদা, মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে সমানে তিন দিন তারা জঙ্গলে পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছে। শরীর আর বইছে না। দলের এক তরুণ শিখ অফিসার ক্যাপ্টেন মোহন সিং গেছেন গ্রামে, স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে কি রকমের ব্যবহার পাওয়া যেতে পারে জানতে। ১১ই ডিসেম্বর শ্যামদেশের সীমান্তে জাপানী ট্যাংক-বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় ১/১৪ নং পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট, এই লোকগুলো ছিল সেই দলে—কোন রকমে নিজেদের প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে। জলজঙ্গল ভেঙে অনেকখানি রাস্তা তারা পার হয়ে এসেছে। এখন তারা যেখানে, সেটা মিত্রপক্ষের এলাকা ব'লেই মনে হচ্ছে। এ ক'দিন তাদের শরীর আর মনের ওপর দিয়ে কম ধকল যায়নি। নতুন ক'রে আবার যুদ্ধের বিভীষিকা বরণ করবার আগে এখানে তারা ভাঙা শরীরমন একটু জোড়া লাগিয়ে নিতে পারবে।

তা আর সম্ভব হল না। ক্যাপ্টেন ফিরে এসে জানালেন শত্রুপক্ষ তাদের পেছনে ফেলে মালয়ের অনেকখানি ভেতরে ঢুকে পড়েছে। সঙ্গীদের কাছে ফিরে যাবার পথ বন্ধ, মাঝখানে পঞ্চাশ মাইল জায়গা জুড়ে সর্বনেশে বন। সৈন্যদের মন একেবারে ভেঙে গেল। বুভুক্ষু ভাগ্যবিড়ম্বিত

মানুষগুলো চোখেমুখে অন্ধকার দেখতে লাগল। এ কষ্টের চেয়ে বরং জাপানীদের হাতে ধরা পড়াও তাদের কাছে ভাল ব'লে মনে হল। বৃটিশ কর্ণেল আর সেইসঙ্গে ভারতীয় অফিসার দুজন সখেদে তাদের নিয়ে গিয়ে তুললেন গ্রামের থানায়। বারো মাইল দূরে অ্যালর স্টারে আত্মসমর্পণের খবর চ'লে গেল। উত্তরে জাপানীরা জানিয়ে দিল পরদিন এসে সেখান থেকে ওদের নিয়ে যাবে।

পরদিন ১৫ই ডিসেম্বর সকালে লোক এল। জাপানী নয়, এক অমায়িক শিখ ভদ্রলোক। যে গাড়িতে ক'রে তিনি এলেন, সে গাড়িতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা লাগানো। তিনি জানালেন, হ্যাঁ, ভারতীয় সৈন্যদের সঙ্গে দেখা করতেই তাঁর এখানে আসা; তিনিই তাদের দেখাশুনা করবেন এবং তারা যাতে ভাল ব্যবহার পায় তা দেখবার ভারও তিনি নিচ্ছেন। তাঁর কথা পাকা করবার জন্যে এবং দলের সবাইকে অ্যালর স্টারে নিয়ে যাবার জন্যে খানিক পরে এক জাপানী অফিসার এসে পৌঁছুলেন। বৃটিশ কর্ণেলটিকে দল থেকে আলাদা ক'রে নিয়ে যাওয়া হল; ভারতীয় অফিসার দুজন অবশ্য শিখ ভদ্রলোকের সঙ্গেই চললেন। শিখ ভদ্রলোক আত্মপরিচয় দিয়ে বললেন: তাঁর নাম গিয়ানী প্রীতম সিং, নিবাস ব্যাঙ্কক, সাধুসন্ত মানুষ, তাঁর ব্রত ভারতের স্বাধীনতা। জাপানীদের সঙ্গে তাঁর একটা বোঝাপড়া হয়েছে, তিনি ভারতীয়দের নিয়ে একটি মুক্তিফৌজ গড়ে তুলতে চান। একটু আগে যে জাপানী অফিসারটি দর্শন দিয়েছিলেন, তাঁর নাম মেজর ফুজিহারা; তাঁর ওপর নির্দেশ আছে: ভারতীয়দের সঙ্গে যেন যুদ্ধবন্দী-সুলভ ব্যবহার করা না হয়, জাপানের সম্মানিত বন্ধু হিসেবে তাদের দেখতে হবে। জাপান চায় বৃটিশের শাসনশৃঙ্খল ভেঙে ভারতবর্ষ স্বাধীন হোক: জাপান তার বিজয়ী বাহিনীর যুদ্ধযাত্রায় বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য চায়।

অ্যালর স্টারে এসে তারা দেখল প্রীতম সিং 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লীগ অব ইণ্ডিয়া' নাম দিয়ে এক সংগঠন খাড়া ক'রে তার এক অফিস খুলে বসেছেন। এ ব্যাপারে স্থানীয় ভারতীয় অধিবাসীরা সকলেই তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিল। এবারে তারা সহায়সম্বলহীন দুঃস্থ সৈনিকদের সেবার কাজে নিজেরা কোমর

বেঁধে লেগে গেল। মেজর ফুজিহারা সেদিন একটু বেশী রাত্রে অফিসার দুজনকে ডেকে পাঠিয়ে কথা বলতে শুরু করে দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, প্রীতম সিং পরিষ্কার ক'রে সব বলেছেন তো? যে এশিয়াবাসী ভাইরা বলদর্পী পাশ্চাত্যের হাতে লাঞ্ছিত হচ্ছে, তাদের বন্দী করে রেখে ব্যথার ব্যথী জাপানের যে কোন সুখ নেই, এখন নিশ্চয় সে কথা তাঁরা বুঝতে পারছেন? শ্বেতাঙ্গ বিজাতীয়দের পরাস্ত ক'রে জাপান জয়ের পথে এগিয়ে চলেছে: ইতিমধ্যেই সে একটি যৌথ-সমৃদ্ধির-অঞ্চল ঘোষণা করেছে, তাতে প্রাচ্যের দেশগুলি হবে স্বাধীন অংশীদার। গ্রেট বৃটেন যুদ্ধে হেরে গেলে বন্ধনমুক্ত অন্যান্য দেশও তাতে যোগ দিতে পারবে: যোগ দিতে পারবে বহুলাঞ্ছিত মালয়, ব্রহ্মদেশ, ভারতবর্ষ। ফুজিহারার কথা বলবার অসাধারণ ক্ষমতা। চমৎকারভাবে আবেগ দিয়ে অন্তরঙ্গের মত এমন অনর্গল কথা ব'লে যান যে, দোভাষী মাঝখানে থাকা সত্বেও তা শ্রোতার মনে সাড়া তোলে। তাছাড়া তিনি যা বলেন আন্তরিকভাবে তিনি তা বিশ্বাস করেন। আস্তে আস্তে ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর মনে তাঁর আন্তরিকতার ছোঁয়াচ লাগল এবং মোহন সিং শেষ পর্যন্ত আলোচনায় জড়িয়ে পড়লেন।

এত বড় একটা কর্মকাণ্ডে প্রীতম সিং-এর মত একজন খুদে লোককে কেন যে হোতা হিসেবে বাছা হয়েছে তা ভারতীয়দের মাথায় ঢুকছিল না। ধর্মপ্রচারক এই শিখ ভদ্রলোক রাজনীতিতে একেবারেই আনাড়ি। কূটনীতির খেলায় তিনি পেরে উঠবেন কেন? নেতার মত নেতা একজনই আছেন যিনি এখন ভারতবর্ষের বাইরে; ভারতীয়দের সকলেই তাঁকে একবাক্যে নেতা ব'লে মানবে। মস্ত তাঁর রাজনৈতিক খ্যাতি। ভারতীয়দের ধারণা তিনি এখন জার্মানিতে কর্মব্যস্ত। নাম তাঁর—সুভাষচন্দ্র বসু।

সুভাষচন্দ্র বসুর কথা প্রীতম সিং-এর মুখেও শোনা গিয়েছিল। ফুজিহারা ও-বিষয়ে কোন রকম মন্তব্য না ক'রে যৌথ সমৃদ্ধির অঞ্চল, বৃহত্তর পূর্ব এশিয়া, 'এশিয়া এশিয়াবাসীর,' ভারতের 'দাসত্ব শৃঙ্খল' ইত্যাদি পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে এলেন। মোহন সিং জানতে চাইলেন এই সব বাঁধিবুলির মানে কী। প্রশ্ন ক'রে কোন ফল হল না। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, তার যুদ্ধবিরোধী প্রস্তাব, স্বাধীনতার উচ্চ আদর্শ—ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা গড়াতে গড়াতে শেষ

পর্যন্ত আসল জায়গায় এসে ঠেকল। ফুজিহারা বললেন, আরাম কেদারায় বসে থাকলে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না—ফকিরের ডেরায় ব'সে থেকে তো নয়ই। গান্ধী নিছক ধর্মগুরু, রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটানো তাঁর কর্ম নয়। দুনিয়ার ভোল বদলাতে গেলে চাই লড়াই-করা ফৌজ পল্টন। সেপাই-শান্ত্রীরাই তো ইতিহাস তৈরি করেছে। তারপর মোহন সিং-এর দিকে ফিরে ফুজিহারা যা বললেন, তার মোদ্দা কথা হল 'তাহলে এ অবস্থায় কী কর্তব্য আপনার? আপনি একজন সৈনিক, নিজের পথ আপনি নিজেই বেছে নেবেন। আপনার পুরনো মনিবের দশা শেষ। যদি সত্যিই নিজের দেশের স্বাধীনতা আপনার কাম্য হয়ে থাকে, তাহলে কাজে কিছুটা হাত লাগাবার চেষ্টা করতে হবে। আপনার উচিত ভারতীয় জাতীয় ফৌজ গড়ে তোলা।

এই প্রস্তাব শোনবার সময় মোহন সিং-এর মনের মধ্যে দুটো ভাব ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠছিল ভারতীয় জাতীয় মানসের অন্তর্লীন টান এবং বৃটিশের আকস্মিক বিপর্যয়—যা শুধু মালয়েই নয়, সমগ্র দূর প্রাচ্যেই বৃটিশের ভবিষ্যৎ ঝরঝরে ক'রে দিয়েছিল। মোহন সিং পরবর্তী কালে তার সেই রাজনৈতিক মনোভাবের কথা এইভাবে ব্যক্ত করেছেন

> যে নীতি ভারতবাসীর বেলায় খাটবে না, সে জন্যে ভারতবাসী অকাতরে রক্ত ঢালবে—এটা ঠিক উচিত ব'লে আমি আমার মনকে বোঝাতে পারিনি। আক্রমণের বিপদ যখন ঘরের কাছে নামিয়ে এল তখন বৃটেন ঘোষণা করল যে তার লড়াই নাকি স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং এমনি আরও সব বড় বড় গালভরা আদর্শের জন্যে। তখন সে দুয়োরে দুয়োরে সাহায্য চেয়ে বেড়াচ্ছিল। এমন কি তার নিজের জাতীয় ইতিহাসে যখন এক ঘোর দুঃসময়, যখন স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে ভারতবর্ষকে সে নিজের কাজে লাগাচ্ছে—তখনও ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্নটা সে একবার ভেবে দেখতে পর্যন্ত রাজী হয়নি। উল্টে ভারতীয় নেতাদেরই সে গ্রেপ্তারের হুকুম জারী করেছে—কেননা ভারতের স্বাধীনতা চেয়ে তাঁরা নাকি মহা অপরাধ করে ফেলেছেন। নিজেরা চাই ব'লে যে জিনিসের নাম উচ্চারণ

করলেই আমাদের দেশের মহত্তম ব্যক্তিরা দণ্ডনীয় অপরাধী হিসেবে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন, পরার্থে সে জিনিস চেয়ে আমরা ভারতবাসীরা কেন লড়াই করতে যাবো?

আমরা ভারতবাসীরা কেন তবে লড়াই করছিলাম? তার একটিমাত্র জবাবই আমি খুঁজে পেয়েছি: আমরা লড়ছিলাম নেহাত মোহগ্রস্ত হয়ে, বেকুবের মত। নিজেদের বীরপুরুষ ভাবলেও আসলে আমরা ছিলাম ভাড়াটে সৈনিক; লড়াইটা পুরোপুরি বৃটেনের স্বার্থে হলেও টাকাটা দীনদরিদ্র ভারতের। এইভাবে ভারতেরই লোক অর্থ ও সামগ্রী দিয়ে ভারতকেই পদানত রাখার ব্যাপারে বৃটেনকে সাহায্য করা হচ্ছিল।

এইভাবে চুটিয়ে জাতীয়তার যুক্তি খাড়া করা হল। যতদিন লড়াই লাগেনি, ততদিন মোহন সিং ভারতীয় অফিসার হিসেবে অন্যদের তুলনায় দেশের ডাক শুনে বেশী উতলা হয়েছিলেন এমন নয়। এখন বৃটিশেরা পাততাড়ি গুটিয়েছে—পাততাড়ি যে গুটিয়েছে, তাতে তাঁর সন্দেহ ছিল না—এ অবস্থায় মোহন সিং-এর কী কর্তব্য, কোথায় তাঁর ইষ্ট নিহিত? মোহন সিং স্বদেশীভাবাপন্ন মানুষ; যে কাজে ভারতবর্ষের লাভ হবে, সে কাজ করতে তিনি রাজী। কিন্তু জাপানীরা কি স্রেফ একদল উদ্ধত অত্যাচারীর জাত নয়? ভারতীয় বন্দীদের দিয়ে বিভীষণ-বাহিনীর কাজ করিয়ে নেবার চেষ্টা ইতিমধ্যেই তারা শুরু করে দিয়েছে—এ থেকেই তাদের মতলব পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে যাচ্ছে। জোরের সঙ্গে মোহন সিং স্পষ্টাস্পষ্টি আপত্তি জানালেন। বললেন, 'এখানে তোমাদের এই উঞ্ছবৃত্তিতে কোন লাভ হবে না। মালয়ে বৃটিশকে হারিয়ে তোমরা বড় জোর তাদের ঠেলাতে পারো, কিন্তু তাদের প্রবাশায়ী করবার একমাত্র স্থান হল ভারতবর্ষ। এখন এই অবস্থায় তোমরা যদি সেখানে যাও, সমস্ত ভারতবাসী ওদের সঙ্গে একজোট হয়ে তোমাদের বাধা দেবে। একমাত্র আমরাই পারি ভারতবর্ষে বৃটিশকে পরাস্ত করতে। যখন আমরা জানব বৃটিশ গিয়ে তোমরা আবার আমাদের ঘাড়ের ওপর চেপে বসবে না, একমাত্র তখনই আমরা অস্ত্র হাতে নেবো।'

ফুজিহারা যা চাইছিলেন তাই পেয়ে গেলেন। কথার ভাবে বোঝা গেল মোহন সিং নিমরাজী। ১৭ই ডিসেম্বর মোহন সিংকে নিয়ে ফুজিহারা গেলেন জাপানী সৈন্যাধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করতে; সমস্ত ভারতীয় বন্দীকে তাঁর অধীনে এনে দেওয়া হল। এই সময়ে জাপানীরা মালয়ে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে আর তাদের পায়ে পায়ে চলেছেন মোহন সিং। তাঁর ধারণায় ফুজিহারার কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন সত্যিকার বন্ধুত্ব। একদিকে এই বন্ধুত্বের জন্যে এবং অন্যদিকে ক্রমশ বেশী বেশী ভারতীয় সৈন্য অধীনে এসে যাওয়ায় তিনি নিজে যেটুকু কাজের কাজ করতে পারছিলেন, তার দরুন মোহন সিং আস্তে আস্তে ওপক্ষে ঝুঁকলেন। মোহন সিং জাপানীদের কাছ থেকে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন দেখে বন্দীরা বর্তে গেল। এবার তাঁর দিক থেকেও তো প্রতিদানে কিছু করা দরকার—তাই মোহন সিং প্রচারধর্মী বক্তৃতা দিতে শুরু করে দিলেন; এইসব বক্তৃতায় বন্দীদের তরফ থেকে হাততালি দেবার লোকের অভাব হল না।

১৯৪১-এর ডিসেম্বরের শেষাশেষি নাগাদ মোহন সিং মন স্থির করে ফেলেছিলেন। বন্দীদের নিয়ে গঠিত একটি কমিটির মত নিয়ে তিনি একটি ভারতীয় জাতীয় ফৌজ গড়তে রাজী হয়ে গেলেন; এই মুক্তিফৌজ প্রীতম সিং-এর ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ-এর সঙ্গে যুক্তভাবে কাজ করবে এবং ভবিষ্যতে বৃটিশের সঙ্গে লড়াই করবে।[১] এর বাইরে যেসব রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, তার জন্যে মোহন সিং সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বের প্রত্যাশী ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের নামের যাদুমন্ত্রে সকলের সব সন্দেহ-সংশয় দূর হয়ে যায়। অদৃষ্টই সুভাষচন্দ্রকে মিলিয়ে দিয়েছে; তাঁর মুখের কথায় তারা বুকের রক্ত ঢেলে দেবে, যাতে তিনি সহায় হন এবং নেতৃত্ব দেন তার জন্যে জাপানীরা তাকে রাজী করাক না কেন। ফুজিহারা এটুকু করবেন কথা দিলেন; তার উত্তরে মোহন সিংও তাঁর দিক থেকে বিশ্বস্ততার প্রতিশ্রুতি দিলেন। সৈন্যদের 'দেশপ্রেমের তালিম' দেবার কাজ তিনি শুরু করে দেবেন। ফৌজ গড়ে তোলবার জন্যে তোড়জোড় শুরু করবেন। এই কাজ করতে গিয়ে জাপানীদের সম্পর্কে আরও বেশী জানা যাবে এবং মালয়ের বেসামরিক ভারতীয় অধিবাসীদের অনেকের সঙ্গেই আলাপ-আলোচনা

১ পরিশিষ্ট ১, ১ নং দ্রষ্টব্য

করা চলবে, তাদের সাহায্য দরকার হবে। ফৌজ হবে ভারতীয়দের নিয়ে; ভারতীয়েরাই চালাবে, ফৌজ ব্যবহারও হবে ভারতবর্ষেরই জন্যে। স্থিরনিশ্চয় না হওয়া পর্যন্ত মোহন সিং এমন কিছু করবেন না যার আর চারা থাকবে না। মোহন সিংকে এইসব ভাবতে দিয়ে তাঁর ওপর অন্য যেসব নির্দেশ ছিল সেইদিকে এবার ফুজিহারা দৃষ্টি দিলেন।

নির্দেশগুলো ঠিক কী ছিল এবং শিখ ধর্মপ্রচারকের সঙ্গে জাপ আক্রমণকারীদের অদ্ভুত যোগসাজশের সূত্রটা কী ছিল, সে বিষয়ে এখন বিচার ক'রে দেখবার সময় এসেছে। অতীত ইতিহাসের মধ্যে এর গোড়া খুঁজতে হবে। কারণ বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয়েরা যে একাধিক বিপ্লবী কার্যকলাপ চালিয়েছিল, এই অসাধারণ ষড়যন্ত্রটি সেই ধারার মধ্যেই পড়ে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে গোলযোগ সৃষ্টির জন্যে জার্মানরা যে নেতাদের নিযুক্ত করেছিল এবং যে সব মতলব ফেঁদেছিল, জাপানীরা সেই রকমেরই কিছু কিছু মতলব নিয়ে সেই নেতাদেরই একজনকে কাজে লাগাচ্ছিল।

বাধানিষেধের দরুন ভারতবর্ষে আন্দোলন চালাবার সুযোগ না পেয়ে ১৯১২ সালে একদল ভারতীয় বিপ্লবী যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্ট কোস্টে গিয়ে ভারতীয় বাসিন্দাদের মধ্যে থেকে নিরাপদে কাজকর্ম চালাবার ঠাঁই ক'রে নেন। সানফ্রান্সিস্‌কো থেকে 'গদর' (বিপ্লব) নাম দিয়ে তারা একটি কাগজ বার করেন। প্রশান্ত মহাসাগরের সমস্ত বন্দরে বিপুল সংখ্যক ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সে কাগজ বিলি হত, আবার সে কাগজ বেআইনীভাবে ভারতবর্ষেও নিয়মিত আসত। ১৯১৪ সালে 'গদরপন্থী' নামে পরিচিত এই বিপ্লবীরা কয়েক সহস্র প্রবাসী শিখকে হাঙ্গামা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দেশে ফিরে যেতে রাজী করায়। সজাগ পাহারা সত্ত্বেও তাদের অনেকেই পাঞ্জাবে পৌঁছে যায়। এদিকে কিছুদিনের মধ্যেই ইউরোপে যুদ্ধ শুরু হল। ষড়যন্ত্রকারী মূল দলটা এবার প্রকাশ্যে জার্মানদের পক্ষ নিয়ে সোজা বার্লিনে চলে গেল। সেখানে ভারতীয় বিপ্লবী সমিতি বেশ জাঁকিয়ে বসল। ভারতবর্ষে তাদের হাতের লোকদের সাহায্য করবার জন্যে সাংহাই, বাটাভিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রে জার্মানদের কূটনৈতিক দপ্তরগুলোকে কাজে লাগানো হল। এইসব হাতের লোকদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সন্ত্রাসবাদী রাসবিহারী বসু। ১৯১২ সালে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জকে হত্যার ব্যাপারে এবং আরও নানা মামলায়

তিনি জড়িত ছিলেন। পাঞ্জাবে তিনি যে বড় রকমের একটা বিদ্রোহ পাকিয়ে তুলছিলেন পুলিশের হস্তক্ষেপে তা গোড়াতেই বানচাল হয়ে গেল। রাসবিহারী বসু সাংহাইতে পালিয়ে গিয়ে রক্ষা পেলেন। সেখানে তিনি ১৯১৫ সালে ভারতীয় বিপ্লবের আরও দুটি পরিকল্পনায় জার্মানদের সাহায্য করেন। ১৯১৬ সালে রাসবিহারী বসু পালিয়ে জাপানে গেলে ব্ল্যাক ড্রাগন সোসাইটির প্রধান কর্মকর্তা প্রভূত ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক দলপতি তোয়ামা তাঁকে আশ্রয় দেন। জাপানী সরকারের তরফ থেকে ফেরারী আসামী হিসেবে তাকে গ্রেপ্তার ক'রে ভারতে চালান করবার সমস্ত চেষ্টা তোয়ামার হস্তক্ষেপে ব্যর্থ হয়। পরে রাসবিহারী বসু তোয়ামার কন্যাকে বিবাহ ক'রে জাপানের নাগরিক হন এবং জাপানে কংগ্রেসের শাখা 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ' প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৪১ সাল পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠান টিকে ছিল।

১৯১৫ সালেও গদর চক্রের লোকেরা জার্মানদের সহায়তায় কাবুলে একটি তথাকথিত 'ভারতের অস্থায়ী সরকার' খাড়া করেছিল। এই সংগঠন মারফৎ ভারতের কোন কোন দেশীয় রাজ্যের রাজাকে ফুসলিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্য থেকে বার ক'রে আনার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ভারতবর্ষের মাটিতে ষড়যন্ত্র বানচাল হওয়ায় শত শত বিপ্লবী অন্তরীণ, কারারুদ্ধ ও দ্বীপান্তরিত হয়। রাসবিহারী বসুর মত আরও অনেকে দূর প্রাচ্যের নানা আশ্রয়স্থলে পালিয়ে যায়। যুদ্ধ থেমে গেলে ছাড়া পেয়ে অনেকেই সেখানে ফিরে আসে। যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগ দেবার পর থেকে সানফ্রান্সিসকোর গদর সমিতি হাত গুটিয়ে ব'সে গিয়েছিল। যুদ্ধশেষ হবার পর রাশিয়ার স্বার্থে তাকে আবার ঠেলে তোলা হল। দূর প্রাচ্যের বিভিন্ন শহরে পুরনো সঙ্গীসাথীদের মধ্যে আবার নতুন ক'রে ষড়যন্ত্র পাকানোর পালা শুরু হয়ে গেল। এর পর তিরিশের যুগের গোড়ার দিকে রাজনৈতিক সংগ্রামক্ষুব্ধ ভারতভূমি থেকে আরও বেশী নির্বাসিত শরণার্থী এসে হাজির হল এবং বিশেষ ক'রে ব্যাঙ্কক হয়ে দাঁড়াল ভারতীয় অসন্তোষের প্রাণকেন্দ্র। সেখানে বৃটিশের প্রভাব-প্রতিপত্তি থেকেও কোন ফল হল না। সুতরাং ১৯৪১ সালে জাপান বহু উপাদান পেয়ে গেল ইচ্ছে করলে যা সে ভারতে বিদ্রোহ ঘটাবার কাজে ব্যবহার করতে পারে।

গোড়ায় জাপানের তেমন কোন মতলব ছিল না। চীনদেশ আক্রমণ করায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেস খোলাখুলিভাবে তার বিরুদ্ধে গেছে।

কাজেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের কাজে লাগাবার কোন সম্ভাবনা আছে ব'লে তার মনেই হয়নি। কিন্তু ১৯৪১ সালের জুন মাসে, বর্মা আক্রমণে বর্মী বিপ্লবীদের লাগাবার ষড়যন্ত্র যখন পেকে উঠছিল, তখন গিয়ানী প্রীতম সিং ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের তরফ থেকে সাহায্যদানের প্রস্তাব নিয়ে ব্যাঙ্ককের জাপ দূতাবাসে গিয়ে হাজির হলেন। টোকিওর রাজদপ্তর সে প্রস্তাবে আগ্রহ দেখাল। মালয় আক্রমণে প্রীতম সিংকে কাজে লাগানোর জন্যে গোয়েন্দা অফিসার মেজর ফুজিহারাকে ভার দেওয়া হল : প্রীতম সিং চেষ্টা করলে জাপবাহিনী হয়ত মালয় আক্রমণে আট লক্ষ ভারতীয়ের সমর্থন পেতে পারে। ভারতীয় সৈন্যদেরও একাংশকে হয়ত তিনি ভাঙিয়ে আনতে পারেন। প্রীতম সিং-এর দলভুক্ত ন'জন ভারতীয়ের সঙ্গে কাজ করার জন্যে ফুজিহারা ব্যাঙ্ককে বেশ কয়েকজন দোভাষী ও গোয়েন্দা কর্মচারী জুটিয়ে ফেললেন। সেই দল থেকেই ক্রমে খাড়া হল 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ অব ইণ্ডিয়া'; সেই সংগঠনটিকেই ট্যাকে ক'রে মালয়ে বয়ে নিয়ে বেড়ানো হচ্ছিল। পরে মোহন সিংকে জোটাতে পেরে আশাতীত ফল পাওয়া গেল।

সিঙ্গাপুরের পতন হওয়ার পর সেখানে বন্দী পয়তাল্লিশ হাজার ভারতীয় সৈন্যের গোটা দলটাকে জাপানীরা মোহন সিং-এর হাতে তুলে দিল। লীগ সংগঠন মারফৎ বন্দীদের জরুরী প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা হল। মোহন সিং নিজে এবং মালয়ের তুখোড় জাতীয়তাবাদী ভারতীয় ব্যবহারজীবী ও বুদ্ধিজীবীরা রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগলেন। ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে টোকিওতে ব'সে তাদের আলোচনার জের চলল : জাপ-অধিকৃত সমগ্র এশিয়ায় অস্থায়ী-ভাবে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ প্রতিষ্ঠিত হল এবং জুন মাসে যাতে ভারতীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সম্মেলন করা যায় তার জন্যে একটি কর্মসূচী প্রণয়ন করা হল।

ইতিমধ্যে ফুজিহারার প্রস্তাব অনুযায়ী জাপানীরা ভারতে স্বাধীনতা সংক্রান্ত একটি ত্রিপক্ষীয় ঘোষণাপত্র প্রকাশের জন্যে চেষ্টা করল। সেইসঙ্গে তারা সুভাষচন্দ্র বসুকে আমন্ত্রণ জানাল যাতে তিনি জার্মানী থেকে চলে এসে দূর প্রাচ্যের বৃহত্তর ক্ষেত্রে নেতৃত্বের সুযোগ গ্রহণ করেন। সুভাষচন্দ্র বেশী আগ্রহান্বিত ছিলেন ত্রিপক্ষীয় ঘোষণাপত্রের ব্যাপারে; সেই উদ্দেশ্যে

তিনি তখন প্রবলভাবে আন্দোলন চালাচ্ছিলেন। মুসোলিনী রাজী, কিন্তু হিটলার রাজী নয়; শেষ পর্যন্ত ২৯শে মে হিটলার চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান জানালে সুভাষচন্দ্র দূব প্রাচ্যের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন।

দূর প্রাচ্যে গেলে লোকে যে তাঁকে লুফে নেবে তাতে সন্দেহ ছিল না। ১৯৪২-এর ১৫ই জুন ব্যাঙ্ককে ভারতীয়দের সম্মেলনে জার্মানী থেকে তিনি যে বাণী পাঠান, সকলে তা সোৎসাহে শোনে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এসে নেতৃত্ব দেবার জন্যে সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তাঁর বাণী শুনে তাদের সব সংশয় যেন দূর হয়ে গেল এবং সম্মেলনেব কাজকর্মে এতক্ষণে যেন একটা নৈতিক সমর্থনও পাওয়া গেল। গোড়ার দিকে আলোচনা যে ভাবে চলছিল, সে তুলনায় পরের দিকের আলোচনার মধ্যে একটা নতুন সংগ্রামী ভাব এবং আত্মবিশ্বাসের স্বর ফুটে উঠল। মালয়ের যে লোকগুলো এতদিন যাবতীয় নীতি নির্ধারণ করে এসেছে, সম্মেলনেব অধিকাংশ ভোট যাদের হাতে—সেই একই নেতার দল নেতৃত্ব করে চলেছে; অথচ এই দু'মাসে এমন বিস্তর জাপানীর পাল্লায় পডতে হয়েছে, যারা ফুজিহারার চেয়ে অন্তঃকরণে ছোট এবং বুদ্ধিতে ভোতা। জাপানীদেব মনোভাব সম্পর্কে সন্দেহ আব তেমন চাপা থাকল না। সম্মেলনে অশান্তভাবে দাবি উঠল: কোন রকম হস্তক্ষেপ হবে না—এই মর্মে জাপানের কাছ থেকে এখনই স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি চাই। তাছাড়া উপস্থিত ভারতীয়েরা চেয়েছিলেন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মূলনীতি অনুসারে পরিচালিত হতে: একমাত্র সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্ব ছাড়া এই মূলনীতির বাইরে যেতে তাঁরা ইচ্ছুক নন। রেডিও-টেলিফোনে রাসবিহারী বসুর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের কথা হল। তাঁদের আমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করলেন। অবশ্য এক বছরের আগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পদার্পণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না।

ব্যাঙ্কক সম্মেলনে পঁয়ত্রিশটি প্রস্তাব[২] পাশ করা হয়। এই সব প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত এত বেশী খুঁটিনাটি বিষয় জাপানের সম্মতিসাপেক্ষ ছিল যে, সম্মেলনে গৃহীত কর্মসূচী নিয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অগ্রসর হতে গেলে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের 'সংগ্রাম পরিষদে'র পক্ষে জাপানের সরকারী অনুমোদন

২ ব্যাঙ্কক প্রস্তাবসমূহ, পরিশিষ্ট ১ দ্রষ্টব্য

একান্ত প্রয়োজন। পাঁচজনের এই কার্যকরী সমিতির সভাপতি ছিলেন রাসবিহারী বসু। লীগ ও আজাদ হিন্দ ফৌজ[৩] প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে না হয় ধরে নেওয়া গেল জাপানের আপত্তি হবে না; কিন্তু কমপক্ষে নিম্নোক্ত পাঁচটি বিষয়ে জাপানের কাছ থেকে নির্দিষ্ট ধরনের স্বীকৃতি পাওয়া নিতান্তই দরকার :

১। লীগ ও আজাদ হিন্দ ফৌজ কর্তৃক সমস্ত ভারতীয় বন্দীর নিয়ন্ত্রণ।

২। জাপানের সঙ্গে স্বেচ্ছায় মিত্রতাবদ্ধ সেনাবাহিনী হিসেবে আজাদ হিন্দ ফৌজের মর্যাদা।

৩। আজাদ হিন্দ ফৌজের ওপর লীগের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব।

৪। শত্রুকবলমুক্ত হবার পর ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা।

৫। পূর্ব-এশিয়া পরিত্যাগকারী ভারতীয় শরণার্থীদের সম্পত্তির ওপর লীগের অধিকার।

জাপানীরা এই শর্তাবলী মেনে নিলে এবং লীগের উদার গণতান্ত্রিক গঠনতন্ত্রে তাদের সম্মতি পেলে ব্যাপারটাকে ভারতের অস্থায়ী সরকার মেনে নেবার মত ঘটনা ব'লে কতকটা মনে হ'তে পারত। তার কমে রাজী না হওয়াই ছিল পরিষদের মনের বাসনা। রাসবিহারী বসুর যোগসাজশে জাপানীরা কালহরণ করতে লাগল এবং মাস ছয়েকের মধ্যে খোলাখুলিভাবে বিরোধ বাধল।

ব্যাঙ্কক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার সময় ভারতবর্ষে রীতিমত বিক্ষোভ ও উত্তেজনার আবহাওয়া—পরে তারই পরিণতি ঘটল ১৯৪২-এর আগস্ট হাঙ্গামায়। সংগ্রাম পরিষদ জাপানীদের কাছ থেকে স্বীকৃতিলাভের আশায় ব'সে থাকবার সময় ভারতের ঘটনাস্রোত সাগ্রহে লক্ষ্য করছিল। ভারতবর্ষে তখন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে 'ভারত ছাড়ো' আওয়াজ, রাসবিহারী বসুর বেতার বক্তৃতা ইন্ধন যোগাচ্ছে; প্রকাশ্য বিদ্রোহের দিন আসন্ন। কোন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে এর চেয়ে বড় প্রেরণা আর হতে পারে না। জাপানের কাছ থেকে সরকারী অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত যতটা যা করা সম্ভব সমস্তই করা হল। ব্যাঙ্ককে লীগের কেন্দ্রীয় দপ্তর এবং জাপ

৩ সংক্ষেপে ইংরেজি আদ্যাক্ষরে 'আই. এন. এ'

অধিকৃত সারা প্রাচ্যে বিভিন্ন রাজ্যশাখার স্থানীয় ঘাঁটি পত্তন করা হল : সংগ্রাম পরিষদের সদস্যেরা যে যার দপ্তরের ভার নিয়ে বসে গেলেন : কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধানে বেতার মারফৎ প্রচারের কাজ তীব্র করে তোলা হল এবং ভারতবর্ষে গুপ্তচরবৃত্তি ও অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ চালাবার জন্যে লোক ভর্তি করা হতে লাগল।

এই একই আবহাওয়ার মধ্যে মোহন সিং তাঁর অধীনস্থ সেপাই ও অফিসারদের নিয়ে আস্তে আস্তে আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তুলছিলেন। ব্যাঙ্কক সম্মেলনের আগে পঁচিশ হাজার স্বেচ্ছাসৈনিকের একটি তালিকা তাঁর তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সম্মেলনের শেষে পদমর্যাদাসূচক নানা রকম জমকালো ব্যাজ এঁটে মোহন সিং যখন জেনারেল মোহন সিং হয়ে সিঙ্গাপুরে ফিরে এলেন, জনসমর্থনের জোরে এতদিনকার দ্বিধা কেটে গিয়ে সৈন্যদলে নাম লেখাবার ধুম পড়ে গেল। 'মোহন সিং-এর অধীনে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদানে'র প্রতিশ্রুতিপত্রে ১৯৪২-এর শেষাশেষি নাগাদ চল্লিশ হাজার যুদ্ধবন্দীর সই পাওয়া গেল। এই সাফল্যের মূলে একাধিক কারণ ছিল। প্রথমত, সকলে ভেবেছিল শপথটা যখন মোহন সিং-এর নামে, তখন পরে কোন অঘটন ঘটলে তিনি তাদের অব্যাহতি পাবার একটা উপায় করে দিতে পারবেন। দ্বিতীয়ত, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে এর আগেই কয়েক সহস্র ভারতীয় বন্দীকে কুলির দলে বেগার খাটতে যেতে হয়েছিল; আজাদ হিন্দ ফৌজে নাম লেখালে সে দুর্ভোগ থেকে রেহাই মেলে, চলাফেরার স্বাধীনতা থাকে এবং কিছুটা সুখসুবিধারও ব্যবস্থা হয়। তৃতীয় কারণ হল, ভারতীয় ক্যাম্প-কমাণ্ডারদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা; স্বেচ্ছাসৈনিকদের লম্বা লিস্ট দাখিল ক'রে তাঁদের কেউ কেউ মোহন সিং-এর নেকনজরে পড়বার চেষ্টা করছিলেন। বন্দীদের বাগে আনার জন্যে কঠিন দৈহিক নির্যাতন সমেত নানা ধরনের কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করা হতে লাগল; বিদ্যাধরীর যে 'কন্‌সেন্ট্রেশন ক্যাম্প' আগে ছিল একটা মামুলি সামরিক বন্দীশালা এখন সেটা এমনই একটা ভয়ের জায়গা হয়ে উঠল যে, সেখানে পাঠাবার ভয় দেখালেই অনেক সময়ে লোকে 'স্বেচ্ছাসৈনিক' হতে রাজী হয়ে যেত।

এইভাবে জোরজার ক'রে লোক ভর্তি করা হচ্ছে, মোহন সিং অত জানতেন না। এমন নয় যে তাঁর হাতে লোকে মোলায়েম ব্যবহার

পেত। মোহন সিং দাপটের সঙ্গে সবাইকে শাসনে রাখতেন; তাঁর ফৌজের বিরুদ্ধে যারা প্রচার করত, তাদের সম্পর্কে রীতিমত কড়া হতে তাঁর আটকাত না। অফিসারদের তিনি আগেই হুঁশিয়ার ক'রে দিতেন তারা যেন তাদের অধীনস্থ লোকদের ওপর প্রভাব না খাটায়। যারা এই হুঁশিয়ারি অমান্য করত, তাদের একঘরে ক'রে আলাদা একটা শিবিরে চালান করা হত; লোকলজ্জা, প্রচার আর থাকার কষ্ট—তাদের টিট করবার এই ছিল সেখানে ব্যবস্থা। ১৯৪২-এর আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে একশো কুড়ি জন ছোট বড় অফিসারকে এইভাবে 'একঘরে' করে রাখা হয় এবং এমন সময়ও গেছে যখন তাদের সঙ্গে কুকুর-বেড়ালের মত ব্যবহার করা হয়েছে।

লড়াইতে পাঠাবার জন্যে আজাদ হিন্দ ফৌজ এক ডিভিশন সৈন্যের একটি দল গড়তে চাইলে জাপানীরা আগস্ট মাসে তাতে মত দেয়। অফিসার ও সৈন্য মিলিয়ে মোট ষোল হাজার তিনশো লোকের একটি সশস্ত্র বাহিনী ১০ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে তৈরি হয়ে গেল। কিছুদিনের মধ্যেই মোহন সিং তাঁর চব্বিশ হাজার উদ্বৃত্ত স্বেচ্ছাসৈনিকদের ভেতর থেকে লোক নিয়ে দ্বিতীয় আরেকটি ডিভিশন গড়তে চাইলেন এবং সেই সঙ্গে বেসামরিক রংরুটদের শিক্ষিত করবার সুযোগসুবিধা চাওয়া হল। জাপানী যোগাযোগ সংস্থার বড়কর্তা ইওয়াগুরোকে তিনি বললেন যে, আড়াই লক্ষ লোকের একটি বাহিনী গড়ে তোলাই তাঁর চরম লক্ষ্য, কাজটা এমন কিছু শক্ত নয়। কেননা মালয়ে এত বেশী বেসামরিক লোক পল্টনে নাম লেখাতে আসছে যে তাঁর রিক্রুটিং অফিসারের দল সামাল দিতে পারছে না। কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজের বাড়বৃদ্ধি এমন কতকগুলো ব্যাপার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল, যার হেরফের ইওয়াগুরোর মধ্যস্থতায় হবার নয়—একদিকে রয়েছে মালয়ে জাপানীদের লোকক্ষয়, অন্যদিকে তাদের নতুন নতুন বিমানঘাঁটি গড়বার ব্যাপক কর্মসূচীর জন্যে মেহনতকারী লোকের চাহিদা। মালয়ে আগের চেয়ে জাপ সৈন্যেরা সংখ্যায় কম; এদিকে আজাদ হিন্দ ফৌজের এখন যা সৈন্যসংখ্যা তাতে হঠাৎ কোন অঘটন ঘটলে সামলানো মুস্কিল; সুতরাং যতক্ষণ না একটা অংশ বর্মায় চলে যাচ্ছে, ততক্ষণ আজাদ হিন্দ ফৌজকে আর বাড়তে দেওয়া যায় না। তাছাড়া ইওয়াগুরো জানত যে, মোহন সিং-এর হাতে ভারতীয় বন্দীদের

ষোল আনা অংশকে ছেড়ে দেওয়া দূরের কথা, শেষ পর্যন্ত এমন কি বাড়তি স্বেচ্ছাসৈনিকদেরও ওপারে নিয়ে গিয়ে জাপানীরা কুলিগিরির কাজে লাগাবে। কথাটা যতদিন সম্ভব চেপে রাখতে হবে। বে-সামরিকদের পল্টনে ভর্তি করার ব্যাপারটা ঝুলিয়ে রাখতে হবে এবং পয়লা ডিভিশনটিকে চটপট বর্মা মুলুকে চালান করতে হবে।

কিছুদিনের মধ্যেই মোহন সিং-এর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। উপলক্ষগুলো ছিল অন্য। আজাদ হিন্দ ফৌজের পয়লা ডিভিশনটি বর্মায় যাবার ডাক পেল বটে, কিন্তু তখনও প্রকাশ্যে আজাদ হিন্দ ফৌজকে স্বীকৃতি পর্যন্ত দেওয়া হয় নি। জাপানীরা যদি ব্যাঙ্কক প্রস্তাবসমূহ মেনেই নিয়ে থাকে, তাহলে নতুন এক মিত্রবাহিনী হিসেবে আজাদ হিন্দ ফৌজকে কিছুটা স্বীকৃতি দেওয়া, কী হিসেবে একে গণ্য করা হবে সে সম্বন্ধে একটা কিছু ঘোষণা করা উচিত বলে তাঁর মনে হল। সিঙ্গাপুরে ভারতীয় বেতার প্রচারের ব্যাপারেও জাপানীদের হস্তক্ষেপ দেখা দিল এবং সংগ্রাম পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সদস্য শ্রী কে. পি. কে. মেনন প্রতিবাদ জানিয়েও কোন ফল পেলেন না। এরপর নভেম্বরের গোড়ার দিকে রেঙ্গুনে ভারতীয়দের সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট মোহন সিং-এর হস্তগত হল। আর তাঁর পক্ষে ধৈর্য ধারণ ক'রে থাকা সম্ভব হল না।

ব্যাঙ্কক প্রস্তাবে দাবি করা হয়েছিল স্থানত্যাগী ভারতীয়দের সম্পত্তি লীগের হাতে দেওয়া হোক, তা থেকে লীগের রোজগার হবে। ১৯৪২ সালে প্রবাসী ভারতীয়দের দেশে ফেরার হিড়িকের সময় বর্মায় ভারতীয়দের অনেক বাড়ি খালি হয়ে যায়, কিন্তু জাপানীরা গোড়ায় সে সব বাড়ি লীগের হেফাজতে তুলে দেয় নি। পরে নিজেদের শাসনকাজের বোঝা হাল্কা করবার জন্যে প্রস্তাব করা হয় যে, জাপানীদের তরফ থেকে লীগই এই সব সম্পত্তি দেখাশুনা করুক। পরে আলোচনায় ব'সে জাপানীরা জানিয়ে দিল যে, ব্যাঙ্ককের প্রস্তাব কখনই স্বীকার ক'রে নেওয়া হয় নি এবং সংগ্রাম পরিষদকে কোন রকম পাত্তা দেওয়া যায় না : স্থানীয় জাপানী সেনাধ্যক্ষেরা যা বলবে তাই হবে। জাপানীরা এও বলল :

> আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী স্থানত্যাগীদের সম্পত্তি শত্রুর সম্পত্তি। সম্পত্তি বলতে এখানে তোমাদের কীই বা আছে ? সম্বল

তো তোমাদের লোটাকম্বল। মনে রেখো, জাপানীদের মন খুব উদার বলেই বিশ্বাস ক'রে স্থানত্যাগীদের সম্পত্তি তোমাদের তদারক করতে দিচ্ছে। যদি ভারতীয়দের ইজ্জতের কথা ওঠে, তাহলে বলতে হবে সেটা গৌণ—মুখ্য কর্তব্য হল সৈন্যাধ্যক্ষের হুকুম তামিল করা।

…ক্রীড়নক হয়ে থাকার কথা বলছ? ক্রীড়নক হওয়ায় দোষ কী? জাপানীদের ক্রীড়নক হতে পেরে তোমাদেব তো বর্তে যাওয়া উচিত।

পরের কথাগুলো বলা হল জাপানী ভাষায়; ভারতীয়দের মধ্যে একজন জাপানী জানত। কথাগুলো ছিল এই:

এই লোকগুলোর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা—ভারতীয়দের স্বভাবই হল তৈলাধার পাত্র, না পাত্রাধার তৈল এই নিয়ে অনর্থক কচকচি করা। আমার মতে, ওদের মুখের ওপর ব'লে দেওয়া ভাল—লীগকে পরিচালনা করা, নির্দেশ দেওয়া এবং নিয়ন্ত্রিত করার সম্পূর্ণ অধিকার সৈন্যাধ্যক্ষের।

এর চেয়ে স্পষ্ট কথা আর হতে পারে না। মোহন সিং ঠিক করলেন জাপানের কাছ থেকে সন্তোষজনক প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্যন্ত আজাদ হিন্দ ফৌজের পক্ষ থেকে বড় রকমের কোন সৈন্যবাহিনী বর্মায় যাবে না। জাপান যদি প্রতিশ্রুতি না দিতে চায়, তাহলে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভেঙে দেওয়া হবে

সংগ্রাম পরিষদের বাকি সদস্যেরা দৃঢ়ভাবে তাঁর বক্তব্য সমর্থন করলেন। পরিষদ থেকে দাবি জানানো হল—ব্যাঙ্ককে গৃহীত প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে সরকারী জবাব চাই, সংগ্রাম পরিষদকে ভারতীয় আন্দোলনের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হিসেবে মেনে নিতে হবে, আজাদ হিন্দ ফৌজকে প্রকাশ্যভাবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং ফৌজ বড় করবার সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। পয়লা ডিসেম্বর ইওয়াগুরো জাপানের তরফ থেকে জানিয়ে দিলেন: ব্যাঙ্ককে যে সব প্রস্তাব পাশ হয়েছিল, সে সম্পর্কে জাপানের

কোন দায়দায়িত্ব নেই : ভারতবর্ষ সম্পর্কে আর কোন সরকারী বিবৃতি আপাতত দেওয়া হবে না ; সশস্ত্র আজাদ হিন্দ ফৌজ বাহিনীর বাইরে যে সব ভারতীয় সৈন্য আছে, তারা পত্রপাঠ জাপানী নিয়ন্ত্রণাধীনে ফিরে যাবে। ইওয়াগুরো বললেন : আজাদ হিন্দ ফৌজকে বাড়ানো না-বাড়ানোর প্রশ্ন জাপানীদের বিষয়ীভূত এবং সে বিষয়ে তারা তড়িঘড়ি কিছু করবে না। এই সাক্ষাৎকারের পর মোহন সিংকে বলা হল, বর্মার জন্যে ৫ই ডিসেম্বর কিছু সৈন্য চাই। মোহন সিং সোজা জানিয়ে দিলেন—হবে না।

কোন কোন জাপানী ব্যক্তিগতভাবে এসে সঙ্কট দূর করতে চেষ্টা করল। ফুজিহারা নতুন উচ্চপদ পেয়ে তখন সাইগনে আছেন, পুরনো বন্ধুদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করার জন্যে তাঁকে মধ্যস্থ হিসেবে ডেকে আনা হল। কিন্তু মোহন সিং আগাগোড়া অসাধারণ বুকের পাটা দেখালেন। তিনি বললেন জাপানীরা যদি ভারতবর্ষে বৃটিশের জায়গা দখল করবার চেষ্টা করে, তাহলে ভারতবর্ষ তাদের বিরুদ্ধে অসি ধারণ করবে : ভারতবর্ষ মাঞ্চুরিয়ার মত নকল স্বাধীনতা চায়নি। মালয়ের কথাই ধরা যাক, 'এখানে যেভাবে তোমরা মালয়বাসীদের পিষে মারছ, যেভাবে তাদের তোমরা খোল আনা জাপানী ছাঁচে ঢেলে সাজছ—তাতে সন্দেহের কারণ আছে বৈকি।' সহযোগিতার আর কোন ভিত্তিই রইল না। একমাত্র রাসবিহারী বসু টলমল করতে লাগলেন। সহকর্মীদের কাছ থেকে তাঁর কপালে শুধু ঘৃণা জুটল। ১৯৪২ এর ৮ই ডিসেম্বর রাসবিহারী বসু বাদে সংগ্রাম-পরিষদের বাকি সমস্ত সদস্য পদত্যাগ করলেন।

জাপানীরা চটে গেলে পাছে কোন বিপদ ঘটে, সেই ভয়ে মালয়ের একদল ভারতীয় এই বলে বায়না ধরল যে, অন্তত একটি সাম্প্রদায়িক সংগঠন হিসেবে লীগকে টিঁকিয়ে রাখা হোক। রাসবিহারী বসু কথা দিলেন তিনি একাই কাজ চালিয়ে যাবেন, জাপানীদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া ক'রে ফেলবেন এবং একটা ন্যায্য সময়ের মধ্যে স্বদেশী ভাইদের তিনি জানিয়ে দেবেন তাঁর কাজের কতটা কী ফল হল। কিন্তু তাঁর প্রথম চেষ্টাই হল মোহন সিং-এর হাত থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নিজের হাতে আনা। যখন দেখা গেল কিছুতেই তা সম্ভব নয়, তখন ইওয়াগুরোর অফিসে ডাকিয়ে এনে সেনানায়কের পদ থেকে খারিজ ক'রে দিয়ে মোহন

সিংকে গ্রেপ্তার করা হল। আজাদ হিন্দ ফৌজ তৈরি হয়ে ছিল। মোহন সিংকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে জানবার সঙ্গে সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভেঙে গেল—সে নির্দেশ মোহন সিং আগেই দিয়ে রেখেছিলেন। নীরবে তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেলেন। তাঁকে নজরবন্দী হয়ে থাকতে হল প্রথমে সিঙ্গাপুর দ্বীপের এক প্রত্যন্ত প্রদেশে, তারপর জোহোর প্রণালীর এক ছোট্ট দ্বীপে এবং শেষে যুদ্ধ-না-থামা পর্যন্ত সুমাত্রায়।

পরের ছ সপ্তাহ ধ'রে আজাদ হিন্দ ফৌজকে আবার ঠেলেঠুলে দাঁড় করানোই হল রাসবিহারী বসুর একমাত্র কাজ। কাজটা যা মনে করা গিয়েছিল তার চেয়ে সহজে হল। জাপানীরা আজাদ হিন্দ ফৌজ উঠিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব মেনে নিতে রাজী হয়নি; আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদেরও আগের অবস্থায় যুদ্ধবন্দী হিসেবে ফিরে যাবার অধিকার দিতে তারা অস্বীকার করল। কর্নেল ইওয়াগুরো অফিসারদের কাছে এক বক্তৃতায় কথা দিলেন যে, জাপান যাতে নীতি সম্পর্কিত একটি সরকারী বিবৃতি দেয় সে ব্যবস্থা তিনি করবেন। সঙ্কটের সময়ে মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন লোক মোহন সিং-এর সঙ্গে কখনও একমত হতে পারেনি, তারা সুযোগ বুঝে একটা তুচ্ছ প্রশ্ন চোখের সামনে বড় ক'রে তুলে ধ'রে আসল প্রশ্নটাকে আড়াল করে দিল। কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল— মোহন সিং আজাদ হিন্দ ফৌজ তুলে দিয়ে ঠিক করেছেন কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন নয়; প্রশ্ন হচ্ছে মোহন সিং যে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাতে ফৌজ তুলে দেবার ক্ষমতার তিনি অধিকারী কিনা। বন্দীনিবাসে ফিরে যাওয়া একটা যা-তা ব্যাপার নয়—ব্যক্তিগতভাবে মোহন সিং-এর নামে শপথ নেওয়া কি ঠিক হয়েছিল? মোহন সিংকে পদচ্যুত ক'রে রাসবিহারী বসু কি বৈধ কাজ করেছেন? জাপানীরা কি দল উঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত ন্যায্যত নাও মানতে পারে? তাহলে আজাদ হিন্দ ফৌজের সদস্যদেরই বা কী দশা হয়? এইভাবে মূলনীতির প্রশ্নগুলো ঘুলিয়ে গেল এবং তাতে ইওয়াগুরো জো পেয়ে গেল। কিছুদিন যেতে না যেতেই দেখা গেল আজাদ হিন্দ ফৌজ বজায় থাকবে কিনা এটা আলোচনার বিষয় নয়, আজাদ হিন্দ ফৌজ কী কী শর্ত মেনে চলবে এই হল আলোচ্য বিষয়। ফেব্রুয়ারীর গোড়ার দিকে নেতৃস্থানীয় অফিসারদের বলা হল সুভাষচন্দ্র বসু জার্মানি থেকে রওনা হয়েছেন।

ব্যস্, যার যত সন্দেহ অমনি সমস্ত শিকেয় তোলা থাকল। ১৯৪৩-এর ১৩ই ফেব্রুয়ারীর পর আবার ধাপে ধাপে আজাদ হিন্দ ফৌজকে ঢেলে সেজে তাতে প্রাণসঞ্চার করা হল।

আজাদ হিন্দ ফৌজকে যে কায়দায় জীইয়ে তোলা হল, তাতে গোটা কতক কথা না ব'লে পারা যায় না। আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়বার মূলে দেশপ্রেম ছিল সন্দেহ নেই; মোহন সিং আন্তরিক ভাবেই চেয়েছিলেন শুধু সেই কাজ করতে যাতে ভারতবর্ষের মঙ্গল হয়; বন্দী সহযোদ্ধাদের কাছে তাঁর আবেদন সত্যিই ছিল দেশপ্রেমে ভরা। কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে উঠতে উঠতে মাস কয়েকের মধ্যে আরামপ্রিয়তা, সুখসুবিধা খোঁজা, গা বাঁচানোর মনোভাব এইসব এমন কতকগুলো উপসর্গ দেখা দেয় যে, ১৯৪৩-এর জানুয়ারীর মধ্যে দেখা গেল আর সব চিন্তা চাপা পড়ে গেছে।

মোহন সিং-এর কাজ করবার স্বাধীনতা, জাপানীরা পাছে কথা ঘোরায় তার জন্যে তাঁর রক্ষাকবচ, শেষ অস্ত্র হিসেবে আজাদ হিন্দ ফৌজকে ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা—এই যা সব আছে ব'লে তিনি মনে করেছিলেন—দেখা যাচ্ছে, সে সব অনেক আগেই বরবাদ হয়ে গিয়েছিল। আনুষ্ঠানিক ভাবে নিজের সৃষ্টি নিজে লোপ করলেন বটে, তবে অন্যদের মনে আর যেসব ধারণা তিনি রোপণ করেছিলেন তা তিনি উপড়ে ফেলতে পারলেন না। সুতরাং দল উঠিয়ে দেবার ব্যাপারে খানিকটা গাঁইগুঁই ভাব দেখা গেল। অফিসার ও সেপাইরা ব্যাজ আর পরিচয়চিহ্ন খুলে ফেললেও নির্দেশ ছিল পুড়িয়ে ফেলবার; ছ সপ্তাহ পরে ফৌজ চালু হতেই দেখা গেল অধিকাংশেরই ব্যাজ আর পরিচয়চিহ্ন ফুস্‌মন্তরে যোগাড় হয়ে গেছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকদের যে বেতন দেওয়া হত, তার পরিমাণ জেনেভা কনভেনশন থেকে নির্দিষ্ট যুদ্ধবন্দীদের দেয় বেতনের চেয়ে বেশী না হলেও প্রকৃত বন্দীদের সে সময়ে যে হারে দেওয়া হচ্ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী; সুতরাং ন্যায্যত দেখলে, দল ভেঙে দেবার সঙ্গে সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকদের উচিত ছিল বেতন নিতে অস্বীকার করা। অথচ অফিসাররা সমানে টাকা নিয়ে যেতে লাগলেন; কারণ, রাসবিহারী বসু বলেছিলেন যে তাঁর ব্যক্তিগত নামে যে টাকা রয়েছে তাই থেকে তাঁদের দেওয়া হচ্ছে। সামান্য যে কয়েকজন টাকা নিতে অস্বীকার করেছিলেন, তাঁদেরও ভাবখানা ছিল

নেহাত্‌ বড় মন ব'লেই কর্তব্যের অতিরিক্ত কাজ তাঁরা করেছেন। এরপর রাসবিহারী বসু ও জাপানীদের কাজ হল অনিশ্চিত অবস্থায় লোকগুলোকে ঝুলিয়ে রাখা, বিধিগত প্রশ্ন তোলা, পরশ্রীকাতরতা আর উচ্চাশা জাগানো। তাদের এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল; কেননা উচ্চপদে আগের চেয়ে দ্বিগুণ লোক নিয়ে যখন আজাদ হিন্দ ফৌজকে নতুন ক'রে খাড়া করবার প্রস্তাব হল, তখন সেটা অধিকাংশের কাছেই নিতান্ত বাইরেকার ব্যাপার ব'লে মনে হয়েছিল। বরং প্রশংসা করতে হয় সেই তিরিশ জন অফিসার আর সেই চার হাজার সেপাইয়ের—জাপানের শর্তাধীনে আজাদ হিন্দ ফৌজে থাকতে না চেয়ে যারা স্বেচ্ছায় প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জে নিদারুণ বন্দীশিবিরে আটক পূর্বগামী দশ সহস্র সঙ্গীসাথীর ভাগ্য বেছে নিয়েছিল।

রাসবিহারী বসু সামরিক ব্যাপারে আকণ্ঠ ডুবে ছিলেন। এদিকে মালয়ে লীগের লোকজন আর কাঁহাতক ধৈর্য ধরে থাকে—জাপানীদের সঙ্গে বোঝাপড়ার ব্যাপারে কী হল না হল অনেক আগেই যে তাঁর জানাবার কথা ছিল। শেষ পর্যন্ত ২১শে ফেব্রুয়ারী মালয়ের লীগ নেতারা তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে দাবি করল তিনি অচলাবস্থা অবসানের কী উপায় বাতলাচ্ছেন জানাতে হবে এবং না জানানো পযন্ত লীগের কাজকর্ম মুলতুবী রাখতে হবে। কিন্তু জাপানীরা আর সহ্য করবে না; বেশী কিছু বলতে এলে এবার মেরে ঠাণ্ডা করবে; ভয়ে লীগ আর টঁ্যা-ফুঁ করল না। এতদিনে রাসবিহারী বসু তাঁর আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলেন, তাঁর খাস দপ্তর ব্যাঙ্কক থেকে সিঙ্গাপুরে পাকাপাকিভাবে স্থানান্তরিত হল। প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হতে হচ্ছে এই কারণ দেখিয়ে তিনি ৩রা এপ্রিল ভারতীয় মুক্তিযুদ্ধের একনায়কত্ব গ্রহণ করলেন। এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিয়ে নেবার জন্যে এপ্রিলের শেষাশেষি একটি নতুন প্রতিনিধি সম্মেলন ডাকা হল এবং সেই সম্মেলনে একটি নতুন গঠনতন্ত্র পেশ করা হল। আর 'অযথা বাদানুবাদ' চলবে না: ব্যাঙ্ককের সব প্রস্তাব বাতিল; প্রশ্ন থাকলে, সুভাষচন্দ্র বসুর কাছে জবাব মিলবে।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, সুভাষচন্দ্র বসু অবাধ কর্তৃত্বের অধিকারী হবেন। সুভাষচন্দ্রের বন্ধু কর্নেল ইয়ামামোতো সম্প্রতি বার্লিনে সামরিক সহদূত ছিলেন। তাঁকে এনে ইওয়াগুরোর স্থলাভিষিক্ত করা হল। লীগকে

সোজাসুজি একটি একনায়ক প্রতিষ্ঠানে পরিণত ক'রে আজাদ হিন্দ ফৌজ:কে পুরোপুরিভাবে তার তাঁবে আনা হল। ১৯৪৩-এর মে-র গোড়ার দিকে সুভাষচন্দ্রের আগমনপ্রতীক্ষায় রাসবিহারী বসু সিঙ্গাপুর ত্যাগ করে টোকিওয় গেলেন। তখনও কেউ জানে না কোথায় কখন কিভাবে তিনি আসবেন। জাপানী নৌ-কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটা খুব গোপন রেখেছিল। কিন্তু জাপ-অধিকৃত সমগ্র এশিয়ার ভারতীয় অধিবাসীরা তাঁর জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। তিনি আসবেন বলে ভরসা দেওয়া হয়েছে আজ এক বছরেরও ওপর; তাদের মুশকিলের আসান করতে এবং জাপানীদের কবল থেকে উদ্ধার করতে এবার নিশ্চয় তিনি অবতীর্ণ হবেন।

২

সু

১৮৯৭-এর ২৩শে জানুয়ারী উড়িষ্যার কটক শহরে বাঙালী পরিবারে সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম। তাঁর জীবনের প্রথম ষোল বছর কেটেছিল কটকে। সে সময়টা বোমাপিস্তলের যুগ। জাতীয় আশা পূরণ না হওয়ার অন্ধ আক্রোশ বাঙালীর ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ায় সারা প্রদেশ তখন সন্ত্রাসবাদের কবলে। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গই এই উপদ্রব ঘাড়ে ক'রে এনেছিল। বঙ্গভঙ্গের উদ্দেশ্য ছিল শাসনযন্ত্র জোরদার করা। এই ব্যবস্থা চালু করা হল হিন্দুদের মতের বিরুদ্ধে, তাদের স্বাতে ঘা দিয়ে। নিজস্ব ভাষা ও সাহিত্য ছিল বাঙালীর জাতীয়তাবোধের মূলে ; সবভারতীয় বোধ এসেছে পরে। কাজেই বাঙালীর চোখে বঙ্গভঙ্গ দেখা দিয়েছিল মারমূর্তিতে, যুদ্ধং-দেহি ভাব নিয়ে। বাঙালীর কি ধর্মকর্ম ব'লে, মানইজ্জত ব'লে কিছু নেই? সদ্য যুদ্ধজয়ী জাপানীদের চেয়ে বাঙালীরাই বা কিসে কম? ঘাড়ে-চেপে-বসা পশ্চিমীরা এবার ঠেলা বুঝবে। উত্তেজনা মাত্রা ছাড়াল। জাতিবিদ্বেষ বদ্ধমূল হতে লাগল। প্রতিকারহীন অন্যায় অবিচারের মধ্যে আশাহত পরাধীন মানুষ অগতির গতি হিসেবে শেষ পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদের পথে পা বাড়াল। বিপ্লবীরা অস্ত্র যোগাড় করতে লেগে গেল, বোমা তৈরির কারখানা বসল, সারা বাংলার স্কুলকলেজ থেকে ছেলেদের সন্ত্রাসবাদী দলে টানার ব্যবস্থা হল। হিংসাত্মক কাজকর্ম বছর বছর বেড়েই চলল : ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ অফিসার, রাজসাক্ষীর ওপর হামলা চলল ; সংগঠন চালাবার জন্যে তহবিল তছরুপ হল। এর প্রতিবিধানমূলক জননিরাপত্তার যে কোন ব্যবস্থাকে অত্যাচার ব'লে মনে করা হতে লাগল। বিক্ষোভ বেড়ে গেল। জাতীয়তাবাদী মানুষের ধারণা হল, এরপর আর শান্তিপূর্ণ উপায়ে

মুক্তিসাধনের কোন আশাই নেই : 'একমাত্র মজুত অথবা সম্ভাব্য সামরিক শক্তির জোরেই বৃটিশকে তাড়ানো সম্ভব।'[১]

১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হল। তাতে খানিকটা হাঁফ ছাড়তে পারলেও দুপক্ষের মিল হল না। আক্রমণের সটান লক্ষ্য এবার বিদেশী শাসন। ১৯১৭ সাল নাগাদ ১৬১টি ঘটনা ঘটে। আক্রমণবাচক ঘটনায় মোট ছাপ্পান্ন জন খুন, চুরাশী জন জখম এবং ৮ লক্ষ টাকা লুঠ হয়। পুলিশ এর মধ্যে মাত্র তেত্রিশটি মামলার কিনারা করতে পারে। বিস্তর লোককে জেলে পুরলেও মোটে চার জনকে তারা ফাঁসীতে লটকাতে পেরেছিল। বোঝাই যায় বিদেশীরা শুধু দমনই করেনি, তাদের সাজা দেবার ক্ষমতারও কিছুটা অভাব ছিল। সন্ত্রাসবাদীদের পোক্ত সংগঠন এবং বিশ্বাসঘাতকদের পত্রপাঠ ভবনদী পার করবার ব্যবস্থা থাকায় বিপদের সম্ভাবনা ছিল কম। তাতে দলে টানাও সহজ হত।

কাজেই বাংলাদেশ বিদ্রোহের স্বপ্নে মশগুল হল আর বাংলার কবিরা গাইলেন স্বাধীনতার মহাসঙ্গীত। এসব ছিল সে যুগের গান। ছেলেবেলায় নিশ্চয় সুভাষচন্দ্র তার কিছু কিছু শুনে থাকবেন। কেননা বিপ্লবীদের অর্ধেক এসেছিল ধনী শিক্ষিত কায়স্থ পরিবার থেকে এবং সুভাষচন্দ্র ছিলেন তাদের স্বজাতি। তিনিও বড় বংশের ছেলে। তাঁর বাবা জানকীনাথ বসু ছিলেন একজন পরহিতব্রতী কৃতী আইনব্যবসায়ী ; নানা রকম সভাসমিতিতে তাঁর ডাক পড়ত এবং তিনি ছিলেন উদারচেতা, গোঁড়া জাতীয়তাবাদী। ১৯০৫ সাল থেকে কটকের পাবলিক প্রসিকিউটর এবং ১৯১২ সাল থেকে বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য। তাঁর অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল ছিল। আট ছেলে ও ছয় মেয়ে। তাদের সম্বন্ধে তিনি উঁচু আশা পোষণ করতেন। জানকীনাথের স্ত্রী ছিলেন বুদ্ধিমতী তেজস্বী মহিলা ; অত বড় সংসার তিনি দৃঢ়হস্তে চালাতেন। বড় পাঁচ ছেলের পর সুভাষচন্দ্র ; মা-বাবা সম্বন্ধে তাঁর খুব ভয়ভক্তি ছিল। যে ছেলেরা তাদের বাপমার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশতে পায়, তাদের দেখে তাঁর খুব হিংসে হত। এসব সত্ত্বেও, বাড়িতে সুস্থ পরিবেশ ও নিয়মশৃঙ্খলা ছিল ; বাড়ির গুণেই তিনি অধ্যবসায় ও সদাচারকে মর্যাদা দিতে শিখেছিলেন।

১ এন. সি. চৌধুরী, 'বায়োগ্রাফি অফ অ্যান আন্‌নোন্‌ ইণ্ডিয়ান', পৃঃ ২৪৫

সুভাষচন্দ্রের দাদারা পড়তেন ব্যাপ্টিস্ট মিশনারী স্কুলে। তাঁকে যখন এই স্কুলে দেওয়া হল তখন তাঁর বয়স পুরো পাঁচ বছর হয়নি। এখানে সাত বছর ধ'রে তিনি ভালমত ইংরেজি শিক্ষা পেলেন। তাঁর ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল, তা বোঝা গেল। অবশ্য খেলাধুলোয় সুবিধে করতে না পেরে এই সময়ে তাঁর মন খারাপ হত। এদিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকায় বাংলাকে আবশ্যিক বিষয় করা হয়েছে; সেদিক থেকে তৈরি হবার জন্যে বারো বছর বয়সে সুভাষচন্দ্র যে ভারতীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন তার নাম র‍্যাভেন্‌শ' কলেজিয়েট স্কুল। এখানে খেলাধুলোর অক্ষমতা তাঁকে আর ততটা বিচলিত করল না। বাগান করার শখ আর প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণের নেশা এবার তাঁকে পেয়ে বসল। তিনি ছিলেন একটু চাপা, গম্ভীর প্রকৃতির ছেলে; বইয়ের পোকা। আত্মানুসন্ধানব্রতী ধর্মতত্ত্ব, যোগ আব নির্বিকল্পভাব—বয়স্কজনোচিত এই সব চিন্তায় ছেলেবেলায় তিনি বিভোর হয়ে থাকতেন। বাড়ির কাছেই পুরী। সেখানে সাধুসন্ন্যাসী ও তীর্থযাত্রীদের দেখে তিনি মোহিত হতেন; যোগ আর তন্ত্রমন্ত্রের দিকে তিনি আকৃষ্ট হতেন। পরের দুঃখ দেখলে অগৌণে প্রতিকারের জন্যে তাঁর মন কেঁদে উঠত। এই অনুকম্পার ভাব তাঁকে জনসেবার কাজে ব্রতী ক'রে তুলল। তাঁর মধ্যে আস্তে আস্তে রাজনীতির বোধ এল এবং কলকাতার নানা গুপ্ত সমিতির সঙ্গে তাঁর কিছুটা সম্পর্ক হল। একদিকে মরমী মানুষ আর একদিকে কর্মী মানুষ—শুরুতেই তাঁকে এই দোটানার মধ্যে পড়তে হল। এটা আরও স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল যখন পনেরো বছর বয়সে দৈবাৎ বিবেকানন্দের রচনাবলী তাঁর হাতে এল। সেবাধর্মেই মুক্তি, সেবা করো মানুষের, বিশেষ ক'রে ভারতমাতার —এই হল বিবেকানন্দের বাণী। বিবেকানন্দের যাবতীয় লেখা, সেইসঙ্গে বিবেকানন্দের গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্পর্কে যেখানে যা পাওয়া গেল সুভাষচন্দ্র পড়ে ফেললেন। নিঃস্বার্থ সেবা হল তাঁর আদর্শ। ১৯১৩ সালে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে দর্শনশাস্ত্র নিয়ে তিনি পড়তে লাগলেন।

কলেজে দর্শনের পড়াশুনা তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্ব আরও বাড়িয়ে তুলল। কী ক'রে পরমার্থ মিলবে? ১৯১৪ সালে মা-বাবাকে না জানিয়ে এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে তিনি উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে উত্তর ভারত পরিভ্রমণে বেরোলেন। কিন্তু তীর্থে তীর্থে ঘোরাই সার হল। এমন কাউকেই পাওয়া গেল না যে

তাকে পথ দেখাতে পারে। পৃথিবীতে তিনি জন্মেছেন কিছু ক'রে যাবেন ব'লে—স্থভাষচন্দ্র এই বিশ্বাস নিয়ে বাড়িতে ফিরে এলেন। তাঁকে ফিরে পেয়ে বাড়ির লোকের দুঃখ ঘুচল। এর কিছুকাল পরেই দেখা যায় দর্শন নিয়ে পিতাপুত্রের জোর আলোচনা চলেছে। এক বন্ধুকে এই সময়ে তিনি চিঠিতে লিখেছিলেন :

> বাবা জিজ্ঞেস করলেন : এই যে বলা হয় 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'—আসলে এটা কি নিছক মনগড়া ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় না? আমি বললাম, 'দাঁড়াতে পারে, যদি সেটা নেহাতই মুখের কথা হয়। কিন্তু যে মুহূর্তে তা উপলব্ধির মধ্যে আসে তখনই তা জলজ্যান্ত অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য হয়ে দাঁড়ায়। আর তাছাড়া, এর উপলব্ধি সম্ভব। কেননা ও-কথা যাঁরা বলেছেন, তাঁরা নিজেরা উপলব্ধি ক'রেই বলেছেন। কাজেই তাঁদের পদাঙ্ক আমরাও অনুসরণ করতে পারি।
>
> বাবা জানতে চাইলেন, 'কিন্তু কে কবে উপলব্ধি করল? তার প্রমাণ কোথায়?'
>
> আমি জবাব দিলাম : 'মুনিঋষিরা উপলব্ধি করেছেন, উপনিষদ্‌ই তার সাক্ষ্যপ্রমাণ : আমি সেই পরমপুরুষকে জানি, যাঁর বর্ণ অরুণোজ্জ্বল, এবং যাঁর অবস্থিতি তমসার ঊর্ধ্বে।'[২]

যাই হোক, তীর্থ থেকে নিরাশ হয়ে ফেরার পর স্থভাষচন্দ্রের মোহ যেমন কাটছিল, তেমনি আস্তে আস্তে রাজনৈতিক কর্মজালে তিনি জড়িয়ে পড়তে লাগলেন। কলেজের সব ব্যাপারে থাকতেন ব'লে ছাত্রদের মধ্যে তিনি বেশ একজন পাণ্ডা হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর উদ্যোগে একটি বিতর্কসভার পত্তন হয়েছিল—কারণ 'দেশে ভাল ভাল লোকের দরকার হবে যারা বাদবিতণ্ডা করতে পারে, পার্লামেন্টে মুখ খুলতে পারে—অবশ্যই, যখন আমরা স্বাধীন হব তখন।'[৩] তিনি চেয়েছিলেন ছাত্ররা দৃঢ়চেতা হোক, দ্রুত চিন্তা করতে শিখুক। কেননা 'কাজকর্মে, মতামতে, উদ্যোগ-আয়োজনে, সব ব্যাপারেই

২ হেমন্তকুমার সরকারকে লেখা চিঠি

৩ দিলীপকুমার রায়, 'দি স্থভাষ আই নীউ,' পৃঃ ২২

আমরা ভারতীয়েরা বড় বেশী পরনির্ভরশীল।'[৪] বন্ধুদের মধ্যে তিনি যে খুব বকবক করতেন তা নয়; কিন্তু বিতর্কসভায় কিম্বা তাঁর বন্ধুসমাজে কোন বিষয়ে তর্ক উঠলে যখন তিনি মুখ খুলতেন, সারা ঘর গমগম করত। তাঁর চাপা স্বভাব, গুপ্ত সমিতিগুলো থেকে স'রে থাকা, সমাজসেবার কাজে তীব্র আগ্রহ, চরিত্রে মহৎ-মহৎ ভাব, কিন্তু তাই ব'লে মোটেই অসামাজিক বা অহঙ্কারী নয়—এইসব দেখে কেউ কেউ তখনও মনে করত সাধকপুরুষ হওয়াই তাঁর কপালে আছে।

এরপর একটা ঘটনা ঘটল; পরে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন এই ঘটনা তাঁর জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল। ঘটনাটি হল, এক ইংরেজ অধ্যাপককে মারধর করার ব্যাপারে নেতৃত্ব করার জন্যে সুভাষচন্দ্রকে কলেজ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। অধ্যাপক ভদ্রলোক একটুতেই ধৈর্য হারিয়ে যা তা কাণ্ড ক'রে বসতেন এবং ছাত্ররাও তাতে চটবার ছুতো খুঁজে পেত। অসদ্ভাব দিন দিন বাড়ছিল। অনেক সময়ে তিনি এমন কথা বলেছেন যার বিরুদ্ধে সারা ক্লাস হৈ হৈ করে উঠেছে। এসব ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রই সবাইকে পথ দেখাতেন। রাগে ছাত্রদের তখন হাত নিস্‌পিস করছিল; একটা কিছু পেলে হয়, তারা তিলকে তাল ক'রে ছাড়বে। এর ভেতর দিয়েই ভারতীয় যুবসমাজে পৌরুষের, তথা ভারতের ভবিতব্যের পরীক্ষা হবে। সুভাষচন্দ্র এই সময়ে লিখেছিলেন: আজ ভারতের নবজীবনের শুরু।...আমাদের ভাগ্য ভাল তাই এই শুভক্ষণ দেখতে পাচ্ছি।...হতাশা ঠেলে ফেলে দাও, দূরে তাকিয়ে দেখ আমাদের সামনে নতুন আলো; আর সেই আলোয় পথ চিনে এগিয়ে যাও।'[৫] এই যখন মনের অবস্থা তখন ছাত্রদের সামলানো মুস্কিল ছিল। শেষ পর্যন্ত দৈবাৎ একটা কথায় ইংরেজ অধ্যাপকটি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে এক ছাত্রের গায়ে হাত তুলে বসলেন। ব্যস্‌, সেইদিন বিকেলেই একদল ছাত্র তাঁর ওপর চড়াও হল। সুভাষচন্দ্র সেই দলে ছিলেন; তাঁর উস্কানিতেই যে ব্যাপারটা ঘটেছে এটা ধ'রেই নেওয়া হল। সুভাষচন্দ্র অভিযোগ অস্বীকার করলেন না, মাপও চাইলেন না। ফলে, ১৯১৬ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে কলেজ থেকে তিনি বিতাড়িত হলেন।

৪ দিলীপকুমার রায়, 'দি সুভাষ আই নীউ', পৃঃ ২৩

৫ হেমন্তকুমার সরকারকে ১৯১৬-র ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে লেখা চিঠি

শাস্তিটা বাড়াবাড়ি রকমের হয়েছিল কিনা এ নিয়ে তর্ক হতে পারে : তবে ঘটনাটা এত রটে গিয়েছিল যে, উদারতা দেখানো বোধহয় শক্ত ছিল। কিন্তু আই-এ পড়া আত্মাভিমানী তরুণের মনে তা যে গভীরভাবে দাগ কাটল তাতে সন্দেহ নেই। গোটাটাই একটা দুঃখের ব্যাপার। জাতিবিদ্বেষের হাতে তাঁকে বলি হতে হল, দেশমাতৃকার প্রতি অপমানের প্রতিবাদ জানাতে গিয়েই তাঁকে মার খেতে হল—তাঁর নিজের কাছে ঘটনাটা এইভাবে দেখা দিল। দেখে মনে হল, কলেজ-কর্তৃপক্ষের শাস্তি তাঁকে একটুও বিচলিত করেনি। সুভাষচন্দ্র কটকে ফিরে এলেন। সেখানে রোগীর শুশ্রূষা ও সমাজসেবার কঠোর কাজে ব্রতী হলেন। সেই সঙ্গে চলল তাঁর মনকে শাসনে আনার সাধনপদ্ধতি—যাকে তিনি বলতেন আত্মানুসন্ধান। কিন্তু আঘাত তিনি ভোলেন নি : উনিশ বছর বয়সের সমস্ত ঝাঁঝটুকু ঢেলে দিয়ে বিষয়টা নিয়ে তিনি আকাশপাতাল ভাবতেন, জাতিবিদ্বেষের আরও অনেক নজির টেনে টেনে তুলে ধরতেন—১৯১৬ সালের কলকাতায় তেমন ঘটনা আকছার ঘটত। জাতিবিদ্বেষ তাঁর মন কুরে কুরে খেত। যে ভৎ৴সনাবাক্য প্রয়োগ ক'রে তাঁকে বিতাড়িত করা হয়েছিল, তাতে গৌরব করবার ছিল। তিনি ছিলেন 'কলেজের উপদ্রবকারীদের শিরোমণি।' হ্যাঁ, ছিলেনই তো। উপদ্রবের এখন হয়েছে কি, এমন সব উপদ্রব তিনি বাধাবেন যা তারা বাপের জন্মেও ভুলবে না। লালমুখো সাহেবদের চেয়ে নিজেকে বড় প্রতিপন্ন করা এখন তাঁর একান্ত লক্ষ্য হল। ভারতবর্ষকেও দেখাতে হবে কারো চেয়ে সে কম নয়। এ কাজে সহায় হওয়াই তিনি একদিক থেকে তাঁর জীবনের ব্রত ব'লে মনে করলেন।

কলেজের পড়াশুনা এদিকে এক রকম বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের বাবা সহানুভূতিসম্পন্ন হলেও অন্য কোথাও ছেলেকে পড়তে যেতে দিতে রাজী হননি ; তাঁর কথা হল, কলকাতার পাঠ্যজীবন আগে শেষ করতে হবে। সুভাষচন্দ্র ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার প্রবেশাধিকার পেলেন। এর পর আর কোন বিঘ্ন ঘটেনি। ইউনিভারসিটি ট্রেণিং কোরে যোগ দিয়ে ১৯১৮ সালে ক'টা দিন তাঁর বেশ ভালভাবেই কাটল, ছাত্র পরামর্শ কমিটির সদস্য হলেন এবং ১৯১৯ সালে দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেলেন। বোঝা গেল, লেখাপড়ার ক্ষেত্রে কোন বাধাই তাঁর

কাছে বাধা নয়। তাছাড়া তাঁর বাবা দেখলেন বাংলাদেশে তখন জোর স্বদেশী হাঙ্গামা চলছে—ছেলেকে কিছুতেই সামলানো যাবে না : সুতরাং ও বিলেতে চলে যাক, আই-সি-এস পরীক্ষা দিক ; ক্ষমতা আর খাতির পেলে আর মাথায় পোকা কামড়াবে না। বাবা হঠাৎ সিদ্ধান্ত করায় ছেলে মহা ফাঁপরে পড়লেন। ক্ষমতা না মানুষকে নষ্ট করে ? যদি তিনি পরীক্ষায় পাশ করেন কী হবে তাঁর স্বাদেশিকতার ? অবশ্য সন্ত্রাসবাদীদের দলে যোগ দিতে আগেই তিনি অস্বীকার করেছেন। দেশেব মানুষকে তিনি জানেন—জানেন বৈকি, তার মধ্যে তাঁর আত্মীয় পরিজনেরাই তো কত—তবে তাঁর মনে হল, এখনও সশস্ত্র বিপ্লবের সময় আসেনি।

মনের মধ্যে অনেক রকম খটকা থাকল, তাহলেও সুভাষচন্দ্র যেতে রাজী হলেন। এমন নয় যে তাঁর মতিপরিবর্তন হয়েছিল : তখনও সেই যুগ চলেছে, যখন আই-সি-এস হয়েও স্বদেশী থাকা চলত ; তাছাড়া পরীক্ষায় পাশ করে দেখানো যায় সাহেবদের চেয়ে তিনি কোন অংশে হীন নন। সুভাষচন্দ্র অত্যন্ত অভিমানী স্বভাবের হওয়ায় ইংলণ্ডে সহজেই জাতিবিদ্বেষের আরও অনেক নমুনা খুঁজে পেলেন। তাই তখনও কেম্‌ব্রিজ থেকে ১৯১৯-এর নভেম্বরে লেখা একটা চিঠিতে তাঁর পক্ষে বলা সম্ভব হল : 'শাদা চামড়ার লোক আমার ফাইফরমাস খাটছে, জুতো সাফ করছে—এই দেখেই আমার সবচেয়ে আনন্দ হচ্ছে।'[৬] কালক্রমে এই বর্ণবিদ্বেষের ধার কমে এসেছিল। কখনও কখনও তা মন থেকে মুছেও গিয়েছিল—কিন্তু তার প্রভাব একেবারে কাটেনি ; সেই কারণে বৃটিশের বিরুদ্ধে সর্বদাই তাঁর মধ্যে একটা বিরূপভাব উঁচিয়ে থাকত।

কেম্‌ব্রিজে পড়বার সময় সুভাষচন্দ্রের কিছু কিছু ইংরেজ বন্ধু জুটতে লাগল ; ছাত্র ইউনিয়নে ছিল সকলের স্বাধীনতা, হত ভাবের আদানপ্রদান। সুভাষচন্দ্রের এসব ভাল না লেগে পারেনি : 'এখানে লোকে সময়ের মর্ম বোঝে। এদের দোষ অনেক, তবু গুণগুলোর জন্যে মাথা আপনি নুয়ে আসে।'[৭] কাজকর্মে তাদের উৎসাহ, নিয়মশৃঙ্খলার প্রতি অনুরাগ এবং সমষ্টির প্রতি ব্যষ্টির আনুগত্য তাঁর কাছে প্রশংসার্হ ব'লে মনে হল। সে সময়ে এই বিচিত্র তরুণ

৬ 'দি সুভাষ আই নৌউ,' ৫৩ পৃঃ পাদটীকা

৭ ঐ, ৫০ পৃঃ, পাদটীকা

যুবকটির সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল অবিচল একাগ্রতা। ভেবেচিন্তে ঐকান্তিকভাবে তিনি চেষ্টা করলেন ইংরেজদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে খাপ খাওয়াতে, যাতে ভালভাবে তাদের খুঁটিয়ে পরখ করা যায়। ভারতীয় সঙ্গীসাথীদের ধরণধারণ দেখে তিনি ভারি লজ্জায় পড়তেন : বলতেন, 'আর কিছু না হোক, লোকে যেন বলতে পারে ছেলেগুলো পুরোদস্তর সভ্যভব্য ছিল।' একবার খুব চ'টে গিয়ে তাঁর বন্ধু দিলীপকুমার রায়-কে বলেছিলেন, 'দোহাই তোমার, ল্যাসোর ঢঙে হাত দুখানা যেখানে সেখানে ছুঁড়ে দিও না।'[৮] ভারতবাসীরা নিজেদের দেশ নিজেরা শাসন করতে পারবে না, কারণ তারা যথেষ্ট সভ্য নয়—ইংরেজদের এই উক্তি তাঁর কাছে অসহ্য ব'লে বোধ হত; তিনি দেখেছিলেন, এই উক্তির একটা কারণ ভারতীয়দের স্বভাবগত বেয়াড়া অঙ্গভঙ্গি। সুভাষচন্দ্র মেয়েদের দেখলেই জড়সড় হতেন। এমন একটা ভাব দেখাতেন যেন মহিলাসমাজের ধারে কাছে গেলেই বিপদ, তাঁর ধারণা তিনি জিতেন্দ্রিয় পুরুষ হতে পেরেছেন এবং যাদের মধ্যে সংযমের কিছুটা অভাব দেখা যেত তাদের তিনি খুব ক'রে ধমকাতেন। খুঁতখুঁতে স্বভাবের জন্যে কেউ তাঁর কাছে ঘেঁষত না, দেশের ছেলেরা তাকে বেরসিক হামবড়া বলত। তিনিও সেই রাগে ভারতীয় ছাত্রসমাজকে মোটেই আমল দিতেন না। তাঁর একাগ্রতা আরও বেড়ে গেল : গুছিয়ে কাজ করবার ক্ষমতা, ব্রহ্মচর্য এবং নিজের কঠোর নিয়মশৃঙ্খলার জন্যে সঙ্গীসাথীদের কাছে তিনি ছিলেন ঈর্ষার পাত্র।

রসকষ কম থাকলেও মাঝে-মধ্যে তিনি হেসে খেলে মন হাল্কা করতে পারতেন। বছর কয়েক পরে সুভাষচন্দ্র একবার বলেছিলেন দিলীপকুমার রায় কিভাবে সঙ্গীতে তাঁর কান কিছুটা তৈরি করেছিলেন এবং তাঁর মধ্যে হাস্যরস ও সৌন্দর্যবোধ জাগিয়েছিলেন। তবে তার জন্যে বইপত্রের জগৎ থেকে টেনে হিঁচড়ে তাঁকে সরিয়ে আনতে হয়েছিল : কেননা সুভাষচন্দ্র বরাবর যে গুরুগম্ভীর আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন তাতে 'আমাদের চেয়ে তার আরও বেশী হাসিখুশী হওয়ার দরকার ছিল।'[৯] ক্বচিৎ কখনও দেখা যেত, মেয়েদের সম্পর্কে তিনি দিব্যি সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন :

৮ 'দি সুভাষ আই নীউ' ৫২ পৃঃ

৯ ঐ, ৮৯ পৃঃ

ইংলণ্ডে তিনি কিছুদিন ডাঃ ধর্মবীরের সঙ্গে ছিলেন ; ধর্মবীরের স্ত্রী ইংরেজ রমণী ব'লে বর্ণগত প্রশ্নে সুভাষচন্দ্রের মনোভাব বুঝে সেইমত নিজেকে খাপ খাওয়ানো তাঁর পক্ষে অন্য অনেকের চেয়ে সহজ ছিল ; ফলে দুজনের খুব ভাব হয়ে গেল

কৃতকার্যতা থেকে এল কঠোরতা। সুভাষচন্দ্র ১৯২০ সালে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বহু প্রতিযোগীর মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করলেন। ইংলণ্ডে পা দেবার মাত্র আট মাসের মধ্যে এতখানি কৃতিত্ব দেখানো কম কথা নয়। এদিকে তখন ভারতীয় জাতীয়তাবাদ নতুন দিকে মোড় নিতে শুরু করেছে। সুভাষচন্দ্র যখন বিলেতে রওনা হন, তখনও গান্ধীজী বৃটিশ শাসনের অবিমিশ্র বিরোধিতায় ঝাঁপিয়ে পড়েন নি। অমৃতসরের মর্মন্তুদ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা তখন সবেমাত্র ঘটেছে ; যে গোলযোগের সূত্র ধ'রে এই নরমেধ অনুষ্ঠিত হল, তা যে এত বড় একটি ঘটনা, হত্যাকাণ্ডের নৃশংসতা পুরোপুরিভাবে তখনও লোকের হৃদয়ঙ্গম হয়নি। ১৯২০ সালে জেনারেল ডায়ার-এর বিরুদ্ধে সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণ এবং হাউস অব কমন্সে ডায়ারী পন্থার নিন্দা সত্ত্বেও যখন দেখা গেল গোটা ইংরেজ জাত ডায়ার-এর কাণ্ডকারখানা সমর্থন করছে,[১০] তখন গান্ধীজী অন্য পথ বেছে নিলেন। তাঁর প্রস্তাব অনুসারে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে অসহযোগের কর্মসূচী গৃহীত হল এবং সেই সঙ্গে বৃটিশের চাকরি ও খেতাব বর্জনের জন্যে ভারতীয়দের কাছে আহ্বান জানানো হল।

বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে বিশেষভাবে তাঁর দাদা শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে

১০ ১৩ই এপ্রিল, ১৯১৯। অমৃতসরের গোলযোগ ব্যাপক আকার নেওয়ায় এবং জনতার হাতে চারজন বৃটিশ খুন হওয়ায় অবস্থা সামলাবার জন্যে মিলিটারি কমাণ্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ারকে তলব করা হয়। জালিয়ানওয়ালাবাগের পাঁচিল ঘেরা বদ্ধ জায়গায় তার নির্দেশ অমান্য ক'রে বিরাট সভা হচ্ছে দেখে ডায়ার গুর্খা সৈন্যদের গুলী চালাবার হুকুম দেয় ; ৩৭৯ জন খুন এবং ১২০০ জন আহত হয়ে সেখানেই পড়ে থাকল। পরে এক তদন্তকালে ডায়ার এই মর্মে বলে যে, বিদ্রোহ যাতে ছড়াতে না পারে সেই চেষ্টাই সে করেছিল। তার এই স্বীকারোক্তির ফলে তাকে সেনাধ্যক্ষ পদ থেকে অপসারণ করা হয় এবং তাকে সরকারীভাবে যৎপরোনাস্তি নিন্দা করা হয়, পরে হাউস অব কমন্স এই সরকারী ব্যবস্থার অনুমোদন জানায়। অবশ্য বৃটেনে তার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। ফলে তা ভারতবর্ষে গণবিক্ষোভের আগুনে ঘৃতাহুতির কাজ করল।

এ নিয়ে সুভাষচন্দ্রের বিস্তারিত আলোচনা হল। শরৎচন্দ্রও তাঁকে পদত্যাগ করতে বারণ করলেন—আই. সি. এস-এর চাকরি খুব অসহ্য ঠেকবে না, কিছু কাজের কাজও করা যায়, তাছাড়া বৃটিশের প্রকৃতিরও পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের মনে হল আসল কথাটা তাঁরা ঠিক ধরতে পারছেন না : 'হয় এই জঘন্য চাকরি ছেড়ে পুরোপুরি দেশের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে, নইলে আমার সমস্ত আশা-আদর্শ জলাঞ্জলি দিতে হবে।'[১১] ভারতীয়দের মধ্যে এর আগে কেউই আই. সি. এস থেকে পদত্যাগ করেনি। তিনি যদি এক্ষেত্রে অপারগ হন তাহলে নিজের প্রতি তাঁর আর কোন শ্রদ্ধা থাকবে না : আর যা কিছু ভাবনা সবই তুচ্ছ—বিবাহে তাঁর স্পৃহা নেই এবং তাঁর 'বাস্তবিকই ঐহিক কোন ভোগবাসনা নেই।'[১২] ১৯২১-এর জানুয়ারীতে তিনি মন স্থির ক'রে ফেললেন : কলকাতায় ফিরে কংগ্রেসের জাতীয় মহাবিদ্যালয় এবং নতুন স্বদেশী পত্রিকা 'ফরওয়ার্ড'-এর কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করবেন। এপ্রিল মাসে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস থেকে তিনি পদত্যাগ করলেন।

সহকারী ভারত-সচিব তাঁকে ডেকে পাঠালেন। সুভাষচন্দ্র পরে বলেছিলেন : 'আমি তাঁকে বলেছিলাম বৃটিশরাজের প্রতি অনুগতও থাকব আবার কায়মনোবাক্যে ভারতবর্ষেরও সেবা করব, এ দুটো একই সঙ্গে হয় ব'লে আমি মনে করি না।' বাবা মনে কষ্ট পেলেন। বাবার দুঃখের কারণ ঘটবে জানাই ছিল, সুতরাং ছেলেকে টলানো গেল না : 'যদি আমরা আগাগোড়া বাড়ির কথা ভেবে সেই ছাঁচে আমাদের আদর্শগুলো গড়ে তুলি, তাহলে মরি-মরি আমাদের আদর্শের কী চেহারাই না হবে।'[১৩]

শ্রীযুক্ত গান্ধীর পায়ে নিজেকে সঁপে দেবেন ব'লে ১৯২১ সালের জুলাই মাসে সুভাষচন্দ্র দেশে ফিরে এলেন। এক বছরের মধ্যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে, গান্ধী সবেমাত্র এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সুভাষচন্দ্র এ থেকে তাঁর নিজের মনোগত একটা অর্থ বার ক'রে নিয়েছেন। এ ঘটনার মাস কয়েক আগে ভারতবর্ষে বিপ্লবের সম্ভাবনা সম্পর্কে দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে তাঁর

১১ দাদাকে লেখা চিঠি ('অ্যান ইণ্ডিয়ান পিলগ্রিম,' ১২৮ পৃঃ)

১২ ঐ

১৩ 'দি সুভাষ আই নীউ,' ৭১, ৭২ পৃঃ

একবার কথা হয়েছিল। তাতে তিনি বলেছিলেন, রুশরা যখন সবেমাত্র তালিম নিচ্ছে তখন ভারতবর্ষে বিপ্লব ঢের দূর এগিয়ে গেছে : আজ অবধি সমানে তা' দেওয়া চলেছে, '······তবে এবার আর ডানা গজাবার আগে পাখিগুলোকে কিছুতেই ছাড়া হবে না। তারপর কাকলিতে মুখর হবে নতুন সেই সকাল।'[১৪] বলতে বলতে উত্তেজনায় তার মুখচোখ লাল হয়ে উঠল, 'স্বদেশী যুগের বীরদের এ ছাড়া ভাবাই যায় না।[১৫] তোমরা বলো তাঁরা ব্যর্থ ?' মাত্র জনকয়েকের এইটুকু একটা ছোট্ট দল—দুর্ধর্ষ বৃটিশের সঙ্গে যারা পাঞ্জা লড়তে চেয়েছিল—তার মধ্যে যে কত সৌন্দর্য ছিল, শৌর্যবীযের ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য—তুমি কি তোমার কল্পনায় দেখতে পাও না ?' সুভাষচন্দ্র লড়াইয়ের জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁর ধারণা হয়েছিল গান্ধীও তাই চান।

সে সময়ে সুভাষচন্দ্র হবু-বিপ্লবী হয়ে দেশে ফিরলেন ; তাঁর বড় আশা তাঁকে কোন একটা দুঃসাহসের কাজ দেওয়া হবে ; তিনি যে চমকপ্রদভাবে ধরাবাঁধা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ত্যাগ করলেন, নিজের কাছে এবং বাড়ির কাছে একমাত্র তাহলেই তার একটা জবাবদিহি থাকে। বোম্বাইতে তিনি গান্ধীর দর্শন পেলেন। প্রথম দিনের সাক্ষাতেই তিনি কি রকম অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর নিজের লেখায় তার বর্ণনা আছে :

> সেদিন বিকেলে যা দেখেছিলাম আজও আমার চোখে ভাসছে। ···দেশী গাল্‌চে বিছানো একটি ঘরে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল। ঘরের দরজার দিকে মুখ ক'রে প্রায় মাঝখানে ব'সে আছেন মহাত্মা। তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্যেরা তাঁকে ঘিরে রয়েছেন। সকলের পরণেই স্বদেশের তৈরি খাদি। ঘরে ঢুকে বিদেশী ধড়াচূড়ায় নিজেকে কেমন যেন বিসদৃশ মনে হতে লাগল, আমি মাপ না চেয়ে পারলাম না। মহাত্মা তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে একগাল হেসে আমাকে স্বাগত জানালেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি আমার জড়তার ভাব কাটিয়ে দিলেন।

১৪ 'দি সুভাষ আই নীউ', ২০১ পৃঃ

১৫ ১৯০৫ সাল থেকে যখন বিলাতী জিনিসের বর্জন শুরু হয়, তখনই 'স্বদেশী আন্দোলন' কথাটা প্রচলিত হতে থাকে।

> কথাবার্তা তখন তখনই শুরু হয়ে গেল। আমি চাইছিলাম খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা পেতে, তাঁর প্ল্যান অনুযায়ী কোন্ স্তরের পর কোন্ স্তর—আন্দোলন ধাপে ধাপে তুলে শেষ পর্যন্ত কিভাবে বিদেশী আমলাতন্ত্রকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করা হবে। সেই উদ্দেশ্যে আমি ঝুড়ি ঝুড়ি প্রশ্ন করতে লাগলাম আর মহাত্মা ধৈর্য ধ'রে একের পর এক উত্তর দিয়ে চললেন।'[১৬]

কোথায় সংগ্রাম আর কোথায় অহিংসা, কোথায় বৈপ্লবিক প্ল্যান আর কোথায় গান্ধীর পদ্ধতিতে বৃটিশকে 'স্বমতে আনা'র সাধু ইচ্ছা—সুভাষচন্দ্র ভেবে এসেছিলেন এক, দেখলেন আর এক। ভগ্নমনে গান্ধীর কাছ থেকে তিনি বিদায় নিলেন, গান্ধীর যে 'কোন ধারণা নেই কিভাবে পরের পর স্তরে স্তরে আন্দোলন চালিয়ে ভারতবর্ষের বাঞ্ছিত স্বাধীনতা মিলবে,' এ বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের আর কোন সন্দেহ রইল না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ব্যারিস্টারির প্রচুর পশার ছেড়ে দিয়ে জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেন ও অর্থাভাব বরণ করেন; সুভাষচন্দ্র কলকাতায় নিজেদের বাড়িতে ফিরে গিয়ে তাঁর অধীনে কাজ আরম্ভ করলেন। দেশবন্ধুর কাছে থেকে অনেকদিক থেকে তার চোখ খুলে গেল।

রাজনীতিতে সুভাষচন্দ্র

১৯২০ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত গান্ধী যে ঘুরে দাঁড়ালেন, তার অব্যবহিত কারণ ছিল অমৃতসরের হত্যাকাণ্ড। এবার একটু তলিয়ে দেখা যাক, বৃটিশ রাজত্বে ভারতবর্ষে অশান্তি ক্রমবর্ধমান হবার মূলে ঠিক কী কী কারণ ছিল, কেনই বা একজন হীরের টুকরো ছেলে তার অমন সর্বোচ্চ চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এল। ইঙ্গ-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে সঙ্গীন অবস্থার সৃষ্টি করল ১৯২০ সাল। এরপর থেকে কোন পক্ষই আর খোলা মন নিয়ে কোন কিছু দেখতে পারল না: বার বার হানা

১৬ 'দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' ৬৬-৬৭ পৃ:

দিয়ে ফিরতে লাগল অশান্তি আর উপদ্রব, জাতিবিদ্বেষের দুর্ভেদ্য দেয়াল তুলে দাঁড়াল প্রচার আর দমন উৎপীড়ন, যা পরবর্তী সাতাশ বছর ধ'রে ভারতের রাজনীতিকে ঘোর বিশৃঙ্খলার মধ্যে ফেলে দিল এবং পরিণামে এদেশ থেকে বৃটিশকে লোপাট ক'রে ছেড়ে দিল, এমন কি ভারত সরকারে তার কোন শরিকানাও থাকল না। যারা মাথা ঠাণ্ডা ক'রে চলার পক্ষপাতী ছিল, তারা সুভাষচন্দ্রের মত একজন ভাল ছেলেকে হারালো : আরও অনেকে ছিল, যাদের বাপ দাদারা একদিন বৃটিশের সঙ্গে থেকে মনপ্রাণ দিয়ে ভারতেব সেবা করে গেছেন কিন্তু তারা নিজেরা বিপ্লবের পথই একমাত্র ব'লে ধ'রে নিয়েছে।

একশো বছর ধ'রে ব'লে আসা হয়েছে বৃটিশ রাজত্বের লক্ষ্য হল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। ধারাবাহিক শাসনসংস্কারের ভেতর দিয়ে ভারতীয়দের প্রথমে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন, পরে প্রাদেশিক শাসনভার দেওয়া হয়েছে, শেষ পর্যন্ত ১৯০৫ সালে দায়িত্বশীল পার্লামেণ্টারী সরকার গঠন করার কথাও ভাবা হচ্ছিল। এই নিয়মতান্ত্রিক ক্রমোন্নতির ব্যাপারে একটা বৈপরীত্য থেকে গিয়েছিল; যদিও শাসনসংস্কারকের দল বার বার জানিয়েছেন ভারতবর্ষের পক্ষে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র উপযুক্তও নয় অভিপ্রেতও নয়, তা সত্ত্বেও তাঁরা যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তাতে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের পথই প্রশস্ত হয়েছে। 'যদি পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র না হয়, তাহলে কী ধরনের সরকার?'—এ প্রশ্নের কোন উত্তর মেলেনি। যখন ভাবতবর্ষের স্বরাজ পাবার মত অবস্থা হবে, তখন ধীরে সুস্থে ও নিয়ে মাথা ঘামানো যাবে: আপাতত হাতে অনেক জরুরী ব্যবহারিক সমস্যা রয়েছে এখুনি যার মীমাংসা হওয়া দরকার। ব্যাপার দাঁড়ালো এই : বৃটিশরা যেন এমন একটা গলি দিয়ে হাঁটছে যার একটাই দরজা, তারা বরাবর ব'লে এসেছে গলিটা তারা ছেড়ে দেবে এবং প্রত্যেক কদমে তারা ক্রমশ দরজার দিকে এগোচ্ছে, অথচ যতই তারা এগোয় ততই বলে দরজা পেরোবার কোন ইচ্ছে তাদের নেই। কাজেই ভারতীয়দের অতি সহজেই এই ধারণা হল যে, কদম কদম এগোবে বটে, তবে দরজা যে বন্ধ সেই বন্ধই থাকবে এবং বৃটিশদের এখান থেকে নড়ানো যাবে না। এদিকে প্রত্যেক পদক্ষেপ মানেই একটা ক'রে নতুন ব্যবস্থা; তাতে

ভারতীয়দের মধ্যে যেমন এসেছে বৃটিশদের বাদ দিয়ে চলবার আগ্রহ, তেমনি নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতাও ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। রাজনৈতিক অশান্তি এই নিয়ে।

আরও কারণ ছিল। বৃটিশরা সাফ জানিয়েই দিয়েছিল যে, অদূর ভবিষ্যতে তারা ভারতবর্ষ ছেড়ে যাবে না, তাছাড়া তাদের আচার-আচরণেও নড়বার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তারা নয়াদিল্লীতে এক মস্ত রাজধানী পত্তন করবার সঙ্কল্প নিল: আইনের চোখে ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের সমানভাবে দেখবার প্রস্তাব না-মঞ্জুর হল: ভারতীয় জনমতের বিরুদ্ধে গিয়ে সরকারপক্ষ থেকে প্রজাদের ওপর বড় বড় সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা যথেচ্ছভাবে চাপানো হতে লাগল: ১৮৭০ সালে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার স্বীকৃত হলেও ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে তখনও বৃটিশদেরই প্রায় একাধিপত্য। ব্যাপারটা চরমে উঠল যখন সরকারে ভারতীয়দের অংশগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় আর ইউরোপীয়দের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ কমে এল এবং সে জায়গায় খুব সাবধানে হলেও রীতিমত বর্ণবৈষম্য মাথা চাড়া দিল।

১৯১৪ সালে যখন প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হল, ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের তখন খুব আশাহত অবস্থা। কেউ কেউ ভাবল বিপ্লব অনিবার্য, অন্য সবাই হাল ধ'রে থাকল। তারপর ১৯১৭ সালের আগস্ট মাসে বৃটিশ সরকার জানাল যে, যথাশীঘ্র ভারতবর্ষে নির্বাচিত সরকার গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তারা প্রকৃত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। এই প্রথম বৃটিশের মুখে শোনা গেল, তারা শুধু গলি ছেড়ে যাবে তাই নয়, দরজাটাও তারা পেরিয়ে যাবে। পরবর্তী ধাপ কী হবে, সে বিষয়ে বড়লাটের সঙ্গে আলোচনা ক'রে সিদ্ধান্ত নেবার জন্যে ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে ভারতসচিব এডউইন মণ্টেগু যখন ভারতবর্ষে এলেন তখন তাঁর বুঝতে দেরি হয়নি যে, বৃটেনের পক্ষে ভারতবর্ষে নিজের দখল বজায় রাখতে হলে এই তার শেষ সুযোগ:

> যদি এমন কিছু হয় যা ভারতবর্ষ গ্রহণ করবে না, কিম্বা গাঁইগুঁই ক'রে কৃপণের মত নামমাত্র রক্ষাকবচ ঠেকিয়ে দেওয়া, খোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-খোড়—তাহলে আমাদের দিক

থেকে সেটা হবে প্রতারণা এবং পরে আর কোন প্রতিকার করা যাবে না, কেননা মরে গেলেও আব কখনও তারা আমাদের বিশ্বাস করবে না। এত বড় একটা মহাদেশ, যার ইতিহাস আমাদের গবেব এবং যার আশা-আকাঙ্ক্ষা দুঃখ-শঙ্কা দেখে বুক ফেটে যায়।[১৭]

মণ্টেগু সাহেব আর বড়লাট, দুজনে আপ্রাণ চেষ্টা করলেন এমন একটা শাসন সংস্কারের খসড়া কবতে যা একাধারে ভাবতবর্ষ ও বৃটিশ পার্লামেণ্ট উভয়েরই গ্রহণযোগ্য হবে। অনেক অভাব-অভিযোগ আছে যা রাজনৈতিক সংস্কারে দূব হতে পারে; কিন্তু তাঁবা সামাজিক অসন্তোষও দেখতে পেলেন: 'অনেক শিক্ষিত ভারতীয়েরই মনের ভাব হল: ভারতবর্ষে যে ইংরেজরা আসে—জন্ম কিম্বা বুদ্ধি, জ্ঞানগম্যতা কিম্বা আনুগত্য—কোন দিক দিয়েই তারা শিক্ষিত ভারতীয়দেব ঠিক তাদের একজন ব'লে মনে কবতে পারে না।' তাঁরা বললেন, 'ভারতীয়দের মধ্যে এমন একদল যদি থেকে থাকে যারা প্রকৃতই চায় ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে আসুক, ইংরেজ অফিসার আর ইংরেজদের বণিকবৃত্তির কবল থেকে ভারতবর্ষ মুক্তি পাক —আমরা মনে করি তাঁদের সেই চাওয়ার মূলে রয়েছে গভীর মনোবেদনা। ইংরেজরা মনে করে না ভারতীয়রা তাদের সমান—এই রকমের একটা ভাব তাঁরা লক্ষ্য করেছেন।'[১৮] পার্লামেণ্টকে দিয়ে এর বিহিত হবার নয়। ভারতবর্ষের বৃটিশ বাসিন্দাদের ষোল আনা হৃদয়পরিবর্তন হলে তবেই এই আপদ বিদায় হতে পারত; কিন্তু তার জন্যে দরকার ছিল দীর্ঘদিনের নিরুপদ্রব শান্তি। দুঃখের বিষয় তার সুযোগ মেলে নি।

১৯১৯ সালে নতুন শাসন সংস্কারের যখন প্রস্তুতি চলেছে, সেই সময় ভারতীয় জনমতের প্রবলতম বিরোধিতা সত্ত্বেও আনা হল রাউলাট বিল।[১৯] এর ফলে পরের পর অনেকগুলো মারাত্মক কাণ্ড ঘটে গেল। বিলটির প্রয়োজন

১৭ ই. এস. মণ্টেগু, 'অ্যান ইণ্ডিয়ান ডায়েরি, ১০-১১ পৃঃ

১৮ 'মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্ট'-এর মুখবন্ধ

১৯ যুদ্ধের সময় বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে যেসব জরুরী ক্ষমতা সরকারের হাতে ছিল, যুদ্ধাবসানের পরেও যাতে তা কতকাংশে বজায় রাখা যায়।

আছে কি নেই এ নিয়ে বিতর্ক হতে পারত[২০]—কিন্তু বাধল অন্য ব্যাপার নিয়ে। যারা শাসন করছে, ভারতীয়দের মতামত তাদের বিরুদ্ধে গেলে তারা বিবেচনা করতে রাজী আছে কি না, যে সামাজিক রূপান্তর ছাড়া আসন্ন সংস্কারগুলো ব্যর্থ হয়ে যাবে সেই রূপান্তর বরণ করতে তারা সমর্থ কি না—এই প্রশ্নে এসে ঠেকে গেল। ইউরোপীয়দের মধ্যে অনেকেই, বিশেষত যারা মনে ক'রত ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের মেরে ঠাণ্ডা করা উচিত,—তারা শাসন-সংস্কারের বিরোধী ছিল। রাউলাট বিল পাশ করার ভেতর দিয়ে এই মনোভাবই প্রকাশ পেল এবং ১৯১৮ সালে মণ্টেগু সাহেব যে বিশ্বাসের ভাব গড়ে তুলেছিলেন এর ফলে তার হানি হল। মেরে ঠাণ্ডা করবার মনোভাব যাদের মধ্যে ছিল, পাঞ্জাবে বিক্ষোভ দেখা দেওয়ায় তারা মওকা পেয়ে গেল। অমৃতসরে সেই হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ঘটল। কে দায়ী এই নিয়ে ১৯২০ সালে যখন কুৎসিত কোঁদল দেখা দিল, তখন ভারতবর্ষকে সাধু সাজিয়ে এবং স্বদেশে উদারচিত্ততার বান বইয়ে দিয়েও পার পাওয়া গেল না। যত যাই হোক, ভারতবর্ষকে ঠকানো হয়েছে। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, আর সে কখনও বৃটেনের কথায় বিশ্বাস করেনি।

১৯২১ সালে এই আবহাওয়ার মধ্যে সুভাষচন্দ্র ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করলেন। পরবর্তী দু বছর ধ'রে কংগ্রেসের জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হিসেবে, জাতীয় সংবাদপত্র 'ফরওয়ার্ডে' এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সমিতিতে প্রচারবিভাগের ভারপ্রাপ্ত হিসেবে তাঁর কঠোর শিক্ষানবিসি চলল। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁকে দেখতে লাগলেন। গোটা কংগ্রেসের তুলনায় মতামতের দিক থেকে বাংলা কংগ্রেস ছিল এমনিতেই একটু দুর্দান্তগোছের; তার ওপর আবার শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন ছিলেন গান্ধীজীর চেয়েও আরেক কাঠি বাঘা স্বদেশী। সুভাষচন্দ্র অল্পদিনের মধ্যেই চিত্তরঞ্জনের আস্থাভাজন হয়ে উঠলেন এবং কলকাতা কংগ্রেসের আদত লোকদের একজন হয়ে উঠতে তাঁর দেরি হল না। ১৯২১ সালে গান্ধীর গুপ্ত বৈঠকে তিনি যোগ দিলেন। মহাত্মার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করলেন এবং নতুন অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী সংক্রান্ত তাঁর উপদেশাবলী শুনলেন। পরবর্তী দু মাসে প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্-এর ভারত আগমনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন দেখা দিল

২০ কখনও কার্যকরী করা হয় নি

সুভাষচন্দ্র হলেন তার একজন পাণ্ডা এবং কলকাতার কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতা। সরকারী আদেশে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বে-আইনী ব'লে ঘোষিত হল। চিত্তরঞ্জন লিখলেন, 'আমার হাতে যেন হাতকড়া, সর্বাঙ্গে শিকলের ভার। এ যন্ত্রণা বন্ধনের।' ১লা ডিসেম্বর বাংলাদেশে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হল।

পুলিশ তাঁকে সেই মুহূর্তে গ্রেপ্তার না করায় সুভাষচন্দ্র ক্ষুণ্ণ হলেন। যখন তিনি দিন গুনছেন কখন পুলিশ হানা দেবে, চিত্তরঞ্জন তাঁর মুখ হাঁড়ি দেখে 'আমাদের 'কাঁদুনে বীর' ব'লে ক্ষ্যাপাতে লাগলেন। পুলিশ হানা দিল ১০ই ডিসেম্বর। বেআইনীভাবে কুচকাওয়াজ করার দায়ে সুভাষচন্দ্রের এই প্রথম কারাদণ্ড হল; তাঁর কাছে সাজাটা বড় কম ব'লে ঠেকল; ম্যাজিস্ট্রেটকে বললেন, 'মোটে ছ' মাস! একি মুর্গীচোরের সাজা?' রাজনীতিতে সবে পা দেবার পক্ষে আরম্ভটা ভালই বলতে হবে। এই সময়ে চিত্তরঞ্জনেরও জেল হয় এবং মেয়াদের অনেকখানি তাঁদের একত্রে কাটে। সুভাষচন্দ্র নেতার পরিচর্যায় নিজেকে ঢেলে দিলেন, তাঁকে রেঁধে খাওয়ালেন এবং তাঁর কাছ থেকে কঠোর কৃচ্ছ্রতা শিখলেন। চিত্তরঞ্জনের আচার-ব্যবহার সুভাষচন্দ্রের মনে গভীরভাবে ছাপ ফেলল: সব সময় তিনি দেশ আর দশের কথা ভাবেন এবং সকলের সঙ্গেই তাঁর সমান সদয় ব্যবহার। সুভাষচন্দ্র এতদিন ধ'রে যে গুরুর সন্ধান করছিলেন, তিনি চিত্তরঞ্জনের মধ্যে তা পেয়ে গেলেন।

তাঁরা দুজনে সমানে আলোচনা করতেন রাজনৈতিক সংগ্রামের কথা, প্ল্যান করতেন ছাড়া পাবার পর তাঁরা কী করবেন। ১৯২২ সালে গান্ধী যখন অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার ক'রে নিলেন তখন দুজনের সে কী রাগ। মোটমাট কংগ্রেস যে নীতি নিয়ে চলছিল, তাতে চিত্তরঞ্জনের একেবারেই সায় ছিল না। সুভাষচন্দ্রের মতও ছিল তাই। তাঁদের মনে হয়েছিল ১৯১৯-১৯২০ সালে সংশোধিত প্রাদেশিক কাউন্সিল বয়কট করতে কংগ্রেস এই যে বলছে, সেটা আদৌ কোন সমাধান নয়। তার চেয়ে ঢের কাজের কাজ হবে যদি নির্বাচনে লড়া যায়, যদি কাউন্সিলে ঢোকা যায়, যদি ভেতর থেকে কাউন্সিলগুলোকে অচল করে দেওয়া যায়। জেল থেকে বেরিয়েই চিত্তরঞ্জন কংগ্রেসকে সেই পথে ভেড়াতে

চেষ্টা করলেন। ১৯২২ সালে আমরা দেখতে পাই সুভাষচন্দ্র জীবনে এই প্রথম রাজনৈতিক বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন—বলছেন মনপ্রাণ ঢেলে কাজ এবং শান্তভাবে দুঃখবরণের কথা, সমাজসেবার কথা, সামাজিক অকল্যাণ দূর করার কথা। বন্যাপ্লাবিত উত্তরবঙ্গে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তিনি রিলিফের কাজের ভার নিয়ে গেলেন, সেখানে ছ'সপ্তাহ ধ'রে তাঁকে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করতে হল। যেখানে দুঃখকষ্ট সেখানে কাজ করবার অদম্য উৎসাহ এবং সংগঠন করবার ক্ষমতা তাঁর মধ্যে ছিল। ফলে তিনি লোকের কাছ থেকে পেলেন অশেষ শ্রদ্ধা এবং প্রদেশ জুড়ে তাঁর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা বেড়ে গেল।

১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসের অধিবেশনে কংগ্রেস-সভাপতি চিত্তরঞ্জন চাইলেন কংগ্রেস তাঁর নতুন মত সমর্থন করুক: সুভাষচন্দ্র ছিলেন তার সচিব এবং সক্রিয় সমর্থক। কিন্তু গান্ধী যদিও জেলে, তাঁর 'কাউন্সিল-প্রবেশ'বিরোধী নীতির প্রভাব তখনও অপ্রতিহত। এক মাস পরে চিত্তরঞ্জন পদত্যাগ ক'রে 'স্বরাজ্য পার্টি'[২১] গড়লেন এবং ১৯২৩ সালের নির্বাচনযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। স্বরাজ্য দল তখনও কংগ্রেসেরই অন্তর্ভুক্ত এবং কংগ্রেসের সরকারী সমর্থন না পেলেও খানিকটা তার ইজ্জতের জোরে নির্বাচনে অপ্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন করল। ১৯২৪ সালের গোড়ায় স্বরাজ্যপন্থীরা দিল্লীর কেন্দ্রীয় আইন সভায় শক্তিশালী সংখ্যালঘু দল হিসেবে দেখা দিলেন এবং মধ্যপ্রদেশ ও বাংলায় দলে ভারী হওয়ায় এই দুই প্রদেশে এমন অবস্থা হল যে, গভর্নরেরা অগত্যা স্বহস্তে কর্তৃত্ব গ্রহণ করলেন।

ইতিমধ্যে ১৯২৪-এর এপ্রিলে কলকাতা কর্পোরেশনের পরিচালনাভার স্বরাজ্যপন্থীদের হাতে এল। কর্পোরেশনে বেপরোয়াভাবে অচল অবস্থা সৃষ্টি সম্ভব হয়নি: চিত্তরঞ্জন হলেন মেয়র আর সুভাষচন্দ্র চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার নির্বাচিত হলেন। নতুন গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কর্পোরেশন বহুলাংশে স্বায়ত্তশাসন পেল আর সুভাষচন্দ্র এক হাজার টাকা বেতন, বড় চাকরি এবং প্রচুর ক্ষমতা হাতে পেলেন। আই. সি. এস হলে যে কাজের ভার পেতে তাঁর বহু বছর কেটে যেত, সাতাশ বছর বয়সে সুভাষচন্দ্র তার চেয়েও ভারী পদ লাভ করলেন। পৌর শাসনকর্তৃপক্ষ খদ্দর পরা ধরলেন, নিজেদের

২১ স্বরাজ্য দল

মাইনে কমিয়ে দিলেন, জাতীয়তাবাদী নায়কদের নামে রাস্তাঘাট ও সাধারণ স্থানের নতুন ক'রে নামকরণ করলেন এবং শিক্ষা, জনকল্যাণ ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি করলেন। সুভাষচন্দ্র যে এতদিকে সামাল দিতে পারলেন তার পেছনে অনেকটা ছিল চিত্তরঞ্জনের প্রভাব। এ কাজ করতে গিয়ে তাঁর মধ্যে যতটা একগুঁয়েমি দেখা যাবে বলে মনে হয়েছিল, ততটা দেখা গেল না; কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসটুকু তিনি ভুলতে পারেন নি। কর্পোরেশনে যেসব প্রবীণ সাহেবসুবোরা চাকরি করত তারা যে তাঁর তাঁবে, এ কথাটা তাদের যে তিনি সমঝে দিতেন না এমন নয়। কর্পোরেশনের কাজ বড় বেশী গঠনমূলক, তাতে খাটতেও হয় খুব; এ কাজ সুভাষচন্দ্রের খুব মনে ধরেছিল। তিনি এ কাজের খুঁটিনাটির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেললেন। এমন হল যে ঝানু আমলাদের মত তিনি ফাইল বগলে ক'রে বাড়ি ফিরতে লাগলেন। এক সময়ে তিনি দেখলেন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে তাঁর নাম এক রকম কংগ্রেসের খরচের খাতায় উঠে গেছে।

এদিকে তাঁকে গদিচ্যুত করবারও তোড়জোড় চলছিল। ১৯২৩ সালে বাংলাদেশে নতুন ক'রে বোমাপিস্তলের উদয় হল: স্বরাজ্যপন্থীদের সম্বন্ধে তখন এই ধারণা যে, তারা সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত। ১৯২৪ সালে অবস্থা আরও সঙ্গিন হল; পুলিশ একেবারেই এঁটে উঠতে পারছিল না। 'উড়ো চিঠিতে ভয় দেখানো নিত্যকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।...যে যার কাজে ঘুরলেও গুপ্ত-সমিতিগুলোর ভয়ে তটস্থ থাকত।'[২২] পুরনো ভয়তরাসের দিনগুলো আবার ফিরে এল। ১৯২৪-এর মার্চ মাসে খুনের দায়ে সন্ত্রাসবাদী গোপীনাথ সাহার ফাঁসি হল। অপরাধ সাব্যস্ত হলেও, তাঁর বীরোচিত আচরণে লোকের মনে গভীরভাবে ছাপ পড়ল। মা-র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি মাকে সান্ত্বনয়ে বললেন, 'ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো যেন ভারতের প্রত্যেক জননীর এমনি সন্তান হয়, যেন ঘরে ঘরে এমনি সন্তানের এমনি জননী হয়।' তারপর স্বগতোক্তি করে বললেন, 'আমার রক্তের প্রতি ফোঁটায় ভারতের ঘরে ঘরে স্বাধীনতার বীজ বোনা হোক।' স্বরাজ্যদলের মুখপাত্র হিসেবে সরকারীভাবে সন্ত্রাসবাদকে নিন্দা জানালেও এই ধরণের বীরত্বব্যঞ্জক কথায় সুভাষচন্দ্রের মনে সাড়া না

২২ লর্ড লিটন, 'পানডিট্স্ অ্যাণ্ড এলিফ্যান্টস'

জেগে পারত না। তাঁর অফিসে ছিল অবারিত দ্বার। বিপ্লবীদের অনেকের সঙ্গেই তাঁর চেনাপরিচয় ছিল এবং গভীর রাত পর্যন্ত তাঁর কাছে লোক আনাগোনা করত। কাজেই সরকারী মহলের চোখে তিনি সন্দেহভাজন না হয়ে পারেননি: বৃটিশের কাছে তিনি ছিলেন ধাঁধাঁ—বিশেষ যে জিনিসটাকে তারা সবচেয়ে বেশী ডবায়। সত্যি বলতে গেলে কি, তাঁর পক্ষে সক্রিয়ভাবে ষড়যন্ত্রের মধ্যে থাকা সম্ভব ছিল না; কিন্তু ১৯২৪-এর অক্টোবরে যখন জরুরী অর্ডিনান্সবলে সন্দেহভাজন সন্ত্রাসবাদী নেতাদের ব্যাপকভাবে ধরা হল, তখন সুভাষচন্দ্র বসুকেও একজন সাঙ্ঘাতিক বিপজ্জনক ব্যক্তি ব'লে গ্রেপ্তার করা হল। তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই আনা হল না; তাঁকে বিনা বিচারে অযথা আটক ক'রে রাখায় দেশে এমন হৈ-চৈ হল যে, বিচারে সাজা দেওয়া সম্ভব হলে কর্তৃপক্ষ তাঁকে আদালতে সোপর্দ না ক'রে পারত না। দুটো মাস সুভাষচন্দ্র আলিপুর জেলে ব'সেই পৌরশাসন-সংক্রান্ত কাজকর্ম চালিয়ে গেলেন। তারপর ১৯২৫-এর জানুয়ারীতে অন্য সাতজনের সঙ্গে তাঁকে বর্মার প্রসিদ্ধ মাণ্ডালে দুর্গে বদলী করা হল।

মাণ্ডালে দুর্গে বন্দীদশার দুটি বছর তাঁর জীবনে খুব স্মরণীয় হয়ে থাকল। তিনি যখন এলেন তখনও অপরিণত, পদে পদে গুরুর উপদেশ দরকার হত এবং মাথার মধ্যে ছাত্রসুলভ ধ্যানধারণাগুলো গিজ গিজ করত; তখন সবে তিনি সাবালক রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা আর বিচার বিবেচনার দিক দিয়ে পোড় খেতে শুরু করেছেন। ১৯২৭ সালে জেল থেকে যখন বেরোলেন দেখা গেল এতদিনে তাঁর একটা নিজস্ব সুস্পষ্ট রাজনৈতিক মতামত গড়ে উঠেছে, চিত্তরঞ্জন বেঁচে নেই এবং ব্যাপকভাবে লোকে তাঁকেই এখন বাংলার স্বাভাবিক নেতা ব'লে মনে করছে। গোড়া থেকেই সুভাষচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাঁর কারাবাস ব্যর্থ যাবে না:

> বাধ্য হয়ে নির্জনতার মধ্যে দিন কাটাতে হয় ব'লে রাজবন্দীরা জীবনের বহু মূল প্রশ্ন নিয়ে থিতিয়ে ভাববার সুযোগ পায়। নিজের দিক থেকে আমি তো বলতে পারি যে, আমাদের ব্যক্তিগত এবং যৌথ জীবনের ঘূর্ণাবর্তে পাক-খাওয়া অনেক জটিলতম প্রশ্ন আস্তে আস্তে সমাধানের খোলা রাস্তা খুঁজে পায়। আগে যেসব জিনিস আমাকে

হাতড়ে ফিরতে হত, যেসব মত পরীক্ষাচ্ছলে আমি ব্যক্ত করতাম, দিন দিন তা আরও পরিপাটিভাবে দানা বাঁধছে। অন্য কারণেব কথা ছেড়ে দিলেও, অন্তত এই একটিমাত্র কারণে আমার মনে হচ্ছে জেলে থেকে আত্মিক দিক থেকে আমি লাভবান হব।[২৩]

তবে দক্ষিণাও কম দিতে হয়নি। অবস্থার চাপে প'ড়ে অন্তর বিদ্রোহ করায় গোড়ার দিকে তাঁর মনে শান্তি ছিল না এবং শরীরস্বাস্থ্যও ভেঙে পড়ছে ব'লে তাঁর মনে হতে লাগল। তাঁর কথা থেকে জানা যায়, পরে তিনি আত্ম-বিশ্লেষণের পথ ধরলেন, নিজের মনের ওপর 'জোরালো সন্ধানী-আলো ফেললেন,' খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিরাসক্তভাবে নিজের ভাবগতিক ও কাজকর্ম যাচাই করতে লাগলেন :

আমার মধ্যে ভাবান্তর দেখা দিল, আমি ঠিক করলাম মানুষ হিসেবে খাঁটি হব। সঙ্কল্প নিলাম, যেমন আর কারো ব্যাপারে তেমনি আমি আমার নিজের চালচলনের ব্যাপারেও সজাগ থেকে সে সম্বন্ধে একটা বিচারে আসব। আমি বলতে পারি, এটা অভ্যেস করার ভেতর দিয়ে আমি রীতিমত সহিষ্ণু হতে শিখলাম—যদিও কার্যত পারব কিনা জানি না— তবে ঘটনা দাঁড়ালো—আমার মনে হল এমন কি সংগ্রামের মধ্যে নিমগ্ন থেকেও প্রত্যেকের কর্তব্য হল প্রতিপক্ষের প্রতি শুধু সদয় হওয়া নয়, তাদের ভালবাসা।[২৪]

তাঁর শিক্ষা সাঙ্গ—এ দাবি তিনি করেননি : শত্রুদের ভালবাসা সব সময়েই কঠিন, কেননা : 'আত্মাদর জিনিসটার খাঁই এত বেশী থাকে যে, সে তার ধারেকাছে বেশীদিন কোন প্রতিবেশীকে সইতে পারে না।' তবে উপলব্ধিটা ছিল আর সেইসঙ্গে ছিল একটা নতুন মনোবল।

১৯২৫-এর জুন মাসে চিত্তরঞ্জন দাশের আকস্মিক মৃত্যুতে এই ব'লে তিনি শোক প্রকাশ করেছিলেন :

২৩ ১৯২৫-এর ২রা মে, দিলীপকুমার রায়কে লেখা চিঠি

২৪ 'দি সুভাষ আই নীউ,'—১৭৮ পৃঃ

> রাজনীতির ক্ষেত্রে আমি তাঁর অনুগামী ছিলাম ব'লে ততটা নয়, আমি সেই মানুষটিকে জেনেছিলাম···ব্যক্তিগতভাবে জেনেছিলাম ব'লেই আমি তাঁকে আমার অন্তরের গভীর সাযুজ্য ও সশ্রদ্ধ ভালবাসা নিবেদন করেছিলাম। বলতে গেলে, সহকর্মী ও দলের লোকেরাই ছিল তাঁর আত্মীয়পরিবার। একবার আট মাস একসঙ্গে জেলে থেকেছি: একই সেলে দু মাস, বাকি ছ মাস পাশাপাশি সেলে। তাঁকে এইভাবে জেনেছিলাম ব'লেই তাঁর চরণে আশ্রয় নিয়েছিলাম।···[২৫]

এই 'কালান্তক ক্ষতি' বাংলার যুবসমাজকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিল। সুভাষচন্দ্রের জীবনেও এক কালান্তর ঘটল: এই প্রথম তিনি নিজের পায়ে দাঁড়ালেন। তার মন অচল হল না। অতীতের কথা ভাবতে বসলেন— ধর্মযোগী আর কর্মযোগীর জীবন নিয়ে দিলীপকুমারের সঙ্গে তাঁর পুরনো তর্কের কথা মনে পড়তে লাগল। এ প্রশ্নে তাঁর মন এখন তৈরি: নিজেকে বেশীরকম সরিয়ে রাখলে মানুষের কর্মের দিকটা ক্ষয়ে যায়, 'কাজ ও সেবা—অধিকাংশের এটাই হওয়া উচিত জীবনের মুখ্য ব্রত।' তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন যে, দুরারোগ্য নিশ্চেষ্টতার ব্যাধির হাত থেকে বাঁচতে হলে ভারতবর্ষের পক্ষে কর্মীর দরকার। পরমার্থ চিন্তা করবে বাছা বাছা জনকয়েক লোক—চিন্তার ফল তারাই আমাদের যোগাবে। চিত্রকর আর সুরকারদেরও স্থান থাকবে: 'ওগো বন্ধু, গানের বন্যায় সারা দেশ ভাসিয়ে দাও, আমাদের জীবনে সহজ হৃত আনন্দ ফিরিয়ে আনো।' তাঁর নিজের পক্ষে শিল্পী হওয়া চলবে না, সে ক্ষমতা তাঁর নেই, কিন্তু শিল্পীর কদর তিনি বোঝেন এবং চেষ্টা ক'রে রসবোধও তিনি অর্জন করেছেন।

জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর সুভাষচন্দ্র যে সব বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা থেকে তাঁর রাজনৈতিক মতিগতি বোঝা যায়। কংগ্রেস সংগঠনকে পাল্টা সরকার হিসেবে গ'ড়ে তুলে স্বাধীনতা পেতে হবে। শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগ ও সংগঠনের দেখাদেখি কংগ্রেসকেও বিভিন্ন বিভাগ ও সংগঠন খাড়া করতে হবে। শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে, ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে

২৫ 'দি সুভাষ আই নীউ' ২১৯ পৃঃ

শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে; যে সমাজতন্ত্রে তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাসী, সেই সমাজতন্ত্রের জন্যে ভালভাবে কোমর বেঁধে লাগতে হবে। কংগ্রেসের ক্ষমতা দখলের উপায় সম্পর্কেও এখন তাঁর ধারণা স্পষ্ট : জাতীয় আন্দোলন শেষ পর্যন্ত সাধারণ ধর্মঘট ও আইন অমান্যের রূপ নেবে; এর ফলে দেশ শাসনের ব্যাপারে অচল অবস্থার সৃষ্টি হবে। জেলখানায় লোক ধরবে না। সরকারের মনোবল ভেঙে যাবে; কারণ, সরকার তার নিজের কর্মচারীদের আনুগত্যের ওপর আর ভরসা রাখতে পারবে না। আমলাতন্ত্র তখন জনপ্রতিনিধিদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হবে।'

ভাবী সংবিধান হবে প্রজাতান্ত্রিক। সুভাষচন্দ্র ডোমিনিয়ন স্টেটাস গ্রহণ করতে রাজী হন নি; কারণ তাঁর ভয় ছিল, তাতে ক'রে ভারতবর্ষে বৃটিশ পুঁজিপতিদের স্বার্থ বরাবরের মত কায়েমী হয়ে বসবে। 'দমনপীড়নমূলক অর্ডিনান্স' থাকবেই না; ধনবৈষম্য, শ্রেণীভেদ ও বর্ণপার্থক্য—এসব বেড়া ভেঙে ফেলতে হবে; নারীপুরুষের সমান অধিকার হবে; নির্বাচনের ভোটে হিন্দুমুসলমানভেদ থাকবে না। সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোয়ারার ভিত্তিতে আইন সভায় জনপ্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থাকে তিনি দেশের মধ্যে বিভেদ জীইয়ে রাখা ও বিদেশী শাসন টিঁকিয়ে রাখবার কৌশল বলেই মনে করতেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল, সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারলে ও সমস্যাটাই আর থাকবে না; জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই বিশ্বাসে তিনি অটল ছিলেন।

১৯২৬-এর শেষে বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে তিনি মনোনীত হন; তাঁর বন্ধুরা ভেবেছিলেন এইভাবে নির্বাচিত হওয়ায় সরকার তাঁকে আর জেলে ধ'রে রাখতে পারবে না। কিন্তু সে চাল খাটল না। তাঁকে জোর ক'রে আটকে রেখে সদস্যপদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে, সুতরাং আইনসভায় আলাপ-আলোচনার কোন বৈধতা থাকছে না—ইত্যাকার সুচতুর জোরালো যুক্তি দেখানো সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র কারাগারে থেকে গেলেন। মাণ্ডালের লালইটের দুর্গের মধ্যে রাজবাড়িটা ছিল যেন রূপকথার রাজ্য; বৃটিশ ১৮৮৫ সালে যে অত্যাচারী থিব রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করেছিল এখানে তার কত না চিহ্ন, একদা-কারারুদ্ধ ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের এখানে কত না স্মৃতি—সুভাষচন্দ্রের সেলের বারান্দা থেকে সব দেখা যেত। এই জেলখানায় তাঁকে আরও কয়েক মাস থাকতে হল। স্বাস্থ্য আগেই বেযুৎ হতে আরম্ভ

করেছিল ; ১৯২৭ সালে তাঁর শরীর এমন ভেঙে গেল যে, বাংলা সরকার এই শর্তে তাঁকে ছেড়ে দিতে রাজী হল যে, তিনি ভারতবর্ষে পদার্পণ না ক'রে সোজা সুইজারল্যাণ্ডে চলে যাবেন। সুভাষচন্দ্র ঘৃণার সঙ্গে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন :

মনের মধ্যে আঁকা মূর্তিগুলো নিজেরাই নিজেদের ভাগ্যবিধাতা। আমরা তো হলাম তাল তাল মাটি ; আমাদের দেহের কৌটোয় বৈশ্বানরের স্ফুলিঙ্গ। আমাদের কাজ এই ভাবমূর্তির পায়ে নিজেদের ডালি দেওয়া। এইভাবে উৎসর্গ-করা জীবন কখনও বৃথা যায় না। আমাদের ঐহিক ও দৈহিক অস্তিত্বে যত ধাক্কাই আসুক আমি যে আদর্শের জন্যে লড়ছি, পরিণামে তার জয় যে হবেই—আমার এ বিশ্বাসের একচুল এদিক ওদিক হয় নি। কাজেই শরীর কেমন থাকল, অদৃষ্টে কী আছে না আছে—এসব নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।

···দোকানদার নেই ; আমি দর কষাকষি করি না। কূটনীতির পিচ্ছিল পথে আমি চলতে চাই না—ও আমার ধাতে নেই। আমি নীতি নিয়ে লড়েছিলাম। ব্যাস্, মিটে গেল। দেহাশ্রয়ী জীবনটা এমন কিছু মূল্যবান নয় যে, দবদস্তুর করে তাকে টিঁকিয়ে রাখতে হবে। বাজারে যে জিনিসের যে দাম, আমার কাছে সে জিনিসের ঠিক সেই দাম নয়। আমি মনে করি না শারীরিক কিম্বা আধিভৌতিক কষ্টিপাথরে জীবনের সার্থকতা অসার্থকতা যাচাই করা যায়। 'আমাদের লড়াই এই মরদেহটার জন্যে নয়, পার্থিব সুখের জন্যে নয়।···আমাদের মল্লযুদ্ধ রক্তমাংসের সঙ্গে নয়—রাজত্বটার সঙ্গে, প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার সঙ্গে, এই পৃথিবীর অন্ধকারের কর্তাদের সঙ্গে, যারা উচ্চাসনে ব'সে আছে তাদের দৌরাত্ম্যের সঙ্গে।'

যেদিকে স্বাধীনতা ও সত্যের আদর্শ আমরা সেইদিকে ; দিনের পর রাত্রির মত এ আদর্শের জয় হবেই হবে। আমাদের দেহ এলিয়ে পড়তে পারে, দেহ ধ্বংস হতে পারে : কিন্তু যদি বিশ্বাস অটুট আর মনোবল বজায় থাকে, জয় আমাদের অনিবার্য। আমাদের প্রয়াস-প্রচেষ্টা

যেদিন সার্থক হয়ে উঠবে, সেদিন আমাদের মধ্যে কে থাকবে কে না থাকবে—তা ঠিক করবার মালিক বিধাতা। নিজের সম্বন্ধে বলতে পারি বাঁচার মত বাঁচতে পেরে আমি সুখী—বাকিটা অদৃষ্টের হাতে।[২৬]

এমনিতেই তাঁর শরীর এত খারাপ হয়ে পড়েছিল যে, সুইজারল্যাণ্ড যেতে হলে শরীরটা ঠিক করে নিতেও সময় লাগবে। এর ফলে ১৬ই মে তাঁকে মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হল। নভেম্বরে সুভাষচন্দ্র সুস্থশরীরে আবার পুরোদমে রাজনীতির কাজ শুরু করলেন; তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হলেন। ঐ মাসেই একটি বৃটিশ পার্লামেণ্টারি কমিশন গঠিত হল; তার ওপর ভার পড়ল ভারতের শাসনতান্ত্রিক ধারায় এরপর কী করলে অগ্রগতি হবে তা ভেবে দেখবার। এদিকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা এতদিন অগৌণে ডমিনিয়ন স্টেটাস পাবার কথা সমানে ভেবে এসেছে। সুতরাং যদিও নির্দিষ্ট সময়ের আগে, তাহলেও ১৯১৯-এর শাসনতন্ত্র অনুসারে, একটা নেহাৎ মামুলি কমিশন ঠেকিয়ে দেওয়ায় চারিদিক থেকে জোট বেঁধে আক্রমণ করার একটা সুযোগ জুটে গেল। কী হিন্দু কী মুসলমান—দেখতে দেখতে রে-রে ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ১৯২১ সালে এই ছিল হাওয়া; আর এই হাওয়াতেই সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ভাল খুলত। দেশভক্ত শ্রোতার দল বেশ গর্জাবে, ঝোঁকে ঝোঁকে আওয়াজ তুলবে—এই তিনি ভালোবাসতেন; যখন তারা হাততালিতে ফেটে পড়বে, তখন তিনি বুঝবেন তাঁর কথায় দেশের লোকের সায় আছে; এতে তিনি বল পেতেন, কথায় ঝড় বইত এবং আত্মবিশ্বাস আসত। জেলে থাকতে এক সময়ে নিজেকে অকিঞ্চিৎকর ও বিশ্বকে রহস্য ব'লে মনে হয়েছিল—আর সেই দার্শনিকতা থাকল না। 'অন্ধকারে হাতড়াচ্ছি ব'লে মাঝে মাঝে মনে হয়'—ব'লে সেই একঘেয়ে ধুয়োটাও আর শোনা গেল না। তাঁর সন্দেহ-সংশয় ব'লে কিছু আর নেই;[২৭] নিজের ওপর তখন তাঁর অখণ্ড, এবং বলতে কি, একগুঁয়ে বিশ্বাস; জনতা তাঁকে পুজো করত বলেই তাঁর মধ্যে এই ভাব

২৬ ১৯২৭ সালের ৮ই মে ইনসিন জেল থেকে দাদাকে লেখা চিঠি

২৭ দি সুভাষ আই নীউ, ১০৫ পৃঃ

এত বেড়ে গিয়েছিল। তিনি হেঁকে বললেন, 'পরাধীন জাতির রাজনীতিই সব', 'দুনিয়ায় এমন শক্তি নেই ভারতবর্ষকে আর বেশীদিন শিকলে বেঁধে রাখে,'[২৮] 'স্বাধীনতার বেদীমূলে জীবন উৎসর্গ করো,'[২৯] 'ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে তাতে সন্দেহই নেই—কবে হবে সেটাই এখন প্রশ্ন।'[৩০]

সাধারণ শ্রোতাদের ওপর তিনি যে কত জোর দিতেন, তা অদ্ভুতভাবে প্রকাশ পেয়েছে তরুণ রাজনৈতিক কর্মীদের কাছে প্রদত্ত তাঁর একটি উপদেশমূলক বক্তৃতায়:

> নিজেদের প্রভাব বজায় রাখার জন্যে বিরাট বিরাট জনতাকে তোমাদের সামলাতে হবে। কখনও কখনও হয়ত হাততালি পাবার চেষ্টা করতে হবে। অনেক সময় জনতার সঙ্গে অভিন্নহৃদয় হবার জন্যে নিজেদের হয়ত একটু নিচে নামবারও দরকার হতে পারে।
>
> আবার, স্রোতের প্রতিকূলেও কখনও কখনও চলতে হতে পারে
>
> আমাদের জাতীয় জীবনের মূল সমস্যাগুলো যদি তোমরা মিটিয়ে ফেলতে চাও, তাহলে সমসাময়িক আর সকলের চেয়ে তোমাদের ঢের বেশী দূরদর্শী হতে হবে। সাধারণ মানুষ অনেক সময় উপস্থিতের সঙ্গে এমনভাবে বাঁধা থাকে যে, ভবিষ্যৎকে তারা দেখতে পায় না। লোকের কুপ্রবৃত্তিগুলোকে যদি ঠেকাতে যাও, হয়ত তারা তোমাদের কথায় কানই দেবে না। সে অবস্থায় সাহসে ভর ক'রে একা দাঁড়াতে হবে। সব অবস্থাতেই লোকের মন যুগিয়ে যে চলতে চায়, সাময়িকভাবে লোকের কাছে সে বাহবা পেতে পাবে—কিন্তু ইতিহাস তাকে মনে রাখে না।[৩১]

২৮ ২৯শে অক্টোবর, ১৯২৯
২৯ ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯২৯
৩০ ২৯শে নভেম্বর, ১৯২৯
৩১ নাগপুর, ২৯শে নভেম্বর, ১৯২৯

সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে বলা যায়, কখনও কখনও যদিও তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে দ্বিধা করতেন না, কিন্তু যেখানে মতের মিল হত সেখানে নিঃসন্দেহে জনতাকেই তিনি সর্বেসর্বা বলে মনে করতেন। এতে মস্ত বড় বিপদের আশঙ্কা থেকে গিয়েছিল; কারণ, তাঁর মধ্যে এমন প্রচণ্ড চালনাশক্তি ছিল যে, তিনি জনতাকে তোড়ে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন; আবার সেই তোড়ে নিজেও ভেসে যেতেন।

১৯২৮ সালে কংগ্রেসপরিচালনার কাজে নাম করবার তাঁর অনেক নতুন নতুন সুযোগ জুটে গেল। তিনি যে বহু টানাপোড়েনের ভেতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতিতে চিত্তরঞ্জনের শূন্যস্থান পূর্ণ করতে পেরেছিলেন—এই উঠ্‌তি খ্যাতি তাতে সহায় হয়েছিল। ১৯২৭-এর ডিসেম্বরে জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে একযোগে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হন। ১৯২৮ সালে গ্রীষ্মকালে পার্লামেণ্টারি কমিশনের আস্পর্ধার জবাব দেবার জন্যে যে সর্বদলীয় কমিটি তৈরি হয়েছিল সুভাষচন্দ্র তার অন্যতম সদস্য ছিলেন। এই জবাবপত্রে ডমিনিয়ন স্টেটাস গ্রহণের সুপারিশ থাকলেও, পূর্ণ স্বরাজের দাবিতে আন্দোলন চালাবার জন্যে 'ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ' গড়ার ব্যাপারে শ্রীযুক্ত নেহরুর সঙ্গে তিনি হাত মেলালেন। সুভাষচন্দ্র যেখানেই যেতেন, মুক্তির পথ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মত জলজ্বল ক'রে ফুটে উঠত এবং ভারতীয় যুবসমাজকে তিনি বক্তৃতায় অনুপ্রাণিত করে তুলতেন। বক্তৃতা ব্যাপারটা তাঁর বেশ রপ্ত হয়ে গেল, উপমা-অলঙ্কার প্রয়োগে তিনি সিদ্ধহস্ত হলেন। উঁচুদরের নেতা হিসেবে তাঁর ব্যাপক প্রতিষ্ঠা হল। ১৯২৮ সালে কংগ্রেস অধিবেশনের সময় তিনি হলেন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের অধিনায়ক; তাঁর মুখে 'ভলাণ্টিয়ারস্, ফল্ ইন' আওয়াজ এবং তাঁর হাতে গড়া স্বেচ্ছাসেবক-দের চটপট নিখুঁত কুচকাওয়াজ—এই সব দেখে শুনে কংগ্রেসের অহিংসবাদী লোকজনেরাও খুশী না হয়ে পারল না; জামশেদপুরের লোহাকারখানার মজুরদের এক ধর্মঘটে তাঁর হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত একটা সুবিধাজনক শর্তে নিষ্পত্তি হল; লাহোর জেলে অনশনে মৃত শহীদ যতীন দাসের শবদেহ নিয়ে ১৯২৮-এর সেপ্টেম্বর কলকাতায় যে শোকমিছিল বার হল, তার নেতৃত্বে থাকলেন সুভাষচন্দ্র। এক রাজনৈতিক সংগ্রামে যোগ

দেওয়ানোর ব্যাপারে ছাড়া মেয়েদের সম্পর্কে তাঁকে তখনও কেউ বড় একটা উৎসাহী হতে দেখেনি এবং এই সময় থেকেই রটতে শুরু করে যে, তিনি পণ করেছেন যতদিন না ভারত স্বাধীন হয় ততদিন তিনি বিয়ে করবেন না। এর সঙ্গে মদ না-ছোঁয়ার ব্যাপারটা যোগ হয়ে সাধারণ লোকের মধ্যে তাঁর প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে বেড়ে গিয়েছিল।

ভারতীয় সংগ্রামের পরবর্তী সঙ্কট এই সময় ঘনিয়ে আসছিল। ইংলণ্ডে নবনির্বাচিত শ্রমিকদলের মন্ত্রিসভার সঙ্গে কয়েক মাস ধ'রে সলাপরামর্শ চালিয়ে বড়লাট লর্ড আরউইন সরকারীভাবে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে, ভারতে শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি ঘটাতে গেলে ডমিনিয়ন স্টেটাসের 'প্রশ্নটি স্বভাবত'ই আসে এবং পার্লামেণ্টারি কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর গোলটেবিল বৈঠক ডাকা হবে। কয়েক সপ্তাহ হালচাল দেখে মনে হল, এতে জাতীয়তাবাদী নেতাদেব কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যাবে। কিন্তু সে অবস্থা কেটে গেল; ১৯৩০ সালে শুরু হল পুরোদমে আইন অমান্য আন্দোলন। মুক্তি মিছিলে নেতৃত্ব করার জন্যে ২৩শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র তাঁর জন্মদিনে গ্রেপ্তার হলেন এবং তাঁর এক বছবের জেল হল। জেলে আবাব তাঁর শান্তসৌম্য ভাব ফিরে এল; এক মাসও হয়নি কংগ্রেস অধিবেশনে জোর গলায় তিনি বলেছিলেন: 'আমি হলাম চরমপন্থী; হয় ষোল আনা, নইলে কিছু নয়—এই আমার নীতি', অথচ জেলে গিয়ে কংগ্রেসী বন্ধুদের সঙ্গে তিনি দিব্যি মিশে গেলেন, একটা চাদর টাঙিয়ে ঘবের এক কোণে তিনি নিজের আলাদা একটু জায়গা ক'রে নিলেন, সেখানে চলল তাঁর লেখাপড়া আর ধ্যানোপাসনা। জেলের মধ্যেও বারকয়েক হাঙ্গামা হল, জেলের সেপাইদের হাতে জনকয়েক কয়েদীকে মারধর খেতে দেখে তার মধ্যে গিয়ে দাঁড়ানোর ফলে তিনি আহত হলেন, জেলখানায় দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি জুলাই মাসে অনশন ধর্ম্মঘট করলেন। মাঝে মাঝে এই ভাবে সুস্থ শরীর ব্যস্ত করলেও দু'বছরের একটানা কঠোর পরিশ্রমের পর জেলে এসে যেটুকু বিশ্রাম তিনি পেলেন তা খুবই কাজের হয়েছিল।

২৫শে সেপ্টেম্বর ছাড়া পাবার পরই তিনি বেরিয়ে সোজা মেয়রের গদিতে বসলেন। কারণ তিনি মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু জেলে

থাকায় ছ মাসের মধ্যে তাঁর পক্ষে শপথ গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। পৌর ও শ্রমিক আন্দোলনের সমস্যা (পরের বছরে তাঁর সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি হওয়ার কথা) আর আইন অমান্য আন্দোলনের বন্দীদের দেখাশুনা করা—এই নিয়ে পরবর্তী তিন মাস সুভাষচন্দ্রকে ব্যস্ত থাকতে হল। এর পর ১৯৩১-এর জানুয়ারীর গোড়ার দিকে নিষেধাজ্ঞা অমান্য ক'রে বাংলার একটি উপদ্রুত অঞ্চলে জোর ক'রে প্রবেশ করায় তাঁর এক সপ্তাহের জেল হয়। ছাড়া পেয়ে বেরোতে না বেরোতে ২৬শে জানুয়ারী 'স্বাধীনতা দিবসের' মিছিলে নেতৃত্ব করতে গিয়ে পুলিশের হাতে তিনি আহত ও গ্রেপ্তার হন। মিছিলে যাতে তিনি না থাকেন তার জন্যে একজন ঝানু পুলিশ অফিসার তাঁকে আগেই গোপনে সাবধান করে দিয়েছিল : অফিসারের পাঠানো লোককে তিনি বলেছিলেন, 'আপনার ওপরওয়ালাকে বলবেন, আমি আইন অমান্য করব।' কংগ্রেসের লোক হিসেবে তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থন করা সম্ভব হয় নি। তবে যে হাজতে তাঁকে রাত কাটাতে হয়েছিল, নিজে মেয়র হিসেবে সেই হাজতের বিশ্রী অবস্থার কথা আদালতে তিনি চুটিয়ে বললেন। এই সময় গান্ধীজী ও বড়লাটের মধ্যে যে গান্ধী-আরুইন চুক্তি হল, তার ফলে ছ সপ্তাহের বেশী তাঁকে জেলে থাকতে হল না। এর পর দশ মাস একটানা বাইরে। ১৯৩১-এর ডিসেম্বরে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক সেরে গান্ধী ভারতে ফিরে এলেন। এক নতুন সংকট দেখা দিল। তারপর নতুন ক'রে শক্তিপরীক্ষা শুরু হ'য়ে গেল।

সুভাষচন্দ্র জানতেন আলোচনা ক'রে কিছু হবে না; তাহলেও আলোচনারত অবস্থায় গান্ধীকে তিনি বিব্রত করতে চাননি। কিন্তু যেই গোলযোগ পেকে উঠতে আরম্ভ করল আর তাঁকে ঠেকানো গেল না। তাঁর তর্জনগর্জনে বাংলার কর্তৃপক্ষ উত্যক্ত হয়ে উঠল; ঠিক যেখানে তাদের রাজনৈতিক ব্যথা, সেখানেই তাঁর হাত পড়তে লাগল; তাঁকে নিরস্ত করতে গিয়ে তাঁর দলবলের কাছে বৃটিশ অফিসারদের প্রচণ্ড তাড়া খেতে হল; হুকুম, পরোয়ানা, নিষেধাজ্ঞা কিছুরই তিনি পরোয়া করলেন না; চারিদিকে ভয়ানক অবিচার, নিষ্ঠুরতা আর অত্যাচার চলছে ব'লে তাঁর মনে হতে লাগল। ১৯৩২-এর ২রা জানুয়ারী নেতৃস্থানীয় কংগ্রেস-কর্মীদের যখন সদলে গ্রেপ্তার করা হল—

বলা বাহুল্য সুভাষচন্দ্রও সেই দলে থাকলেন। এর ঠিক দুদিন আগে এক বন্ধুকে সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন :

> পূর্ণপ্রস্ফুটিত ফুলের আঘ্রাণ চাও? তবে কাঁটাগুলোকে বরণ করো। হাস্যময়ী ঊষার মাধুরী চাও? তবে রাত্রির তমসাবৃত প্রহর যাপন করো। মুক্তির আনন্দ আর স্বাধীনতার সান্ত্বনা চাও? তবে তার মূল্য দাও। এবং মুক্তির মূল্য হল দুঃখভোগ আর আত্মত্যাগ।[৩২]

সেই মূল্য দেবার জন্যে সুভাষচন্দ্র এক পা বাড়িয়ে ছিলেন। নিজেকে তিনি নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছিলেন কাজের মধ্যে। মাণ্ডালেতে রোগভোগের পর থেকে কয়েকটা বছর তিনি হাঁফ ফেলার সময় পাননি। ১৯৩২-এর শেষাশেষি আবার তিনি গুরুতর অসুখে পড়লেন, ১৯৩৩-এর ২২শে ফেব্রুয়ারী এই শর্তে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হল যে, ডাক্তারের বিধানমতে চিকিৎসার জন্যে তিনি ইউরোপে চলে যাবেন। এবার শর্তটি সাগ্রহে মানা হল। ১১ই মার্চ ভিয়েনার ডাঃ ফুর্থ-এর স্বাস্থ্যনিবাসে সুভাষচন্দ্র ভর্তি হলেন।

ডাক্তারদের কাছে তাঁর শরীরের অবস্থা ভাল ঠেকল না; অনেকদিন ধ'রে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে। অবশ্য বেশীদিন তাঁকে শয্যাগত হয়ে থাকতে হল না। কংগ্রেসের একজন বড় নেতা ও দেশভক্ত বিঠলভাই প্যাটেলও তখন অসুস্থ অবস্থায় ভিয়েনায়। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। দুজনে ভারতবর্ষের ঘটনাবলী খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছিলেন। এপ্রিল মাসে বড়লাটের সঙ্গে গান্ধীজীর পত্রবিনিময়ে একটু নরম ভাব দেখা গেল। এরপর দেশবাসীকে দিয়ে নিজের কিছু কিছু মত মানিয়ে নেবার জন্যে গান্ধী যে প্রায়োপবেশন করলেন, তারপরই তিনি ভগ্নস্বাস্থ্যের দরুন জেল থেকে খালাস পেলেন। ১৯৩২ সালে যে আইন অমান্য আন্দোলনের জন্যে তিনি জেলে গিয়েছিলেন, ৮ই মে থেকে সেই আন্দোলন তিনি মুলতুবী রাখলেন।

৩২ দিলীপকুমার রায়, 'দি সুভাষ আই নীউ'

ভিয়েনায় সুভাষচন্দ্র ও প্যাটেলের কাছে ব্যাপারটা নিছক আত্মসমর্পণ ব'লে মনে হল। তাঁরা একটি যুক্ত বিবৃতির খসড়া নিয়ে আলোচনায় বসলেন। সাংবাদিকের[৩৩] কাছে এক সাক্ষাৎকারে প্যাটেল বললেন, 'আমার তরুণ বন্ধুটি মনে করেন আক্রমণ হবে ছোরার মত ধারালো আর আমি মনে করি নিজেদের বাড়িতে আমাদের বেপরোয়া হলে চলবে না।' সুভাষচন্দ্র ফোড়ন কাটলেন, 'গান্ধী হলেন সেকেলে জীর্ণ গৃহসজ্জা। এক সময়ে যথেষ্ট কাজে লেগেছেন, এখন বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছেন।' তার উত্তরে প্যাটেল বললেন, 'সক্রিয় রাজনীতিক হিসেবে হয়ত তাই। কিন্তু তাঁর নামের মূল্য বিরাট এবং চিরদিন থাকবে।' সুভাষচন্দ্র গোঁ ধ'রে থাকলেন: গোলটেবিল বৈঠক ক'রে মিছে সময় নষ্ট হল, কেননা 'ইতিহাসে কখনই আলাপ আলোচনা ক'রে সত্যিকার কোন পরিবর্তন আসেনি।' —'আলোচনা না করা মানে তো যুদ্ধ করতে চাওয়া!' —'আপত্তি কী? স্বাধীনতার জন্যে ভারতবর্ষ স্বচ্ছন্দে রক্ত ঢালতে পারে। পঁয়ত্রিশ কোটি দুর্ভাগা জীবন মুক্তির পথ চেয়ে আছে।'

প্যাটেল বললেন, 'নবীন ভারতের এই হল মনের কথা। মনটা ধারালোও হতে পারে, ভোঁতাও হতে পারে। সৃষ্টিশীলও হতে পারে, আত্মঘাতীও হতে পারে। তবে মনের ভাবটা এই। দেবতারা যদি ম্যায়-ভুখা-হুঁ হন, রক্ত না দিয়ে আমাদের উপায় কী?' যুক্ত বিবৃতিতে ব'লে দেওয়া হল গান্ধীজী ব্যর্থ: এখন দরকার কংগ্রেসকে ঢেলে সাজার, দরকার নতুন নেতার। যদি কংগ্রেসকে হদ্দমুদ্দ নাও বদলানো যায়, কংগ্রেসের ভেতর আমূল সংস্কারের নীতিতে একটা দল গড়তে হবে।

আপাতত এ ভয় দেখানো বৃথা। এখুনি এ নিয়ে ভারতবর্ষে যে বিশেষ এগোনো যাবে, সুভাষচন্দ্র কিম্বা প্যাটেল, কারো সে আশা ছিল না। দুজনেই মনে করেছিলেন বাইরে ভারতবর্ষ সম্পর্কে সহানুভূতি জাগাতে পারলেই কাজের কাজ হবে, বিশ্বের জনমতের চাপে বৃটিশের মুঠো আল্‌গা হবে। সুভাষচন্দ্র আরও এগোতে চেয়েছিলেন, রুশদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করবার জন্যে তাঁর বেজায় লোভ হচ্ছিল। তার কারণ এ নয় যে তিনি কমিউনিস্ট ছিলেন—বরং প্রায়ই তাঁকে বলতে শোনা যেত যে, ভারতবর্ষের

৩৩ 'সাটারডে ইভনিং পোস্ট'-এ ১৯৪৪-এর ১১ই মার্চ মিঃ আলফ্রেড টির্ণয়ের বিবরণ

The Bose/Patel Statement

The events of the last thirteen years have demonstrated that a political warfare based on the principle of maximum suffering for ourselves and minimum suffering for our opponents can not possibly lead to success. It is futile to expect that we can ever bring about a change of heart in our rulers merely through our own suffering or by trying to love them. And the latest action of Mahatma Gandhi in suspending the civil disobedience movement is a confession of failure as far as the present method of the Congress is concerned. We are clearly of opinion that as a political leader Mahatma Gandhi has failed. The time has therefore come for a radical reorganisation of the Congress on a new principle and with a new method. For bringing about this reorganisation a change of leadership is necessary, for it would be unfair to Mahatma Gandhi to expect him to evolve or work a programme and method not consistent with his life-long principles. If the Congress as a whole can undergo this transformation, it would be the best course. Failing that a new party will have to be formed within the Congress, composed of all radical elements. Noncooperation can not be given up but the form of Non-cooperation will have to be changed into a more ~~[illegible]~~ militant one and the fight for freedom to be waged on all fronts

V J Patel

sd. V. J. Patel

sd Subhash Chandra Bose.

9.5.33

বসু-প্যাটেল যুক্ত বিবৃতি

আমাদের নির্যাতন সর্বাধিক আর প্রতিপক্ষের লাঞ্ছনা নামমাত্র—এই নীতিতে যে রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালিত হয় তা ব্যর্থ হতে বাধ্য; গত তেরো বছরের ঘটনাবলীই তার প্রমাণ। শুধুমাত্র নিজেরা দুঃখ বরণ ক'রে অথবা প্রতিপক্ষকে ভালবাসার চেষ্টা ক'রে আমরা কোনদিন শাসকদের হৃদয় গলাতে পারব, এ আশা বৃথা। আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ রেখে মহাত্মা গান্ধী শেষ যে কাণ্ড করলেন তাতে মেনেই নেওয়া হল যে, কংগ্রেসের বর্তমান পদ্ধতি অচল। "আমরা সুস্পষ্টভাবে মনে করি, রাজনৈতিক নেতা হিসেবে মহাত্মা গান্ধী ব্যর্থ। সুতরাং সময় এসেছে এখন নতুন নীতির ওপর নতুন পদ্ধতিতে কংগ্রেসকে ঢেলে সাজবার। কংগ্রেসকে পুনর্গঠিত করতে হ'লে নেতৃত্বের বদল হওয়া দরকার; কেননা এটা আশা করা অন্যায় যে, মহাত্মা গান্ধী এমন কোন লক্ষ্য বা কর্মপন্থা ধার্য বা চালু করবেন নিজের সারা জীবনের নীতির সঙ্গে যা মিলবে না। যদি গোটা কংগ্রেসে এই পরিবর্তন আসে, তাহলে তো ভালই। যদি তা না হয়, তাহলে আমূল সংস্কার যারা চায় তাদের সবাইকে নিয়ে কংগ্রেসের ভেতরেই একটা দল গড়তে হবে। অসহযোগ ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে না, তবে অসহযোগের ধরন পাল্টাতে হবে—আরও জঙ্গীভাব আনতে হবে এবং স্বাধীনতার লড়াই যেন দশ দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

স্বাঃ ভি. জে. প্যাটেল

স্বাঃ সুভাষচন্দ্র বসু

৯. ৫. ৩৩

সমস্যা কমিউনিজমে সমাধান হবে না—তবে রাশিয়ার কাছ থেকে বিপ্লবের কলাকৌশল শেখা এবং বৃটিশের বিরুদ্ধে যে কোন সাহায্য নেবার ব্যাপারে তাঁর প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল। প্যাটেল তাঁকে নিরস্ত করলেন; কারণ তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলেন যে, ঐ ধরনের যোগাযোগ হলে ভারতে সুভাষচন্দ্রের কাজে ব্যাঘাত ঘটবে।

অন্য পাঁচটা শক্তি ছিল যাদের মিত্র হিসেবে পাকড়ানো যেতে পারে। মে মাসে সুভাষচন্দ্র জার্মানি যাবার অনুমতি যোগাড় করলেন। এরপর ক্রমান্বয়ে তিনি বার্লিন, রোম, প্রাগ, ওয়ারস, ইস্তানবুল, বেলগ্রেড, বুখারেস্ট সফরে গেলেন: এর মধ্যে কয়েকটা জায়গায় পরের দুবছরে তিনি আরও কয়েকবার গেলেন। ইতিমধ্যে ১৯৩৩-এর অক্টোবরে বিঠলভাই প্যাটেলের মৃত্যু হল; নিজের কিছু কিছু ধারণার ব্যাপারে তো বটেই, সেই সঙ্গে তিনি ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিদেশে জ্ঞানবিতরণের ব্যাপারেও তাঁর প্রচুর টাকার অছি ক'রে গেলেন সুভাষচন্দ্রকে। তাঁর প্রতি স্বর্গত বন্ধুর এই আস্থায় সুভাষচন্দ্র অত্যন্ত অভিভূত হলেন এবং বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ পেলেন। বিশ্বের জনমত গঠনের প্রয়োজনের ওপর আগের চেয়েও বেশী ক'রে তিনি জোর দিতে লাগলেন, আরও বেশী ক'রে কাজে নামবার জন্যে লোকজনকে তিনি আহ্বান জানালেন। অধীর হয়ে তিনি তাঁর বন্ধু দিলীপকুমার রায়কে যোগীর নির্জন কক্ষ ছেড়ে বিদেশে ভারতবর্ষ সম্পর্কে প্রচারে তাঁর সহায় হবার জন্যে আমন্ত্রণ জানালেন। কোথায় রইল তাঁর মনের সেই নির্বিকারভাব, কোথায় রইল তাঁর আপন অন্তরিত বিনয়। তাঁর পথই পথ—কোন সন্দেহ ছিল না তাঁর—পথ একটাই, জানে একজনই।

তিনি অবিরাম লিখে চললেন: ভারতবর্ষের ন্যায্য অধিকারের কথা, ভারতে বন্ধুরা কী করবে না করবে; যাদের বিরুদ্ধে অবিচার হচ্ছিল, তিনি তাদের পক্ষ নিলেন। লোকের দুঃখ তিনি সইতে পারতেন না, তাঁর সাহায্য চেয়ে কেউ নিরাশ হত না। ইউরোপ-প্রবাসী ভারতীয়দের তিনি খোঁজখবর নিতেন, বিশেষত ছাত্রসম্প্রদায়কে তিনি বলতেন তারা যেন ভুলে না যায় যে তারা ভারতের দূত। বিলেতের নানা জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ভারতীয়দের সাহায্য করার জন্যে তাঁর উদ্যোগে একটি ছাত্র-সমিতি গড়ে ওঠে। বার্লিনপ্রবাসী যেসব ভারতীয় বিশেষ ক'রে নাৎসী গোঁয়ারদের হাতে

লাঞ্ছিত হয়েছিল তারা তাঁর সাহায্য ও উৎসাহের কথা কখনও ভোলেনি।

যেখানে যেখানে সম্ভব হয়েছে, সেখানেই সুভাষচন্দ্র রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন এবং সেখানকার গঠনতন্ত্রের ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করেছেন। ডাঃ বেনেস্-এর সঙ্গে তাঁর বার কয়েক দেখা হয়। ১৯৩৬ সালে দেখা করলেন ডি ভ্যালেরার সঙ্গে, রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁর কাছ থেকে প্রচুর উৎসাহ পেলেন। অ্যাডলফ্ হিটলার, রিবেনট্রপ প্রমুখ নাৎসী চাঁইদের সঙ্গেও তাঁর দেখাসাক্ষাৎ হল; তাদের কাছ থেকে তিনি সোজাসুজি জানতে চাইলেন কবে নাগাদ তারা বৃটেনের ওপর হামলা করবে, 'কেননা আমরাও হয়ত ঠিক সেই সময় বৃটিশের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে পারি।' জার্মানরা তার উত্তরে বলেছিল তেমন কোন মতলব তাদের নেই এবং তারা আশা করছে একটা আপোষ হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন: 'বৃটেন আমাদের বরাবরের শত্রু। তোমাদের সাহায্য মিলুক না মিলুক, ওদের সঙ্গে আমরা লড়বই।'[৩৪] ইউরোপে যুদ্ধ যে বাধবেই বাধবে, এ বিষয়ে তিনি স্থিরনিশ্চয় ছিলেন এবং ১৯৩৬ সালে দেশে ফেরবার সময় তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল যুদ্ধ লাগল ব'লে।

গান্ধী এদিকে সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে গ্রামোদ্যোগ নিয়ে পড়লেন। কংগ্রেসনেতাদের কেউ কেউ তাঁর অনুগামী হলেন, কেউ রইলেন জেলে, নিয়মতান্ত্রিক পথে ফিরে গিয়ে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টার কথা কারো কারো মনে ধরল। ফলে সরকারের সঙ্গে কিছুটা বোঝাপড়া হল। ১৯৩৫ সালের গঠনতন্ত্র যখন বিধিবদ্ধ আইন হল, তখন সেই আইন অনুযায়ী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে এবং নিয়মতান্ত্রিক পথে চলতে কংগ্রেস আগ্রহ দেখাল।

জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে যারা আমূল সংস্কারের পক্ষপাতী ছিল, যারা সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষে থাকলে তাঁর অনুগামী হত, তারা ১৯৩৪ সালে কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টি গড়ে তুলল। সুভাষচন্দ্র সহানুভূতি দেখালেও তাঁর ধারণায় কংগ্রেসের মধ্যে সংস্কার ক'রে কিম্বা নতুন দল পাকিয়ে এখন কোন কাজ হবে না। ক্ষমতা কব্জা করা এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন চালানো, এর বাইরে গান্ধী আর কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না: ইত্যাকার ধারণা দ্রুত পরিত্যাগ ক'রে সুভাষচন্দ্র এগিয়ে চলেছিলেন:

৩৪ 'অন টু ডেল্হি,' ৬৭-৬৮ পৃঃ

> দেশে আমাদের এমন একটা পার্টির দরকার শুধু ভারতের স্বাধীনতার জন্যে চেষ্টা করাই যার কর্তব্য হবে না—সেই সঙ্গে একটি জাতীয় গঠনতন্ত্র তৈরি করাও হবে তার কাজ। স্বাধীনতালাভের পর সেই পার্টি জাতীয় পুনর্গঠনের ষোল আনা কর্মসূচী কাজে পরিণত করবে। গণপরিষদের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।···তেমনি আবার হাতে ক্ষমতা এলে ছেড়ে দেবারও কোন কথা উঠতে পারে না।···[৩৫]

১৯৩৪-এর নভেম্বরে সুভাষচন্দ্র 'দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগ্‌ল্' নামে ভারতের জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে নিজের একটি ভাষ্য প্রকাশ করেন। এই বইতে তিনি একসঙ্গে নিয়মতান্ত্রিক সহযোগিতা ও দোদুলচিত্ত বার্ধক্যপীড়িত গান্ধীর আপসরফার বিরোধিতা করলেন, অন্য দিকে ভারতকে একটি নতুন মধ্যপন্থা দেখালেন। গণতন্ত্র ও একনায়কত্বের মাঝামাঝি কোন পথ নয়; দুটি ভিন্ন ধরনের একনায়কত্ব—কমিউনিজম ও ফ্যাশিজম-এ দুইয়ের মধ্যবর্তী একটি পথ। রোম আর ইস্তানবুলে যা তিনি দেখে এসেছিলেন, তাতে তাঁর মনে প্রবলভাবে নাড়া লেগেছিল—এক জায়গায় কড়া রকমের পার্টি সংগঠন, অন্য জায়গায় মুস্তাফা কামালের হাতে প্রাচ্যের একটি পশ্চাৎপদ রাষ্ট্রের দ্রুত আধুনিক রূপান্তর। ভারতবর্ষের মাটিতে ও সমাজেও ঐ এক ভাবেই দেশ-গঠনের কাজ হওয়া দরকার এবং দেশশাসনের জন্যে চাই একজন ডিক্টেটর। দরকার 'বছর কয়েকের জন্যে ডিক্টেটরী ক্ষমতাযুক্ত একটি জবরদস্ত কেন্দ্রীয় সরকার·· সামরিক শৃঙ্খলাবদ্ধ একটি জবরদস্ত পার্টির সরকার।'[৩৬] স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ভারতবর্ষকে অটুট রাখবার এই হল একমাত্র উপায়।

১৯৩৪-এর শেষে বাবার অসুখের খবর পেয়ে সুভাষচন্দ্র বিমানপথে স্বদেশে রওনা হলেন। কিন্তু বাবার সঙ্গে তাঁর শেষ দেখা হল না। ছেলে উজ্জ্বল রত্ন ব'লে রায়বাহাদুর জানকীনাথ বসু[৩৭] অনেক আগে থেকেই সুভাষচন্দ্রের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাঁর ছেলে একজন নামকরা বিদ্রোহী

৩৫ ১৯৩৪ সালে রোম সফরের পরে লিখিত নিবন্ধ।

৩৬ 'দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগ্‌ল্' ৩৪৫-৫ পৃঃ।

৩৭ ১৯৩০ সালে বন্দীদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে তিনি 'রায়বাহাদুর' খেতাব বর্জন করেন।

বলে তাঁর কম গর্ব ছিল না। পিতার শেষকৃত্যের পর সুভাষচন্দ্র দেশে থেকে যাবেন মনস্থ করেছিলেন; কিন্তু জেল থেকে খালাস পাবার কোন আশা নেই দেখে ১৯৩৫-এর ১০ই জানুয়ারী সমুদ্রপথে আবার ইউরোপ যাত্রা করলেন। সেই বছরটাতে তাঁর স্বাস্থ্য রীতিমত ফিরে গেল এবং বছরের শেষাশেষি ভারতবর্ষে এসে আবার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বার দুর্নিবার ইচ্ছা তাঁকে পেয়ে বসল। ১৯৩৬-এর গোড়ার দিকে তিনি মন বেঁধে ফেললেন। আগামী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা হবে কিনা সে সম্বন্ধে কংগ্রেসের আসন্ন অধিবেশনে আলোচনা হবে। সেবারকার নির্ধারিত সভাপতি শ্রীযুক্ত জওহরলাল নেহেরু তাঁকে চলে আসার জন্যে অনুরোধ করলেন। আলোচনাটা এবার বেজায় গুরুত্বপূর্ণ; বৃটিশের সঙ্গে যাতে কোন আপস না হতে পারে তার জন্যে বৈঠকে তাঁর থাকা একান্ত দরকার। ১৯৩৬-এর মার্চ মাসে সুভাষচন্দ্র ঘোষণা করলেন যে, তিনি ভারতে ফিরে আসবেন; সরকারীভাবে তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হল যে, দেশে ফিরলেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে। সুভাষচন্দ্র খোলাখুলি জানিয়ে দিলেন সরকারী চোখরাঙানিকে তিনি থোড়াই কেয়ার করেন। তিনি ভেবে দেখলেন তাঁকে গ্রেপ্তার করলে ফল ভালই হবে; ইউরোপে তাঁর কার্যকলাপ এবং তাঁর গ্রন্থভুক্ত মতামত সম্পর্কে গান্ধী যাই ভাবুন না কেন, পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করলে কংগ্রেস তাঁর পেছনে দাঁড়াতে বাধ্য হবে। ৮ই এপ্রিল সুভাষচন্দ্র বোম্বাই পৌছুলেন এবং জাহাজ থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার হলেন। দর্শনাকাঙ্ক্ষী বিপুল জনতার দিকে তাকিয়ে সুভাষচন্দ্র চীৎকার ক'রে বললেন, 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম যেন চলতে থাকে।' ইংলণ্ডে প্রতিবাদ হল, ভারতীয় আইনসভায় নিন্দাসূচক প্রস্তাব আনা হল—কিন্তু কোন ফল হল না। একদিকে ভারতের শাসকমহল থেকে বলা হল, সুভাষচন্দ্র এদেশে 'আইরীশ কায়দায় যুদ্ধায়োজন' চালাবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন; অন্যদিকে বৃটেনের সরকারী মহল এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে না চেয়ে এই যুক্তি দেখাল যে, 'দুঃখের বিষয়, শ্রীযুক্ত বসু এমন এক ব্যক্তি, অসাধারণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যিনি তাঁর ক্ষমতাকে ধ্বংসমূলক কাজে লাগাচ্ছেন।'[৩৮]

৩৮ ১৯৩৬-এর ২রা ডিসেম্বর 'দি টাইমস্' পত্রে প্রকাশিত ভারতসচিব লর্ড জেটল্যাণ্ডের উক্তি

শারীরিক দিক থেকে এবার তাঁর বন্দীজীবন কষ্টকর হল না। দার্জিলিঙের কাছে দাদার বাড়িতে অন্তরীণ অবস্থায় তাঁর মেয়াদের বেশির ভাগ সময় কাটল। ১৯৩৭-এর ১৭ই মার্চ জেল থেকে ছাড়া পাবার অল্পদিনের মধ্যেই শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। সুভাষচন্দ্রকে দেখে আগের চেয়ে অনেক ভাল মনে হল; আগের চেয়ে অনেক শান্ত, অনেক বেশী আত্মসমালোচনার মনোভাব দেখা গেল আর অসহিষ্ণুতাও আগের চেয়ে কম। সেই সঙ্গে তাঁর স্বভাবে একটা নতুন লৌকিক গুণও দেখা গেল: সাধারণ লোকজনদের সঙ্গে তিনি দিব্যি তাদের ভাষায় তাদের মর্যাদা দিয়ে কথা বলতে শিখেছেন।

১৯৩৫ সালের গঠনতন্ত্রসম্মত প্রথম নির্বাচনে কংগ্রেস সবে জিতেছে এবং গ্রীষ্মের মধ্যে স্থির হয়ে গেল সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করবে। এই সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র নির্লিপ্ত থাকলেন এবং ছাড়া পাবার পরেই পুরনো বন্ধু ডাঃ ধরমবীর ও তাঁর স্ত্রীর আমন্ত্রণে অক্টোবর পর্যন্ত শৈলাবাসে কাটালেন। এরপর কলকাতায় গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর কথা হল; ১৯৩৮ সালে তিনি কংগ্রেস-সভাপতির পদ গ্রহণ করতে রাজী হলেন। তারপর মাস দেড়েক বাদগাস্তেনে এবং ১৯৩৮-এর জানুয়ারীতে অল্পদিনের জন্যে তিনি ইংলণ্ডে থাকলেন। লণ্ডনে মিঃ অ্যাট্‌লি, মিঃ আরনেস্ট বেভিন এবং সার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন: ডরচেস্টারে একটি সম্বর্ধনা সভা হল: 'যেসব ইংরেজ এই প্রথম তাঁকে দেখল তারা সবাই তাঁর মধুর শান্ত ব্যবহার দেখে এবং তাঁর মুখে ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে দৃঢ়তাপূর্ণ উক্তি শুনে খুব খুশী হল।'[৩৯] ২৩শে জানুয়ারী করাচীতে তিনি পদার্পণ করলেন। জনৈক প্রশ্নকর্তাকে তিনি এই ব'লে জবাব দিলেন, 'বিবাহ? ওসব ভাববার এখন আমার সময় নেই।'

সুভাষচন্দ্রের খ্যাতি এখন শুধু দেশে নয়, দেশের বাইরেও। বিদেশে ভারতীয় রাজনীতিজ্ঞ বলতে গান্ধী ও জওহরলাল নেহরুর পরেই তাঁর নাম। ভারতবর্ষে অনেকের কাছে তিন জনের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্বই সব চেয়ে চিত্তাকর্ষক ব'লে মনে হল। কোন কোন জায়গায় তাঁর খ্যাতি গান্ধীর সমান হয়ে দাঁড়াল। মাত্র একচল্লিশ বছর বয়সে তাঁকে কংগ্রেস-

৩৯ 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান', ১১ই জানুয়ারী, ১৯৩৮

সভাপতিপদে মনোনীত ক'রে গান্ধী আসলে যে বাংলা ও অন্যত্র সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বকামী বামপন্থী বিপুল জনসমষ্টিকে কংগ্রেসের বাঁধা রাস্তায় ভেড়াতে চেয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। সুতরাং সুভাষচন্দ্র দেখলেন কয়েক বছর ধ'রে যা হয়ে আসছিল তাঁর সভাপতি হওয়াটা সে রকমের একটা আনুষ্ঠানিক অভিনন্দনের ব্যাপার মাত্র নয়। তিনি কারও হাতের লোক হয়ে থাকতে রাজী নন। কংগ্রেসের ঐক্য বজায় রাখার প্রয়োজন মেনে নিয়েও তিনি কংগ্রেসের নীতি যথাসম্ভব পাল্টাতে চাইলেন। ফলে, গান্ধীর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত তাঁর বিচ্ছেদ এড়াবার আর কোন উপায় রইল না। এই ছাড়াছাড়ি হওয়ার দরুন সুভাষচন্দ্রের জীবনে দ্বিতীয় যুগসন্ধি দেখা দিল।

৩

বিদ্রোহী সভাপতি

এতক্ষণ আমরা দেখলাম সুভাষচন্দ্র বৃটিশরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ; এর আগের অধ্যায়ে নানা ঘটনার সূত্রে এও দেখা গেছে যে, গান্ধীজীর মতবাদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য ক্রমশ বাড়ছে। এই মতভেদ কিভাবে ধাপে ধাপে বেড়ে গেল একটু খুঁটিয়ে দেখা দরকার ; কারণ, শুধু বৃটিশের বিরুদ্ধে নয়— কংগ্রেসের হর্তাকর্তাবিধাতার অপ্রতিহত ক্ষমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ভেতর দিয়েই সুভাষচন্দ্র রাজনৈতিক দিক দিয়ে পুরোপুরি সাবালক হতে পেরেছিলেন।

১৯৩৪ সালে লেখা 'দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগ্‌ল্' বইতে সুভাষচন্দ্র স্বয়ং এই মতভেদের গোড়াকার ইতিহাসের কথা বলেছেন। ১৯২১ সালে সেই প্রথম সাক্ষাতের দিন থেকেই এর শুরু। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অবলীলাক্রমে বিসর্জন দিয়ে সুভাষচন্দ্র তখন আত্মহারা ; সদ্য কেম্‌ব্রিজ থেকে ফিরেই মহাত্মার কাছে গেছেন কাজের নির্দেশ নিতে। নির্দেশ বলতে কিছু নেই। গান্ধী তখন বোধহয় ভাবছিলেন বৃটেনের দোরগোড়ায় কংগ্রেস যদি হত্যা দিয়ে বেশ কিছুকাল প'ড়ে থাকে, তাহলে হয়ত ভারতের প্রতি তার দুর্ব্যবহারের দরুন চারিদিকে টি-টিক্কার পড়বার ভয়ে বৃটিশের মন গলতে পারে। গান্ধীর অনুগামীরা সকলেই যে ভাবতেন তাঁর মৌনব্রতে কাজ হবে এমন নয়। কারো কারো আশা ছিল আইন অমান্য একবার শুরু হলে তা থেকে আরও কাজের কাজ কিছু করা যেতে পারে। এই দলে ছিলেন সুভাষচন্দ্র। ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে মহাউৎসাহে তিনি জেলে গেলেন ; কিন্তু কী কাণ্ড, যেই একটিমাত্র জবর হিংসাত্মক ঘটনা ঘটল অমনি গান্ধী ভয় পেয়ে আন্দোলন তুলে নিলেন।

সুভাষচন্দ্রের মতে, 'যখন জনসাধারণের বিক্ষোভ সবে চরমে উঠতে আরম্ভ করেছে, ঠিক সেই সময়ে এল পিছু হটার আদেশ—এমন আদেশকে সর্বনাশ ছাড়া আর কী বলা যায়।' ১

১৯২২ সালে জেলে যাওয়ায় গান্ধীর হাতে সেই সময় কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ পরিচালনাভার ছিল না। চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে যোগ দিয়ে সুভাষচন্দ্র তখন বিভিন্ন আইনসভায় বাধাসৃষ্টির স্বরাজী পরিকল্পনা কাজে লাগাবার চেষ্টা করছেন; এ সম্পর্কে জেলে ব'সেই দুজনের অনেক আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। ১৯২২-এর শেষদিকে কংগ্রেসকে দিয়ে এই নীতি সরকারীভাবে গ্রহণ করানোর চেষ্টা হল বটে, কিন্তু মহাত্মার প্রভাব প্রবল থাকায় সম্ভব হল না। ফলে স্বরাজ্য পার্টি গড়ে উঠল। স্বরাজীদের বাঘা বাঘা লোকেরা ১৯২৪ সালে জেলে চলে যাওয়ায় এই বিশেষ গরম ব্যাপারটা আস্তে আস্তে জুড়িয়ে গেল। আর মাণ্ডালেতে সুভাষচন্দ্রের মনের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে যেতে লাগল। হয়ত আরও অনেকের মত তিনিও ভাবলেন গান্ধীর রাজনৈতিক জীবন খতম হতে আর দেরি নেই। মহাত্মার দৌড় বেশী নয়, কিন্তু সুভাষচন্দ্র থামতে নারাজ; অহিংসা নিয়ে হয়েছে তাঁর বিষম জ্বালা। বৃটিশ যতক্ষণ না শক্ত পাল্লায় পড়ছে, ততক্ষণ ভারতের অবস্থা তাদের মাথায় ঢুকবে না। তখনও তিনি ব্যক্তিগতভাবে গান্ধীজীর বিরুদ্ধে দাঁড়াননি বটে—রাজনৈতিক দিক থেকে তখনও তিনি খুবই কাঁচা—তবে তিনি বুঝেছিলেন এখন চাই এমন এক নতুন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, যে নেতৃত্ব দরকার হলে হিংসার আশ্রয় নিতেও রাজী থাকবে।

১৯২৮ সালে দুজনেই আবার জেলের বাইরে রাজনীতিতে ফিরে এলেন। সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক বুদ্ধি এতদিনে পাকা হয়েছে। গান্ধীর সঙ্গে তিনি দেখা করতে গেলেন এবং এই প্রথম তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব একটি কর্মসূচী গ্রহণ করবার জন্যে জেদ ধরলেন। পার্লামেণ্টারী কমিশনের বিরুদ্ধে লোকের মধ্যে কংগ্রেস যে বিক্ষোভ জাগিয়ে তুলেছে, তাতে বাঞ্ছিত বিপ্লবের এই হল সুযোগ। গান্ধী যাতে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত নেতৃত্ব নেন, তার জন্যে সুভাষচন্দ্র অনেক কাকুতি-মিনতি করলেন। তাঁর ধারণায় বৃটিশকে সহজেই উৎখাত করা যাবে: 'আমরা সহযোগিতা করছি ব'লেই

১ দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগ্‌ল্ ৯০ পৃঃ

মুষ্টিমেয় ইংরেজ আমাদের দেশ শাসন করতে পারছে।'[২] কিন্তু গান্ধীর তখন সেদিকে মন ছিল না :

> যদিও তাঁর চোখের সামনে বার্দোলির কৃষক খাজনা-বন্ধ আন্দোলনের ভেতর দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে তারা সংগ্রামের জন্যে তৈরি, তবু তাঁর এক উত্তর···তিনি কোন আলো দেখতে পাচ্ছেন না।[৩]
>
> দেশ তৈরি, নেতারাই শুধু প্রস্তুত নয়।[৪]

এমন কি এর ওপর আবার গান্ধী সর্বদলীয় কমিটির ডমিনিয়ন স্টেটাস সংক্রান্ত সুপারিশ মানতেও রাজী ছিলেন। এই মনোভাবের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে মিলে সুভাষচন্দ্র ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ গড়ে তুলেছিলেন ; গান্ধীকে সেই তাঁর প্রথম প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ জানানো। বছর ঘুরতে না ঘুরতে গান্ধীবাদী বৈরাগ্যের বিরুদ্ধে তিনি আরেকটু সোজাসুজি আক্রমণ শুরু ক'রে দিলেন :

> ···এই রকমের একটা অনুভূতি ও মনের ভাব আছে যে, আধুনিকতা খারাপ, বৃহৎ আকারের উৎপাদন দোষের, চাহিদা বাড়ানো অনুচিত, জীবনমাত্রার মান বাড়ানো অন্যায়······এবং আত্মা জিনিসটা এত দামী যে তার জন্যে শরীরচর্চা ও সামরিক শিক্ষাকেও হেলাফেলা করা চলে।[৫]

তিনি বললেন : 'ভারতবর্ষে মুনিঋষিদের আদর চিরকালই থাকবে, কিন্তু আমরা যদি স্বাধীন, সুখী ও সমৃদ্ধ নবীন ভারত গড়ে তুলতে চাই, তাহলে তাঁদের নির্দেশ অনুসরণ করলে আমাদের চলবে না।···আমাদের বাস করতে হবে আজকের জগতে।'

ডমিনিয়ন স্টেটাসের প্রশ্নে কংগ্রেসের মধ্যে মূলগত পার্থক্য সৃষ্টি হওয়ার

২ ৩০শে মে, ১৯২৯

৩ 'দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল্,' ১৭০ পৃঃ

৪ ঐ, ১৮১ পৃঃ

৫ নিখিল ভারত যুব সম্মেলন, কলকাতা, ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯২৮

কথা ১৯২৮ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমরা অত্যন্ত তীব্রভাবে অনুভব করছি ইতিহাসের এই পরম সন্ধিক্ষণে আমাদের প্রবীণ নেতারা তাঁদের কর্তব্য ঠিকমত পালন করতে পারছেন না।'[৬] তখনও তিনি সশ্রদ্ধচিত্তে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন এবং বেশ খানিকটা সমীহ ভাব নিয়েই পাল্টা প্রস্তাব আনলেন। যখন ভোটে তাঁর প্রস্তাব হেরে গেল, তখন এক বছরের জন্যে পুরোদস্তুর স্বাধীনতা সংগ্রাম মুলতুবী রাখার সিদ্ধান্ত তিনি মেনে নিলেন। কিন্তু ১৯২৯ সালে এই সংগ্রামের একটা নিজস্ব মনগড়া চেহারা তিনি খাড়া করে ফেললেন। যেখানে সমগ্র কংগ্রেস এই সংগ্রামকে প্রতিরোধের প্রতীক ব'লে মনে করছিল, সেখানে সুভাষচন্দ্র চাইলেন এই সংগ্রামকে ক্ষমতাদখলের প্রয়াস হিসেবে দেখতে। ১৯২৯-এর অক্টোবরে ডমিনিয়ন স্টেটাস প্রসঙ্গে বড়লাটের ঘোষণার তিনি নিন্দা করলেন এবং এই ঘোষণার উত্তরে যে সবদলীয় ফতোয়া তৈরি হল তাতে তিনি সই করতে রাজী হলেন না। তাঁর প্রধান সঙ্গী এ ব্যাপারে তাঁর হাতছাড়া হল ; ডিসেম্বরের কংগ্রেস অধিবেশনে জওহরলাল নেহরুর সভাপতি হবার কথা, গান্ধীজী তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফতোয়ায় সই করিয়ে নিলেন।

কংগ্রেসের অধিবেশনে গান্ধী ঘোষণা করলেন কংগ্রেসের এখন লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা ; ফলে, কিছুদিনের মধ্যেই ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের[৭] কথা লোকে ভুলেই গেল। সুভাষচন্দ্র বললেন, 'কিন্তু তাঁর প্রস্তাবে যে কর্মসূচী দেওয়া হয়েছে, তার দ্বারা আমরা পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারি না।'[৮] পুরোপুরি নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী সুভাষচন্দ্র একটি পাল্টা প্রস্তাব পেশ করলেন। তাঁর মতে, কংগ্রেস তার কাঠামো বিস্তৃত করে নিজেকে একটি পাল্টা সরকারে পরিণত করুক, তার পেছনে জনসাধারণের সমর্থন যোগাড় করুক এবং তারপর এমন ব্যাপকভাবে আইন অমান্য শুরু করে দিক যাতে সরকারের পক্ষে দৈনন্দিন শাসন চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। কংগ্রেস ছাড়া আর কারো সাধ্য নেই সে অবস্থা আয়ত্তে আনে। তখন সারা দেশের ভার টুক্ ক'রে কংগ্রেসের হাতে এসে যাবে।

৬ কংগ্রেসের বিষয়-নির্বাচনী বৈঠকে বিবৃতি, ডিসেম্বর, ১৯২৮

৭ জাপানে যেটা ছিল, সেটা নয়। ৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য

৮ লাহোর কংগ্রেসে বক্তৃতা, ডিসেম্বর, ১৯২৯

গান্ধী শেষ পর্যন্ত ডমিনিয়ন স্টেটাস প্রত্যাখ্যান করায় অনেকেই তাঁর পক্ষে এসে গেল—অন্যথায় তারা সুভাষচন্দ্রেরই সমর্থক হত। ফলে, পাল্টা প্রস্তাব ডাহা হেরে গেল। আরেকটা ব্যাপারে গোলমাল বাধল। পুরো কংগ্রেসকে যখন টানা গেল না, সুভাষচন্দ্র চাইলেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে এমন কয়েকজনকে নেওয়া হোক যারা তাঁর মতের সমর্থক, তাহলে অধিবেশন সাঙ্গ হবার পরেও কংগ্রেসের মন্ত্রণার মধ্যে চরমপন্থীদের মতামত স্থান পাবে। তাঁর মতে, কার্যকরী সমিতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধিরা ছাড়াও সব রকম মতামতেরই লোক থাকা উচিত। এবার গান্ধীজী আবার কঠিনভাব ধারণ করলেন; তরুণ সুভাষচন্দ্রের উগ্রচণ্ডীভাব দেখে তিনি ঘাবড়ালেন না। তাঁর চোখের সামনে দিয়ে সুভাষচন্দ্র বাষট্টি জন সমর্থককে নিয়ে মণ্ডপ থেকে গট গট ক'রে বেরিয়ে গেলেন: মাত্র বাষট্টি জন, তাতে ওয়ার্কিং কমিটিতে বড় জোর আধখানা আসন হয়। কিন্তু এই প্রতিবাদের পেছনে যে গভীর বিক্ষোভ ছিল, গান্ধীজী তা ধরতে পেরেছিলেন। এই সময়ে সি. এফ. এণ্ডরুজকে তিনি একটি চিঠি লেখেন; তাতে যুব ভারতের সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ ক'রে তিনি স্বীকার করলেন যে, এই প্রতিক্রিয়া ঠেকাবার একমাত্র উপায় তাঁর নিজের নেতৃত্বে অহিংস অভিযান চালানো—তাঁর ধারণা, এর ফলে যুবজনোচিত রুদ্ধ আবেগ প্রকাশের একটা নিরাপদ রাস্তা পাওয়া যাবে। সুতরাং ১৯৩০-এর আন্দোলনে সুভাষচন্দ্রের চাহিদা কতকাংশে মিটল এবং তাতে সুভাষচন্দ্র উৎসাহ বোধ করলেন।

১৯৩১-এর মার্চ মাসে গান্ধী-আরুইন চুক্তি হ'ল। জেল থেকে ছাড়া পেয়েই সুভাষচন্দ্র বোম্বাই ছুটলেন গান্ধীকে তাঁর সন্দেহের কথা জানাতে—তাঁর ভয় হচ্ছিল দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তেমন জোরের সঙ্গে নাও রাখতে পারে। মহাত্মা সে ব্যাপারে তাঁকে আশ্বস্ত করলেন এবং মার্চের শেষে যখন কংগ্রেসের বৈঠক বসল সুভাষচন্দ্র তাঁর অস্বস্তির কথা শুধুমাত্র লিপিবদ্ধ করিয়ে রাখলেন। জনসাধারণের ওপর গান্ধীর তখন বিরাট প্রভাব—সুভাষচন্দ্র বিলক্ষণ জানতেন। তিনি তাঁর বইতে লিখেছেন: 'আমি তাঁর সঙ্গে কিছুদিন ঘুরেছি। যেখানেই গিয়েছি পিল পিল ক'রে লোক এসেছে তাঁকে দেখতে। আর কোথাও কোন নেতা জনসাধারণের এমন স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যর্থনা

পেয়েছে কিনা সন্দেহ। লোকের কাছে তাঁর আকর্ষণ শুধু মহাত্মা হিসেবে নয়, রাজনৈতিক সংগ্রামের মহারথী হিসেবে।'[৯] ক্ষুব্ধ নবীনের পক্ষে তাঁকে ঠেকাতে যাওয়ার সত্যিই কোন মানে হয় না। গান্ধী নিজের পথ আঁকড়ে রইলেন; মাত্র কটিবাস প'রে ১৯৩১ সালে লণ্ডনের আপোষ-আলোচনায় তাঁর উপস্থিতি বোধহয় এই সর্বপ্রথম বৃটিশ জনসাধারণকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে, ভারতের সমস্যা সমাধানে তাদের দায়িত্ব আছে। কিন্তু সুভাষচন্দ্র এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, আলাপ-আলোচনা ক'রে কিছু হবে না। তিনি বললেন, 'বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের এখন যা মেজাজ এবং মনোভাব, তাতে বৈঠকে সত্যিকার কোন ফল ফলবে ব'লে…আমি মনে করতে পারছি না।…ফলাফল যখন…ঘোষণা করা হবে, তখন লোকে যা উপযুক্ত ব'লে মনে করবে তাই করবে।'[১০]

১৯৩২ সালের জানুয়ারীতে যে সঙ্কট দেখা দিল, তার সঙ্গে অবশ্য গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থতার কোন যোগাযোগ ছিল না। ১৯৩১ সালে ভারতবর্ষে ব্যাপক অশান্তি দেখা দেয় এবং এই অশান্তি দমন করবার জন্যে সরকার নানারকম কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ২৮শে ডিসেম্বর ভারতবর্ষে ফিরে গান্ধীজী অভিযোগ করলেন যে, লর্ড আরুইনের সঙ্গে তাঁর যে চুক্তি হয়েছিল সেই চুক্তি ভঙ্গ করা হচ্ছে। এদিকে লর্ড আরুইনের আমল শেষ এবং রক্ষণশীল দলই আবার ক্ষমতা হাতে পেয়েছে; নতুন বড়লাট তো গান্ধীর অভিযোগ সম্পর্কে আলোচনা করতেই রাজী হলেন না। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দেওয়া হল। বাকি সকলের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র কারাবরণ করলেন এবং পনেরো মাস ধ'রে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে থাকল।

এরপর ১৯৩৩-এর এপ্রিল মাসে ভিয়েনায় সুভাষচন্দ্র এবং বিঠলভাই প্যাটেল গান্ধীর ওপর এক হাত নিলেন। এর আগে কোন কংগ্রেসকর্মী এত তীব্রভাবে গান্ধীকে সমালোচনা করতে সাহস পায় নি। সুভাষচন্দ্র তাঁর বইতে আরও কড়াভাবে লিখলেন: কংগ্রেসের সেকেলে নেতাদের বুদ্ধিবৃত্তি নিম্নস্তরের; তাঁর মতে, খুব কম নেতারই নিজেদের বিচারক্ষমতা আছে।

৯ 'দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগ্‌ল,' ২৪১ পৃঃ।

১০ কলকাতায় ১৯৩১-এর ৪ঠা জুলাই-এর বক্তৃতা

'কংগ্রেসের যত মাথা সব একটি লোকের কাছে বাঁধা।'[১১] গান্ধী আবার স'রে দাঁড়ালেন এবং বিশ্ব ইতিহাসে তাঁর স্থান নিয়ে সুভাষচন্দ্র এমনভাবে আলোচনা জুড়লেন যেন গান্ধীর ভূমিকা শেষ হয়ে গেছে। এখন আর শুধু এ প্রশ্ন নয় যে, কোন্ পথে মুক্তি আসবে—সুভাষচন্দ্র দেখতে চান স্বাধীন ভারতের পরিকল্পনা। গান্ধীর কাছে স্বাধীনতা অর্জন করাটাই যথেষ্ট; ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর ওলটপালট এবং সংবিধান বচনার কাজ দুদিন পরে হলেও চলবে। সত্যি বলতে কি, ওসব কাজ অন্য কোন নেতা বা অন্য কোন পার্টি পরে এসে যদি কবে তাতেও গান্ধীর আপত্তি নেই। সুভাষচন্দ্রের মতে, ও তিনটি অভিন্ন। তিনি সমাজতান্ত্রিক, সুতরাং ভাবতবর্ষের পুনর্গঠনের ব্যাপারটা পুঁজিবাদের হাতে ছেড়ে দিতে বাজী নন, আবাব গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংবিধান তৈরি হবে এও তিনি ঠিক বিশ্বাস করেন না। যে হাতে স্বাধীনতা আদায় হবে, সে হাত আল্‌গা কবা চলবে না। কেননা তাঁর মতে, তাহলে, আজ যারা বৃটিশের হুকুম তামিল করছে সেই সব কায়েমী স্বার্থ, পরগাছা আর খয়েরখাঁর দল সাধারণ মানুষের সংগ্রামলব্ধ ধন লুটেপুটে খাবে। উঁহু, স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংবিধান এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা চাই। যতক্ষণ না জোরজার ক'রে গণতন্ত্রজাত কুপ্রভাবগুলো কাটিয়ে ওঠা যাচ্ছে, ততক্ষণ যে শক্ত হাতে এসব হবে সেই হাতই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করবে।

গান্ধী প্রতিপক্ষকে বোঝেন না; তাঁর পরিকল্পনার কোন বালাই নেই; তিনি আন্তর্জাতিক সাহায্য পাওয়ার কোন চেষ্টা করেন না; বৃটিশের ওপর রয়েছে তাঁর ভরসা; বাজনৈতিক নেতা হবেন, না বিশ্বগুরু হবেন —এই দোটানায় তিনি দ্বিধাগ্রস্ত। উপরোক্ত পাঁচটি কারণে গান্ধী ব্যর্থ হয়েছেন ব'লে সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস করতেন। তিনি বলতেন, 'আমূল পরিবর্তনে বিশ্বাসী এবং স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে দরকারমত দুঃখবরণ ও ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত যে জঙ্গী বাহিনী—তারই হাতে ভারতের ভবিষ্যৎ'[১২], কারণ 'নেতার শক্তি নির্ভর করে অনুগামীদের সংখ্যার জোরে নয়, তারা কোন্ ধাতুতে গড়া তার ওপর।'[১৩] তিনি এও সমানে বিশ্বাস করতেন যে, প্রতিপক্ষ ও তাঁর

১১ 'দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগ্‌ল', ৮৬ পৃঃ

১২ ঐ, ৩৩০ পৃঃ

১৩ ঐ, ৩২৯ পৃঃ

নিজের দলবল সম্পার্কে তাঁর ধারণা একেবারে নিভু্র্ল এবং পরিণামে তাঁর জয় অনিবার্য।

গান্ধী যে অতীতের মত আর কখনই কংগ্রেসকে হাতের মুঠোয় রাখতে পারবেন না—এ ধারণা হবার সঙ্গত কারণ ছিল। ১৯৩৩ সালে জেল থেকে বার হবার পর পুরো চার বছর গান্ধী নেতৃত্ব দেওয়া থেকে বিরত ছিলেন। এক হিসেবে এই নেতৃত্ব তখনও আসত জওহরলাল নেহরুর মারফৎ; জওহরলালের ব্যক্তিত্বের একটা দিক লক্ষ্য ক'রে বলা যায়, গান্ধী যদি সক্রেটিস হন জওহরলাল প্লেটো। কিন্তু অহিংসার বুলি মহাত্মার মুখেই মানায়; যে জওহরলাল ১৯২৯ সালেও সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অহিংসবাদের বিরুদ্ধে বলেছেন, তাঁর মুখ দিয়ে অহিংসার বুলি তেমন গড় গড় ক'রে বেরিয়ে এল না। ব্যক্তিগতভাবে নেহরুর খুব জনপ্রিয়তা বাড়ল, কিন্তু ১৯১৯-এর পর থেকে যে-জাতের নেতৃত্বের দরুন ভারতবর্ষে কংগ্রেসের এত প্রতিপত্তি, তিনি সে-জাতের নেতৃত্ব দিতে পারলেন না।

ফলে ইউরোপে নির্বাসিত থেকেও স্বদেশে সুভাষচন্দ্রের প্রভাব যতটা কমতে পারত ততটা কমল না। ১৯৩৪ সালে কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টি গড়ে উঠল; সুভাষচন্দ্র তাঁর 'দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' বইতে যে নতুন, কঠোর নিয়মানু-বর্তী পার্টির স্বপ্ন দেখেছিলেন যা একদিন ভারতের হৃদয় থেকে কংগ্রেসের আসন টলিয়ে দেবে—সে পার্টির অভাব এতে মিটল না। কিন্তু এ থেকে বোঝা গেল লোকের মধ্যে বামপন্থী ঝোঁক এখনও বলবৎ আছে। সুতরাং সুভাষচন্দ্রের বই, যাতে খোলাখুলিভাবে একাধিপত্যের প্রশংসা করা হয়েছে, যখন ১৯৩৫ সালে ভারতে এসে পৌছুল—খোদ গোয়েন্দা পুলিশেরও আটকাবার সাধ্য হল না[১৪]—সুভাষচন্দ্রের মুখনিঃসৃত বাণীর মতই সমান ভক্তিভরে লোকে তাঁর বইতে লেখা তত্ত্বকথায় কান দিল। কারণ, ফ্যাশিজমের করাল মূর্তি অন্য জায়গার চেয়ে ভারতবর্ষে ঢের কম প্রকট ছিল। কেবলমাত্র বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি ঘৃণায় যাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন, এমন কি আবিসিনিয়ার ধর্ষিত হওয়ারও একটা যৌক্তিকতা আছে ব'লে তাদের মনে হয়েছিল এবং এ ব্যাপারে বৃটেনে নিন্দাবাদকে তারা নিছক স্বার্থপ্রণোদিত ব'লে মনে করেছিল। অতএব মুসোলিনিভক্তি সত্ত্বেও লোকচক্ষে সুভাষ-

১৪ ভারতবর্ষে নিষিদ্ধ ছিল

চন্দ্রের একটুও মর্যাদাহানি হয়নি। এইভাবে দেশের মধ্যে যে সব ভাবধারার আমদানি হল সে সময়ে তার পাল্টা জবাব দেবার মত মনের জোর কংগ্রেসের ছিল না।

এদিকে কংগ্রেসের যা অভাব ছিল, সংগঠনের দিকে তা পূরণ করা শুরু হল। সর্দার প্যাটেলের শক্ত হাতের পরিচালনায় দেশের সামাজিক ও প্রশাসনিক জীবনের মধ্যে কংগ্রেসের সংগঠন এমনভাবে চাবিয়ে গেল—সুভাষচন্দ্র অনেক আগেই এই কাজে হাত দেওয়ার কথা বলেছিলেন—যে, ১৯৩৬ সালের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রথম নির্বাচনে নেমে দেখা গেল এগারোটার মধ্যে সাতটা প্রদেশেই কংগ্রেস হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েছে, নয় সর্ব-বৃহৎ দল হিসেবে দেখা দিয়েছে। ১৯৩৭-এর মার্চ মাস নাগাদ গান্ধী আবার সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরে এলেন এবং মাস কয়েক গেলে অনেক দর-কষাকষির পর তিনি সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করতে দিতে রাজী হলেন।

সুভাষচন্দ্র যদি ভারতবর্ষে জেলের বাইরে থাকতেন, তাহলে গান্ধীকে ডিঙিয়ে ১৯৩৩, ১৯৩৪ এবং এমন কি ১৯৩৫ সালেও নিজের নতুন পার্টি বানাতে পারতেন। কিন্তু ১৯৩৭ সালে ছাড়া পেয়ে এসে তিনি দেখলেন মহাত্মা শুধু জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বেই পুনর্বহাল নন, সাতটি প্রাদেশিক সরকারের ওপর কর্তৃত্বের জোরে শাঁসালো ক্ষমতার অধিকারী হতে চলেছেন। গান্ধী অবশ্য জানতেন দেশের মধ্যে সুভাষচন্দ্রই হলেন একমাত্র লোক যিনি কংগ্রেসের মধ্যে ফাটল ধরাতে পারেন এবং সে সম্ভাবনা তখনও রয়ে গেছে। তরুণ সুভাষচন্দ্রকে আর উপেক্ষা করা চলবে না। ছাড়া পাবার পর সুভাষচন্দ্র যখন আবার রাজনৈতিক দায়দায়িত্ব ঘাড়ে নিলেন, তখন কলকাতায় গান্ধীর সঙ্গে তাঁর দেখা হল। দুজনে ঐকান্তিক আগ্রহে দীর্ঘ সময় ধ'রে আলাপ-আলোচনা করলেন। আলোচ্য বিষয় ছিল 'ঐক্য'।

এ অবস্থায় ঐক্যের খুবই দরকার ছিল। গান্ধী এই ভেবে সান্ত্বনা পাচ্ছিলেন যে, প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত নাকচ করবার ক্ষমতা প্রাদেশিক গভর্নরের থাকলেও সে ক্ষমতা কার্যত প্রযুক্ত হবে না। কাজেই এই প্রথম সুযোগ মিলল বিধিমতে স্বাধীন হবার; অন্তত কংগ্রেসের কিছু কিছু মনোবাঞ্ছা তো আইন ক'রে মেটানো যাবে। নতুন গঠনতন্ত্রের এমন কি

অংশবিশেষও মেনে নেওয়ার ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রের অমত ছিল; কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠনের তিনি বিরুদ্ধে ছিলেন। আপত্তি নীতির দিক দিয়ে ততটা নয়; তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল যে, ক্ষমতার ছিটেফোঁটা পেলে মন্ত্রিসভায় শুধু নয় কংগ্রেসেও দুর্নীতি ঢোকার ভয় আছে। সরকারী কাজকর্মের খুঁটিনাটিতে জড়িয়ে প'ড়ে এতদিনের লক্ষ্য চোখের আড়ালে চলে যাবে। ১৯২৪ সালে পৌরসভার কর্তৃপদ পেয়ে তাঁর নিজের কী হাল হয়েছিল তিনি জানেন; কাজের মধ্যে এমন ভাবে ডুবে যেতে হয়েছিল যে, কী কংগ্রেস আর কী স্বাধীনতা সংগ্রাম—কোন দিকেই তাঁর তাকাবার উপায় ছিল না। কংগ্রেস মন্ত্রিসভারও ঐ এক দশা হতে বাধ্য। সংগ্রামে জয়ী হবার আগেই গদিতে গিয়ে বসলে ভুল করা হবে।

কিন্তু ও ব্যাপারে এখন আর কিছু করবার নেই। গান্ধী প্রস্তাব করলেন ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেসের সভাপতি হতে হবে; সুতরাং এ অবস্থায় যা হবার হয়ে গেছে ভেবে সুভাষচন্দ্রকে রাজী হতে হল। একদিকে ইউরোপে লড়াই বাধবার জোর সম্ভাবনা, অন্যদিকে ১৯৩৫-এর ফেডারাল শাসনবিধির বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে লড়বার প্রয়োজন—এই দুই কারণে তিনি মনে করেছিলেন কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্যের দরকার। গান্ধীর সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে, ভারতবর্ষ যদি স্ব-স্ব-অঞ্চলে-স্বাধীন কয়েকটি রাজ্যের যোগফল হয় তাহলে আসল কলকাঠি বৃটিশের হাতে থেকে যাবে; সুতরাং সে প্রস্তাব মানা যায় না। বৃটিশ চলে যাবার পর ভারতীয় গণপরিষদে ব'সে দেশের সংবিধান ঠিক হবে—সুভাষচন্দ্র এখন এই মতে সায় দিলেন।

১৯৩৮ সালে হরিপুরায় কংগ্রেসের একান্নতম অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক রাজ্যাভিষেক হল। একান্নটি তোরণের ভেতর দিয়ে একান্নটি বলদবাহী শকটে যেতে যেতে সভাপতি সুভাষচন্দ্র জয়ধ্বনিরত দেশভক্ত জনতাকে সগর্বে অভিবাদন জানালেন। নতুন সভাপতি ব'লে, জাতীয় সংগ্রামের নবীন নেতৃত্বের প্রতীক ব'লে শুধু হর্ষধ্বনি নয়—সুভাষচন্দ্রের তারুণ্য, তাঁর উদ্দীপনা, তাঁর মানবতা, গান্ধীর সঙ্গে তাঁর নতুন সাযুজ্য দেখে গর্বে লোকের মন ভ'রে উঠল। সুভাষচন্দ্রের জীবনের সে এক পরম লগ্ন; তিনি সে কথা মনে রেখে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টি থেকে কংগ্রেসের সমগ্র নীতি সম্পর্কে এক বিরাট ভাষণ দিলেন। অগৌণে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে

তাঁর চড়া স্বর এই ভাষণে একটু নরম হতে দেখা গেল। নতুন দল তৈরি অথবা পুরনো দলের সংস্কার—এসব কথা তাঁর বক্তৃতায় আদৌ শোনা গেল না; গান্ধীকে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে মহাত্মা এবং স্বাধীনতার স্থপতি ব'লে উল্লেখ করলেন। অন্যদিকে তিনি বললেন স্বাধীনতা অর্জনের পর কংগ্রেসের উচিত ক্ষমতা হাতে রাখার চেষ্টা করা। ভারতবর্ষে শিল্পবিপ্লব না হয়ে পারে না: এই বিপ্লব গ্রেট বৃটেনের মত আস্তে আস্তে হবে না, হবে রুশ দেশের মত জোর কদমে। এর জন্যে সরকারের তরফ থেকে চূড়ান্ত শক্তি প্রয়োগের দরকার হবে: 'পার্টিকে ক্ষমতা হাতে নিতে হবে, শাসনপরিচালনার ভার নিতে হবে এবং দেশগঠনের নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পন্ন করতে হবে।' ইউরোপের বিভিন্ন বিপ্লবের নজির তুলে তিনি বললেন, তা না হলে অরাজকতা দেখা দেবে। 'যারা লড়াই ক'রে ক্ষমতা আদায় করেছে, ঠিক ভাবে সেই ক্ষমতা কাজে লাগানো একমাত্র তাদের পক্ষেই সম্ভব'; এটা মোটেই ফ্যাশিজ্‌ম্ নয়, তাঁর মতে: বিরোধী দলগুলিকে নিষিদ্ধ করা হবে না এবং কংগ্রেসের কাঠামো গণতান্ত্রিকই থাকবে।

ক্ষমতা হস্তান্তরের পর যাতে কোন বিলম্ব বা অনিশ্চয়তা না ঘটে তার জন্যে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সবিস্তারে দেশগঠনের কর্মসূচী প্রস্তুত হওয়া দরকার। কংগ্রেসের উদ্যোগে এই উদ্দেশ্যে একটি 'নিখিল ভারত জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি' গঠনের ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র জোর দিলেন; এ কাজে তিনি নেহরুর কাছ থেকে সাহায্য পেলেন, অবশ্য গান্ধী কোন উৎসাহ দেখালেন না।

বৃটেনের প্রতি মনোভাবের দিক থেকে গান্ধীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মতের খুব একটা অমিল রইল না।

> বৃটিশ জনসাধারণের প্রতি আমাদের কোনই শত্রুভাব নেই। আমরা লড়ছি গ্রেটবৃটেনের সঙ্গে; আগে আমরা পুরোপুরি স্বাধীন হই, তারপর ঠিক করব গ্রেটবৃটেনের সঙ্গে আমাদের কী ধরনের সম্পর্ক হবে। তবে প্রকৃত আত্মনিয়ন্ত্রণ একবার হাতে এসে গেলে বৃটিশ জনসাধারণের সঙ্গে যথেষ্ট আন্তরিকতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে কোনই বাধা থাকবে না।[১৫]

১৫ সভাপতির ভাষণ, ১৯৩৮

তা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র ও গান্ধীর মৈত্রী সংকটাপন্ন অবস্থায় থেকে গেল এবং ১৯৩৮ সালে বছর যত শেষ হয়ে আসতে লাগল ততই এই মৈত্রীতে চিড় ধরতে আরম্ভ করল। নতুন বছরের গোড়ায় সুভাষচন্দ্র ভেবেছিলেন যুদ্ধের বিপদ এইবার বুঝি দূরে সরে গেল। তিনি যে মস্ত ভুল করেছেন তা বোঝা গেল মিউনিক চুক্তি দেখে। বৃটেন যখন ঘরের কাছে ব্যস্ত, তখন ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা কিভাবে তার সুযোগ নিতে পারে—এ নিয়ে সুভাষচন্দ্র এক সময়ে অনেক কিছু ভেবে রেখেছিলেন। এবার সেই সমস্ত মনে পড়ে গেল। তিনি তখন কংগ্রেসের নেতা ; প্রদেশে প্রদেশে কিম্বা উচ্চ নেতৃমহলে কংগ্রেসের কার্যকলাপ দেখে সব সময় তিনি খুশী হতে পারছিলেন না। মাঝে মাঝে নিজেকে তাঁর নিদারুণ নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল। একবার সুভাষচন্দ্র তাঁর বন্ধু দিলীপকুমার রায়কে অনেক করে অনুরোধ জানালেন যেন দিলীপকুমার পণ্ডিচেরী আশ্রমে ফিরে না যান ; কেননা তাঁর এমন একজনকে চাই যাকে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন : 'দিনরাত বেশিরভাগ পাজী-বদমায়েশদের সঙ্গেই আমাকে ওঠানামা করতে হয়। তুমি যদি কলকাতায় থাকতে তো জানতাম অন্ততঃ একজন আছে যার কাছে গিয়ে দুদণ্ড মনের কথা বলে আসা যায়...'[১৬] আর একবার দিলীপকুমার সুভাষচন্দ্রকে বললেন তাঁর সঙ্গে নির্জনবাসে যেতে। কিন্তু সুভাষচন্দ্র বললেন, তা হয় না : 'জীবনযুদ্ধে পরাজিত' এই ছাপ নিয়ে তিনি যোগী বনতে পারবেন না ; কিছুদিনের জন্যে যাওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা তাতে 'সংগ্রামের আগুন', তাঁর সংগ্রামী মনোভাব ক্ষুণ্ণ হতে পারে। মন তখন তৈরি হয়ে গেছে, কোমলতার ভাব দেখা দেয় কালেভদ্রে ; তবু প্রশ্নটা নিয়ে তখনও আলোচনা করা যায়। দিলীপকুমার রায়ের মতে, আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি তাঁর বন্ধু সব সময়েই টান অনুভব করেছেন এবং কখনই তিনি সে ডাক একেবারে প্রত্যাখ্যান করেননি। দিলীপকুমার মনে করেন, সুভাষচন্দ্রের মধ্যে যে মরমী মন ছিল একদিন তা আধ্যাত্মিকতার ডাকে সাড়া দিতই দিত। এই সময় এক অটোগ্রাফের খাতায় সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন :

বাঁধা রাস্তার বাইরে অজ্ঞেয়ের সন্ধানে যে অভিযাত্রী জীবন, সেই

১৬ 'দি সুভাষ আই নাউ', ৩৬ পৃষ্ঠা

> জীবনই আমাকে বেশি ক'রে টানে। এই জীবনে যন্ত্রণা থাকতে পারে কিন্তু সুখও আছে; অন্ধকার প্রহর থাকলেও রাতপোহানো সকালও আছে। আমি আমার দেশবাসীকে ডাকছি— এই পথে এসো।[১৭]

খুব কম লোকের মধ্যেই এমন অসামান্য তেজ, এমন অফুরন্ত প্রাণশক্তি দেখা যায়।

১৯৩৯ সালে তাঁকে সর্বশক্তিতে ভর ক'রে দাঁড়াতে হয়েছিল। তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন বছরটা বেশ ঘোরালো: ইউরোপে যুদ্ধ, 'ইংলণ্ডের ফ্যাসাদ,' কংগ্রেসের পরম সুযোগ—এসব ঘটল ব'লে। এ সুযোগ আর কারো হাতে বিশ্বাস ক'রে ছেড়ে দেওয়া যায় না—গান্ধীজীকে তো নয়ই। কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলো ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে গেছে এবং তাদের ওপর মোড়লি করতে পেরে কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডও মৌজ হয়ে আছে: কারো কারো মধ্যে এমন ভাবও দেখা যাচ্ছে যে, দেখে যাই মনে হোক আসলে হয়ত ১৯৩৫ সালের বিধানসম্মত ফেডারাল ব্যবস্থা ততটা খারাপ নয়। বৃটিশের সঙ্গে তখন তখনি একটা এস্পার ওস্পার করবার প্রবল আগ্রহে বিজ্ঞজনদের উপদেশ পায়ে ঠেলে, ওয়ার্কিং কমিটির মতের বিরুদ্ধে গিয়ে সুভাষচন্দ্র ১৯৩৯ সালে কংগ্রেস সভাপতি হবার জন্যে পুনর্বার নির্বাচনে দাঁড়ালেন। গান্ধীজী এ অবস্থার জন্যে তৈরি ছিলেন না: দুজনের মতপার্থক্য এমন একটা স্তরে এসে দাঁড়াল যখন আর তা উপেক্ষা করা যায় না এবং তাতে লোকলজ্জার কারণ ঘটতে আরম্ভ করল। জনসমর্থন আদায়ের স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতার গুণে সুভাষচন্দ্র নির্বাচনে গান্ধীর মনোনীত প্রার্থীকে অল্প ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে দিলেন এবং দ্বিতীয় বছরের জন্যে নির্বাচিত সভাপতি হলেন।

সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য যদি এই সময় আবার ভেঙে পড়বার মত না হত, তাহলে হয়ত পরে যেসব ঘটনা ঘটল তা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র সভাপতিপদে বহাল থাকতেন। গান্ধী ঘোষণা করলেন যে, নির্বাচনে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর নিজের পরাজয় ঘটেছে এবং আভাসে জানিয়ে দিলেন যে এরপর তিনি হয়ত বিদায় নেবেন। তার উত্তরে সুভাষচন্দ্র জানালেন যে তিনি মোটেই মহাত্মার বিরুদ্ধে দাঁড়াননি এবং এ বিষয়ে একটা মিটমাট ক'রে ফেলতে চাইলেন;

১৭ 'দি সুভাষ আই নীউ', ৭৮-৯ পৃঃ

কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটি প্রথমোক্ত কারণটিকে পদত্যাগ করার একটা অজুহাত হিসাবে নিল এবং ফেব্রুয়ারীর শেষাশেষি কংগ্রেসের কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটতে লাগল। ১০ই মার্চ যখন কংগ্রেসের অধিবেশন বসল, গান্ধী অনুপস্থিত থাকলেন এবং সুভাষচন্দ্র এলেন স্ট্রেচারে শোয়া অবস্থায়; সভাপতির শোভাযাত্রায় তাঁর স্থান নিল তাঁর প্রতিকৃতি। তাঁর ছোট্ট নিস্তেজ অভিভাষণ তাঁর হয়ে অন্য লোকে পড়ে দিল; সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অধিবেশনে তাঁর পক্ষে আদৌ যোগ দেওয়া সম্ভব হল না। ছ মাসের মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাও ভাল, নইলে আইন অমান্য শুরু হবে—এই মর্মে তিনি বীরত্বপূর্ণ প্রস্তাব আনলেন বটে, কিন্তু উপস্থিত সবাই তাতে ঘাবড়ে গেল; প্রস্তাবটি ভোটে অগ্রাহ্য তো হলই, উল্টে এমন একটি বিরোধী প্রস্তাব তাঁকে মেনে নিতে হল যার দ্বারা ওয়ার্কিং কমিটি ও কর্মসূচী ঠিক করার ব্যাপারে আগে তাঁকে গান্ধীর অনুমোদন পেতে হবে।

এরপর সুভাষচন্দ্র আর গান্ধীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধ'রে যে পত্রালাপ চলল, তাতে কোন ফল ফলল না। সুভাষচন্দ্র অভিযোগ করলেন তাঁর বিরুদ্ধ-বাদীরা জোচ্চুরি ক'রে তাঁকে হারিয়েছে: বিপক্ষের প্রস্তাব নিয়মবিরুদ্ধ ছিল এবং ইচ্ছে করলেই তা নাকচ করা যেত: গান্ধীকে মধ্যস্থ হয়ে কংগ্রেসের ঐক্য পুনরুদ্ধার করবার জন্যে তিনি মিনতি জানালেন। সুভাষচন্দ্র তখনও তর্ক ক'রে প্রমাণ করতে চাইছেন তাঁর বক্তব্যই সঠিক; নিজের গোঁ ছাড়তে, নীতির ব্যাপারে আর কারো মত গ্রহণ করতে তিনি যে রাজী—এমন কোন লক্ষণ তাঁর মধ্যে দেখা গেল না। গান্ধীর কাছে মনে হল পার্থক্যটা মৌলিক এবং জরুরী; তিনি বললেন, আইন অমান্য শুরু করলে শেষে অরাজকতা দেখা দেবে এবং প্রলয়কাণ্ড ঘটবে; চারিদিকের এই হিংসাত্মক আবহাওয়ায় তিনি জেনেশুনে ঘাড়ে বিপদ ডেকে আনতে রাজী নন। তিনি এও মনে করেন না যে, উভয় পক্ষের লোক নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি তৈরী করলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। গান্ধীজী যথাসম্ভব সুর মোলায়েম ক'রে বললেন, এ ব্যাপারে তিনি কোন রকম সাহায্য করতে পারবেন না: সুভাষচন্দ্র মতভেদের কথাটা স্পষ্ট করেই জানিয়েছিলেন: দেখা গেল, গান্ধী আরও স্পষ্টবাদী: 'আমাদের এক জায়গায় হবার রাজনৈতিক ভিত্তি কোথায়? ও ব্যাপারে মিল হবে না, এটা স্বীকার ক'রে নেওয়াই ভাল।

তার চেয়ে সামাজিক, নৈতিক এবং পৌরনীতির ক্ষেত্রে আমাদের মিল হোক। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের কথা বাদ দিচ্ছি, কারণ সে ব্যাপারেও আমরা দেখেছি আমাদেব মধ্যে মতভেদ আছে।'[১৮] তবে সুভাষচন্দ্র এ নিয়ে মন খারাপ না ক'রে নির্ভীকভাবে তাঁব কর্মপন্থা লিপিবদ্ধ করুন এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য বেছে নিন, তারপব তাঁর কর্মপন্থা ও নামের তালিকা কংগ্রেসের কাছে অনুমোদনের জন্যে পেশ করুন।

যদি সুভাষচন্দ্র আর গান্ধীব মধ্যে একজনকে বেছে নিতে কংগ্রেসকে বলা হয়, তাহলে তাব একটাই ফল হবে—সুভাষচন্দ্র বিলক্ষণ জানতেন। মধ্যস্থতার জন্যে আবার তিনি ব্যগ্রতা জানালেন: 'আমাদেব মধ্যে বিচ্ছেদ হলে বিশ্রী গৃহযুদ্ধ দেখা দেবে।' কংগ্রেসের শক্তিক্ষয হবে এবং বৃটিশ মজা লুটবে। কিন্তু গান্ধী মনে কবলেন বিচ্ছেদই ভাল। অচলাবস্থাব মধ্যে এপ্রিলেব শেষাশেষি সুভাষচন্দ্রকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের সম্মুখীন হতে হল এবং পদত্যাগ না ক'বে তাঁব উপায় থাকল না।

অনেকে মনে কবেন, এই ঘটনাব পর থেকে সুভাষচন্দ্রের দেশপ্রেমেব সর্বত্যাগী মহিমা ক্ষুণ্ণ হতে শুরু কবল। এই দ্বিতীয়বাব তাঁব জীবনেব মোড ঘুরল: তিনি বলতে পাবতেন প্রথমবার তাঁব জীবনেব মোড ঘুবেছিল বৃটিশের অবিচারেব দরুন; এবার তাঁব স্বদেশবাসী, নিজের সঙ্গীসাথীরাই তাঁর প্রতি অবিচার কবল। কেননা গান্ধীব মনোনীত প্রার্থীকে হারিযে তিনি গণতন্ত্র-সম্মতভাবেই নির্বাচিত হয়েছিলেন; গান্ধী না চাইলেও জনসাধারণ চেয়েছিল ব'লেই তিনি সভাপতি হয়েছিলেন, নেতা হযেছিলেন। যারা তাঁকে ভোট দিয়েছিল তারা তাঁর মতামতেব কথা জানত এবং তারা জেনে বুঝে তাঁর মতামত গ্রহণ করেছিল। জনসাধারণ যে দায়িত্ব তাঁকে দিয়েছিল, চক্রান্ত ক'রে তা হরণ ক'রে নেওয়া হল, এ চক্রান্ত শুধু তাঁর বিরুদ্ধে নয়, নির্বাচনকারী গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে। কংগ্রেসে তাঁকে এমন একটা অবস্থায় ঠেলে নিয়ে যাওয়া হল যাতে সবাই দেখতে পায় যে নেতা হিসেবে তিনি ব্যর্থ। এতে ক'রে তাঁর প্রতি সাঙ্ঘাতিক অবিচার করা হল।

হয়ত সত্যিই তিনি পারেননি, হয়ত তাঁর জায়গায় একজন কম বুদ্ধিমান, কম আত্মনির্ভরশীল লোককে বসালে সে ঠিক চালিয়ে নিয়ে যেতে

১৮ ১৯৩৯-এর ১০ই এপ্রিল তারিখে সুভাষচন্দ্রকে লেখা গান্ধীর পত্র

পারত। কেননা আপোস ক'রে চলা সুভাষচন্দ্রের ধাতে ছিল না ; মাঝামাঝি কোন রাস্তা, শাদা আর কালোর মাঝামাঝি কোন সুর, পরমতসহিষ্ণুতা— তাঁর কাছে এ সবের কোন বালাই ছিল না। তাঁর সঙ্গে একমত না হলেই সে শত্রু—তার বিরুদ্ধে লড়তে হবে। একবার তিনি বলেছিলেন, 'আমি হলাম চরমপন্থী ; হয় পুরোপুরী, নয় একেবারেই কিছু না…।' এই ছিল তাঁর চিরকেলে ধরন : তাঁর সবলতাও বটে দুর্বলতাও বটে ; এবং বর্তমানে এটাই যে তাঁর কাল হল তাতে সন্দেহ নেই।

এর মধ্যে শুধু অবিচারের দিকটাই সুভাষচন্দ্রের নজরে পড়ল। তাঁর আঠারো বছরের কর্মজীবনে স্বাধীন হবার সুযোগ এই একবারই মিলেছিল ; সে সুযোগ এভাবে হেলায় হারাতে দেখে সুভাষচন্দ্রের মন ভেঙে গিয়েছিল। এই রকম একটা মানসিক অবস্থার মধ্যেই তিনি আবার তাঁর আমূল পরিবর্তনের মতবাদ পুরোপুরিভাবে আঁকড়ে ধরলেন। মাসগানেকের মধ্যেই তাঁর উদ্যোগে কংগ্রেসদলের মধ্যে গরমপন্থী 'ফরোয়ার্ড ব্লকে'র পত্তন হল ; তিনি বললেন, তাঁর লক্ষ্য হল সমস্ত বামপন্থী গ্রুপকে একজোট করা এবং কংগ্রেসের মধ্যে একদিকে নিয়মতান্ত্রিক মনোভাব ও অন্যদিকে একনায়কতন্ত্রকে বাধা দেওয়া। কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্টিকে টানতে না পারায় বাংলার বাইরে ফরোয়ার্ড ব্লককে একটা বড় রকমের খুঁটি হারাতে হল। ফরোয়ার্ড ব্লকের সংগঠন গড়ে উঠল সুভাষচন্দ্রের নিজস্ব সামরিক কায়দায় : এই সংগঠনের নামে তিনি তাঁর বিপ্লবী ফতোয়া জারী করলেন : বাংলাদেশে চরম কিছু করবার দিকে যাদের ঝোঁক, তাদের এই সংগঠনে টানা হল। কিন্তু কংগ্রেসের কায়েমী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেবে ব'লে উৎফুল্ল হয়ে সুভাষচন্দ্র ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা দেখা দিল না। এমন কি খোদ বাংলাদেশেও গান্ধী শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রকে নস্যাৎ ক'রে দিলেন।

তাই ব'লে সুভাষচন্দ্র জোরালো ভাষায় স্পষ্টাস্পষ্টি সমালোচনা করতে ছাড়লেন না। কংগ্রেসে জঘন্য একনায়কতন্ত্র চলে ব'লে তিনি এবার কটূক্তি করলেন ; বললেন হিটলারী ব্যবস্থার সঙ্গে তার খুব তফাৎ নেই। প্রাদেশিক সংগঠনে নিজের প্রভাব বাড়াবার জন্যে কংগ্রেস যে একটি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তার প্রতিবাদে সুভাষচন্দ্র জুলাই মাসে দেশব্যাপী বিক্ষোভ

প্রদর্শনের জন্যে ডাক দেন। আগস্ট মাসে কংগ্রেসের দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে তিন বছরের জন্যে তাঁকে সসপেণ্ড্ করা হল। সুভাষচন্দ্র ভাব দেখালেন তিনি এসব কেয়ার করেন না—তাঁকে শাস্তির কথা জানানো হলে তিনি বললেন, 'ব্যস্?'—এবং তখনও তিনি জানেন বাংলাদেশে তাঁর পেছনে বিরাট জনসমর্থন আছে। আঘাতটা কিন্তু গভীরভাবে বিঁধেছিল। পরের মাসে হিটলার যুদ্ধ শুরু করে দিল। যুদ্ধ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের যে বৈঠক বসল, তাতে যোগ দেবার জন্যে সুভাষচন্দ্র আমন্ত্রিত হলেন। কিন্তু নিজের কর্মপন্থা ছাড়া আর কিছুই তিনি ঠিক ব'লে মানতে পারলেন না এবং যখন দেখলেন ওয়ার্কিং কমিটি কিছুতেই তাতে রাজী হচ্ছে না, তখন তিনি সভা ছেড়ে গটগট ক'রে বেরিয়ে এলেন। এই লড়াই বাধবে ১৯২৯ সাল থেকে তিনি ব'লে আসছেন; রুশ-জার্মান চুক্তি হওয়ায় তিনি সাময়িকভাবে ভেবেছিলেন লড়াই পিছিয়ে যাবে; তবে তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল জার্মানি জিতবে। গান্ধী এ অবস্থাতেও আশা করে আছেন বৃটিশের হৃদয় পরিবর্তন হবে। সুভাষচন্দ্র বললেন, বৃটিশের এখন হৃদয় পরিবর্তন হয়েই বা কী হবে? বৃটিশের এখন নাভিশ্বাস উঠেছে, তাদের রাজত্ব যায়-যায়। বিজেতারা এসে পড়বার আগেই ওদের শিথিল মুষ্টি থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে হবে। একাজ করতে না চাইলে কংগ্রেসের চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতাই প্রকাশ পাবে এবং তার মানে দাঁড়াবে কংগ্রেস যেন বৃটিশ রাজত্বকে টিঁকিয়ে রাখবারই পক্ষপাতী।

১৯৪০-এর মার্চ মাসে রামগড়ে কংগ্রেসের অধিবেশন চলাকালে বিরোধীপক্ষ থেকে যে 'আপোষবিরোধী সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয় সুভাষচন্দ্র তাতে যোগ দেন। এই সম্মেলন থেকে অবিলম্বে সারা ভারত জুড়ে সংগ্রাম শুরু করবার আহ্বান জানানো হল—এই সংগ্রাম 'হবে নিরলস ও নিরবচ্ছিন্ন, কিছুতেই তার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া চলবে না—১৯৩২ সালে যেমন করা হয়েছিল।' কংগ্রেস মুখে যা বলে, কাজে তা করে না। বৃটিশ তাই কংগ্রেসের কথায় আজকাল কোন গুরুত্ব দেয় না। ক্রমশঃ সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা মারাত্মক হয়ে উঠতে লাগল। তিনি বললেন বটে যে হিটলারী মতবাদের তিনি বিরোধী—কিন্তু জার্মান সামরিক শক্তির ছাপ তখনও তাঁর মনের ওপর ছিল: জুন মাসে শ্রীযুক্ত নীরদ চৌধুরীকে তিনি বলেছিলেন, 'আমি

ব'লে রাখছি, ১৬ই জুলাইয়ের মধ্যে ইংল্যাণ্ড পরাজয় স্বীকার ক'রে আত্মসমর্পণ করবে'ঃ জার্মানরা এসে পড়বার আগেই ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা পেতে হবে।

> ইউরোপে একেকটা ঘা খাবে আর ভারতবর্ষে ক্ষমতাগর্বী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর মুঠো আল্গা হয়ে আসবে।······
>
> সাম্রাজ্যের সাহায্য কুড়িয়ে বা ভারতবর্ষের সাহায্য নিয়ে বৃটেনকে রক্ষা করবার কথা এখন আর আমরা যেন না বলি। এই নিদারুণ সঙ্কটের সময় ভারতবর্ষের উচিত আগে নিজের কথা ভাবা।···ভারতীয় জনসাধারণের পক্ষ থেকে এখুনি দাবি তোলা দরকার:—অস্থায়ী জাতীয় সরকার মারফৎ ভারতবাসীদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দাও।[১৯]

পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সুভাষচন্দ্রকে বাইরে ছেড়ে রাখা কোন দায়িত্বশীল সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ১৯৪০-এর ২রা জুলাই সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হলেন; উপলক্ষটা ছিল জাতীয় মর্যাদাহানিকর অন্ধকূপ হত্যার স্মৃতিস্তম্ভ অপসারণের উদ্দেশ্যে কলকাতায় তাঁর নেতৃত্বে সংগঠিত গণবিক্ষোভ। অবশ্য এ ছাড়াও তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের আরও নানা অভিযোগ ছিল; ফলে, অন্য বিক্ষোভকারীরা ছাড়া পাবার পরেও সুভাষচন্দ্রকে কারাগারে বন্দী ক'রে রাখা হল। এমন কি দিলীপকুমার রায়ও লক্ষ্য করলেন কংগ্রেস চোখ বন্ধ ক'রে থেকে এমন সুযোগ নষ্ট হতে দেওয়ায় সুভাষচন্দ্রের মনে এই সময় এমন হতাশা ও বিরক্তি দেখা দেয় যে, তিনি নিজেকেই ভারতের ত্রাণকর্তা ব'লে ভাবতে আরম্ভ ক'রে দিলেন। পরে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার শ্রোতাদের কাছে প্রায়ই তিনি বর্ণনা করতেন কিভাবে তাঁর পরবর্তী কার্যকলাপের সূত্রপাত হল:

> আমরা ভাবছিলাম কী করা যায়, কোন্ নতুন পদ্ধতি কাজে লাগানো যায়। তরুণেরা বোমা পিস্তল নিয়ে যে যতটুকু পারে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। এই তরুণ বিপ্লবীদের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করলাম। তাদের কতটা শক্তি আমি জানতাম। ওরা খাঁটি বিপ্লবী,

১৯ জুন ১৯৪০-এর 'ফরোয়ার্ড ব্লক' সম্মেলনের বক্তৃতা

> অদম্য ওদের উৎসাহ। কিন্তু আমাদের মাতৃভূমির পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের পক্ষে একা ওদের ক্ষমতা ও আত্মোৎসর্গ যথেষ্ট ছিল না।[২০]

আইন অমান্য, এমন কি সন্ত্রাসবাদও, যথেষ্ট নয়। ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে বাইরের সাহায্য অপরিহার্য। বৃটেনের তো টলটলায়মান অবস্থা। ভারতবর্ষকে এখন শুধু বোঝাতে হবে যে, সুযোগ এসে গেছে—শুধু বৃটিশের ক্ষমতার বাঁধনটুকু খোলবার জন্যে এখন দরকার সামান্য একটু সামরিক সাহায্য। সাহায্যটা আসবে কোথা থেকে? সেটাই হল প্রশ্ন। সুভাষচন্দ্র এক সময়ে মুসোলিনীর ভক্ত ছিলেন; হিটলার সম্পর্কে তাঁর কোনদিনই কোন মোহ ছিল না। যুদ্ধে অক্ষশক্তি জিতবে ঠিকই, তবে ভারতবর্ষকে তারা বিনা স্বার্থে সাহায্য দেবে না। রাশিয়া সম্বন্ধে তাঁর ভাবনাটা বোধহয় এই রকম ছিল যে, বিপ্লবের দুঃখকষ্টের স্মৃতি পুরনো হয়ে যায় নি ব'লেই রাশিয়া হয়ত ভারতবর্ষের প্রয়োজন বুঝবে। এমন কাউকে এদেশের বাইরে যেতে হবে, যার নামডাক আছে এবং যাকে সকলে গুরুত্ব দেবে। সুভাষচন্দ্র বলেছেন, 'শেষকালে ঠিক করলাম আমি নিজেই ভারতের বাইরে চলে যাবো'।[২১]

তার জন্যে প্রথম দরকার জেল থেকে বার হওয়া। জেলখানার মধ্যে তাঁকে মরতে দিতে সরকার হয়ত চাইবে না, সুভাষচন্দ্র সেকথা জানতেন। তাহলে সাহসে বুক বেঁধে নিয়ে তিনি আমরণ অনশন চালিয়ে যাবেন ব'লে ঘোষণা করলেন:

> সরকার পশুশক্তির জোরে আমাকে জেলের মধ্যে আটক রাখতে বদ্ধপরিকর। তার উত্তরে আমার কথা হল—'হয় আমাকে মুক্তি দাও, নইলে আমি প্রাণপাত করব—আমার জীবন মরণ আমার হাতে।'

রাজনৈতিক অন্তিম ইচ্ছা হিসেবে তিনি আবেদন জানালেন:

> এখুনি হাতে হাতে কোন ফল পাওয়া না গেলেও কোন আত্ম-

২০ 'অন টু দিল্লী', ৭১ পৃঃ

২১ ঐ, ৭২ পৃঃ

ত্যাগই কখনও বৃথা যায় না। ক্লেশ স্বীকার ও আত্মত্যাগের ভেতর দিয়েই আদর্শের প্রসার হতে পারে; 'শহীদের রক্তেই পীঠস্থান গড়ে ওঠে'—সর্বদেশে সর্ব যুগে এটাই চিরন্তন নিয়ম।

এই মরজগতে সব কিছুই ধ্বংস হয়, সব কিছুই ধ্বংস হবে—শুধু বিনাশ নেই ভাবাদর্শের, বিনাশ নেই স্বপ্নের। ব্রত পালনের জন্যে এক ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করতে পারে—কিন্তু তার মৃত্যুর পর হাজার মানুষের জীবনে সে আদর্শ মূর্তি পরিগ্রহ করবে। বিবর্তনের চাকা এমনিভাবে ঘুরে ঘুরে চলে—একের ভাবাদর্শ আর স্বপ্নের দায়ভাগ এমনিভাবে উত্তরপুরুষে বর্তায়। এই পৃথিবীতে দুঃখভোগ ও আত্ম-ত্যাগের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়ে কোনদিনই কোন ব্রত সফল হয়নি।

দেশবাসীকে আমি ব'লে যেতে চাই—'ভুলো না, দাসত্বের চেয়ে বড় অভিশাপ আর নেই। ভুলো না, অন্যায়-অবিচারের সঙ্গে আপোষ করা মহা অপরাধ। জীবন পেতে হলে জীবন দিতে হবে—মনে রেখো, এই হল চিরকালের নিয়ম, মনে রেখো বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করাই সকলের বড় ধর্ম—তার জন্যে যত দামই দিতে হোক।'

আজকের সরকারের কাছে আমার কথা—'সাম্প্রদায়িকতা আর অবিচারের পথে উন্মত্ত অভিযান বন্ধ করো। এখনও সময় আছে পিছু হটবার। এমন কোন অস্ত্র ছুঁড়ো না যা ফিরে এসে তোমার গলার ফাঁস হবে। বাংলাদেশকে দ্বিতীয় সিন্ধুপ্রদেশে পরিণত করো না।'

······আমার অনশন শুরু হবে ২৯শে নভেম্বর, ১৯৪০। অন্যান্য বারের মত এবারেও আহার্য শুধু জলের সঙ্গে নুন। তবে পরে যদি দরকার বুঝি সেটুকুও পরিত্যাগ করব।[২২]

এ ধরনের ওজস্বী 'নৈতিক প্রতিবাদে' ফল না হয়ে পারে না। বলপ্রয়োগ ক'রেও যখন খাওয়াতে পারা গেল না, তখন অনশনের ছ'দিন পরে সুভাষচন্দ্র জেল থেকে ছাড়া পেলেন। শরীর সারাবার জন্যে কিছুদিন তিনি বাড়িতে চুপচাপ পড়ে থাকলেন: ২৯শে ডিসেম্বর 'শয্যাশায়ী অবস্থায়' তিনি বাংলার

২২ বাংলার গভর্নরের কাছে লেখা চিঠি: ২৬শে নভেম্বর, ১৯৪০

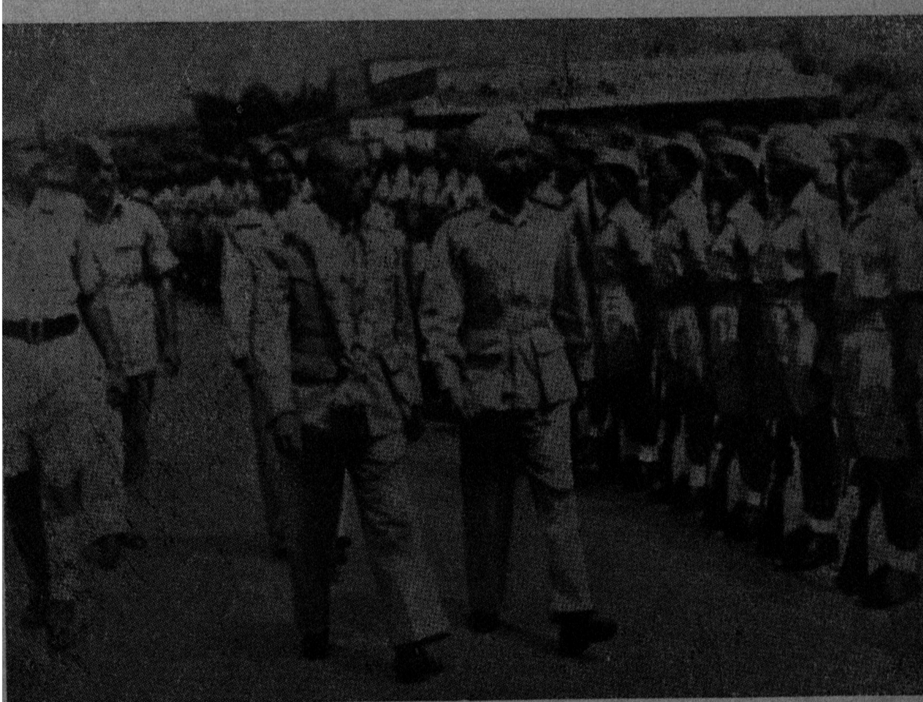
রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বড়লাটকে একটি কড়া চিঠি লিখে পাঠালেন। এরপর তিনি লোকজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ ক'রে দিয়ে 'নির্জনবাস' গ্রহণ করলেন। ১৬ই জানুয়ারী জনকয়েক বন্ধুর সঙ্গে তাঁর দেখা হল; তাঁরা দেখলেন সুভাষচন্দ্রের একগাল দাড়ি। ১৯৪১-এর ২৬শে জানুয়ারী ছিল রাজদ্রোহের অভিযোগে সুভাষচন্দ্রের বিচারের তারিখ। কিন্তু ঐদিন তাঁকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

১৭ই জানুয়ারী খুব ভোরে কলকাতায় সুভাষচন্দ্রের বাড়ির সামনে একটি গাড়ি এসে দাঁড়ায়। কাকপক্ষী টের পাবাব আগেই বাড়ি থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন এক ভদ্রলোক, নাম মৌলবী জিয়াউদ্দিন। সঙ্গে সামান্য যা লটবহর ছিল, গাড়িতে চাপান হল। তারপর ভদ্রলোক সকলের অলক্ষ্যে সরে পড়লেন—যেন পশ্চিমে কোথাও নিজের দেশঘরে ফিরছেন। আসলে ওটা সুভাষচন্দ্রের ছদ্মবেশ; সঙ্গে তাঁর ভাইপো শিশির কুমার বসু। ভারতবর্ষ থেকে পালিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে সুভাষচন্দ্রের যাত্রা এখান থেকে শুরু হল। কলকাতা থেকে ট্রেনে উঠলে ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা; কেননা ষ্টেশনে গোয়েন্দাদের কড়া নজর এবং ঘরের কাছে হওয়ায় ছদ্মবেশ থাকলেও লোকে চিনে ফেলতে পারে। কাজেই দিনের বেলায় গা ঢাকা দিয়ে থাকা আর রাত্তির হলেই বেরিয়ে পড়া—এইভাবে কলকাতা থেকে ২১০ মাইল রাস্তা পাড়ি দিয়ে গোমোয় এসে পৌছুলেন। ভাইপোর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেখান থেকে তিনি পেশোয়ারের ট্রেন ধরলেন। পেশোয়ারে শ্রীযুক্ত ভগৎরাম ব'লে একজন সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করলেন। পেশোয়ারে দুদিন থাকার পর দ্বিতীয় পর্যায়ের যাত্রা শুরু হল—লক্ষ্যস্থল এবার কাবুল। সুভাষচন্দ্রকে পাঠানের বেশ ধারণ করতে হল, ভগৎরাম হলেন রহমত খান এবং স্থানীয় ভাষার অজ্ঞতা ঢাকার জন্যে সুভাষচন্দ্র বোবা ও কালা সাজলেন।

পেশোয়ার থেকে মোটরে ক'রে তাঁরা রওনা হলেন। খাইবার গিরি সঙ্কটের প্রবেশমুখ আগলাচ্ছে জামরুদ দুর্গ। তার আগেই তাঁরা কাবুলে যাবার বড় রাস্তা ছেড়ে মেঠো রাস্তা ধরলেন। রাস্তা অসম্ভব খারাপ গাড়ি বেশী দূর গেল না। তারপর উপজাতিদের এক গাঁয়ে রাত কাটিয়ে পরদিন দুজন সশস্ত্র পাঠান প্রহরী সঙ্গে নিয়ে তাঁরা আফগান সীমান্তের দিকে পায়ে



মেজর ফুজিহারা ও ভারতীয় নেতৃবর্গ : সিঙ্গাপুর ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২



মোহন সিং (ডান দিকে) ও রাসবিহারী বসু 'আই-এন-এ পরিদর্শনরত, সেপ্টেম্বর ১৯৪২



মেসেরিংস্-এ বিশেষ সৈন্যবাহিনী



মেসেরিংস্-এ সুভাষচন্দ্র ও হাউপ্টম্যান হারবিগ

হেঁটে রওনা হলেন। উপজাতীয় অঞ্চলের ভেতর দিয়ে তাঁরা চলতে লাগলেন। আফগানিস্থান থেকে বেরিয়ে কাবুল নদীর দুই মুখ যেখানে এক জায়গায় এসে মিলেছে, সেখানে তাঁরা নদী পার হয়ে দ্বিতীয় রাত আড্ডা-শরীফে এক মসজিদে কাটালেন। সেখান থেকে তাঁরা গেলেন লালপুরায়। চতুর্থ দিনে আবার তাঁরা কাবুল নদী পার হয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়লেন। এখন তাঁরা আফগানিস্থানের অনেকখানি ভেতরে। ছাড়পত্র দেখবার দায় থেকে রেহাই পাওয়া গেল। সঙ্গীরা নদী পার ক'রে দিয়ে বিদায় নিল; আর এখন তাদের কিছু করবার নেই। ক'দিন সমানে হাঁটতে হওয়ায় সুভাষচন্দ্রের শরীর আর বইছিল না। ক্লান্ত হয়ে রাস্তার ধারে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। গাড়ির সন্ধানে ভগৎরাম সারাদিন হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ালেন। শেষকালে সন্ধ্যের দিকে একটা ছাদ-খোলা লরী পাওয়া গেল; লরীর মাথায় তাঁরা কোন রকমে চড়ে বসলেন। বরফ-ঢাকা উপত্যকা পার হয়ে কাবুলে পৌছুতে তাঁদের পুরো একটা রাত এবং পুরো একটা দিন কেটে গেল।

লাহোর গেটে এসে লরী থেকে তাঁরা নামলেন। ঠাণ্ডায় হাত পা প্রায় জমে গেছে। সেই অবস্থাতেই তাঁরা ডেরা খুঁজতে বেরোলেন। লরী-ড্রাইভারদের সরাইখানায় থাকবার একটা জায়গা পাওয়া গেল। সে রাত ভারী কষ্টে কেটেছিল:

> বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। দরজা খুলে রাখা গেল না। ঘরের মধ্যে এত ধোঁয়া যে, নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম। গোটা কতক শুকনো কাঠ যোগাড় ক'রে আমরা আগুন পোহাবার ব্যবস্থা করলাম। ঠাণ্ডায় আমাদের সমস্ত শরীর জমে গিয়েছিল।
>
> সন্ধ্যাবেলায় ভগৎ রাম বাজার থেকে কয়েকটা মোমবাতি, আর সেই সঙ্গে কিছু শুকনো রুটি আর কাবাব কিনে আনল। আমি রুটি খেতে পারছি না দেখে ভগৎরাম আমাকে এক কাপ চা এনে দিল। চায়ে রুটি ডুবিয়ে ডুবিয়ে আমি খেতে লাগলাম।[২৩]

পরের তিনদিন তাঁরা রুশ দূতাবাসে ঢোকার চেষ্টা করলেন। কাজটা সহজ

২৩ 'হিন্দুস্থান টাইম্‌স্‌, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬: উত্তমচাঁদের ধারাবাহিক নিবন্ধ

ছিল না। কাবুলে তাঁদের চেনাপরিচিত কেউ নেই, ভগৎরামের পুস্তভাষা-জ্ঞানও তেমন কাজে আসছিল না, কারণ বেশীর ভাগ লোকই ফার্সীতে কথা বলে। যে কোন মুহূর্তে ভারতবর্ষে সোরগোল উঠতে পারে। তাছাড়া খুব সন্তর্পণে চলাফেরা করতে হবে ; যাতে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ না করে। এখানে ভারতীয় যে কেউ বৃটিশের চর হতে পারে, যে কোন আফগান হতে পারে গোয়েন্দা বিভাগের লোক। দূতাবাসগুলোর সামনে পাহারা মোতায়েন : রুশ প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করবার দ্বিতীয় কোন উপায় না পেয়ে তাঁরা একদিন রাস্তার মধ্যে তাঁর গাড়ি দাঁড় করালেন কিন্তু নিজেদের বক্তব্য ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারলেন না। সরাইখানার নোংরা ঘর, সারাক্ষণ বোবা সেজে থাকা, ময়লাচিট পোষাক, হাড়কাঁপানো শীত—সবকিছু মিলে সুভাষচন্দ্রের অসহ্য ঠেকতে লাগল। এখন আর ফেরা যায় না ; ভারতবর্ষে ফেরা মানে হার স্বীকার করা : কিন্তু যে ক'রেই হোক এই অবান্ধব দেশ ছাড়তে হবে। পাঁচদিনের দিন 'একেবারে মরিয়া হয়ে' তিনি ভগৎরামকে ইতালীয় দূতাবাসে পাঠালেন। তাঁরা স্মিতমুখে স্বাগত জানাল, অভিনন্দনও জুটল এবং ছাড়পত্রের প্রতিশ্রুতি মিল্‌ল।

কাবুল থেকে রোম কিম্বা বার্লিন যেতে গেলে মস্কো হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। তখনও সুভাষচন্দ্র অক্ষশক্তি সম্পর্কে বিরূপ। তখনও তিনি আশা ক'রে আছেন সোভিয়েট দেশের ভেতর দিয়ে যাবার সময় শেষ পর্যন্ত সোভিয়েটের কর্তাব্যক্তিদের দর্শন মিলে যাবে। তিনি বললেন, 'বার্লিন কিম্বা রোমে যেতে আমার খুব মন সরছে না। কিন্তু না গিয়ে উপায় নেই।'

১৯৪১-এর ২৬শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের খবর কলকাতায় প্রকাশ পায়। কাবুলে ঠিক এই সময় এক আফগান পুলিশ হয়ত নেহাৎ ঘটনাক্রমেই লরীড্রাইভারদের সরাইখানায় দুইজন 'হজযাত্রী' এতদিন ধ'রে কেন আছে, এই নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। একবার ঘুষ দিতেই তার খাঁই বেড়ে গেল ; দিনের পর দিন এসে সে আরও বেশী ঘুষ দাবি করতে লাগল। লোকটা পাছে বেইমানি ক'রে ধরিয়ে দেয়, সেই ভয়ে তাঁরা শেষ পর্যন্ত শ্রীযুক্ত উত্তমচাঁদ নামে এক ভারতীয়ের শরণার্থী হলেন। দেখা গেল

তাঁরা বিচারে ভুল করেননি। উত্তমচাঁদ সগর্বে তাঁদের স্থান দিলেন। তবে এরকম একটা বিপদ ঘাড়ে নিতে গিয়ে মনে মনে তাঁর ভয়ও হল।

নতুনভাবে যাত্রা শুরু করতে আরও ছ' সপ্তাহ কেটে গেল। এই সময়ের মধ্যে বার বার রুশদের টানবার চেষ্টা ক'রে সুভাষচন্দ্র ব্যর্থ হলেন: ইতালীয়দের টালবাহানায় তিনি এত চটে গেলেন যে নিজের চেষ্টায় বেরিয়ে পড়াব জন্যে ভেতরে ভেতরে মতলব আঁটতে লাগলেন। ইতিমধ্যে ইতালীয়-দের কাছ থেকে খবর এসে গেল ওদিককার সব ব্যবস্থা পাকা। ওরলান্দো মাস্‌সোত্তা—এই নামে এক ছাড়পত্র নিয়ে সুভাষচন্দ্র ১৮ই মার্চ তারিখে রুশ সীমান্তের দিকে রওনা হলেন। ইউরোপ থেকে একদল লোক পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে। তারাও তাঁর সঙ্গে গেল। কাবুল থেকে—বোখারা এই নিষিদ্ধ পথের দুর্গমতা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা অনেক পরিব্রাজকের লেখাতেই পাওয়া যায়: হিন্দুকুশের উঁচু উঁচু গিরিপথ, তাশকুরগানের গিরিনালা, আফগান প্রান্তরশায়ী কত যে মৃত নগর, প্রাচীন পুণ্যতীর্থ মাজার-ই-শরীফ, জঙ্গলে ঘেরা বিষণ্ণ অস্থাস, পাটা কেসরের জঘন্য পারঘাট আর সেই আদ্যিকালের সমরখন্দের বুকে কলকারখানার বেপরোয়া অগ্রগতি। সুভাষচন্দ্র সারা পথ কোথাও না থেমে সটান মস্কোর ট্রেন ধরলেন এবং তারপর ১৯৪১-এর ২৮শে মার্চ বিমানপথে বার্লিনে গেলেন। রাশিয়ার কাছে প্রার্থনা জানবার কোন সুযোগই তিনি করে উঠতে পারলেন না; তা ছাড়া এখন আর তার কোন উপায়ও রইল না।

কাবুলে থাকার সময় সুভাষচন্দ্রকে একজন প্রশ্ন করেছিল যে, ভারতবর্ষে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক দলাদলি থাকতে দেশ কি ক'রে ঐক্যবদ্ধ হবে? উত্তরে তিনি বলেছিলেন:

> দেশে যতদিন তৃতীয় পক্ষ, অর্থাৎ বৃটিশ আছে, ততদিন দলাদলি যাবে না। বিভেদ দিন দিন বাড়বে। যদি কোন ডিক্টেটর বিশ বছর ধ'রে ভারতবর্ষকে কড়া শাসনে রাখতে পারে, একমাত্র তা হলেই এই বিভেদ ঘুচতে পারে। বৃটিশ রাজত্ব খতম হবার পর অন্তত বছর কয়েকের জন্যে ভারতবর্ষে ডিক্টেটরশিপ দরকার হবে।

> ও ছাড়া আর কোন রকম গঠনতন্ত্রে আমাদের দেশে কাজ এগোবে না। ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্যেই গোড়ায় একজন ডিক্টেটর দরকার। এই ধরনের দলাদলি একমাত্র ডিক্টেটর ছাড়া আর কেউ দূর করতে পারে না। ভারতবর্ষের রোগ একটা নয়। তার এত রকমের রাজনৈতিক ব্যাধি একমাত্র একজন নির্মম ডিক্টেটরই সারাতে পারে।···ভারতবর্ষে দরকার একজন কামাল পাশার।[২৪]

ভারতে কামাল পাশার ভূমিকায় কাকে তিনি কল্পনা করেছিলেন, তা ব'লে না দিলেও বোঝা যায়। সুভাষচন্দ্রের ধারণায়, ১৯৩৯-এর পর বিপ্লবী মনোভাব বহুগুণ বেড়ে গেছে। গান্ধী হলেন নিষ্ক্রিয় এবং নেহেরু হলেন গান্ধীর হাতধরা—তাই তারা কেউই সেই বিপ্লবী মনোভাবকে কাজে লাগাবেন না। সুভাষচন্দ্রের গ্রহস্থানে এখন রাহু এবং বৃটিশের গ্রহস্থানে কেতু। সুতরাং এই হল সময়। যারা পৃথিবীর নতুন মনিব হবে তারা যে আগের মনিবের মতই হবে না তাই বা কে বলতে পারে—সুতরাং ভারতবর্ষ তাদের দিয়ে আগে থেকে কড়ার করিয়ে নেবে। কিন্তু ভারতবর্ষ স্বাধীন নয় ব'লে তার সঙ্গে চুক্তি হতে পারে না। রাশিয়া সম্পর্কে নিরাশ হয়ে এবার তিনি অস্থায়ী জাতীয় সরকারের প্রবক্তা হিসেবে, বিপ্লবী ভারতের স্বয়ম্ভু প্রতিনিধি হিসেবে সে ভার নিজের হাতেই গ্রহণ করলেন।

২৪ হিন্দুস্থান টাইমস, ৮ই মার্চ, ১৯৪৬

৪

'জয় হিন্দ'

'ত্রিপক্ষীয় শক্তিবর্গের সাফাই গাওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়।...আমার দেশের মানুষের কাছে যখন বলি, তখন আমার পরিচয়পত্রের প্রয়োজন হয় না।' (মে ১৯৪২)

জার্মানরা তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবে, এ কথা সুভাষচন্দ্র ভাল ক'রেই জানতেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তারা ভারতবর্ষে বিপ্লব বাধাবার জন্যে দূর দূর মুলুকে ষড়যন্ত্রের জাল পেতেছিল—তাদের উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে বৃটিশ পল্টনকে দূরে সরিয়ে রাখা। ১৯৩৩ সালে হিটলারের কমিউনিষ্ট দলনের ফলে বার্লিনে ভারতীয়দের পুরনো প্রভাব একেবারেই ঘুচে গিয়েছিল ; ১৯১৪ সালে ভারতীয় বিপ্লবীদের যেসব সমিতিকে জার্মানরা কাজে লাগিয়েছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর দেখা গেল তার একটিও আর টিঁকে নেই। কিন্তু ১৯৪১-এর মার্চ মাসে সুভাষচন্দ্র যখন জার্মানিতে পৌছুলেন, তখন হিটলারকেও ভারতবর্ষ নিয়ে মাথা ঘামাতে হচ্ছিল। হিটলার তখন ঠিক করে ফেলেছে জুন মাসে রুশদেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং এই সময় তার সৈন্যবাহিনী লিবিয়া থেকে ইতালীয়দের উদ্ধার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই দুটো ব্যাপারের সঙ্গেই ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ জড়িয়ে ছিল ; কেননা একে তো ভারতীয় বাহিনী মধ্যপ্রাচ্যের সর্বত্র যুদ্ধ করাচ্ছে, তার ওপর সাম্রাজ্যের যুদ্ধঘাঁটি হিসেবে ভারতবর্ষের গুরুত্ব মাসের পর মাস বেড়েই চলেছিল ; রিবেনট্রপ যখন সুভাষন্দ্রকে স্বাগত জানালেন, তখন তাঁর মনে এইসব খেলছিল ; ভারতবর্ষে বিপ্লবের তরঙ্গ উত্তাল, সুভাষচন্দ্রের মুখ থেকে এই খবর শুনে রিবেনট্রপ খুব খুশী হলেন।

ভারতের গোপন বেতারকেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে তিনি বেতার মারফৎ বৃটিশবিরোধী প্রচার চালাবেন এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের ভেতর থেকে লোক নিয়ে 'আজাদ হিন্দ' ইউনিট গড়ে তুলবেন—গোড়ায় এই ছিল সুভাষচন্দ্রের মতলব। তিনি অক্ষশক্তির কাছ থেকে ভারতের স্বাধীনতাসংক্রান্ত এমন একটি ঘোষণা-পত্র চাইলেন, যার ওপর ভর ক'রে প্রচার চলবে এবং যা হবে ভবিষ্যতের রক্ষাকবচ।

১৯৪১ সালের জুন মাসে রোমে গিয়ে চিয়ানোর কাছেও তিনি এই একই দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু রিবেনট্রপ কিংবা চিয়ানো, দুজনের একজনও সে প্রস্তাব মেনে নিতে রাজী হয়নি। চিয়ানোর তখন হাত জোড়া; কেননা একদিকে আফগানিস্থানের প্রাক্তন রাজা আমানুল্লা এবং অন্যদিকে জেরুজালেমের গ্র্যাণ্ড মুফ্‌তি—একসঙ্গে এই দুজনকে তখন তাঁকে সামলাতে হচ্ছিল।[১] এ বিষয়ে জার্মানরা ছিল আরও স্পষ্টবক্তা:

> রিবেনট্রপের মতে, প্রচারের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সব কিছু সুভাষচন্দ্রের হাতে দিয়ে তাঁকে সাহায্য করতে হবে; কিন্তু তাহলেও তিনি মনে করেন ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত ক'রে অক্ষশক্তির পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে কোন ঘোষণা জারী করবার সময় এখনও আসেনি। পাছে এ বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে কোন কথা দিতে হয়, ফ্যুরার সেই ভয়েই সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করেননি। পক্ষান্তরে সুভাষচন্দ্রের যোগাযোগ রিবেনট্রপের সঙ্গে; বৃটিশবিরোধী কার্যকলাপের ব্যাপারে বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রেখে চলবেন।[২]

জার্মানদের এই মনোভাবের অন্যান্য নানা কারণের মধ্যে আরও একটা ব্যাপার ছিল; ১৯৪০ সালে জার্মানদের সঙ্গে রাশিয়ার যে গোপন আলোচনা হয়, তাতে ধ'রে নেওয়া হয় যে, বৃটেনের পতনের পর ভারতবর্ষ রাশিয়ার প্রভাবাধীন হবে।[৩] ১৯৪১-এর ২২শে জুনের আগে পর্যন্ত জার্মানি

১ চিয়ানোর ডায়েরী, ম্যালকম মাগারিজ সম্পাদিত, ৩৫৫ পৃঃ

২ চিয়ানোর কূটনৈতিক দলিলপত্র, মাগারিজ সম্পাদিত

৩ সার উইন্‌স্টন চার্চিল, 'দি সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার,' ২য় খণ্ড, ৫২০ পৃঃ

আর রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ না থাকায় জার্মানদের পক্ষে প্রকাশ্যে তার বিরোধী কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব ছিল না।

অক্ষশক্তি যে পর্যন্ত না ঘোষণা করছে, সে পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র বেতার প্রচারে নামতে রাজী নন। তবে যুদ্ধবন্দীদের মনের ভাবগতিকটা এই বেলা বুঝে নেওয়া দরকার; তৎক্ষণাৎ তিনি সেই কাজে লেগে পড়লেন। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে প্যারাস্যুটের সাহায্যে ছোট ছোট দল পাঠান হবে; তারা সেখান থেকে প্রচার করবে এবং সেখান থেকে খবরাখবর সংগ্রহ ক'রে পাঠাবে। যে মাসে জার্মানির ল্যাম্স্ডর্ফ-এর বন্দীশিবির এবং সাইরেনাইকার বড় বড় বন্দীশালা থেকে বাছাই করা বন্দীদের বার্লিনে আনা হল। তাদের ভেতর থেকে যে ভাবে সাড়া পাওয়া গেল, তাতে উৎসাহিত হয়ে সুভাষচন্দ্র চাইলেন উত্তর আফ্রিকার সমস্ত ভারতীয় বন্দীদের অবিলম্বে জার্মানিতে নিয়ে আসতে। তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর হল। ইতিমধ্যে যে সব বন্দী এসে গিয়েছিল তাদের সবাইকে ড্রেসডেনের কাছে অ্যানবুর্গ ক্যাম্পে এক জায়গায় রাখা হল এবং ঠিক হল পরে যারা আসবে তাদেরও সেখানে পাঠানো হবে।

রাশিয়া আক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্যারাস্যুটে লোক নামাবার ষড়যন্ত্রটা ভিন্ন মূর্তিতে দেখা দিল। মাপকাঠিটা হঠাৎ বড় হয়ে উঠল। ভারতবর্ষকে একাধারে নিকট এবং দূর ব'লে মনে হতে লাগল; কারণ, যুদ্ধের সম্ভাবনা ও পরিণাম বহুগুণ বড় হয়ে তখন চোখের সামনে ধরা দিচ্ছে। জার্মানরা মনে করছে কেল্লা ফতে। সুভাষচন্দ্র সেই আসন্ন দিনের কথা ভেবে মনে মনে তৈরী হচ্ছেন, যেদিন ঝড়ের বেগে জার্মানদের বিজয়ী বাহিনী তাঁকে ভারতের সীমান্তে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দেবে। তিনি প্রস্তাব করলেন তিনটি পদাতিক ব্যাটালিয়ন নিয়ে একটি ভারতীয় স্বেচ্ছাবাহিনী এবং জার্মান পঞ্চম বাহিনী সংগঠনের অধীনে ভারতীয়দের একটি অনিয়মিত যোদ্ধাবাহিনী গঠন করা হোক। জার্মান বাহিনী যখন স্টালিনগ্রাড ছাড়িয়ে মধ্য এসিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে, তখন তাদের অগ্রবাহিনীর সঙ্গে থাকবে তাদের তালিম-দেওয়া তাজ্কিক ও উজবেক ইউনিট। উজবেকিস্তান ও আফগানিস্থানে পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় স্বেচ্ছাবাহিনী জার্মান বাহিনীকে পেছনে ফেলে লাফ দিয়ে এগিয়ে যাবে এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে বৃটিশ-ভারতীয় রক্ষাব্যূহ ভেঙ্গে তছনছ

ক'রে দেবে। জার্মানদের সঙ্গে ভারতীয় স্বেচ্ছাবাহিনী থাকার ফলে ভারতের সৈন্যবাহিনীর মনোবল এবং সেই সঙ্গে গোটা রক্ষাব্যবস্থা হুড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়তে পারে।

এরপর সুভাষচন্দ্র তাঁর স্বেচ্ছাবাহিনী নিয়ে ভারতবর্ষের ভেতরে ঢুকবেন এবং ভাবতের সৈন্যবাহিনী পুরনো মনিবদের ছেড়ে ঘুরে দাঁড়াবে। আস্তে আস্তে তাঁর ফৌজকে ভিত্তি ক'রে গ'ড়ে উঠবে স্বাধীন ভারতের ক্রমবর্ধমান বলে বলীয়ান সেনাবাহিনী। ভারতবর্ষের নাম ক'রে তিনি যেমন ভূমির দখল নেবেন, কংগ্রেসরাজ প্রতিষ্ঠিত করবেন—সেই সঙ্গে আবার ঐ ফৌজ থেকেই সরকারী কর্মকর্তা ও প্রশাসন বিভাগের লোকজন নেওয়া হবে।

সেপ্টেম্বরে অ্যানাবুর্গ শিবরে সৈন্যসংগ্রহের জন্যে একদল ভারতীয়কে পাঠানো হল। বৃটিশ অফিসার এবং অন্য যারা সেপাইদের বাজভক্ত রাখার জন্যে প্রভাব খাটাচ্ছিল, তাদের সবাইকে অন্যত্র সবিয়ে দিয়েও দেখা গেল সৈন্যসংগ্রহের কাজ তেমন দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে না। ডিসেম্বরে সুভাষচন্দ্র নিজে গেলেন। তখনও সেখানে বিরোধিতার ভাব রীতিমতভাবে রয়েছে। সুভাষচন্দ্র বক্তৃতা দিতে গিয়ে বাব বার বাধা পেলেন, তাঁর অনেক কথাই লোকের কানে গেল না। তবে ব্যক্তিগত ভাবে মেলামেশা ক'বে সাড়া পাওয়া গেল। প্রশ্ন শুনে বোঝা গেল তাদের আগ্রহ আছে—কার কী পদমর্যাদা হবে? ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে যারা পুবনো লোক, তাদের কা রকম কী সুবিধে দেওয়া হবে? জার্মান সৈন্যদের তুলনায় স্বেচ্ছাবাহিনীর সেপাইদের অবস্থা কেমন দাঁড়াবে? সুভাষচন্দ্র দরাদরির ভেতর যেতে চাইলেন না এবং বেশ কিছু প্রভাবশালী লোককে তিনি হাঁকিয়ে দিলেন। অন্যদিকে সেপাইদের অনেকেই দেশবরেণ্য নেতা হিসেবে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাল এবং অনেকেই মুখে বলল ফৌজে বিনাশর্তে যোগ দিতে তারা রাজী; শিবিরের জনমত বিরুদ্ধে ব'লে এবং এন-সি-ও'দের চাপে প'ড়ে কেউ কেউ ইচ্ছে থাকলেও মুখ ফুটে বলতে পারল না। সুভাষচন্দ্র তাঁর অনুগামীদের বললেন, 'এন-সি-ও'দের আগে এখান থেকে বিদায় করো, তারপর এর মধ্যে যারা স্বেচ্ছায় যোগ দিয়েছে তাদের দিয়ে আবার নতুন ক'রে লোকজনদের পাকড়াও। নতুন কায়দায় ফল

হল। যথেষ্ট লোক এল ফৌজে নাম লেখাতে; তাদের নিয়ে ১৯৪২-এর জানুয়ারীতে দু দুটো ইউনিট গড়ে উঠল।

গোড়ায় সুভাষচন্দ্র মাত্র একজন সেক্রেটারি নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। সেক্রেটারি ছিলেন তাঁর পুরনো বান্ধবী কুমারী শেঙ্ক্‌ল্; তিনি ১৯৩৪ সালে 'দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগ্‌ল্' বইটি লেখার ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রকে সাহায্য করেছিলেন। ১৯৪২-এর জানুয়ারী মাসের ভেতর সুভাষচন্দ্র তাঁর চারপাশে সহকারী হিসেবে জন পঁচিশেক ভারতীয় কর্মী পেয়ে গেলেন। সুভাষচন্দ্রের কাছে ঘেঁষতে দেবার আগে জার্মান পররাষ্ট্র বিভাগ থেকে তাদের জনে জনে ভাল ক'রে ছেঁকে নেওয়া হয়েছিল। এরা এসে যাবার পর সুভাষচন্দ্র 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেন্‌ডেন্স লীগ' বা 'আজাদ হিন্দ কেন্দ্র' নাম দিয়ে একটি অফিস খাড়া করলেন। এই অফিসে সবাইকে তিনি কাজে লাগালেন। একদলের কাজ হল বেতার প্রচারের প্রোগ্রাম তৈরী করা; ১৯৪১-এর ডিসেম্বরে এই গোপন 'আজাদ হিন্দ বেতার' কেন্দ্র চালু হয়। অন্যদের নিয়ে একটি পরিকল্পনা কমিটি তৈরী হল; তাদের কাজ হল স্বাধীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানো।

সুভাষচন্দ্রের কাছে কাজ ক'রে সুখ ছিল। তিনি যে ভাবে সমালোচনা করতেন, তাতে কাজে উৎসাহ হত। প্রত্যেকের কাজকর্ম সম্বন্ধে ব্যক্তিগত ভাবে তিনি নজর দিতেন এবং তাঁর কাছ থেকে নিত্যনতুন চিন্তার খোরাক পাওয়া যেত। তারও পর তিনি ছিলেন খুব দিলদরাজ; কর্মীদের মধ্যে কেউ ব্যক্তিগত সমস্যায় পড়লে তাঁর কাছ থেকে সহানুভূতির অভাব হত না। তাঁর একাগ্রতা দেখে সকলেই অবাক হত। তাঁর কর্মীদের একজন বলেছিলেন, একটা বিশেষ সমস্যা নিয়ে তিনি এমন মেতে উঠতেন যে, তখন তাঁর কাছে কোন রকম অনুমান জাতীয় বিষয় তুলে ধরতে সঙ্কোচ লাগত।[৪] উপস্থিত কাজের সঙ্গে যে জিনিসের প্রত্যক্ষ যোগ নেই, সে জিনিস তিনি আদৌ আমল দিতেন না ব'লে মনে হয়। মানুষকেও তিনি এইভাবেই বিচার করতেন; ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কার দাম কতটুকু তার ভিত্তিতেই গ্রহণ-বর্জনের নীতি ঠিক হত। বড় বড় স্বদেশী নেতাদের নামের বেলায়ও এই সরল বিচারই ছিল প্রশস্ত: 'উনি কি

৪ গিরিজা মুখোপাধ্যায়, 'দিস্ ইউরোপ'

ইতিহাসে অমর হবেন ?'—এই ছিল সব সময় বিচারের মানদণ্ড। সুভাষচন্দ্র দাঁতে দাঁত দিয়ে অক্লান্তভাবে কাজ করতেন; কর্মীদেরও তিনি নাকে দড়ি দিয়ে খাটাতেন এবং তাদের কেউ কেউ তাঁকে প্রচণ্ড ভয় পেত।

সুভাষচন্দ্র জার্মানিতে আছেন, সেকথা তখনও সরকারীভাবে স্বীকৃত হয়নি। তখনও তাঁকে সিনর ওর্লাণ্ডো মাস্‌সোত্তা ব'লে উল্লেখ করা হত—জার্মানরা বলত মহামান্য মাস্‌সোত্তা। তাহলেও ১৯৪২-এর গোড়া থেকে বার্লিনে ক্রমেই বেশী বেশী লোক তাঁর পরিচয় জানতে আরম্ভ করল। বিভিন্ন পার্টি ও অনুষ্ঠানে প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায় তাঁকে দেখে উল্লাস প্রকাশ করত এবং 'জয় হিন্দ' ধ্বনির সূত্রপাত এখান থেকেই। তারা দ্বিধাহীনভাবে সাড়া দিল এবং আনুগত্য জানাতে একটুও দেরি করল না—এই ঘটনা সুভাষচন্দ্রের মনে গভীরভাবে নাড়া দিল। তরুণদের মধ্যে একদল তাঁর ফৌজে স্বেচ্ছায় যোগ দিতে চাইল; তাদের কাছে তিনি বললেন তাঁর বহুদিনের সাধ ছিল একটি স্বাধীন ভারতের ফৌজ গড়ে তোলা—এতদিনে তাঁর সে সাধ পূর্ণ হওয়ায় তিনি গর্বিত। তারপর তিনি আবেগের সঙ্গে তাদের প্রত্যেককে একটি ক'রে ফুল উপহার দিলেন, এই নির্বাসনে এর বেশী কিছু দেবার তাঁর সঙ্গতি নেই। এবার থেকে তাদের সকলেব কাছে তিনি হলেন 'নেতাজী', শ্রদ্ধেয় নেতা—এরপর এই নাম একান্তভাবেই তাঁর স্বকীয় হয়ে গেল।

ওদিকে তখন জাপানীদের জয়ের পালা পড়েছে। প্রাচ্যে হু হু ক'রে এগিয়ে চলেছে জাপান। রাশিয়ায় আর উত্তর আফ্রিকায় জার্মানদের যুদ্ধজয় সুভাষচন্দ্রের কাছে এখন অবান্তর। ভারতে বৃটিশের প্রভুত্ব বজায়ের চাবিকাঠি—সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন, কলকাতা—একে একে বেহাত হচ্ছে। বক্তৃতা দিতে গেলেই সিঙ্গাপুরের পতনের কথা তিনি না ব'লে পারছেন না। এর অল্প পরেই 'গুপ্ত' বেতারকেন্দ্র থেকে তিনি প্রথম বক্তৃতা দিলেন; 'কোথাকার জল কোথায় গড়ায় দেখার জন্যে এতদিন আমি নিঃশব্দে ধৈর্য ধ'রে প্রতীক্ষা করেছি; দিন এসে যাওয়ায় এবার আমি সামনে এসে বলতে পাবছি।' বৃটিশ সাম্রাজ্য যে ধ্বসে পড়ছে এটাই তার সন্দেহাতীত প্রমাণ: ভারতবর্ষ আনন্দে আটখানা হোক। বৃটেন হল চিরকালের শত্রু, দু'চারজন ভারতবাসী তাদের সহায় হবে, তবে অধিকাংশ ভারতবাসীই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবে:

এই সংগ্রামে, এবং এরপর দেশ-পুনর্গঠনের সময়ে আমরা তাদের সকলের সঙ্গেই মনেপ্রাণে সহযোগিতা করব যারা আমাদের সাধারণ শত্রুকে ঘায়েল করতে সাহায্য করেছে।[৫]

এরপর তিনি 'ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা' করলেন—শুনে গোয়েবেল্‌স্ উৎসাহিত হল, যদিও 'ভারতের জনগণকে বিদ্রোহের জন্যে উস্কে দেবার উপযুক্ত সময় আমাদের দিক থেকে এখনও আসেনি।'[৬]

ঘোষণার খবর শুনে জাপানীরাও লাফিয়ে উঠল।

১৩ই মার্চ সুভাষচন্দ্র ভারতীয় জনগণকে উদ্দেশ ক'রে যে দ্বিতীয় ঘোষণাপত্র জারী করলেন, তাতে ভারতে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্-এর মিশনের উল্লেখ ছিল। পরে তার বিরুদ্ধে আরও বিস্তৃতভাবে আক্রমণ করা হল। এই মিশনের কোন মানেই হয় না। স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের মত একজন নামকরা সাম্রাজ্যবাদবিদ্বেষী উদারনৈতিক মানুষের পক্ষে এহেন জঘন্য কাজের ভার নেওয়া কি ক'রে সম্ভব হ'ল? এতে ভারতবর্ষের অপমান; বৃটিশ বরং তেজোর সেই নীতি গ্রহণ করুক—ভারতবর্ষ ভারতবাসীকে দিয়ে ছেড়ে চলে যাওয়ার যে নীতি দু'বার ঘোষণা করা হয়েছে। ক্রিপ্‌স্ মিশনের বিরুদ্ধে টোকিও বেডিও থেকে একই ধরনের অভিযান চালাচ্ছিলেন রাসবিহারী বসু। তাঁরা দুজনেই বললেন যে, তাঁদের বেতারপ্রচারের ফলেই ৯ই এপ্রিল মিশনের ব্যর্থতা ঘটে; তাঁদের মুরুব্বিরাও সেই কথা বলল। তাঁদের প্রচার ভারতের জাতীয়তাবাদীদের মনে যে খুব বেশী আঁচড় কাটতে পেরেছিল, সত্যিই তা বিশ্বাস হয় না; তবে টোকিও আর বার্লিনে এ বিষয়ে লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না।

এর অব্যবহিত পরেই ভারতবর্ষ সম্পর্কে ত্রিপক্ষীয় ঘোষণা দাবি ক'রে জাপানীদের প্রস্তাব এল এবং তারা সুভাষচন্দ্রকে আমন্ত্রণ জানাল। এতদিনে সত্যিকার নির্ভরযোগ্য দোসর পাওয়া গেল। অক্ষশক্তির একনায়কদের বোঝাবার জন্যে সুভাষচন্দ্র এবার আদাজল খেয়ে লাগলেন। ২৯শে এপ্রিল ওবেরসাল্‌জ্‌বুর্গে মিলিত হয়ে হিটলার আর মুসোলিনি জাপানীদের প্রস্তাব

৫ ১৯৪২-এর ২৮শে ফেব্রুয়ারীর বেতারবক্তৃতা

৬ 'গোয়েবেল্‌স্ ডায়েরী' (২রা মার্চ, ১৯৪২), লোচনের সম্পাদিত, ৬৮ পৃঃ

বিচার বিবেচনা ক'রে দেখল। তারপর জানিয়ে দিল: না, এখনও সময় আসেনি। সুভাষচন্দ্র তখন রোমে, মুসোলিনির সঙ্গে তাঁকে দেখা করতে বলা হল। চিয়ানোকে তিনি বললেন, এর ফলে জাপানীদের ফাঁদেই পা দেওয়া হচ্ছে: জাপানীরা নিজেদেব মতলবমত চলবে এবং দেখবে যে একমাত্র তারাই ভারতবর্ষেব মুক্তিদাতা। চিয়ানো কথাটা উড়িয়ে দিলেন, তবে ৫ই মে সুভাষচন্দ্রকে তিনি ডুচের কাছে নিয়ে গেলেন। তাঁর ডায়েরীতে তার বিবরণ আছে:

> ভারতবর্ষেব স্বাধীনতার স্বপক্ষে ত্রিপক্ষীয় ঘোষণা জারীব ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র ঝুলোঝুলি করায় মুসোলিনি শেষ পর্যন্ত তাঁব যুক্তি মেনে নিলেন। সাল্‌জ্‌বুর্গের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য ক'বে জার্মানদের কাছে তিনি তারযোগে প্রস্তাব পাঠালেন যেন অবিলম্বে ঘোষণা জারী কববার ব্যবস্থা হয়।[৭]

মুসোলিনি তার নতুন প্রস্তাব মানিয়ে নেবার জন্যে জার্মানদেব জানাল যে, সুভাষচন্দ্রকে সে 'পাল্টা সরকার' গড়তে এবং আরেকটু বিশেষ ভাবে সকলের নজরে পড়তে বলেছে। গোয়েবেল্‌স্‌-এর ১১ই মে-র রোজনামচায় এ সম্বন্ধে জার্মানদেব মনোভাবের কথা লেখা আছে:

> ও ধরনের রাজনৈতিক চাল চালবার উপযুক্ত সময় এখন এসেছে ব'লে আমরা মনে করি না; তাই ব্যাপারটা আমাদেব তেমন পছন্দ হচ্ছে না। অবশ্য দেখে মনে হচ্ছে জাপানীরা ঐ ধরনের কিছু করতে খুবই ব্যগ্র। যাই হোক্‌, প্রবাসী সরকারের পক্ষে বেশীদিন শূন্যে ঝুলে থাকা ভাল নয়। যতক্ষণ পযন্ত তারা পায়ের নিচে কিছুটা মাটি না পাচ্ছে, ততদিন তারা শুধু তত্ত্বের রাজ্যেই থেকে যাবে।[৮]

হিটলারেরও ছিল এই মত। সুভাষচন্দ্র সে মত পাল্টাতে পারলেন না।

৭ চিয়ানোর ডায়েরী ৪৬৫ পৃঃ

৮ গোয়েবেলস্‌-এর ডায়রী ১৫৭ পৃঃ

২৯শে মে ফ্যুরারের লড়াইয়ের প্রধান ঘাঁটিতে সাক্ষাৎকার উপলক্ষে তিনি হিটলারকে বললেন যে, দেশে তাঁর যে রকম মানসম্মান এবং দেশের সঙ্গে তাঁর যে রকম যোগাযোগ তাতে বাইরে থেকে প্রচারের জোরে তিনি ভারতবর্ষে অভ্যুত্থান ঘটাতে পারেন। ভারতবর্ষে আগে কখনই বিদ্রোহ এতটা আসন্ন হয়নি—এখন শুধু একটু ধাক্কা লাগাতে পারলেই বিদ্রোহ শুরু হয়ে যাবে। হিটলার তার জবাবে বলল লক্ষ লক্ষ নিরস্ত্র বিপ্লবীকে হাজার কয়েক অস্ত্রসজ্জিত সৈন্যের একটি বাহিনী দিয়েই ঢিট করা যায়; বিদেশী কোন শক্তি দ্বারদেশে গিয়ে ঘা না দিলে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। জার্মানি এখুনি কিছু করতে পারছে না; জাপানেরও দম ফুরিয়ে আসছে। রাশিয়ার কোন্ জায়গায় জার্মানরা রয়েছে এবং ভারতবর্ষই বা কোথায়—দেয়ালে টাঙানো ম্যাপের কাছে সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে গিয়ে হিটলার সব দেখাল। দূরত্ব এখনও বিশাল। হিটলার বলল এ অবস্থায় ভারতবর্ষ সম্পর্কে কোন কিছু ঘোষণা করা মূঢ়তা হবে; দুনিয়াশুদ্ধ লোক মনে করবে এমন কি হিটলারের পক্ষেও সাত তাড়াতাড়ি ওধরনের ঘোষণা শোভা পায় না। বরং হিটলার এখন মিশরের স্বাধীনতা ঘোষণার জন্যে চটপট তৈরী হবে, কেননা সে ঘোষণা রোমেল কাযকরী করবার ক্ষমতা রাখে। ভারতবর্ষ সম্পর্কে কোন কিছু হেঁকে বলবার অবস্থা আসতে এখনও অনেক দেরি।

যদিও জার্মানিতে সুভাষচন্দ্রের উপস্থিতি এবং হিটলারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের খবর এবার রাষ্ট্র ক'রে দেওয়া হল, তাহলেও সুভাষচন্দ্র ইউরোপের ওপর আর ভরসা রাখতে পারছিলেন না। ত্রিপক্ষীয় ঘোষণা হলে তিনি গ্যাঁট হয়ে বসতে পারতেন: ঘোষণার অভাবে তাঁর ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে এটা তিনি বুঝলেন। যদিও তিনি রোম আর প্যারিসে আজাদ হিন্দ কেন্দ্রের পত্তন করেছেন, উত্তর আফ্রিকায় সদ্য বন্দী হওয়া সেপাইদের কুড়িয়ে বাড়িয়ে যদিও এখন তাঁর ফৌজে সৈন্যসংখ্যা হয়েছে পুরো তিন হাজার—তাহলেও জার্মানরা যুদ্ধে জিতলে এ সাফল্য হবে একেবারেই অকিঞ্চিৎকর। হয়ত তখন পেছনের কথা তাঁর একবার মনে পড়েছিল ভারতবর্ষ ছেড়ে এসে তবে কি তিনি ভুল করেছেন? স্বদেশে যে সংগ্রাম চূড়ান্ত আকার ধারণ করতে চলেছে, দেশে থাকলে তিনি তাতে

অংশ নিতে পারতেন। এখানে তিনি পরমুখাপেক্ষী, নিজের কোন ক্ষমতা নেই, তাঁকে চোখে চোখে রাখা হয়েছে, তিনি সন্দেহের পাত্র। কিন্তু এখন ফিরে যাবারও আর উপায় নেই। দূর প্রাচ্যে ভারতীয়দের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে তিনি রাজী হয়ে গেলেন। হয়ত সেখানে গেলে কিছুটা সুরাহা হতে পারে, জাপানীদের অধীনে তিনি ত্রিশ লক্ষ ভারতীয়কে তাঁর হাতে পাবেন—তারা ইতিমধ্যেই খানিকটা সংগঠিত। ব্যাঙ্কক সম্মেলনে তিনি জোরালো একটি বাণী পাঠালেন, সম্মেলনে সকলের মুখে মুখে ফিরছিল তাঁর নাম। তিনি সেই বাণীতে বললেন যে, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন অখণ্ড· 'পৃথিবীর যেখানে যত ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আছে, তাদের সবাইকে নিয়ে এখন একটি মিলিত সংগঠন গড়বার সময় এসেছে।'[১] সম্পূর্ণভাবে পরের ওপর নির্ভর ক'রে ভারতীয়দের ব'সে থাকা চলবে না, নিজেদের চেষ্টাতেই স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে।

সুভাষচন্দ্র অবশ্য তখন তখনি প্রাচ্যে গিয়ে পৌঁছতে পারলেন না, তাকে আরও এক বছর অপেক্ষা করতে হল। তখনও ইউরোপে তার করবার অনেক কিছু ছিল, কাজেই এ সময় একটুও ঢিলে দেওয়া যায় না। যুদ্ধপরিস্থিতি ও প্রাচ্যে রাজনীতির পট পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে পুরোদমে প্রচার অভিযান চলতে লাগল। সুভাষচন্দ্র বলতেন ভারতে কী ঘটছে না ঘটছে সে সম্বন্ধে ভারত সরকার যতটুকু খবর প্রকাশ করে, তিনি তার চেয়ে ঢের বেশী খবর রাখেন, সুভাষচন্দ্র তাঁর বেতার বক্তৃতায় এমনভাবে সাঙ্কেতিক নির্দেশ জুড়ে দিতেন, যাতে মনে হয় ভারতের ব্যাপক অংশ জুড়ে তাঁর দলের লোকেরা ছড়িয়ে আছে। প্যারাসুটের সাহায্যে লোক নামাবার স্থানকালের বিশদ বর্ণনা দিয়ে তিনি ভারতীয় কৃষকদের বলতেন তারা যেন ঐসব লোকদের সাহায্য করে। ভারতীয় পুলিশ ও ভারতীয় সেপাইদের তিনি এই ব'লে শাসাতেন যে, তারা যদি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত না নেয়—তাহলে বৃটিশকে সমর্থন করবার অপরাধে স্বাধীন ভারতে একদিন তাদের সরকারী কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। ১৯৪২-এর আগস্ট হাঙ্গামার সময় বিপ্লব আসন্ন ভেবে উত্তেজনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি আরও দুটি 'বেতার কেন্দ্র' খুললেন—একটি 'কংগ্রেস

১ 'ব্যাঙ্কক টাইম্‌স্‌,' জুন, ১৯৪২

রেডিও' ও আরেকটি 'আজাদ মুসলিম রেডিও'। আবেগপূর্ণ কণ্ঠে তিনি দেশের মানুষকে অবিচলিতভাবে লড়াই চালিয়ে যেতে বললেন। পৃথিবীর জনমত আজ তাদের দিকে, বিদেশ থেকে যেটুকু সাহায্য দরকার তা চাইলেই পাওয়া যাবে: এই সাহায্য আদায় করতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। বার বার তাঁকে নিজের অধিকার দাবি করতে হল: 'আমার সারা জীবন গেছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটানা দীর্ঘ আপোষহীন লড়াই ক'রে— এই সংগ্রামী জীবনই হল আমার বিশ্বস্ততার গ্যারান্টি।' অক্ষশক্তির সাফাই গাওয়া তাঁর উদ্দেশ্য নয়; ভারত এবং ভারতের স্বাধীনতা নিয়েই তাঁর মাথাব্যথা: কাজ মিটে গেলেই তিনি দেশে ফিরবেন।[১০]

গান্ধীজীর স্বরের সঙ্গে এসব বেতার বক্তৃতার স্বরের মিল ছিল কম; বরং সুভাষচন্দ্রের নিজস্ব চরমপন্থার সঙ্গেই এই স্বরের মিল বেশী ছিল। কিন্তু ১৯৪২-এর আগস্টের হিংসাত্মক ঘটনাবলীর পর সুভাষচন্দ্রের যেন মনে হতে লাগল নীতির দিক দিয়ে তাঁর আর মহাত্মার মধ্যে কোন অমিল নেই; কেননা সুভাষচন্দ্রের ধারণা এই হিংসাত্মক ঘটনাবলীর পেছনে স্পষ্টতই গান্ধীর উৎসাহ ছিল। যাই হোক, তিনি ভেবে দেখলেন গান্ধীকে আক্রমণ ক'রে লাভ নেই; এখন তিনি জেলখানায় বন্দী, সুতরাং তার পক্ষে উত্তর দেওয়াও সম্ভব নয়। সুভাষচন্দ্র দেখলেন ভারতবর্ষে যদি ব্যাপকভাবে লোককে টানতে হয়, তাহলে তাকে এমনভাবে কথা বলতে হবে যা শুনে মনে হবে গান্ধী হলেও ঐ কথাই বলতেন…অবশ্য মনগড়া, নয়া সহিংস গান্ধী।

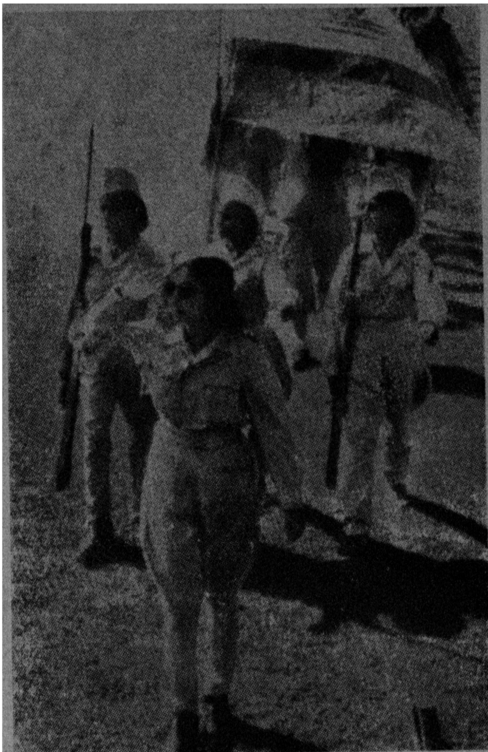
ইতিমধ্যে সামরিক দুটি প্রচেষ্টাই শক্তিসঞ্চয় করেছে। তার আগে আরেকটি ভারতীয় ইউনিটের কথা ব'লে নেওয়া দরকার; ইতালীয়দের অধীনে এই ইউনিট গড়ে ওঠে; সুভাষচন্দ্র ক্রমাগত চেষ্টা ক'রেও ইউনিটটিকে নিজের দখলে আনতে পারেননি। ভারতীয় মুসলিম ইকবাল শেদাই-এর উদ্যোগে এই ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়; ১৯৪১ সালে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তার বারকয়েক বৈঠক হয়েছিল, তাতে তিনি দেখলেন সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাঁর কোন সুবিধে নেই। সুতরাং তিনি জনকয়েক ভারতীয়

১০ দ্রষ্টব্য 'ফোল্কিশের চিত্তবাখ্তার' ১৪ই মে, ১৬ই আগস্ট, ৮ই অক্টোবর, ১৯৪২; ৭ই জানুয়ারী, ৪ঠা মার্চ, ১৯৪৩; 'ফ্রাঙ্কফুর্টের জেইটুং', ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৪২

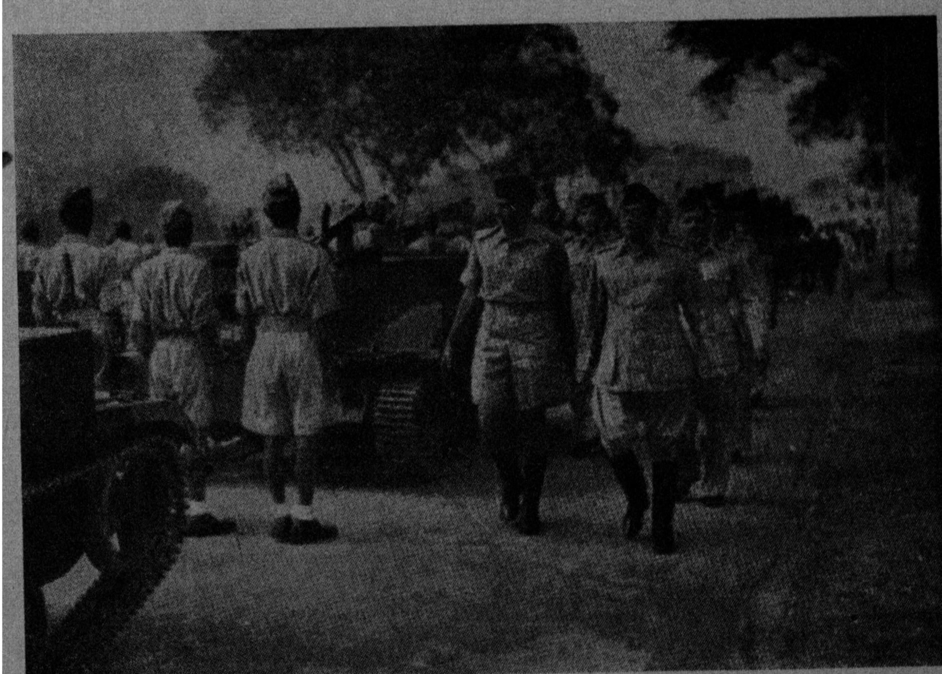
সৈনিকের সাহায্যে রোম থেকে বেতারে প্রচার সুরু ক'রে দিলেন। এর পরের ধাপ হিসেবে শেদাই একটি সামরিক ইউনিট গঠন করলেন ; সমস্ত ভারতীয় বন্দী জার্মানিতে যাবে, এই মর্মে ইতালি ও জার্মানির মধ্যে চুক্তি থাকা সত্ত্বেও এ কাণ্ড করা হল।

'সেন্ত্রো মিলিতেয়ার ইণ্ডিয়া' নামধেয় এই ইউনিটটি খুব অল্পদিনই বেঁচে ছিল—১৯৪২-এর এপ্রিল থেকে নভেম্বর ; বিদ্রোহ করার ফলে এই বাহিনী ভেঙ্গে দেওয়া হয়। একদিকে ইতালির যুদ্ধবন্দীদের অস্থায়ী শিবিরে এবং অন্যদিকে এল্ অ্যালামিন থেকে পশ্চাদপসরণের সময় ধরা পড়া ভারতীয়দের দিয়ে সদ্য ভর্তি করা উত্তর আফ্রিকার বড় বড় বন্দীশালা—এই দুই জায়গা থেকে লোক জুটিয়ে শেদাই তাঁর বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। উত্তর আফ্রিকায় তাঁর প্রচার বিশেষভাবে লোকের মনে ধরেছিল : সেখান থেকে কয়েকশ' স্বেচ্ছাসৈনিককে তিনি ইতালির বন্দীনিবাসে চালান করার ব্যবস্থা করলেন যাতে সেখানে গিয়ে আবার তাদের কানে মন্ত্র দেওয়া যায়। নভেম্বরে ইউনিটে সৈন্যসংখ্যা হল ৩৫০ ; ইতালীয় অফিসারদের অধীনে তাদের যুদ্ধ-বিদ্যায় পারদর্শী করার কাজ অনেকখানি এগোল। এমন সময় খবর রটে গেল যে, তাদের নাকি লিবিয়ায় যুদ্ধ করতে পাঠানো হচ্ছে ; অর্থাৎ শেদাই তাদের যে কথা দিয়েছিলেন, সে কথার খেলাপ করা হচ্ছে। উত্তর আফ্রিকায় মিত্রপক্ষের অবতরণের পরের দিন ৯ই নভেম্বর স্পষ্টই বোঝা গেল রণক্ষেত্রের দিকে এবার তাদের যাত্রা আসন্ন। সেপাইরা কুচকাওয়াজ করতে অস্বীকার করল এবং শেদাই এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে নারাজ হলেন। ১৫ই নভেম্বর সেন্ত্রো মিলিতেয়ার ইণ্ডিয়া ভেঙে দেওয়া হল ; পরে আর তা নতুন ক'রে জীইয়ে তোলা হয়নি।

শেদাই যে কাণ্ডকারখানা চালাচ্ছিল তাতে এই অনর্থই যে ঘটবে, সুভাষচন্দ্র আগেই তা আন্দাজ করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র এও ভাবতে পারতেন যে, বৃটিশের গোলামি করা যার অভ্যেস তাকে দিয়ে এর চেয়ে আর বেশী কী হবে ? তবে আজাদ হিন্দ ফৌজ তাকে বাদ দিয়েই চলতে পারে, কেননা রাশিয়ার অগ্রগতির বেগ কমে যাওয়ায় যদিও অনিয়মিত সৈন্যদল সম্পর্কে জার্মানদের আর সে আগ্রহ নেই, তাহলেও ভারতীয় ফৌজ অচিরে জার্মান বাহিনীর স্বীকৃত রেজিমেণ্ট হিসেবে গণ্য হতে চলেছে।



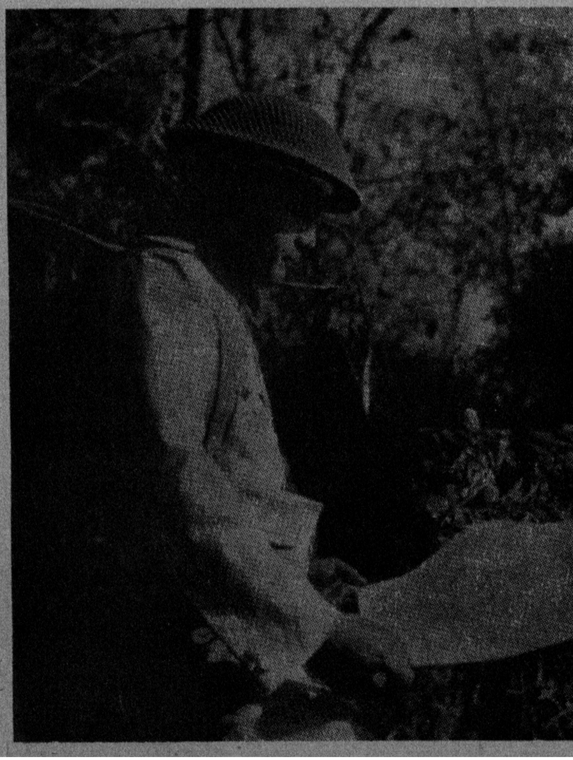
ঝাঁসীর রাণী বাহিনীর প্যারেডে
কুমারী স্বামীনাথন



এ. এফ. ভি. ব্যাটালিয়ান পরিদর্শনরত সুভাষচন্দ্র
সিঙ্গাপুর, ১৯৪৩



আজাদ হিন্দ ঘোষণাপত্র পাঠ,
২১শে অক্টোবর, ১৯৪৩



সর্বোচ্চ সেনাধিনায়ক

✓ এন. জি. স্বামী ও আবিদ হোসেন নামে যে দুজন বেসামরিক ভারতীয়কে সুভাষচন্দ্র ১৯৪১ সালে অ্যানাবুর্গ শিবিরে সৈন্যসংগ্রহের জন্যে পাঠিয়েছিলেন, তারা নিজেরাই ছিল যথাক্রমে ব্র্যাণ্ডেনবুর্গের অন্তর্গত মেসেরিৎস্-এর অনিয়মিত সৈন্যদল এবং স্যাক্সনির অন্তর্গত ফ্র্যাঙ্কেনবুর্গের ফৌজের আদি সদস্য। অনিয়মিত সৈন্যদলের পরিচালনাভার পড়েছিল হাউপ্ট্ম্যান হারাবিগ্-এর ওপর। ১৯৪২-এর জানুয়ারী মাসে স্বামী এবং হারাবিগ্ একদল স্বেচ্ছাসৈনিক নিয়ে মেসেরিৎস্-এ গেল এবং হাসান তার দলবল নিয়ে গেল ফ্র্যাঙ্কেনবুর্গে। দু'জায়গায় এরপর একই কায়দায় সৈন্য সংগ্রহ করা হয়। অ্যানাবুর্গে প্রত্যেক ইউনিটের জন্যে সম্ভাব্য রংরুটদের নামের একটি ক'রে আলাদা তালিকা তৈরী করা হয়েছিল। তারপর তাদের ছোট ছোট দলে ভাগ ক'রে ডেকে নিয়ে যাওয়া হল এবং তোয়াজে রেখে ও পুরনো স্বেচ্ছাসৈনিকদের নজির দেখিয়ে তাদের সৈন্যদলে নাম লেখাবার জন্যে প্রলুব্ধ করা হতে লাগল। এমন কোন নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই যাতে বলা যায় যে, তাদের ওপর জোর খাটানো হয়েছিল; বন্দীদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত যাদের কিছুতেই টলানো যায়নি, তাদের শুধু অন্য কোন যুদ্ধবন্দীশিবিরে চালান ক'রে দেওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে আবার, বেইমানির কাজ করলে এবং বিরোধী প্রচার চালালে স্বেচ্ছা-সৈনিকদের হাতেই কঠোর শাস্তি পেতে হত। যেসব সাহসী সেপাই তাদের বন্ধুবান্ধবদের বুঝিয়ে ফিরিয়ে আনবে ব'লে ফৌজে যোগ দিয়েছিল, তাদের অনেককেই সেদিক থেকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা পেতে হল।

লেররেজিমেণ্ট ব্র্যাণ্ডেনবুর্গ-এর একটি অংশ জার্মান পঞ্চম বাহিনী শিক্ষানবিশ ইউনিটের ঘাঁটি তখন মেসেরিৎস্-এ। ভারতীয়রা এসে দেখল তাজিক, উজবেক ও ইরাণীরাও সেখানে তাদের মত একই উদ্দেশ্যে যুদ্ধের ছলাকলা আয়ত্ত করছে। হারাবিগ প্রথমেই চাইলেন ভারতীয়রা যাতে ভুলে যায় যে তারা বন্দী—দিন পনেরো ধ'রে তাদের অবাধে ঘুরে বেড়াতে দেওয়া হল: তারপর পদাতিক হিসেবে তাদের তালিম দেওয়া শুরু হল। দলে যারা আগে এসেছে, ক্রমে তারা বেতার চালনা, ভগ্নস্তূপ সরানো ও ঘোড়ায় চড়ার শিক্ষা পেল: এ ছাড়া পর্বতারোহণ ও প্যারাস্যুটের সাহায্যে লাফানোর বিশেষ শিক্ষাক্রমও ছিল। লোকজনের মনোবল, শৃঙ্খলা ও

জার্মানদের সঙ্গে ভারতীয়দের সম্পর্ক খুবই ভাল ছিল ; জার্মান অফিসাররা ছিল সবাই প্রথম শ্রেণীর।

সুভাষচন্দ্র মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসতেন কতদূর এগিয়েছে। ১৯৪২-এর জুলাই মাসে জার্মানরা যখন এল্ অ্যালামিনে প্রতিপক্ষের ভারতীয় সৈন্যদের লক্ষ্য ক'রে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচার চালাবার জন্যে একদল ভারতীয়কে পাঠাবার প্রস্তাব করল, সুভাষচন্দ্র তখন তাতে রাজী ছিলেন। মিশরের দ্বারপ্রান্তে রোমেল পৌঁছে গেছে। মিশরের ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থা কী হবে এই নিয়ে হিটলার আর মুসোলিনির মধ্যে আলোচনা চলেছে ; চিয়ানোর দপ্তর থেকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের একটি খসড়া তৈরী হয়ে রয়েছে।[১১] এ অবস্থায় সুভাষচন্দ্র সাহায্য না ক'রে পারেন না। কিন্তু আফ্রিকায় অনিয়মিত সৈন্যদল কিম্বা স্বেচ্ছাবাহিনী—এর কোনটাই বরদাস্ত করতে রোমেল রাজী নয় : যুদ্ধক্ষেত্রেকে রোমেল কখনই পররাষ্ট্র দপ্তরের বুদ্ধির দৌড় দেখবার জায়গা ব'লে মনে করে না। সেপ্টেম্বরে লেররেজিমেণ্ট-এর 'মহড়ায় এবং অক্টোবরের কুচকাওয়াজে ভারতীয়দের দক্ষতার প্রশংসা করা হল। কিন্তু এসব বেশীদিন চলল না। স্তালিনগ্রাদ ও এল্ অ্যালামিনের পরে জার্মানদের উৎসাহে দেখতে দেখতে ভাঁটা পড়ল। ১৯৪৩-এর ১৩ই জানুয়ারী ভারতীয়দের নব্বইটি অনিয়মিত সৈন্যদলকে স্বেচ্ছাবাহিনীর মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া হল।

শুধু একটা ক্ষীণ আভাসমাত্র রয়ে গেল। এন. জি, স্বামী ও তার বাছাই করা চারজন শিক্ষার্থীকে ভারতবর্ষে গুপ্তচর হিসেবে কাজ করবার জন্যে কায়দাকানুন ও যন্ত্রকৌশল শেখানো হতে লাগল। এরা বেতার টেলিগ্রাফি সম্পর্কে খুব উচ্চাঙ্গের শিক্ষালাভ করেছিল। অদৃশ্য কালির ব্যবহার শিখেছিল, অর্থনৈতিক গুপ্ত তথ্যের গুণাগুণ যাচাই ও ব্যবহার করতে পারত ; জার্মানরা তাদের নিজস্ব গুপ্তচরদের জন্যে যেসব ক্ষুদে ক্ষুদে সাংকেতিক যন্ত্র তৈরি করেছিল তার কিছু কিছু চালাতে পারত। ১৯৪৩-এর মার্চ মাসে স্বামীকে বলা হল পছন্দ সই একটা সাংকেতিক যন্ত্র বেছে নিতে ; সেই সঙ্গে তাকে বলা হল কোন্ গুপ্ত সঙ্কেত সে ব্যবহার করবে। এরপর ২৪শে মার্চ সে এবং তার লোকজনেরা মোটরচালিত জলপোত

১১ চিয়ানোর ডায়েরী : ২৬শে জুন, ২রা ও ৩রা জুলাই, ১৯৪২

'ওসোর্নো'তে গিয়ে উঠল; তাদের ওপর ভার পড়েছে জাপানযাত্রী সুভাষচন্দ্রের অনুগমন করবার।

রয়ে গেল স্বেচ্ছাবাহিনী; ১৯৪৩-এর গোড়ার দিকে তার সৈন্যবল তখন দু হাজার। গোড়ায় গোড়ায় স্বেচ্ছাবাহিনীর বলবৃদ্ধি হচ্ছিল খুবই ঢিমে তালে। ১৯৪২-এর জুলাই মাসে অ্যানাবুর্গ থেকে নতুন লোকের আমদানি যখন বন্ধ হয়ে গেল জার্মানরা এই ব'লে শাসাতে লাগল যে, তাড়াতাড়ি ব্যাটালিয়নের সমান সৈন্যসংখ্যা যদি না হয় তাহলে স্বেচ্ছাবাহিনী ভেঙে দেওয়া হবে। ফলে, উত্তর আফ্রিকায় সদ্য বন্দী হওয়া সৈন্যদের ভেতর থেকে বেশ কয়েক শো সেপাই জোটানো জরুরি হয়ে পড়ল; জার্মানিতে নিয়মিতভাবে একসঙ্গে অনেক সেপাই জুটিয়ে না পাঠানো পযন্ত সুভাষচন্দ্র তাগিদ দিয়ে দিয়ে ইতালীয়দের অস্থির ক'রে তুললেন। সুভাষচন্দ্রের প্রচারকেরা নবাগতদের স্বাগত জানাত—এমন কি তাদের এগিয়ে আনবার জন্যে ইতালির সীমান্তে গিয়েও হাজির হত—এবং সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের জন্যে লোকজনদের তৈরী করত। এ ব্যাপারে কোন পরিশ্রমই সুভাষচন্দ্রের গায়ে লাগত না; তার মুখ দিয়ে কথার ফোয়ারা ছুটত। তিনি বলতেন, তোমাদের কত কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে তা আমি জানি: তোমাদের বৃটিশ মুরব্বিরা হেরে যাওয়ায় তোমাদের মন কিভাবে ভেঙে গেছে আমি জানি। কিন্তু আমি দিন-দুনিয়ার অনেক কিছু দেখেছি, বৃটিশের পরাজয়ে আমি তাই অবাক হইনি: বৃটিশ এককালে ছিল সিংহ, এখন আর নয়; এখন আর বৃটিশকে ভয়ভক্তি করবার কোন কারণ নেই:

> সাপ মরে গেলেও লোকে মরা সাপ দেখে ভয় পায়; ইংরেজরা হল মরা সাপ। এ যুদ্ধে ইংরেজরা যে হেরে গেছে, তাতে সন্দেহই নেই। এখন কথা হল, আমরা কিভাবে আমাদের দেশের ভার নেব। ইংরেজরা যখন যেতেই বসেছে, তখন আর ভিক্ষাস্বরূপ কিম্বা অন্য কোন জাতের কাছ থেকে উপহারস্বরূপ স্বাধীনতা পাবার কোন মানেই হয় না; কেননা সেরকম স্বাধীনতা বেশীদিন টিঁকতে পারে না।…আমরা জোয়ান, আমাদের ইজ্জত ব'লে একটা জিনিস আছে।

> আমরা অস্ত্রবলে স্বাধীনতা আদায় ক'রে নেব। স্বাধীনতা কেউ কখনও চেয়ে পায় না। হাত মুচড়ে আদায় করতে হয়।
>
> আমাদের বরাত ভাল। ইংরেজের সঙ্গে যেসব দেশ যুদ্ধ করছে তারা আমাদের সাহায্য করতে রাজী। তারা জানে ভারত স্বাধীন হলে দুনিয়ার সুখসমৃদ্ধি বাড়বে। সুতরাং তারা আন্তরিকভাবে আমাদের সাহায্য করতে রাজী। এই মহৎ ব্রত তোমরা গ্রহণ করবে কিনা, নিখুঁতভাবে পালন করবে কিনা তা তোমাদের ওপর নির্ভর করে। যদি করো ভাল, নইলে সারা জীবন বন্দী হয়ে থাকতে হবে।...[১২]

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, উপস্থিত বন্দীদের কাছ থেকে তাঁর এই আবেদনে প্রচুর সাড়া পাওয়া গেল। সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের ধাক্কা তখনও তারা ভাল ক'রে সামলে উঠতে পারেনি—তাদের মনের মধ্যে ছিল তার তাজা স্মৃতি। অ্যানাবুর্গে বন্দীদের অবস্থা ছিল অন্য, অনেকদিন ধ'রে বন্দীনিবাসে থেকে থেকে তাদের মনের মধ্যে ভাটা পড়ে গিয়েছিল ব'লেই সুভাষচন্দ্র তাদের মধ্যে গদাইলস্করী ভাব ও সন্দেহপরায়ণতা দেখেছিলেন। শ্রীগিরিজা মুখোপাধ্যায়[১৩] সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে লিখেছেন: 'প্রকাণ্ড একটা ছাতিম গাছের নিচে সোজা হয়ে দাড়িয়ে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেপাইদের কাছে ব'লে চলেছেন। দেখলাম 'কিভাবে সমস্ত শ্রোতাকে তিনি মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রেখেছেন এবং কিভাবে তারা উৎকর্ণ হয়ে শুনছে।...তাঁর বক্তৃতা যখন শেষ হল... শ্রোতাদের চোখেমুখে নতুন আশা, নতুন জীবন, নতুন উদ্দীপনা। তাদের মধ্যে অধিকাংশই এসেছিল নেহাত কৌতূহল বশে। বক্তৃতার পর ডজন ডজন লোক এসে নাম লেখাবার জন্যে ভিড় করল।' তাদের এই আচরণের কারণ বোঝা শক্ত নয়। এই রকম জোরের সঙ্গে কথা বলা; এই রকমের একবগ্গা ভাব; হয় সব ভাল নয় সব মন্দ, এইভাবে সমস্ত কিছুকে দেখা; যা অস্পষ্ট বা অনির্দিষ্ট তাকে এড়িয়ে চল: সৈন্যদের কাছে এসব তো ভাল লাগবেই। যুদ্ধের সময় সেনানায়কদের মধ্যে এই গুণটি আছে কিনা সৈন্যরা পরখ

১২ ১৯৪২-এর জুন মাসে ইতালি থেকে আগত বন্দীদের সম্বর্ধনা উপলক্ষে বক্তৃতা

১৩ 'দিস ইউরোপ'

ক'রে নেয়। সুভাষচন্দ্রের মধ্যে সেগুণের প্রকাশ দেখে সৈন্যেরা এবার চনমন ক'রে উঠল।

আগস্ট মাসে স্বেচ্ছাবাহিনী স্যাক্সনির সামরিক শিক্ষাকেন্দ্র কোয়েনিগ্‌স্‌ব্রুয়েকে স্থানান্তরিত হল। এখানে অক্টোবর মাসে বাহিনীর পয়লা ব্যাটালিয়নের মহড়া সুভাষচন্দ্র দেখতে পেলেন। সৈন্যসংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছিল : ১৯৪৩-এর জানুয়ারীতে দ্বিতীয় ব্যাটালিয়ন পুরো ভর্তি হয়ে গেল এবং তৃতীয় ব্যাটালিয়ন গড়ে তোলার কাজে হাত দেওয়া হল। কিন্তু সৈন্যবল বাড়াতে গিয়ে দেখা দিল টাকার সমস্যা। পররাষ্ট্র দপ্তর সুভাষচন্দ্রকে মাসে মাসে যে অর্থসাহায্য দিত, গোড়ায় গোড়ায় তাই দিয়ে সৈন্যদের মাইনে যোগান হচ্ছিল। কিন্তু আর সে টাকায় কুলোচ্ছিল না। ১৯৪২-এর সেপ্টেম্বর নাগাদ প্রস্তাব এল যে, এবার থেকে সরাসরি জার্মানরাই তাদের মাইনে গুণবে এবং স্বেচ্ছাবাহিনীর সৈন্যদের হিট্‌লারের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতে হবে—এ প্রস্তাব না মেনে সুভাষচন্দ্রের উপায় রইল না।

প্রথম শপথ গ্রহণের প্যারেডে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জাপানী সামরিক সহদূত কর্ণেল ইয়ামামোতো।[১৪] পাঁচশো স্বেচ্ছাসেবক এই অনুষ্ঠানে জমায়েত হয়েছিল। জার্মান কম্যাণ্ডার লেফটেনাণ্ট-কর্ণেল ক্র্যাপ্‌ সেপাইদের কাছে বক্তৃতা করে এবং জার্মান অফিসারদের পরিচালনায় এককালীন ছ জন ক'রে সৈন্য শপথ গ্রহণ করে। যথোচিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে অনুষ্ঠানটি পালিত হয়; সৈন্যেরা তাদের অফিসারদের তরবারি স্পর্শ ক'রে জার্মান ভাষায় বলতে থাকে :

> ভগবানের নামে আমি এই পবিত্র শপথ গ্রহণ করছি—সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের যে স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা, সেই সংগ্রামে জার্মান সেনাবাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে জার্মান রাষ্ট্র ও জার্মান জনগণের নেতা অ্যাডল্‌ফ্‌ হিটলারকে আমি মেনে চলব এবং সাহসী সৈনিক হিসেবে এই শপথ পালন করতে গিয়ে আমি প্রাণ বিসর্জন করতেও রাজী।

১৪ দ্রষ্টব্য ১৯ পৃষ্ঠা

এই অনুষ্ঠানে সুভাষচন্দ্র স্বেচ্ছাবাহিনীর হাতে বাহিনীর নিজস্ব পতাকা তুলে দিলেন—ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সবুজ, শ্বেত, গৈরিক ত্রিবর্ণ পতাকার ওপর মুদ্রিত চরকার বদলে ঝাঁপিয়ে-পড়া বাঘের ছবি। সুভাষচন্দ্র বললেন, 'স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে তোমাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা হবে : এই ধর্মযুদ্ধে যারা শহীদ হবে, তাদের প্রত্যেকের স্মৃতিতে মিনার উঠবে।' অনুষ্ঠানটি খুব জমকালো ও বীরত্বব্যঞ্জক হয়েছিল। এ এক স্মরণীয় দিন ; গর্বে ও আবেগে সুভাষচন্দ্রের মন ভ'রে উঠেছিল। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, 'যখন আমরা একসঙ্গে ভারত অভিযানে যাব, আমি থাকব বাহিনীর পুরোভাগে।' নতুন সজ্জায় সৈনিকদের সুন্দর দেখাচ্ছিল, মাঝখানে ঝলমল করছিল রেশমী পতাকা ; তাদের কুচকাওয়াজ দেখে সবাই খুব বাহবা দিয়েছিল। তবু একদিক থেকে সুভাষচন্দ্র তাদের পরিত্যাগ করছিলেন : এরপর থেকে জার্মানির সৈন্য হিসেবেই তাদের পদোন্নতি ও পদমর্যাদা সাব্যস্ত হবে : নামে না হলেও, কার্যত স্বেচ্ছাবাহিনী হয়ে দাঁড়াল জার্মান সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত একটি সেনাদল।

১৯৪২ সালে সুভাষচন্দ্র স্বেচ্ছাবাহিনীর জন্যে যে সব প্রতীক উদ্ভাবন করেছিলেন তার তো একটি স্বেচ্ছাবাহিনীর ঝাণ্ডা! যখনই তিনি সৈন্যদের কাছে বক্তৃতা দিতেন, একবার ক'রে ঝাঁপিয়ে-পড়া বাঘের জঙ্গীপণার কথা তাঁর বলা চাই—ঝাঁপিয়ে-পড়া বাঘের মূর্তি তাদের উর্দিতেও লাগানো থাকত। বার বার তিনি মনে করিয়ে দিতেন 'স্বাধীনতা কেউ দেয় না, আদায় ক'রে নিতে হয়'—স্বাধীনতা কখনই কেউ দান হিসেবে পায় না, কেননা প্রত্যেকটা দানের পেছনেই থাকে বন্ধনের কাঁটা ও স্বার্থের ফাঁস। ভারতীয়দের মধ্যে স্বদেশী মনোভাবের পরিচায়ক সম্ভাষণ হিসেবে 'জয়হিন্দ' অল্পদিনের মধ্যেই সকলের বুলি হয়ে দাঁড়াল ; রবীন্দ্রনাথের ভারত বন্দনা হল জাতীয়-সঙ্গীত—বার্লিন থেকে ভারতীয় শ্রোতাদের জন্যে প্রচারিত বেতার অনুষ্ঠানে ধুয়ো হিসেবে এই গানের ব্যবহার যুদ্ধের গোড়া থেকেই চলে আসছিল। সুভাষচন্দ্রের 'নেতাজী' উপাধি ধারণ এবং ২৮শে জানুয়ারী 'স্বেচ্ছাবাহিনী দিবস' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত—সব কিছুর উদ্দেশ্য ছিল একটাই। স্বেচ্ছাবাহিনীর নিজস্ব একটা ঐতিহ্য চাই। সৈন্যদের মনোবল বজায় রাখবার জন্যে চাই একটা ভিত্তি—নইলে জার্মান সেনাবাহিনীর মত

শুধুমাত্র নিয়মানুবর্তিতার জোরে কিম্বা ভারতীয় সেনাবাহিনীর মত শুধুমাত্র হুকুমের জোরে কাজ হবে না।

মেসেরিৎস্‌-এ সুযোগসুবিধা পাওয়া গিয়েছিল; কিন্তু এখানকার জার্মান অফিসারদের কাছ থেকে সে-সব কিছু পাওয়া গেল না। ক্র্যাপ্‌ ছিল নির্বিবাদী মানুষ, মদেই সারাক্ষণ ডুবে থাকত; নাৎসী দলের লোক হলেও নিয়মশৃঙ্খলার দিকে তার কোন নজর ছিল না। তার অধীনস্থ জার্মানরাও খুব যে কাজের ছিল তা নয়: তাদের ভাবখানা ছিল—স্বেচ্ছাবাহিনীতে আসতে পেরেছে তাই রক্ষে, নইলে পূর্বরণাঙ্গনে তাদের ঠেলে পাঠাত; কোন বিশেষ গুণ নিয়ে তারা এই বাহিনীতে আসেনি; ভারতীয় সেপাইদের সঙ্গে আন্তরিক কোন সম্পর্ক গড়ে তোলবারও তারা চেষ্টা করেনি। ফলে, এইসব অফিসারদের প্রতি ভারতীয় সেপাইরা কোন রকম শ্রদ্ধা বা মনের টান অনুভব করেনি। তৎসত্ত্বেও স্বেচ্ছাবাহিনীতে লোকসংখ্যা যখন কম ছিল তখন সকলের মধ্যে ছিল একটা জমাট ভাব। পরে বাহিনীকে এমন বাড়িয়ে ফেলা হল যে, ভারতীয় সৈন্য ও জার্মান সেনাপতিদের আর আগের সেই উঁচু মান রইল না। কাজেই সৈন্যদের মনোবল বজায় রাখা কখনই সহজ হয়নি এবং ভারতীয়দের সঙ্গে জার্মানদের কখনই তেমন বনিবনাও হয়নি।

অন্য একটা দিকও ছিল। স্বেচ্ছাবাহিনীতে সেপাইরা যখন প্রথম আসত, তখন তাদের মধ্যে পুরনো সামরিক শৃঙ্খলাবোধ, সাধারণ শিষ্টাচার ও ধর্মীয় আচার-বিচার কিছুটা থেকে যেত। কিন্তু সপ্তাহ কয়েক গেলেই দেখা যেত সবকিছু ধুয়ে মুছে গেছে; নৈতিক পদস্খলনে উৎসাহ দিয়ে তাদের মধ্যে যেসব প্রচার চলত, সেইসব প্রচার এর জন্যে অংশত দায়ী। জাতিধর্মভেদ ঘুচিয়ে দেবার জন্যে সুভাষচন্দ্রের দৃঢ় সংকল্পও এ ব্যাপারে তাদের খানিকটা প্রভাবিত করেছিল। একজন সেপাইকে বলতে শোনা গিয়েছিল: 'ভারতবর্ষে আমাদের একশোটা ধর্ম, একশোটা দেবতা; কিন্তু এখানে সবকিছুই জয়হিন্দ।' কিন্তু 'জয়হিন্দে'র পক্ষে ধর্মভয়ের স্থান দখল করা সম্ভব নয়; ফলে, উচ্ছৃঙ্খলতার বান ডাকল।

কারো কোন কাজ নেই, মুস্কিলের এটাও একটা কারণ। সুভাষচন্দ্রও বুঝেছিলেন, জার্মানরাও বুঝেছিল—মনোবল ঠিক রাখতে গেলে এবং

প্রচার চালাতে গেলে স্বেচ্ছাবাহিনীকে দিয়ে যাহোক কিছু করানো দরকার। এল্ অ্যালামিন্-এর যুদ্ধের ঠিক আগে তাঁরা প্রথমে মতলব করেছিলেন স্বেচ্ছাবাহিনীকে উত্তর আফ্রিকায় পাঠানো হবে ; কিন্তু রোমেল সে প্রস্তাব প্রত্যাখান করে, তা আমরা আগেই দেখেছি। এরপর প্রস্তাব হয় গ্রীসে এক কোম্পানী সৈন্য পাঠাবার ; কিন্তু ঘটনাচক্রে তা সম্ভব হয়নি। স্বেচ্ছা-বাহিনীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র ইউরোপে থাকাকালীন শেষ যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা থেকে বোঝা যায় তাঁর পূর্বেকার মত পরে কতটা বদ্‌লে গিয়েছিল। স্বেচ্ছাবাহিনী ভারতবর্ষের অথবা ভারতবর্ষেব ধারে কাছে ছাড়া আর কোথাও যুদ্ধ করবে না—প্রথমে তিনি এই কথাই বলেছিলেন : পরে যখন প্রাচ্যে রওনা হলেন তখন তিনি তাঁর নির্দেশে একটিমাত্র সর্ত বেখে গেলেন—স্বেচ্ছাবাহিনীকে একমাত্র বৃটিশাধীন ভারতীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবহাব কবা চলবে। চাবদিকের অবস্থা দেখেশুনে ১৯৪৩-৪৪ সালে স্বেচ্ছাবাহিনীকে ফরাসী উপকূলে পাঠিয়ে দেওয়াই সবচেয়ে প্রশস্ত ব'লে মনে করা হল ; এতে রোগ পুরোপুরি সারল না, মাত্র আংশিক উপশম হল।✓

১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসে আজাদ হিন্দ কেন্দ্রে যোগ দিয়ে বামপন্থী ভারতীয় সাংবাদিক এ. সি. এন. নাম্বিয়ার হলেন সহকারী নেতা ; তিনি ইউরোপে আছেন প্রায় আঠারো বছর। সুভাষচন্দ্র প্রকাশ্যে আত্ম-প্রকাশ করবার পর যে বেসামরিক কাযকলাপের প্রসার ঘটে, নাম্বিয়ার ছিলেন গোড়া থেকেই তার কর্ণধার। বেতারে প্রচার, পুস্তিকা প্রকাশ, প্রচারের কাজ—সমস্তই বাড়ানো হল ; সৈন্যদের সুখসুবিধার দিকে নজর দিতে হল, পেন্সনভোগী ও সাহায্যপ্রার্থীদের তালিকাও দীর্ঘ হতে লাগল। ১৯৪২-এর মে মাস নাগাদ আজাদহিন্দ কেন্দ্র জার্মানীতে রীতিমত মানমর্যাদা পেল। বৈদেশিক মিশন হিসেবে আজাদহিন্দ কেন্দ্রকে গণ্য করা হতে লাগল ; এই স্বীকৃতির অর্থই হল, কেন্দ্রের সদস্যেরা উচ্চ হারে রেশন পাবেন এবং বিদেশীদের ওপর আরোপিত বাধানিষেধ তাঁদের ওপর পুরোপুরিভাবে প্রযোজ্য হবে না। সুভাষচন্দ্রের বেলায়ও তার কার্পণ্য ঘটল না ; জার্মানরা তাঁকে থাকবার জন্যে একটা ভাল বাড়ি দিল, গাড়ি দিল এবং অতিথি-অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করবার বাবদে তাঁর জন্যে বিশেষ রেশনের বন্দোবস্ত

হল। নিজের জন্যে তিনি মাসে দশ এগারো হাজার টাকা ভাতা পেতে লাগলেন এবং ১৯৪১ সালে আজাদহিন্দ কেন্দ্রের জন্যে মাসিক বরাদ্দ হল পনেরো-ষোল হাজার টাকা। ১৯৪৪ সালে সেটা দাড়াল একচল্লিশ-বিয়াল্লিশ হাজার টাকা। সুভাষচন্দ্র এই অর্থসাহায্য ঋণ হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন এবং ভেবেছিলেন ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে জার্মানীর এই ঋণ পরিশোধ করা হবে ; খরচের ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র ছিলেন মুক্তহস্ত।

সুভাষচন্দ্রের প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে কুমারী শেঙ্ক্‌ল্‌ এক বছরের ওপর কাজ করবার পর ১৯৪২-এর জুলাই মাস থেকে আজাদ হিন্দ কেন্দ্রে যাওয়া বন্ধ ক'রে দিলেন। পরে বোঝা গেল কাজ থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেবার কারণ অন্য। এমিলি শেঙ্ক্‌ল্‌-এর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের পরিচয় ১৯৩৪ সাল থেকে ; তিনি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে স্ত্রী হিসেবেই এই সময় গোপনে সম্পর্ক রক্ষা করছিলেন এবং ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি সুভাষচন্দ্রের কন্যার জননী হন। শেঙ্ক্‌ল্‌-এর সঙ্গে তাঁর এই সম্পর্কের দরুন সুভাষচন্দ্র খুবই মানসিক অশান্তিতে ছিলেন। ভারতবর্ষে তাঁর নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে লোকের যে উঁচু ধারণা, সেটা হয়ত তাঁর নিজের অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু তাহলেও লোকের বলার একটা মূল্য আছে : লোকে বলত, দেশ যতদিন না স্বাধীন হচ্ছে ততদিন কামালপাশার মত সুভাষচন্দ্রের পণ বিয়ে না করা। জাতের বাইরে মেয়ে বিয়ে করার ব্যাপারেও নানারকম কথা উঠতে পারে ; সেইজন্যে তাঁর জার্মান বন্ধুরা তাঁকে বারণ করেছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি ঠিক করলেন ব্যাপারটা একেবারে গোপন রাখতে হবে। জার্মানী থেকে দূরপ্রাচ্যে রওনা হবার ঠিক আগে দাদার কাছে লেখা একটা চিঠিতেই শুধু তাঁর স্ত্রীর কথা জানান।

আট মাস লেগে গেল তাঁর জাপানে যাবার ব্যবস্থা হতে, তাঁর পক্ষে স্থলপথে যাবার কোন রাস্তা ছিল না ; গোড়ায় তিনি ভেবেছিলেন ইতালীয়েরা হয়ত তাঁকে উড়োজাহাজে ক'রে পাঠাবার একটা বন্দোবস্ত করতে পারবে। সে আশা যখন ত্যাগ করতে হল তখন তিনি জাপানীদের দ্বারস্থ হলেন। জাহাজে শত্রুব্যূহ ভেদ ক'রে যাবার চেষ্টা করলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা : সুতরাং ডুবোজাহাজে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। ঠিক হল, নৌবিভাগের সঙ্গে ব্যবস্থা পাকাপাকি হলেই তিনি রওনা হবেন। তাঁর

জাপানী বন্ধু সামরিক সহদূত কর্ণেল ইয়ামামোতো তার যোগাড়যন্ত্র করতে তুরস্ক ও রাশিয়ার ভেতর দিয়ে ১৯৪২-এর নভেম্বরে স্বদেশে গেলেন।

জার্মানীতে যে ক'মাস অপেক্ষা ক'রে থাকতে হল তারমধ্যে সুভাষচন্দ্র তাঁর নীতিনির্দেশগুলো নাম্বিয়াকে বুঝিয়ে দিলেন। আজাদ হিন্দ কেন্দ্রের নতুন নতুন শাখা খোলা, বেতার প্রচার জার্মানদের পুলিশী ব্যবস্থা ভারতীয়দের দিয়ে অনুশীলন করানো, জাহাজী ও বৈমানিকদের তালিম দেওয়া—এই সমস্ত ব্যাপারে নানারকম প্ল্যান করা হল। স্বেচ্ছাবাহিনী সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হল: যত শীঘ্র সম্ভব বাহিনীকে কাজে লাগাতে হবে, জার্মান অফিসার ও এন-সি-ও দের সরিয়ে সে জায়গায় ভারতীয়দের নিযুক্ত করতে হবে, সাম্প্রদায়িক মনোভাব নির্মূল করতে হবে। ভারী কামান ও ট্যাঙ্ক সমেত আধুনিক সর্ববিধ জার্মান অস্ত্রশস্ত্রে বাহিনীর লোকজনকে শিক্ষিত ক'রে তুলতে হবে: সময় ও সুযোগমত সুভাষচন্দ্র পরে অন্যান্য নির্দেশ পাঠাবেন।

১৯৪২ সালে সুভাষচন্দ্র স্ত্রী ও শিশুকন্যা অনীতাকে নিয়ে ভিয়েনায় শান্তিতে বড়দিন কাটালেন। এরপর জানুয়ারী মাসে প্যারিস থেকে ঘুরে এসে সুভাষচন্দ্র জানতে পারলেন তাঁর যাত্রার দিন আসন্ন। যাবার আগে আর একটিমাত্র উৎসব হতে পারল। ২৬শে জানুয়ারী বার্লিনে 'স্বাধীনতা দিবস' পালিত হ'ল। বড় পার্টি হল: এই পার্টিতে ছ'শো অতিথি সুরাপাত্র হাতে সুভাষচন্দ্রের দীর্ঘজীবন কামনা করল। এর দুদিন পরে 'স্বেচ্ছাবাহিনী দিবসে' সৈন্যদের কাছে সুভাষচন্দ্র তাঁর শেষ ভাষণ দিলেন। তাঁর ইউরোপ ত্যাগের খবর কেউ যাতে জানতে না পারে তার জন্যে যাবার আগে তাঁর যে দুটি বক্তৃতা রেকর্ড করিয়ে রাখা হয়েছিল, তিনি চলে যাবার পর তা বেতারে প্রচারিত হয়[১৫] এবং লোকজনের সঙ্গে দেখা হলে তিনি প্রায়ই কথাপ্রসঙ্গে বলতেন যে, অল্পদিনের মধ্যেই বেশ লম্বা মেয়াদে তাঁকে রাশিয়ার রণক্ষেত্রে গিয়ে থাকতে হবে। গোড়ায় তিনি ভেবেছিলেন স্বামী ও হাসান দুজনকেই সঙ্গে নিয়ে যাবেন, কিন্তু স্থানাভাবের জন্যে তা সম্ভব হল না; একা হাসান তাঁর সহযাত্রী হল। খবরটা কাকপক্ষীও টের পেল না: ২৪শে মার্চ স্বামী

১৫ একটি প্রচারিত হয় ১৯৪৩-এর ২৮শে ফেব্রুয়ারী; 'ফোলটিসের বেওবাখটের', ৪ঠা মার্চ, ১৯৪৩

যখন জলপথে যাত্রা করল, সে জানতেই পারেনি সুভাষচন্দ্র তার আগেই রওনা হয়ে গেছেন।

আজাদ হিন্দ কেন্দ্রে কোন রকম দুশ্চিন্তার আভাস দেখা গেল না—সুভাষচন্দ্র গেছেন তো দীর্ঘ সফরে। সুভাষচন্দ্রের জায়গায় নাম্বিয়ার অল্প-দিনের মধ্যেই গুছিয়ে ব'সে গেলেন; যেসব সুযোগ-সুবিধা সুভাষচন্দ্র ভোগ করতেন, তার অধিকাংশই নাম্বিয়ারের দখলে এল। অবশ্য কর্তার শূন্য গদীতে ব'সে নাম্বিয়ার যে রকম ভড়ং করতে লাগলেন, তাঁর সহকর্মীদের তা পছন্দ হল না। স্বেচ্ছাবাহিনীর লোকদের কাছে নাম্বিয়ার খাতির পেলেন—জার্মান অফিসার আর এন-সি-ওদের হটিয়ে দিয়ে সে জায়গায় ভারতীয়দের বসাতে গিয়ে যখন নানারকম ঝঞ্চাটের সৃষ্টি হল, তখন নাম্বিয়ার বুঝিয়ে-সুজিয়ে একাধিকবার তাদের মাথা ঠাণ্ডা করেছিলেন। কিন্তু তাহলেও সুভাষচন্দ্র না থাকায় লোকের উৎসাহ-উদ্দীপনায় আস্তে আস্তে ভাটা পড়তে লাগল। শেষ পর্যন্ত যখন নাৎসীদের পায়ের নিচে মাটি সরতে শুরু করল, তখন ইউরোপের ভরাতীয়েরা ঝড়ের মুখে কুটোর মত ভেসে গেল।

৫

এশিয়ায় নতুন কণ্ঠস্বর

অস্থায়ী সরকার প্রত্যেক ভারতীয়ের আনুগত্যের অধিকারী ব'লে এতদ্বারা স্বীয় দাবি জানাচ্ছে। (২১শে অক্টোবর, ১৯৪৩)

সুভাষচন্দ্র বসু ও আবিদ হাসান ১৯৪৩-এর ৮ই ফেব্রুয়ারী একটি জার্মান ডুবোজাহাজে ক'রে কিয়েল ত্যাগ করলেন। তাঁরা অনেকখানি রাস্তা ঘুরে অতলান্তিকে এসে পড়লেন এবং তারপর উত্তমাশার পাশদিয়ে বরাবর সাগর পাড়ি দিয়ে মাদাগাস্কারের চারশো মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে পূর্বনির্দিষ্ট একটি জায়গায় এসে পৌছুলেন। সেখান থেকে ২৮শে এপ্রিল রবারের ডিঙ্গিতে চড়ে তাঁরা জাপানী আই-২৯ নম্বর ডুবোজাহাজে গিয়ে উঠলেন। এই ডুবোজাহাজে তাঁরা ভারত মহাসাগর পার হলেন। সুমাত্রার উত্তর প্রান্তে সবং থেকে তাঁরা কর্নেল ইয়ামামোতোর সঙ্গে বিমানপথে টোকিওতে গেলেন, ইয়ামামোতো তখন জাপ-ভারতীয় সংযোগ-রক্ষাকারী দল 'হিকারীকিকান'-এর সর্বোচ্চ কর্তা হিসেবে কাজ করছিলেন এবং তিনি তখন সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই সবং-এ উপস্থিত হয়েছিলেন। জার্মানি থেকে যাত্রা করবার আঠারো সপ্তাহ পর ১৩ই জুন তারিখে সুভাষচন্দ্র টোকিওতে পৌছুলেন।

এই প্রথম এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হচ্ছে। তিনি ছাড়া আর একজন মাত্র যাত্রী। চারিদিকে অখণ্ড স্তব্ধতা, ঠায় ব'সে থাকার অস্বস্তির মধ্যেও সুভাষচন্দ্রের শান্ত নির্বিকার ভাব। মাঝে মাঝে উত্তেজনার মুহূর্ত আসে—ক্যাপ্টেনের হয়ত মনে হয় শত্রুপক্ষ তাদের ডুবোজাহাজ দেখে ফেলেছে। সমূহ বিপদের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে প্রতি মুহূর্তে গেল-গেল

ভাব। তারই মধ্যে ব'সে সুভাষচন্দ্র বই পড়তেন, দরকারী বিষয়গুলো-খাতায় টুকে রাখতেন, 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল্'-এর নতুন সংস্করণের জন্যে কাজ করতেন, দূর প্রাচ্যে গিয়ে নতুন কী করবেন না করবেন সে বিষয়ে তিনি হাসানকে মুখে মুখে বলতেন। অনেক প্রশ্নই এখনও অমীমাংসিত।

১৯৪২ সালের ঘটনাবলীর কিছু কিছু তিনি জানেন, তবে পুরো ঘটনা তাঁর জানা নেই ; তিনি জানেন ষোল হাজার স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে একটি বাহিনী গড়া হয়েছিল ; কিন্তু যখন একটু লেগে থাকতে পারলে চাইলেই সব কিছু হাতে এসে যেত, ঠিক সেই সময় আন্দোলনের যিনি নেতা—মনে হয়, তিনি ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। অদূরদর্শী নেতৃত্বের জন্যেই বোধহয় এই অঘটন ঘটেছিল : নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিতে গিয়ে ভারতবাসীরা যদিই বা জাপানীদের উদ্দেশ্যসিদ্ধিতে কিছুটা কাজে লাগে, তাহলে তাতে কী এমন ক্ষতি ছিল? এসব অবশ্য রাসবিহারী বসুর মাথায় ঢুকবে না ; তাঁর সহকর্মীদের মাথায় তো আরও বেশী জট—রাসবিহারী বসু তাদের এ কথা বোঝাবেন কেমন ক'রে? রাসবিহারীর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা বলতে শুধু তো এক সন্ত্রাসবাদ—জাপানীদের টানতে গেলে যে রাজনৈতিক কলাকৌশল জানা দরকার সে সব শেখবার তাঁর সুযোগই হয়নি। জাপানীরা যে বলেছে, 'তোমরা সরকারেরও মালিক নও, রাষ্ট্রেরও মালিক নও ; আমাদের কাছ থেকে যা পেয়েছ একমাত্র সেই জিনিসই তোমরা আমাদের দেবার কথা বলতে পারো। সুতরাং তোমাদের সঙ্গে চুক্তি হবে কেমন ক'রে?' কথাটা একেবারে মিথ্যে ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যায় না ; এ নিয়ে জাপানীদের ওপর খড়্গহস্ত হওয়ার কোন মানেই হয় না।

সুভাষচন্দ্রের কৌশল হবে অন্য। প্রথমে তিনি জাপানীদের দেখাবেন যে, বর্মায় সামরিক গুপ্তচরবৃত্তি ও পঞ্চমবাহিনী সংগঠনের উৎস হিসেবেই শুধু নয়, এ আন্দোলন তাদের সমগ্র রাজনৈতিক ও প্রচার প্রচেষ্টার দিক থেকেই রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান অবস্থায় কাজের চেয়েও, এমন কি যুদ্ধবিগ্রহের চেয়েও, আখেরে বেশী ফল দেবে নাম, রণধ্বনি আর স্লোগান। অক্ষশক্তির স্বীকৃত একটি অস্থায়ী ভারতীয় সরকার গঠন করতেই হবে—১৯৪২ সালে খোদ জাপানীরাই এ প্রস্তাব করেছিল।[১] তাহলে জাপানীরাও

১ গোয়েবলস' ডায়েরী, ১৫৭ পৃঃ

লোক পাবে, তাদের সঙ্গে ব'সে বোঝাপড়া করা চলবে। সেই সঙ্গে যুৎসই উৎসাহী ভারতীয় নেতৃমণ্ডলীরও দরকার। দূর প্রাচ্যে ভারতীয়দের সমগ্র জনবল ও অর্থবল যাতে সরকারের হস্তগত হয়, সুভাষচন্দ্র সে ব্যবস্থাও করবেন; তার ফলে যেমন আর্থিক দিক থেকে তাঁকে আর পরমুখাপেক্ষী হতে হবে না, তেমনি যথোপযুক্ত একটি সৈন্যবাহিনীও তিনি গড়ে তুলতে পারবেন। তাহলে কালক্রমে ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করার ব্যাপারে কেউ তাঁকে কথতে পাববে না।

সুভাষচন্দ্রের সংগ্রামী অতীত, ভারতবর্ষ থেকে রহস্যময় অন্তর্ধান, হিটলার-মুসোলিনির সঙ্গে বৈঠক এবং ইউরোপে তাঁর সাফল্য: এই সব কারণে বোঝাই যাচ্ছিল দূর প্রাচ্যে সকলেই তাঁকে স্বাগত জানাবে। তার চেয়েও বড় কথা—আজাদ হিন্দ আন্দোলনের সূত্রপাত থেকেই দূর প্রাচ্যেব ভাবতীয়েবা তাঁব নাম শুনে আসছিল এবং তাদের কথা দেওয়া হয়েছিল যে তিনি আসবেন। ১৯৪১ সালে মোহন সিং ফুজিহারার কাছে সুভাষচন্দ্রের নাম প্রস্তাব কবেন। সিঙ্গাপুরের প্রথম বেসামবিক আলোচনায় এবং টোকিওর বৈঠকে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে কথাবার্তা হয়। ব্যাঙ্কক সম্মেলনে সুভাষচন্দ্রের প্রেরণাময় বাণী শোনানো হয়। ১৯৪১-এব আগস্ট মাসে মালয থেকে তার 'দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগ্‌ল্‌' পুনঃপ্রকাশিত হল। বছরেব শেষাশেষি যখন অবস্থা সঙ্গিন হয়ে দাঁড়াল, তখন লোকে আশা কবতে লাগল এবং গুজবও রটে গেল যে, তিনি আসবেন। দোদুল্যচিত্ত অফিসারদেব আজাদ হিন্দ ফৌজে টিঁকিয়ে রাখার জন্যে এবং বেসামরিক লোকদের মুখ বন্ধ করবার জন্যে শেষ পর্যন্ত ১৯৪৩-এর ফেব্রুয়ারী মাসে কথা দেওয়া হল যে, এবার সুভাষচন্দ্র সত্যিই আসছেন।

সুতরাং সৈন্যের দল ও বেসামরিক লোকজন সবাই তাঁর প্রতীক্ষায় ছিল; তিনি আসতেই তারা মহা উৎসাহে ভিড় ক'রে তাঁকে স্বাগত জানাল। সে সময় সুভাষচন্দ্রকে পায় কে? ব্যক্তিগত উৎসাহ উদ্দীপনা, অফুরন্ত প্রাণশক্তি, অখণ্ড প্রতাপ আর বিশ্ববীক্ষার জোরে তিনি পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের সত্যিই হৃদয় জয় করলেন। লোকে তাঁর টানে ভেসে গেল; সুভাষচন্দ্র যেদিকে যে-পন্থায় তাদের নিয়ে চলেছেন ভারতে তাদের নেতারা তা পছন্দ কববেন কিনা—এসব দাঁড়িয়ে ভেবে দেখবার মত মনের

অবস্থা তখন খুব কম লোকেরই ছিল। সেটা আব তখন একটা সমস্যা নয়। তিনি তাঁর অধিকার ঘোষণা করেছেন, লোকে হৈ হৈ ক'রে মেনে নিয়েছে। মুষ্টিমেয় যে কয়েক জনের কাছে ব্যাপারটা ভাল ঠেকেনি, 'তারা সুভাষচন্দ্রকে মনে করেছে আত্মম্ভরী স্বৈরাচারী—যাঁর ধারণায় ভারতবর্ষে একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হলে ভাল হয় এবং যিনি নিজেই সেই ক্ষমতার অধিকারী হবেন ব'লে ফন্দি আঁটছেন। যারা এইভাবে ভাবছিল তাদের ঢিট হতে বেশী সময় লাগল না।

পৌছুনোর পরের দিনই সুভাবচন্দ্রের সঙ্গে তোজোর সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হল। তাঁর কাছে জাপানী প্রধানমন্ত্রী কিছু গোপন করবেন না; ভাবতবর্ষে যুদ্ধাভিযান হোক না হোক, বৃটিশের পরাজয়ের পর ভারতবর্ষ জাপানের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসবে। তবে জাপান ভারতবর্ষেব কাছে কোন কিছু দাবি করবে না, যুদ্ধের সময় প্রয়োজন হলে অবশ্য অন্য কথা—এবং তাবতবর্ষকে সে স্বাধীনভাবে থাকতে দিতেই চায়। ভারতীয়েরা যদি নিজেদের গরজে কিছু কবে, তাহলে জাপানীরা খুশী হয়ে সাহায্য করবে, কেননা তাতে জাপানেরই সার্থসিদ্ধি হবে। 'অস্থায়ী সরকার গঠনের ব্যাপারে তোজো সুভাযচন্দ্রকে উৎসাহ দিলেন, জাপানীরা যেমন এগোবে সেই মত ভাবতীয় এলাকা অস্থায়ী সরকাবেব কর্তৃত্বে আসবে, এরপর সুভাযচন্দ্রের উপস্থিতিতে জাপানী পার্লামেণ্টে ভারতবর্ষ সম্পর্কে তোজো ঘোষণা করলেন:

> ভারতীয় জনগণের শত্রু অ্যাংলো-স্যাক্সনদের সমস্ত প্রভাব ভারতের মাটি থেকে উৎখাত করবার জন্যে এবং ভারতবর্ষ যাতে প্রকৃতই পূর্ণ স্বাধীনতা পায় তার জন্যে সর্ববিধ উপায়ে সাহায্য করবে ব'লে জাপান দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করছে।[২]

ইউরোপে হিটলার-মুসোলিনির দরজায় বছর দুই হত্যা দিয়ে প'ড়ে থেকেও যাঁকে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে, এই ঘোষণায় তাঁর খুশির অন্ত ছিল না। জাপান সম্বন্ধে তাঁর ভয় নেই; ভারতবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বৃটিশেরই ভাবি সাধ্য হত ভারতবর্ষ শাসন করবার, বিশেষত যদি তাঁর হাতে জবরদস্ত এক

২ ১৬ই জুন, ১৯৪৩ ('অন্ টু ডেল্হি', ১১ পৃঃ)

ভারতীয় জাতীয় বাহিনী থাকত! তিনি বললেন, জাপান হল ভারতের পরম বন্ধু—এই যুগান্তকারী ঘোষণা ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

একদিকে জাপানের অগণন সাধারণ মানুষের মধ্যে আছে সৌন্দর্যের অনুষ্ঠান-উপচার আর পিপীলিকাসুলভ অধ্যবসায়, অন্যদিকে তার যুধ্যমান সৈন্যদের মধ্যে দেখা গেছে জানোয়ারের মত হিংস্রতা—পৃথিবীর মানুষ আজও এ দুটো জিনিস ঠিক মেলাতে পারে না। সুভাষচন্দ্রের এই প্রথম জাপানে আসা। সেখানকার প্রিয়দর্শী মানুষদের দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। যেমন তাদের প্রাণশক্তি তেমনি তাদের নিয়মানুবর্তিতা। দিনকয়েকের মধ্যেই লীগ এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কে তিনি মুখে মুখে রাসবিহারী বসুর কাছ থেকে সব জেনে নিলেন। তারপর এ বিষয়ে জাপানীদের অনুসৃত নীতি নিয়ে সমরদপ্তরের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হল। মাঞ্চুকুও আর নানকিং-চীনের সরকারের সঙ্গে জাপানীদের কী ধরনের সম্পর্ক এবং বর্মা ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে স্বাধীনতা দেওয়ার ব্যাপারে জাপানীদের সঙ্গে কী ধরনের ব্যবস্থা আছে না আছে, সে বিষয়ে তিনি খুঁটিয়ে জানতে লাগলেন। ১৯শে জুন একটি সাংবাদিক বৈঠক ডেকে এবং এরপর দু'দিন বেতারে বক্তৃতা দিয়ে তিনি দূরপ্রাচ্যে তাঁর আগমনের কথা ঢাক পিটিয়ে জানিয়ে দিলেন। স্বদেশে যারা অক্ষশক্তির সততায় সন্দিহান ছিল, তাদের উদ্দেশ্যে তিনি আরেকবার আবেদন জানালেন: ভারতবর্ষ অক্ষশক্তিকে যদি বিশ্বাস করতে না পারে, তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখুক: কেননা 'অতবড় ঘাগী ধুরন্ধর চালাক বৃটিশ রাজনীতিকেরাই যখন আমায় পটাতে কিংবা ভাংচি দিতে পারেনি, তখন আর কারো পক্ষে তা সম্ভব হবে না।'[৩] ইংলণ্ডের সঙ্গে আপোষ করবার কথা আর যেন মনেও স্থান দেওয়া না হয়: ভারতবর্ষ হাতছাড়া করা অর্থনৈতিক দিক থেকে তার পক্ষে সম্ভব নয় এবং ভারতবর্ষের পক্ষে সেটা আশা করাই বাতুলতা। তবে অক্ষশক্তিত্রয় বৃটিশকে মোক্ষম ঘা দিয়েছে, ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করবে ব'লেছে—ভারতবর্ষ তার জন্যে তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। অবশ্য ভারতবাসীর রক্তেই ভারতের মুক্তি অর্জন করতে হবে। একমাত্র তাহলেই ভারত তার নিজের স্বাধীনতা নিজে রক্ষা করবার শক্তি পাবে। ভারতবর্ষ থেকে তিনি যেজন্যে স'রে পড়েছিলেন, তাঁর সে উদ্দেশ্য

৩ বেতার বক্তৃতা, ২৪শে জুন, ১৯৪৩

সিদ্ধ হয়েছে : তিনি নিজের চোখে দেখতে পেয়েছেন তুনিয়ার কোথায় কী ঘটেছে, অক্ষশক্তির মধ্যে বিশেষভাবে জাপান ভারতবর্ষকে সাহায্য করবার জন্যে তৈরি; অক্ষশক্তির অধীন প্রত্যেকটা দেশে ভারতীয়েরা একজোট হয়েছে, স্বদেশের মানুষদের পাশে গিয়ে তারা দাঁড়াবে। যারা ভারতে আছে তারা এবার একাজে অংশ নিক :

> আইন-অমান্য আন্দোলনকে সশস্ত্র সংগ্রামে রূপান্তরিত করতে হবে। ভারতের জনসাধারণ যখন ব্যাপকভাবে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হবে, একমাত্র তখনই তারা স্বাধীনতালাভের অধিকার অর্জন করবে।[৩]
>
> ভারত স্বাধীন হবে—তার আর দেরি নেই। স্বাধীন ভারতে কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত হবে, অন্ধকার কারাকক্ষ থেকে তখন সুখ, চরিতার্থতা ও স্বাধীনতার আলোয় এসে দাড়াবে ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তানেরা।[৪]

এশিয়ায় এ ছিল সত্যিই এক নতুন কণ্ঠস্বর। প্রবাসী ভারতীয়দের এর মধ্যে টেনে আনবার কাজটা তখনও বাকি। ২৭শে জুনের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বিলক্ষণ বুঝতে পারলেন যে, সিঙ্গাপুরে একবার তার যাওয়া নিতান্ত দরকার। এই সময় চীন ও মাঞ্চুকুওতে অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্যে তার নির্ধারিত সফর মুলতুবী রাখতে হল। ২রা জুলাই তিনি সিঙ্গাপুরে পৌছুলেন। তাঁকে সম্বর্ধনা জানাতে শহর ভেঙে লোক এল।

তারপর সাতদিন ধ'রে চলল প্রকাশ্য অনুষ্ঠান আর ঘরোয়া বৈঠক; যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত পরে প্রতি বছরই এই সাতদিন 'নেতাজী সপ্তাহ' হিসেবে পালিত হত। সুভাষচন্দ্র সামরিক ও বেসামরিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একে একে দেখা ক'রে কার কতটা এলেম বুঝে নিলেন। তাদের মধ্যে তু-একজন ছাড়া কেউই এর আগে এ রকম উঁচুদরের কোন নেতার দর্শন পায়নি। কাজেই তাঁকে দেখে সকলেই চমৎকৃত ও কৃতার্থ হল। সবাই ভাবল বহু প্রতীক্ষার পর এতদিনে আসল নেতা পাওয়া গেছে যিনি তাদের

৩ বেতার ভাষণ, ২৪শে জুন, ১৯৪৩ ৪ সংবাদপত্রে বিবৃতি, ১৯শে জুন, ১৯৪৩

সব সংশয় ঘুচিয়ে দিতে পারবেন, যাঁর কাছ থেকে সব প্রশ্নের সদুত্তর মিলবে। ৪ঠা জুলাই জাপ-অধিকৃত সারা এশিয়ার লীগ প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে তিনি লীগের সভাপতিত্ব ও আজাদ হিন্দ ফৌজের আনুগত্য গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, ভারতের বাইরে সমস্ত ভারতীয় জনসাধারণ একবাক্যে তাঁকে স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা ব'লে মানে; বললেন, ভারতবর্ষে তাঁর গুপ্তচরদের মারফত তিনি জেনেছেন যে, সেখানকার জনমত তাঁর প্রচেষ্টা সমর্থন করে। জাপান হল সত্যিকার বন্ধু; তাদের সততা সম্পর্কে তিনি সবাইকে ভরসা দিলেন। যাতে জাপানের সঙ্গে তালে তাল দিয়ে চূড়ান্ত বিপ্লবী আঘাত হানা যায় তার জন্যে তিনি অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার গড়ে তুলবেন। ভারতবর্ষের ভেতরে ও বাইরে স্বাধীনতার সমস্ত সৈনিককে তিনি এই সরকারের অধীনে সামিল হতে বললেন :

> আমাদের সামনে কঠিন সংগ্রাম—শত্রুপক্ষ শক্তিমান, নিষ্ঠুর; তাদের কোন বিবেকের বালাই নেই। স্বাধীনতার এই শেষ জেহাদে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অভাব, পথশ্রম আর মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। এই পরীক্ষায় যদি উত্তীর্ণ হও, তাহলেই স্বাধীনতা মিলবে।[৫]

পরদিন আজাদ হিন্দ ফৌজ পরিদর্শন করবার পর এই ফৌজের অস্তিত্বের কথা সারা বিশ্বে রাষ্ট্র ক'রে দিলেন।[৬] এই দিনটিও তাঁর জীবনের একটি গৌরবময় দিন : এই সৈন্যবাহিনীর অভিযানের ফলে ভারতবর্ষে অন্তর্বিপ্লব চরম আকার নেবে, সেপাইরা বিদ্রোহ করবে : যতক্ষণ ভারতের সুপ্রাচীন রাজধানী দিল্লীর লালকেল্লায় বিজয়োৎসব অনুষ্ঠিত না হয়, ততক্ষণ রণধ্বনি হোক 'চলো দিল্লী' 'দিল্লী চলো'। ফৌজদের সামনে দুটি কাজ : স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করা এবং তারপর স্বাধীন ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনী হিসেবে মোতায়েন থাকা। এই ফৌজকে প্রথম শ্রেণীর আধুনিক রণনিপুণ অসমসাহসী বাহিনী হতে হবে; অফিসাররা হবে এমন যাতে তাদের নিয়েই স্বাধীন ভারতের সেনাপতিমণ্ডলী গড়ে উঠতে পারে।

৫ সিঙ্গাপুরের বক্তৃতা, ৪ঠা জুলাই, ১৯৪৩

৬ 'অন টু ডেল্হি', ৩৭ পৃঃ

সুভাষচন্দ্র বললেন, "আমাকে অনুসরণ করো……তোমাদের আমি স্বাধীনতা ও জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেব।" ৬ই জুলাই সৈন্যদের কুচকাওয়াজ হল; এই কুচকাওয়াজে স্বয়ং তোজো উপস্থিত থেকে সৈন্যদের অভিবাদন গ্রহণ করলেন। এরপর ৯ই জুলাই তুমুল ধারাবর্ষণের মধ্যে ষাট হাজার লোকের এক বিরাট সভায় সুভাষচন্দ্র বললেন :

> ভারতবর্ষে দ্বিতীয় কোন স্বদেশী নেতা নেই যিনি আমার মত এতদিকে এত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন বলে দাবি করতে পারেন।[৭]

বৃটিশকে তাড়াতে হলে ভারতের একার শক্তিতে কুলোবে না। তিনি এসেছেন বাইরে থেকে সাহায্য যোগাড় করতে। শ্রোতাদের বলা হল : পূর্ব এশিয়ায় ত্রিশ লক্ষ[৮] ভারতীয় আছে, এখন তাদের সমস্ত সম্পদ সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহার করতে হবে। আওয়াজ উঠুক : 'ষোলআনা যুদ্ধের জন্যে ষোলকলা আয়োজন চাই', তাঁর লক্ষ্য হল তিন লক্ষ সৈন্য আর তিন কোটি ডলার।[৯]

সুভাষচন্দ্র যেখানে যান সেখানেই তাঁর প্রশস্তি হয়, ভক্তিতে গদগদ হয়ে লোকে প্রায় তাঁর পুজো করে—এসব দেখে;অভিভূত হয়ে শ্রোতাদের মন রাখার জন্যে তিনি এমন সব দাবি ক'রে বসতে লাগলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিতে শুরু করলেন যে যারা তাঁর অন্ধ ভক্ত তারাও আপত্তি না ক'রে পারেনি।[১০] অবশ্য শ্রোতাদের কাছ থেকে সেই কারণেই তিনি জোর হাততালি পেলেন। যুদ্ধবন্দীদের শিবিরে ঘুরে ঘুরে তিনি দুহাজার স্বেচ্ছাসৈনিক যোগাড় করলেন, প্রত্যেক জায়গায় গিয়ে ভারতীয়দের নিয়ে সভা করলেন, জাপানীদের সঙ্গে ব'সে নিরন্তর সলা-পরামর্শ চালালেন। আগস্ট মাসে তিনি

৭ 'অন টু দিল্লি', ৩২ পৃঃ

৮ সুভাষচন্দ্র সচরাচর এই সংখ্যাটি বলতেন, কিন্তু সংখ্যাটি বেশ বাড়ানো ছিল। ১৯৪২ সালে বর্মা থেকে লোক পালাবার পর জাপ অধিকৃত এশিয়ায় ভারতীয়দের সংখ্যা বিশ লক্ষও ছিল কিনা সন্দেহ

৯ স্থানীয় ১ ডলার ২ শিলি, ৪ পেনি (আনুমানিক দেড় টাকা—অনুবাদক)

১০ 'আন টু ফ্রিম এ ইন্ডিয়া'? 'স, এ আয়ার, ২৪৭-৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য

রেঙ্গুনে বর্মার স্বাধীনতা উৎসবে যোগ দিলেন। তারপর ব্যাঙ্কক এবং সাইগন সফরে গেলেন। বক্তৃতা দিলেন, অসংখ্য সাক্ষাৎপ্রার্থীর প্রশ্নের জবাব দিলেন এবং জাপানী সেনাধ্যক্ষদের সঙ্গে ও সরকারী আমলাদের সঙ্গে লম্বা লম্বা বৈঠক হল; সেই সঙ্গে উপলক্ষ পেলেই একটা ক'রে বেতার-বক্তৃতা। শরীরে তাঁর শ্রান্তিক্লান্তি নেই, ঘুম নামমাত্র এবং রাত গভীর হলেও তাঁর কাজ ফুরোয় না।

কোন্ দেশে কী ঘটছে সব তাঁর নখদর্পণে থাকত; এবং জার্মানির মত এখানেও সেইসব ঘটনা তিনি তাঁর বেতার-বক্তৃতায় সুবিধাজনকভাবে ব্যবহার করতেন। ১৯৪৩-এর গ্রীষ্মকালে বাংলাদেশে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ায় তিনি জো পেয়ে গেলেন। আগস্ট মাসে এক বেতার বক্তৃতায় তিনি জানালেন যে, ভারতের বন্দরে নির্বিঘ্নে জাহাজ ভিড়তে পারবে—যদি এ ধরণের কোন প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় তাহলে লীগের পক্ষ থেকে তিনি এক লক্ষ টন চাল পাঠাতে রাজী আছেন। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কোন রকম সাড়া মিলল না; ফলে, ভারত সরকার ও তখনকার নতুন বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের ওপর আরও এক হাত নেবার তিনি সুযোগ পেয়ে গেলেন। উত্তর আফ্রিকায় মিত্রশক্তির জয়লাভ, সিসিলি দখল এবং ইতালিতে সৈন্যাবতরণ—ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্পর্কহীন দূরের ঘটনা ব'লে তিনি এসব উড়িয়ে দিলেন। জাপানীরা দ্বারদেশে দাঁড়ানো—ব্যস্, শুধু এ থেকেই বুঝে নাও বৃটিশের পরাজয় ধ্রুব। আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কে বৃটিশের মুখ-বুঁজে-থাকার সরকারী নীতিতে তিনি অসম্ভব চটে যেতেন: তিক্ততার সঙ্গে বলতেন, 'এর চেয়ে আমাদের যদি ওরা গালমন্দও দিত, তাহলেও ভাল ছিল।'

মাস দেড়েকের মধ্যেই সুভাষচন্দ্র আসল সমস্যাগুলো ঠিক ধ'রে ফেললেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে মোক্ষম জায়গা হল মালয়, বর্মা আর শ্যামদেশ। মালয়ে রীতিমত ৮ লক্ষ ভারতীয়ের বাস; বর্মায় লোকসংখ্যা তার চেয়ে কম—৬ লক্ষ। প্রধানত এই দু জায়গা থেকেই তাঁকে অর্থবল ও লোকবল সংগ্রহ করতে হবে। শ্যামেও হাজার পঞ্চান্ন ভারতীয় থাকে; আজাদ হিন্দ ফৌজে এখান থেকে যেমন মোটা সরবরাহ মিলবে, তেমনি বাকি দুটি দেশের মধ্যে যোগাযোগের একটা সেতুও হবে। সুভাষচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে বর্মায় ও শ্যামে বিশেষ কাজের ভার দিয়ে নিজস্ব প্রতিনিধি পাঠালেন।

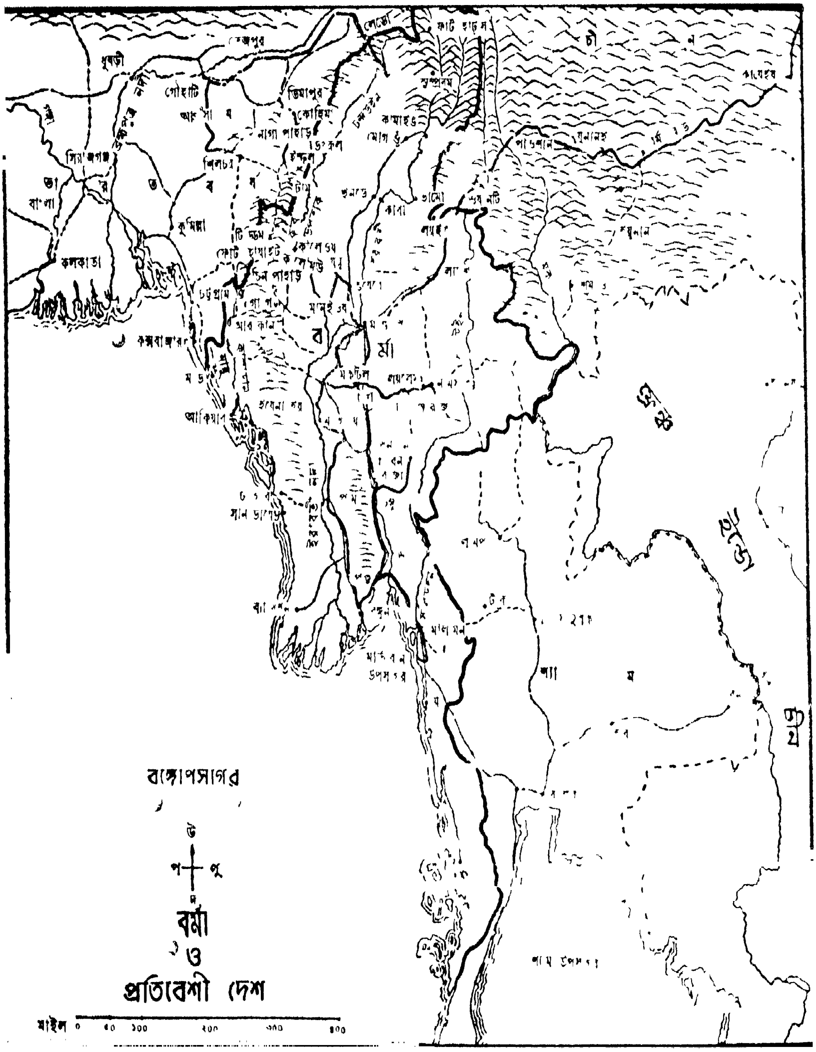
বর্মায় ভারতীয়দের বিভিন্ন প্রচেষ্টার মধ্যে সঙ্গতি আনা ও সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার : শ্যামে লীগ সংগঠনের মধ্যেকার অন্তর্বিরোধ কঠোর হস্তে দূর করা দরকার। চীন ও ইন্দোনেশিয়ায় তখনও তাঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভব হয়নি ; তবে সেখানকার অল্পসংখ্যক ভারতীয়দের ভেতর থেকে টাকা পয়সা ও সৈন্য সংগ্রহের জন্যে তিনি জনকয়েক অভিজ্ঞ সামরিক অফিসার পাঠালেন।

এও স্পষ্ট হল যে, আজাদ হিন্দ ফৌজের পরিচালনাভার তাঁকে নিজের হাতেই নিতে হবে : ৮ই আগস্ট তিনি এই সঙ্কল্প কাজে পরিণত করলেন এবং ২৫শে আগস্ট সৈন্যদের কাছে তাঁর প্রথম 'বিশেষ হুকুমনামা'য়[১১] একথা ঘোষণা করলেন। প্রস্তাবিত ইম্ফল অভিযানে ফৌজের কী ভূমিকা হবে এ নিয়ে জাপানীদের সঙ্গে তাঁর আগেই কথা হয়েছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সেনাধ্যক্ষ ফিল্ড-মার্শাল কাউন্ট তেরাউচি এই অভিযানে আজাদ হিন্দ ফৌজকে আদৌ ঘেঁষতে দিতে চাননি। তিনি বললেন মালয়ে হেরে গিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যেরা মন-ভাঙা হয়ে আছে ; জাপানী যুদ্ধাভিযানের ক্লেশ তারা সইতে পারবে না এবং কষ্টের লাঘব হবে ব'লে তখন তারা দল ত্যাগ ক'রে পুরনো বন্ধুদের কাছে ফিরে যাবার লোভ কিছুতেই সম্বরণ করতে পারবে না। তাঁর প্রস্তাব হল, ভারতবর্ষকে শত্রুকবলমুক্ত করবার পুরো ভার জাপানী সৈন্যবাহিনীর হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত ; সুভাষচন্দ্র নিজে শুধু এইটুকু দেখুন যেন ভারতীয় জনসাধারণের কাছ থেকে শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা পাওয়া যায়, আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান অংশটি সিঙ্গাপুরেই থেকে যাক এবং যারা গুপ্তচরবৃত্তি ও প্রচারের কাজ চালাবে তারাই শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে সঙ্গে চলুক।

এ রকম চাছা-ছোলা কথা শুনে বেশ ধাক্কা লাগল ; সহজ ভাষায় বলতে গেলে, পঞ্চম বাহিনীর ভূমিকা নিতে বলা হচ্ছে—মোহন সিং যে মোহন সিং তিনিও এ প্রস্তাব মানতে পারেননি। সুভাষচন্দ্র চান তাঁর বাহিনীকে যথাসম্ভব বাড়াতে এবং যথাসম্ভব বেশী লোককে দিয়ে লড়াই করাতে। ভারতবর্ষে জাপানীরা বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করলেও তাতে বড় গলা ক'রে ভারতীয়দের যুদ্ধজয়ের কথা বলা যাবে ; তার ফলে, তন্মুহূর্তে ভারতবর্ষ নিজগুণে স্বাধীনতার অধিকারী হতে পারবে। সুভাষচন্দ্র

১১ পরিশিষ্ট-২, ১নং দ্রষ্টব্য

ভেতরের ব্যাপার ধরতে পেরে চট ক'রে প্রশ্নটাকে মুখরক্ষার সমস্যা হিসেবে উপস্থিত করলেন। তিনি বললেন, 'জাপানীরা নিজেদের আত্মোৎসর্গে যদি ভারতের স্বাধীনতা আনে, তাহলে তার চেয়ে গোলামিও ভাল।'[১২] ভারতের জাতীয় সম্মানের কথা তুলে জোর দিয়ে বললেন যে, ভারতীয়দেরই



সব চেয়ে বেশী রক্ত ঢালতে ও আত্মত্যাগ করতে হবে এবং আসন্ন যুদ্ধাভিযানে আজাদ হিন্দ ফৌজকে একেবারে সম্মুখভাগে স্থান দিতে হবে।

১২ 'মাই মেমারিজ অব দি আই, এন, এ, অ্যাণ্ড ইট্‌স্ নেতাজী', শাহ নওয়াজ খান ২৬৫ পৃঃ

শেষ পর্যন্ত পরীক্ষামূলকভাবে একটি রেজিমেণ্ট[১৩] সঙ্গে নিতে তেরাউচি রাজী হলেন। যদি জাপানীদের বিচারে এই রেজিমেণ্ট উৎরোয়, তাহলে বাদবাকি সৈন্যদের যুদ্ধে পাঠানো হবে।

এই প্রতিশ্রুতিতে ভর ক'রে সুভাষচন্দ্র তাঁর পরিকল্পনা স্থির করলেন। সুপ্রীম কম্যাণ্ড-এর হেডকোয়ার্টার স্থাপিত হল, আজাদ হিন্দ ফৌজের ১ম ডিভিশনটিকে পুনর্গঠিত ক'রে শিক্ষার জন্যে উত্তর মালয়ে পাঠানো হল, এরপর প্রধান কাজ দাঁড়াল সৈন্যদের মনোবলের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া। সৈন্যবল ও অস্ত্রবলের দিক থেকে প্রতিপক্ষের শক্তি বেশী, আজাদ হিন্দ ফৌজের কাজ শুধু এই প্রবলতর শত্রুর সম্মুখীন হওয়াই নয়, সেইসঙ্গে শত্রুকে নিজের দলে ভাঙিয়ে আনা, সুতরাং সব চেয়ে বড় কথা হল মনোবল, অন্য যেকোন সৈন্যবাহিনীর তুলনায় আজাদ হিন্দ ফৌজের নিয়মশৃঙ্খলা ও মনের জোর ঢের বেশী হওয়া দরকার। তিনি বললেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস—ভারতসীমান্তে আজাদ হিন্দ ফৌজের আবির্ভাব হবে ভারতের জনসাধারণের কাছে এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে উদাত্ত আহ্বান।'[১৪] কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রত্যেকটি লোকের মন যদি চাঙ্গা থাকে, তাঁর নেতৃত্ব ও তাঁর ব্রত সম্পর্কে যদি তাদের প্রগাঢ় আস্থা থাকে—তবে তো। তা নয়, আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব, কুড়েমি আর ঢিলেমি। দলত্যাগ, চুরি এসব লেগেই আছে, কথাবার্তায় অবিশ্বাস প্রকাশ পায়। সুভাষচন্দ্র সাফ জানিয়ে দিলেন এখুনি এসব বন্ধ করা দরকার। যাদের আগ্রহ নেই, যারা কাপুরুষ—মনের কথা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়ে তারা স'রে পড়ুক, তাদের ধ'রে রাখবার তাঁর এতটুকু ইচ্ছে নেই। ফৌজে বাদবাকি যারা থেকে যাবে তাদের জন্যে তিনি তাঁর যথাসাধ্য করবেন নিহতদের পরিবারের জন্যে পেন্সনের ব্যবস্থা হবে, আহতেরা সেবাযত্ন পাবে এবং সাহসী বীরেরা পুরস্কৃত হবে। সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ ফৌজের বেতন বাড়িয়ে দিলেন, রেশন ব্যবস্থার উন্নতি করলেন, নিয়মিতভাবে তাদের কাছে যেতে লাগলেন। শিক্ষারত অফিসার আর এন-সি-ও'-দের প্যারেড পরিদর্শন করতে লাগলেন,

১৩ বৃটিশের এক ব্রিগেডের সমান জাপানীদের তিন ব্যাটালিয়নের একটি রেজিমেণ্ট

১৪ কুয়ালালামপুরের বক্তৃতা, ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩

খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কেও তাঁর খুব আগ্রহ দেখা গেল। সৈন্যদের খাওয়ার সময় একেকদিন হুট ক'রে এসে প'ড়ে তিনি তাদের সঙ্গে খেতে ব'সে যেতেন। তাঁর বাড়িতে অফিসারদের ছিল অবারিত দ্বার। খাইয়ে দাইয়ে আর কথাবার্তা ব'লে অফিসারদের আদর-আপ্যায়ন করার ব্যাপারে কখনও তিনি কার্পণ্য করতেন না। তাদের তিনি ব্যাডমিণ্টন খেলতে ডাকতেন—শরীর-চর্চার জন্যে প্রতিদিন তার ব্যাডমিণ্টন খেলা চাই, তারা ছিল তার আপন জন, সংগ্রামের সাথী। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের হৃদয়ের মণিকোঠায় তার ফৌজের স্থান, ওতপ্রোতভাবে তিনি তাকে নিজের সঙ্গে বাঁধতে চাইলেন।

নিজের মধ্যে তিনি ফুটিয়ে তুললেন অপার অখণ্ড আত্মবিশ্বাসের ভাব। এই সময় আজাদ হিন্দ ফৌজ পরিদর্শনরত অবস্থায় তোলা তাঁর ফটোতে দেখা যায় দীর্ঘ পদক্ষেপে তিনি চলেছেন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্মুখে নিবদ্ধ কদাচিৎ ঘাড় ঘুরিয়ে এটা ওটা খুঁটিয়ে দেখছেন, তার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মুখের দৃপ্ত ভঙ্গিমা, নিখুঁতভাবে তাকে পায়ে পায়ে অনুসরণ করছে তার পারিষদবৃন্দ। তাঁর বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গি, 'সুপ্রীম কমাণ্ডার' ব'লে নিজেকে জাহির করা, পরনে তকতকে-ঝকঝকে উর্দি, পায়ে নিত্যসঙ্গী দিল্ড-বুট—গরমের দেশে যা মোটেই সুখকর নয়—এ সমস্ত কিছুর একটাই উদ্দেশ্য ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের আনুগত্য ও সংগ্রামস্পৃহা যেন নেতাজীকে এমনভাবে ধ্যানজ্ঞান করে, যাতে এই ফৌজের গোড়াপত্তনের দুঃখময় স্মৃতি মন থেকে মুছে যায় এবং তার চাকচিক্য দেখে সারা ভারতের চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

সেপ্টেম্বর মাসে ১ম ডিভিশনের বাছা বাছা লোক নিয়ে তৈরি হল 'সুভাষ বাহিনী', সুভাষচন্দ্রের সেরা তরুণ অফিসারদের মধ্যে একজন ছিলেন ক্যাপ্টেন শাহ্‌ নওয়াজ, ১।১৪ নং পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের তিনি পুরনো লোক। ক্যাপ্টেন শাহ্‌ নওয়াজের ওপর 'সুভাষ বাহিনী' পরিচালনার ভার পড়ল। ২০শে নভেম্বর এই পরীক্ষামূলক বাহিনী বর্মায় রওনা হল, তার আগে পর্যন্ত চলল তার কঠোর শিক্ষানবিশি। অন্যান্য রেজিমেণ্টেও দ্রুত লোক ভর্তি হল, নতুন নতুন স্বেচ্ছাসৈনিক এল মালয়, শ্যাম, বর্মা ও দক্ষিণ-চীনের নব নির্মীয়মাণ বেসামরিকদের শিক্ষাশিবির থেকে। শিক্ষা সংগঠনের দুটো দিক ছিল, একদিকে অফিসার ও এন-সি-ও'দের শিক্ষা-শিবির, অন্যদিকে

কিশোরদের সংস্থা 'বালক সেনা'। সিঙ্গাপুরে প্রতিষ্ঠিত 'ঝাঁসীর রাণী বাহিনী'তে সৈনিক হিসেবে ও নার্স হিসেবে মেয়েদের কাজ করতে হত।

জাপানীদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ ও রণকৌশল সংক্রান্ত খবর সংগ্রহের যে দায়িত্ব আগে থেকেই আজাদ হিন্দ ফৌজের ওপর দেওয়া ছিল, সুভাষচন্দ্র সে দায়িত্ব পালন করতে রাজী ছিলেন—তবে তিনি চাইলেন গোটা ব্যাপারটা তাঁর নিজের হাতে আনতে। ইতিপূর্বে ভারতীয়দের গুপ্তচর হিসেবে লাগিয়ে কোন ফল হয়নি। ১৯৪২ সালে বর্মায় জাপানীদের বিভিন্ন ঘাঁটি থেকে যে একশো তিরিশ জন ভারতীয়কে ভারতবর্ষে পাঠানো হয়েছিল তারা কেউই ফিরে আসেনি : ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে প্যারাস্যুটে ক'রে যে দলটাকে ভারতবর্ষে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, তাদের কাছ থেকে কোনই খবর পাওয়া যায়নি। শুধু বিস্তৃত সীমান্ত অঞ্চলে কাছাকাছি জায়গা থেকে গুপ্তচর-দলপতিরা তাদের লোকজনদের নিজেদের আওতার মধ্যে রেখে যতটুকু যা খবর আনিয়েছে, ততটুকুই কাজ হয়েছে। চিন্দউইন বরাবর ও আরাকানে হিকারি-কিকান দলের ঘাঁটি থেকে পরিচালিত গুপ্তচর বৃত্তির এই বেড়াজাল আরও মজবুত ও জোরালো করা হল। রেঙ্গুণ ও পেনাং-এর গোয়েন্দা স্কুল থেকে এবং মোহন সিং বিশেষ কাজে লাগাবার জন্যে যে সব দলকে আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, তাদের ভেতর থেকে লোক নিয়ে এই গুপ্তচর বিভাগ গড়ে উঠেছিল। এখন এই দলগুলোর ভূমিকা নতুন ক'রে নির্দিষ্ট হল : 'বাহাদুর দল' শত্রুপক্ষের পশ্চাদ্ভাগে গিয়ে অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ চালাবে, গোয়েন্দাগিরি করবে এবং ভারতীয় সৈন্যদের ভাঙিয়ে আনার চেষ্টা করবে। 'খবরসন্ধানী দলে'রও ঐ এক কাজ হবে যুদ্ধক্ষেত্র এলাকায় এবং 'শক্তিবর্ধক দল' ভারতীয় যুদ্ধ-বন্দীদের একত্র ক'রে কানে মন্ত্র দেবার পর আজাদ হিন্দ ফৌজে চালান ক'রে দেবে।

সুভাষচন্দ্র গোয়েন্দা তৈরির ঘাঁটিগুলো মারফত ভারতবর্ষের সঙ্গে বেতারে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করতে চাইলেন। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে স্বামী টোকিও থেকে জুলাই মাসে এসে পেনাঙে যায়; সুভাষচন্দ্র নিজে রেঙ্গুণের স্কুলগুলো সযত্নে পরিদর্শন করেন। এসব জায়গায় কারিগরি শিক্ষার মান দেখে তাঁরা কেউই তেমন খুশী হতে পারেননি; তবে পেনাঙের বাটু

পাহাটের স্কুলশিক্ষক এস. এন. চোপরার পরিচালিত দলটির মধ্যে সুভাষচন্দ্র সম্ভাবনা দেখতে পেলেন। চোপরার অধীনে একটি সাবমেরিন পার্টি গঠনের প্রস্তাবে জাপানীরা সায় দিল, এই দলে থাকবে জার্মানি থেকে স্বামীর আনীত চারজন লোক এবং যন্ত্রপাতির একাংশ। দলের লোকেরা পাঞ্জাব, বোম্বাই ও বাংলাদেশ থেকে বেতারে সংবাদ দেবে আর চোপরা দিল্লীতে ব'সে তাদের সঙ্গে সংযোগ রাখবে। অক্টোবর মাসে সুভাষচন্দ্র স্বয়ং তাদের কী করতে হবে না হবে বুঝিয়ে দিলেন। কোন্ এলাকায় কোন্ কোন্ লোককে বলা-কওয়া আছে ও কারা কারা সহানুভূতিশীল তার তালিকা তৈরি ক'রে তিনি তাদের হাতে দিলেন এবং তারা কী পেশা ও ছদ্মবেশ নেবে সে বিষয়েও উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন, প্রধান লক্ষ্য হবে সামরিক ও অর্থনৈতিক গুপ্ত তথ্য যোগাড় ক'রে পাঠানো। পরে সময় বুঝে হয়ত তারা রাজনৈতিক কাজও করতে পারে, তবে অভিজ্ঞতা না থাকলে সে কাজ সহজ হবে না; তাছাড়া গুপ্ত বিপ্লবী চক্রগুলোর বিশ্বাস উৎপাদন করতে গিয়ে ধরা পড়ে যাবারও ভয় আছে। সুতরাং ফরোয়ার্ড ব্লক নেতাদের নামের কোন তালিকা তিনি তাদের দিলেন না—বললেন: কারা কারা জেলের বাইরে আছে সব তাঁর জানাও নেই।

সুভাষচন্দ্র তাঁর গুপ্তচরদের এই ব'লে সাবধান ক'রে দিলেন যে, তারা যেন খুব বেশী ঝুঁকি না নেয়। বর্তমানে তারা প্রধানত জাপানীদের হয়ে কাজ করছে। তাতে ভারতবর্ষের লাভ একেবারেই পরোক্ষ। বিপদ দেখলে তারা যেন ঘাপ্‌টি মেরে প'ড়ে থাকে। বললেন, তারা যেন ধৈর্যহারা না হয়। এমন একটা সময় আসবে যখন তাদের প্রাণ হাতে নিয়েও কাজ ক'রে যেতে হবে: সেই সময় না আসা পর্যন্ত তারা যেন নিজেদের গা বাঁচিয়ে চলে। স্বামীর অধীনে একমাস থেকে তারা বেতারযন্ত্রে হাত পাকিয়ে নিল এবং তার দেওয়া সঙ্কেতগুলো আয়ত্ত ক'রে ফেলল। ৮ই ডিসেম্বর গুপ্তচরের এই দলটা ডুবোজাহাজে চ'ড়ে দিন চোদ্দ পরে বোম্বাই আর করাচীর মাঝামাঝি কাথিয়াবাড় উপকূলে এসে নামল। ভারতবর্ষে দু মাসেরও কম সময়ের মধ্যে তারা বেতার-গ্রাহক যন্ত্র সমেত ধরা প'ড়ে গেল।

অস্থায়ী সরকার

রেঙ্গুণে যেমন সরকারী ভবনে এখন ময়ূরকেতন উড়ছে—তেমনি দিল্লীর লাল কেল্লার ওপর অচিরে ত্রিবর্ণ পতাকা উড়বে।[১৫]

১৯৪৩-এর ১লা আগস্ট জাপানীরা যখন বর্মাকে স্বাধীনতা দিল, তখন সুভাষচন্দ্র ওপরের ঐ কথাগুলো ব'লে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। সেপ্টেম্বরের শেষে পুনরায় যখন উৎসব অনুষ্ঠিত হল তখন তিনি আবার রেঙ্গুণে এলেন। বর্মায় নির্বাসিত দিল্লীর শেষ মুঘল বাদশা বাহাদুর শাহের সমাধিস্থল পরিদর্শন ক'রে এই সময়ে তিনি ভারত-বর্মার মধ্যে একটা মিলনের সেতু বেঁধে দিলেন। ১৭ই অক্টোবর ফিলিপাইনের স্বাধীনতা উৎসবে তিনি বক্তৃতা দিলেন। এবার তাঁর নিজের পালা; যাতে ২১ শে অক্টোবর তারিখে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার উদ্বোধন করা যায়, তার জন্যে তিনি তোড়জোড় শুরু ক'রে দিলেন।

জুন মাসেই এই প্রয়োজনীয় ব্যাপারে তোজোর সম্মতি পাওয়া গিয়েছিল; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁকে সিঙ্গাপুরে হিকারি-কিকানের সঙ্গে বহুদিন ধ'রে এ নিয়ে টানাহেঁচড়া করতে হল, এত কাণ্ড করবার পর তবে তিনি স্থানীয় জাপানীদের কাছ থেকে খুটিনাটি ব্যাপারগুলোতে অনুমোদন পেলেন। ইয়ামামোতোর সঙ্গে এর আগেই তাঁর ভাব খানিকটা চটে গিয়েছিল। তার ওপর আবার সুভাষচন্দ্র টোকিওর কর্তাব্যক্তিদের যখন নিজের খুঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে লাগলেন, তখন দুজনের সম্পর্ক আরও খারাপ হল। তবে গোলমালটা তখনকার মত ধামাচাপা দেওয়া থাকল। ইত্যবসরে সুভাষচন্দ্র ঘোষণাপত্রের একটি খসড়া তৈরী করলেন এবং মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। গোড়ায় ছিল যাহোক একটা খাড়া করবার ব্যাপার: একদিকে পুরনো কুখ্যাত মন্ত্রিসভার কাউকে—যদি মন্ত্রিত্ব নিতে রাজীও থাকে—মন্ত্রিসভায় স্থান দিয়ে তিনি জাপানীদের মনে সন্দেহের উদ্রেক করতে চাননি; অন্যদিকে, নিজের নিজের কাজ ছেড়ে চলে আসতে রাজী আছে, এমন উপযুক্ত বুদ্ধিমান লোকেরও খুব অভাব ছিল। সুভাষচন্দ্র

১৫ সংবাদপত্রে বিবৃতি ('অন টু ডেলহি' ৫২ পৃঃ)

গোড়ায় মোটে চারজন মন্ত্রী নিয়োগ করলেন এবং নিজেকে 'রাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী এবং যুদ্ধ ও পররাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী' আখ্যা দিলেন। এ ছাড়া থাকবে আটজন সামরিক প্রতিনিধি ও বিভিন্ন আঞ্চলিক লীগ কমিটির পক্ষ থেকে আটজন বেসামরিক উপদেষ্টা।[১৬]

২০শে অক্টোবর ভোর হবার আগেই কিভাবে ঘোষণাপত্র লেখা হয়েছিল, প্রচার মন্ত্রী শ্রীযুক্ত আয়ার তার বর্ণনা দিয়েছেন।[১৭] সুভাষচন্দ্র একগোছা সাদা কাগজ নিয়ে পেন্সিল দিয়ে ঘস ঘস ক'রে লিখে চললেন। এক মুহূর্ত ফিরে তাকানো নয়, কোন রকম কাটাকাটি নয়, একেকটি পৃষ্ঠা শেষ হয় আর টাইপিস্টের কাছে চলে যায়, টাইপ হবার পর একটি শব্দ, একটি কমারও নড়চড় হয় না। এমনি দ্রুত গতিতে আবিষ্ট হয়ে ঘাড় গুঁজে তিনি ঘোষণাপত্র সম্পর্কে তার বিবৃতি লিখলেন। 'যখন লেখা শেষ হল তখন প্রায় সকাল ছ'টা: রাত দুপুর থেকে দুগ্ধবিহীন কফির পেয়ালায় তিনি চুমুক দিয়ে চলেছেন। কফি ছিল রাত জেগে কাজ করার চিহ্ন: রাত্রে খাওয়ার পর তার কফি খাওয়ার বহর দেখে পরিচারকেরা ব'লে দিতে পারত রাত ক'টা পর্যন্ত তিনি কাজ করবেন।

আয়ারের লেখায় সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনের আরও অনেক খবর পাওয়া যায়, তিনি খুব বেশী রকম সিগারেট খেতেন, উত্তেজনার কোন কারণ ঘটলে একটার পর একটা সিগারেট ধরাতেন এবং প্রত্যেকটা সিগারেট একেবারে শেষ পর্যন্ত খেতেন। তাঁর ডাক্তার এ নিয়ে অনুযোগ করতেন' সিগারেট, পান-সুপারি, ব্যাডমিণ্টন—সবই মাত্রাতিরিক্ত হচ্ছে, চা খেতে তিনি সব সময়েই রাজী। কিন্তু অতিথি-আপ্যায়নের ব্যাপারে মুক্তহস্ত হলেও নিজে তিনি খুব সাদাসিধে নৈষ্ঠিক জীবন যাপন করতেন। তার নিজের ঝোলার মধ্যে থাকত জপের মালা, ছোট্ট একখানা 'গীতা' এবং পড়বার জন্যে আরেকপ্রস্থ চশমা। সিঙ্গাপুরে থাকার সময় তিনি প্রায়ই রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজদের সঙ্গে ব'সে তত্ত্বালোচনা করতেন নয়তো শেষ রাত্রে উঠে গাড়িতে ক'রে মিশনে চলে যেতেন; 'সেখানে সিল্কের গেরুয়াবাস প'রে রুদ্ধদ্বার উপাসনাকক্ষে ব'সে হাতে মালা নিয়ে কয়েক ঘণ্টা ধ'রে ধ্যানস্থ

১৬ পরিশিষ্ট ২ (২) দ্রষ্টব্য

১৭ 'আন টু হিম এ উইটনেস', এস. এ. আয়ার, ১৬৩ পৃঃ

থাকতেন।'[১৮] তাঁর স্বভাব ছিল নিখুঁত, ব্যবহার ছিল যথোচিত, কাজ হাতে নিলে সুচারুভাবে শেষ করতেন। দৈনন্দিন কাজে তিনি এমন মগ্ন হয়ে যেতেন যে, অনেক সময় খাওয়ার কথাও তার মনে থাকত না। সুভাষচন্দ্র জন্তুজানোয়ার ভালবাসতেন; একটু সময় পেলেই তিনি তাঁর পোষা জানোয়ারদের দেখাশুনো করতেন; পরের দিকে রেঙ্গুণে তাব একপাল বাঁদর, ছাগল, খরগোশ, হাঁস, রাজহাঁস আব একটা টাট্টু ঘোড়া ছিল, তাঁর একমাত্র চক্ষুশূল ছিল বেড়াল। ঘরোয়াভাবে তাঁকে দেখে মনে হয় শান্ত:হিসেবী মানুষ; রোজ কলার দাম নিয়ে চাকরকে এবং গাড়ির গতিবেগ নিয়ে ড্রাইভারকে তিনি উত্ত্যক্ত করেন, আবার দীনদরিদ্র অতিথিও যাতে কোন রকম সঙ্কোচ বোধ না কবে সেদিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি।

সিঙ্গাপুরের ক্যাথে সিনেমা হলে ২১শে অক্টোবরের উৎসব-অনুষ্ঠান হল। গোড়ায় সুভাষচন্দ্র জবর গোছের একটা বক্তৃতা দিলেন। তাতে বললেন 'অস্থায়ী সরকাব গঠনের পেছনে ভারতের অসামরিক জনসাধারণেব সমর্থন তো আছেই, এমন কি বৃটেনের অধীন ভারতীয় সৈন্যবাহিনীরও বেশ বড একটা অংশের সমর্থন আছে।' ভারতবর্ষেব সীমান্ত অতিক্রম করতে পাবলে এবং ভারতেব মাটিতে জাতীয় পাতাকা স্থাপন করতে পারলে সত্যিকাব বিপ্লব শুরু হয়ে যাবে, 'যার ফলে ভারতে শেষ পর্যন্ত বৃটিশ রাজত্বের অবসান ঘটবে'—এ বিষয়ে তাঁব কোন সন্দেহ ছিল না। জাপানীদের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত তিনি দশটি জঙ্গী বিমানেব দাম দিতে চাইলেন। ইয়ামামোতোর উপস্থিতিতে বৈকালিক অধিবেশনে ঘোষণাপত্র[১৯] পড়া হল। খুব রংচঙে জমকালো দৃশ্য: সারা হলঘর জুড়ে নানা রঙের নিশান, বড বড় হরফে লেখা শ্লোগান, জাতীয় পতাকা—সুভাষচন্দ্র নিজে এবং তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যেরা জমকালো ইউনিফর্ম প'রে হাজির—মঞ্চের ওপর সারি-সারি মাইক্রোফোন; যেন বহির্বিশ্বের দুর্ধর্ষ ক্ষমতার মূক প্রতীক: আজাদ হিন্দ ফৌজের গার্ড-অব-অনার: প্রাচ্যের কূটনীতিক ও রাজনৈতিক নেতাদের স্বাগত-সম্ভাষণ। এর আগে কারো চোখে পড়েনি—কিন্তু চারিদিক দেখেশুনে এখন তাদের কেমন যেন মনে হতে লাগল এর মধ্যে সত্যি আছে,

১৮ 'আন টু হিম এ উইটনেস', এস. এ. আয়ার, ২৬৯ পৃঃ
১৯ অন টু ডেল্‌হি', ১৩১ পৃঃ। পরিশিষ্ট ২ (২) দ্রষ্টব্য

যথার্থই অনেক কিছু হাতে এসেছে। সেই সঙ্গে রীতিমতভাবে আবেগ জাগিয়ে তোলা হল। এই সরকার কারো হাতধরা নয়—দশ দশটি বিমান উপহার দেওয়া, বাংলাদেশের জন্যে চাল পাঠাতে চাওয়া, এসব ঘটনা থেকেই তা বোঝা যাবে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর আনাতোলিয়ায় কামাল পাশার গঠন-করা অস্থায়ী সরকারের মতই এই সরকার। আপাতত এই সরকারের কাজের পরিধি হবে সঙ্কীর্ণ, সামরিক ব্যাপারই প্রাধান্য পাবে—তবে সময় এলে এই সরকার 'নিজ দেশে কার্যরত যে কোন সরকারের মতই স্বাভাবিক ভাবে কাজকর্ম চালাবে।' এরপর চারিদিকের সেই আবেগে-ফেটে-পড়া অবস্থার মধ্যে সুভাষচন্দ্র প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে শপথ গ্রহণ করলেন :

> ঈশ্বরের নামে আমি এই পবিত্র শপথ গ্রহণ করছি যে, ভারতবর্ষকে ও আমার দেশের আটত্রিশ কোটি মানুষকে শৃঙ্খলমুক্ত করবার জন্যে আমি, সুভাষচন্দ্র বসু, আমার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত স্বাধীনতার পবিত্র যুদ্ধে রত থাকব।
>
> আমি চিরদিন ভারতের সেবক হয়ে থাকব, এবং আটত্রিশ কোটি ভারতীয় ভাইবোনদের মঙ্গলসাধন হবে আমার জীবনের সর্বোচ্চ ব্রত।
>
> স্বাধীনতালাভের পরেও, আমি ভারতের স্বাধীনতা সুরক্ষিত করার জন্যে আমার শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত বিসর্জন দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকব।[১৯]

মন্ত্রিসভার সদস্যেরাও একে একে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে একভাবে শপথ নিলেন। দলবদ্ধভাবে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হল। রবীন্দ্রনাথের এই গানটি জার্মানিতেও গাওয়া হত ; এখানে সে গানটি হিন্দীতে অনুবাদ ক'রে নেওয়া হয়েছিল এবং সুভাষচন্দ্রের নির্দেশে একজন তরুণ ভারতীয় সৈনিক তাতে সুর দিয়েছিল। গান আরম্ভ হতেই যে যেখানে ছিল সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। সুভাষচন্দ্র, ইয়ামামোতো আর মন্ত্রীর দল অ্যাটেন্‌শনের ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন : তারপর মুহুর্মুহু হর্ষধ্বনি, শ্লোগান আর হাততালি। মনে হল, স্বাধীনতার দিন যেন এসে গেছে। প্রতিনিধিরা বিমুগ্ধনেত্রে চারিদিকে

১৯ 'অন টু দিল্লি', ১৩: পৃঃ। পরিশিষ্ট ২ (২) দ্রষ্টব্য

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, নিজের প্রিয়জনদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে এই মুহূর্তের খানিকটা স্মৃতি-সুধারস তারা হৃদয়পাত্রে ভ'রে নিতে চাইছে।

২৩শে অক্টোবর মধ্যরাত্রে অস্থায়ী সরকার বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। যুক্তরাষ্ট্রকে এর মধ্যে টানার ব্যাপারে মন্ত্রিসভায় কারো কারো আপত্তি ছিল। সুভাষচন্দ্র তাতে চটে উঠলেন—তাঁর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা সম্পর্কে তখন কিংবা তার পরে কখনই কোন প্রশ্ন ওঠেনি; মন্ত্রীদের ওপর কোন ভার ছিল না এবং তাঁদের কাজ ছিল শুধু পরামর্শ দেওয়া। সপ্তাহ কয়েক পরে জাপান, বর্মা ক্রোশিয়া, জার্মানি, ফিলিপাইন, নানকিং, মাঞ্চুকুও, অবশিষ্ট ফ্যাশিস্ট—ইতালি, শ্যাম—এরা সবাই এই সরকারকে স্বীকার করে নিল, কিন্তু ভিশি- ফ্রান্স থেকে স্বীকৃতি না আদায় সুভাষচন্দ্র ক্ষুণ্ণ হলেন।

স্বীকৃতি দেওয়া এক এবং বৈধতা মেনে নেওয়া আর এক। সরকারের একমাত্র রাজ্যপাট হল লীগ এবং একমাত্র প্রজাবৃন্দ হল লীগের সদস্যেরা, তাও আবার বিদেশে স্থায়ী বসবাসকারী হিসেবে তাদের কোন আনুগত্যের ব্যাপার থাকলে তার বিপক্ষাচরণ করা যাবে না। যতক্ষণ ভারতবর্ষের কোন একটি অংশে প্রবেশ করা না যাচ্ছে, ততক্ষণ অস্থায়ী সরকার হল ভবিষ্যতের সরকার। এ অবস্থায় আইন প্রণয়ন করা যাবে না, নিজের ভূখণ্ড ব'লে কিছু নেই, বিদেশী হিসেবে বিশেষ সুবিধার অধিকারী হওয়া যাবে না, কাউকে নাগরিক অধিকার কিংবা শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়া সম্ভব হবে না। এ সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র এই সরকারের পক্ষ থেকে কয়েকটা নির্দিষ্ট দাবি জানালেন:

> অস্থায়ী সরকার প্রত্যেক ভারতীয়ের আনুগত্যের অধিকারী ব'লে এতদ্দ্বারা স্বীয় দাবি জানাচ্ছে। এই সরকার প্রত্যেক নাগরিককে ধর্মাচরণের স্বাধীনতা এবং সেইসঙ্গে সমানাধিকার ও সমান সুযোগ দেবে ব'লে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।[২০]

খুবই সাহসের কথা ও স্পর্ধাযুক্ত দাবি, অকুতোভয় এই মানুষটি এত সাহস ও

২০ 'অন, ডেল্‌হি' ১৩১ পৃ. পরিশিষ্ট ২(২) দ্রষ্টব্য

এত বড় স্পর্ধা খুব কমই দেখিয়েছেন। কিন্তু তিনি বিলক্ষণ জানতেন তাঁর ক্ষমতা কিসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। জাপানীরা লীগকে দিয়েছিল ভারতীয় সম্প্রদায়ের ওপর খবরদারি করবার ভার। ফলে তার পক্ষে নানাভাবে চাপ দেওয়া সম্ভব হয়েছিল—যেমন, সিঙ্গাপুরে রেশনকার্ড বিলি করার ব্যাপারে। এর বাইরে, জাপানী নিরাপত্তা পুলিশকেও লীগ খবর দিয়ে কাজে লাগাতে পারত ; লীগের কথা তারা শুনত এই কারণে যে, লীগ যদি তার দাপট বজায় রাখতে পারে তাহলে তাতে জাপানীদেরই পোয়া-বারো। লীগের জায়গা নিল অস্থায়ী সরকার—অবশ্য অবস্থা সেই একই থেকে গেল। রাসবিহারী বসু যেমন লীগ সদস্যদের চালিয়ে নিয়ে বেড়াতেন, ঠিক তেমনি ভাবেই নেতাজী তার প্রজাবৃন্দের ওপর কর্তৃত্ব করতে লাগলেন—তাদের আনুগত্যের জোরেও নয় কিংবা তাঁর নিজের সার্বভৌম অধিকারবলেও নয়, আসলে জাপানীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে।

এর অল্প কিছুদিন পরে মালয়ে অস্থায়ী সরকার ও তার নেতা সুভাষচন্দ্রের প্রতি 'আনুগত্যসূচক শপথ' চালু হয়েছিল, তাতে আইনত অথবা কার্যত অবস্থার কোন হেরফের হয়নি। সুভাষচন্দ্র জার্মানিতে থাকার সময়েও শপথ গ্রহণের ব্যাপারটাকে প্রচারের অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন এবং এখন তা খুবই কাজের ব'লে তিনি মনে করলেন। মালয়ের ভারতীয় সম্প্রদায়কে বলা হল :

> আমাদের সরকারের প্রতি আনুগত্যের শপথ একমাত্র লীগের সদস্যেরাই গ্রহণ করতে পারবে; ভারতীয়দের মধ্যে যারা লীগের সদস্য নয়, তাদের প্রকৃত ভারতীয় ব'লে গণ্য করা যেতে পারে না।

শাখা লীগের সভাপতির কাছ থেকে ছোট নীল কার্ড নিয়ে তাঁর সামনে ব'সে ছাপানো শপথবাক্যের নিচে সই করতে হত :

> আমি·····, আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের সভ্য, এতদ্দ্বারা ঈশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা করছি এবং এই পবিত্র শপথ গ্রহণ করছি যে, আমি কায়-মনোবাক্যে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত

থাকব এবং সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্যে যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকব।

লীগের মোদ্দা যে কাঠামো তা পরিবর্তন করা মন্ত্রিসভার দিক থেকে দরকার হয়নি। বিভাগীয় কর্তাদেব বলা হয় এখন মন্ত্রী, বিভাগীয় এই কর্তৃমণ্ডলী ও সামরিক কর্তৃপক্ষ মারফত সুভাষচন্দ্র কাজ চালাতে লাগলেন। মন্ত্রিসভা হাতে পেয়ে তাঁর বল আরও বেড়ে গেল এবং আরও ভালভাবে তাঁকে খেলানো গেল। লীগের চেয়ে এই মন্ত্রিসভা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে অনেক বেশী উদাব দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করল এবং তাতে নৈতিক ফল আরওভাল হল। সুভাষচন্দ্র এই ভেবে উৎফুল্ল হলেন যে, তিনি কিছু করতে পারুন না পারুন তাঁর আসন পাকা হল। তিনি পদবী পেয়েছেন, পদও পেয়েছেন, তা সে যতই ভিত্তিহীন হোক। তিনি হলেন 'রাষ্ট্রের মাথা', (হেড অব দি স্টেট) এবং শ্রীযুক্ত কে, পি, কে মেনন 'বলি, তাঁর মাথার অবস্থাটা (স্টেট অব দি হেড) কেমন?' ব'লে চিৎকার কবলেও সাধারণ ভারতীয়দেব কাছে ওটা ছিল মনে ধরবার মত, তাতে তারা অনেক বেশী ভরসা পেল, বৃটিশ চলে গিয়ে পযন্ত তেমন কোন ভরসা তারা পাচ্ছিল না।

গোড়াব যুগে যা ছিল তার চেয়ে এখন লীগ বেশী সুসংগঠিত। এপ্রিল মাসে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিস্-এর অফিসার লেফটেনান্ট-কর্ণেল চ্যাটার্জীকে দিয়ে রাসবিহারী বসু লীগের সদর-দপ্তর ঢেলে সাজাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। চ্যাটার্জীর কাজ সুভাষচন্দ্রের খুব পছন্দ হয়েছিল এবং তাঁর সংগঠনেব ওপর ভিত্তি ক'রে অস্থায়ী সরকারের রূপ দেওয়া হল। একটি সামগ্রিক মহাকরণ এবং অর্থ, প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা, স্বাস্থ্য, ট্রেনিং, সৈন্য-সংগ্রহ, পুনর্গঠন, শিক্ষা ও মহিলা-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আটটি বিভাগ থাকল। আস্তে আস্তে এই সমস্ত দপ্তরের জন্যে মন্ত্রী নিয়োগ করা হল। সুভাষচন্দ্র দেখলেন লীগের ভেতর কঠোর শৃঙ্খলা আনা দরকার : যুদ্ধ শেষ না হওয়া পযন্ত তাঁর হুকুমে সমস্ত রকম নির্বাচন বন্ধ ক'রে দেওয়া হল এবং তিনি ফতোয়া দিলেন যে, যারা মনেপ্রাণে সহযোগিতা করতে অপারগ হবে অথবা বিরোধী-প্রচার করবে তাদের লীগ থেকে বহিষ্কৃত করা হবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি লীগের মধ্যে পাহারাদারির ব্যবস্থা মেনে নিলেন এবং তাকে জোরদার

করলেন ; অপরাধীদের শাস্তিবিধানের ভার তিনি নিজের হাতে নিলেন, বহুক্ষেত্রে তিনি স্বয়ং তদন্ত পরিচালনা করলেন।

বরাবরের মত এখনও সব চেয়ে বড় সমস্যা দাঁড়াল টাকার। সুভাষচন্দ্র দুদিক দিয়ে সমাধানের রাস্তা খুঁজলেন। তিনি বুঝেছিলেন জাপানীদের কাছ থেকে অর্থসাহায্য না নিলে তাঁর চলবে না এবং তিনি প্রায়ই বলতেন ভারতের জন্যে যেখান থেকেই সাহায্য আসুক নিতে হবে ; কিন্তু তিনি জানতেন তাঁর দলের মধ্যে এই মনোভাবটি খুব প্রবল—যেন জাপানীদের কাছ থেকে টাকা নেবার মানে এ না হয় যে, তারা যা বলবে তাই করতে হবে। জাপানীদের কাছ থেকে কিছুটা সাহায্য তাঁর ন্যায্যতই প্রাপ্য। আজাদ হিন্দ ফৌজে যারা আছে কিম্বা নেই, যুদ্ধবন্দী হিসেবে তাদের সকলের ব্যয়ভার জাপানীদেরই বহন করতে হবে ; কাজেই এতে কোন বাড়তি খরচ হচ্ছে না। অবশ্য সুভাষচন্দ্র চেষ্টা করবেন আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য বেসামরিকদের ভেতর থেকে সৈন্যসংগ্রহ ও তাদের শিক্ষাদান সহ লীগের যাবতীয় কার্যকলাপের ব্যয়ভার বহন করতে। ১৯৪৩-এর অক্টোবর নাগাদ দেখা গেল এই বাবদ মাসিক খরচের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় দশ লক্ষ স্থানীয় ডলার (আনুমানিক ১৫ লক্ষ টাকা) ; চ্যাটার্জী দেখলেন নতুন নতুন সৈন্য সংগ্রহ ও শিক্ষাদানের পরিকল্পনাগুলো চালু হলে খরচের পরিমাণ পাঁচগুন বেড়ে যাবে। অথচ টাকার আমদানি সে হারে বাড়েনি ; ১৯৪৩-এর জুলাই পর্যন্ত মোট চাঁদা উঠেছে বিশ লক্ষ ডলারেরও কম।

কাজেই সব বক্তৃতাতেই সুভাষচন্দ্রকে টাকার কথা বলতে হয়। গোড়ার দিকে ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে সকলে মুক্তহস্তে চাঁদা দিয়েছে ; কিন্তু ক্রমে সে উৎসাহে ভাঁটা পড়ল এবং সুভাষচন্দ্রও আবেদন ছেড়ে শাসানির রাস্তা ধরলেন। ১৭ই অক্টোবর তিনি বললেন, 'আমি আরও দুতিন সপ্তাহ অপেক্ষা ক'রে দেখব ; তারপর ভারতবর্ষের নাম নিয়ে যা করতে হয় তাই করব।' ২৫শে অক্টোবর মালয়ের ব্যবসায়ীদের সম্বোধন ক'রে তিনি কড়াভাবে বললেন :

> আইনত দেখতে গেলে যে দেশ যুদ্ধে লিপ্ত সে দেশে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব'লে কিছু থাকে না।……আপনারা যদি ভেবে থাকেন আপনাদের ধনসম্পত্তি আপনাদের নিজেদের, তাহলে ভুল

ভেবেছেন।…ধনপ্রাণ এখন আর আপনাদের নয়; ভারতবর্ষ—একমাত্র ভারতবর্ষই তার মালিক।…

যে ভাবেই হোক আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে…আমরা এখন যুধ্যমান স্বাধীন মানুষ…এই সহজ সত্যটি উপলব্ধি করতে পারলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনারা বুঝবেন আপনাদের নিজের বলতে এখন আর কিছুই নেই; প্রাণ নয়, সম্পত্তি নয়, কিছুই এখন আপনাদের নয়।

যদি আপনারা এই সহজ সাদা কথাটা বুঝতে না চান তাহলে আপনাদের সামনে সাফ একটি রাস্তা খোলা……যে পথ ইংরেজেরা নিয়েছে। এক সময়ে তারা এখানে রাজত্ব করেছে, কিন্তু আজ তাদের এখানে থাকার একটিমাত্র জায়গা; সে জায়গা হল জেলখানা। আপনারা যদি চান জেলখানায় যেতে পারেন, ইংরেজদের পাশেই আপনাদের স্থান হবে। কিন্তু মনে রাখবেন, যুদ্ধ শেষ হবার পর ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হবে, তখন সেই স্বাধীন ভারতে আপনাদের ঠাঁই হবে না।

সুভাষচন্দ্রের কানে এসেছিল মালয়ের ধনী ভারতীয়েরা নাকি এই ব'লে গাঁইগুঁই করছে যে, তিনি তাদের ওপর জুলুম করছেন এবং তারা অন্য দেশের নাগরিক হয়ে ও অন্যান্য উপায়ে টাকা দেবার হাত থেকে বাঁচতে চাইছে। তিনি বললেন, তার আগে তারা আর একবার ভেবে দেখুক:

ভারতবর্ষ যাতে শত্রুকবলমুক্ত হয় আমাকে সেই চেষ্টা করতে হবে; যে ভাবে যত কষ্ট ক'রেই হোক ভারতবর্ষকে আমি স্বাধীন করব।…যদি আপনারা তার দায় এড়াতে চান, সোজাসুজি বলুন যে, আমরা স্বাধীনতা চাই না; আমি আগেই বলেছি, সেক্ষেত্রে আপনাদের আলাদা রাস্তা বেছে নিতে হবে।…

যতক্ষণ আপনারা নিজেদের ভারতীয় ব'লে জাহির করছেন এবং যতক্ষণ ভারতীয় হিসেবে চাইছেন পূর্ব এশিয়ার টাকায় থাবা বাড়াতে ও টাকা করতে, ততক্ষণ স্বাধীন ভারতীয় হিসেবে আপনাদের দায়-দায়িত্ব পালন না ক'রে উপায় নেই। ভাববেন না কর্তব্য পালনের ব্যাপারটা আপনাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করবে।…

আপনাদের ধনসম্পত্তির একচ্ছত্র মালিক আজাদ হিন্দ অস্থায়ী সরকার; আমি সেই সরকারের প্রতিভূ।...আমি আগেই বলেছি যে ভাবে যত কষ্ট ক'রেই হোক ভারতের স্বাধীনতা আমাদের অর্জন করতে হবে এবং 'যুদ্ধের জন্যে সমস্ত কিছু উৎসর্গ করার নীতি সম্ভব হলে স্বেচ্ছামূলকভাবে, দরকার হলে বাধ্যতামূলকভাবে চালু করতে হবে।.. যদি আপনারা স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসতে রাজী না হন, তাহলে ভাববেন না আমরা সেজন্যে আপনাদের গোলাম হয়ে থাকব।... আমাদের লক্ষ্য সাধনে সহায় হতে যারা অস্বীকার করবে, তারা প্রত্যেকে...আমাদের শত্রু।

কিন্তু ওতে সুবিধে হচ্ছিল না: সুভাষচন্দ্রের চাহিদা অনেক বেশী; তিনি দেখলেন ভারতীয়দের বিষয়সম্পত্তির ওপর রীতিমতভাবে কর ধায করা দরকার। চ্যাটার্জীকে বলা হল একটা কৌশল বার করতে: তারই ফলে 'তহবিল তত্ত্বাবধায়ক বোর্ড' তৈরী ক'রে ১৯৪৪-এর শুরুতে ভারতীয়দের বলা হল কার কত সম্পত্তি আছে বোর্ডকে জানাতে। সম্পত্তির পরিমাণের ওপর শতকরা দশ থেকে পঁচিশ ভাগ কর বসল এবং ক্রমশ জোরের সঙ্গে আদায় করা হতে লাগল।।

সুভাষচন্দ্র আরও একটি বিষয়ে চ্যাটার্জীকে মাথা ঘামাতে বললেন: দখলীকৃত ভারতীয় এলাকায় শাসন-পরিচালনা কি ভাবে হবে। সুভাষচন্দ্র বললেন, আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের মাটিতে পা দেবার পর 'সমগ্র ভারতবর্ষ মুক্ত করতে কমপক্ষে বারোমাস—এবং হয়ত তার বেশিও—লাগতে পারে।'[২১] একজন প্রাক্তন ভারতীয় ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে সিঙ্গাপুরে তিনি 'পুনর্গঠন কলেজ' খুললেন, বেসামরিক শাসন-পরিচালনা ও রিলিফের কাজে লোকজনকে তালিম দেওয়া তার কাজ হল। পত্তন হবার প্রথম সপ্তাহেই মন্ত্রিসভার বেশ কয়েকটি বৈঠক বসল, তাতে এইরকমের আরও নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা হল। স্বাধীন ভারতে সাম্প্রদায়িক সমস্যার মূলোচ্ছেদ—যার নাম দেওয়া হল 'জাতীয় ঐক্য'—আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের পদক ও পেন্সন, দখল-করা এলাকায় চালু করবার জন্যে

২১ ১৯৪৩-এর ২রা অক্টোবরের বেতার বক্তৃতা

অস্থায়ী সরকারের ব্যাঙ্কনোটের নক্সা—এসব প্রশ্ন খুঁটিয়ে বিচার করার জন্যে সাব-কমিটি তৈরি করা হল। পদক ও নোটের নক্সা তৎক্ষণাৎ ঠিক হয়ে গেল এবং নভেম্বর মাসে টোকিওতে অর্ডার পাঠানো হল। জাতীয় ঐক্যের ব্যাপারটা অতটা জরুরী ছিল না এবং সে বিষয়ে রিপোর্ট পেশ করা হল অনেক পরে। ক্রমশ সিদ্ধান্ত হল ভারতের যোগাযোগের ভাষা হবে হিন্দুস্থানী,[২২] 'জয়হিন্দ' হবে সাধারণ সম্ভাষণ, কংগ্রেসের ত্রিবর্ণ নিশান হবে জাতীয় পতাকা এবং রবীন্দ্রনাথের গান হবে জাতীয় সঙ্গীত।

আবার তোজো সকাশে

বৃহত্তর পূর্ব এশিয়া সম্মেলনে যোগ দেবার জন্যে সুভাষচন্দ্র ২৫শে অক্টোবর বিমান পথে সিঙ্গাপুর থেকে টোকিও যাত্রা করলেন। ১লা নভেম্বর তোজোর সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করলেন। সুভাষচন্দ্র বুঝতে পারছিলেন হিকারি-কিকানকে নিয়ে ফ্যাসাদে পড়তে হতে পারে; যে সব ব্যাপারে তিনি এখুনি অগ্রসর হতে চান, সে সব ব্যাপারে টোকিওর কর্তাদের দিয়ে তিনি পাকাপাকিভাবে সিদ্ধান্ত করিয়ে নিতে চাইলেন। তোজোর সঙ্গে সমানে সমানভাবে তাঁর কথা হল। তেরাউচির মনোভাব সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র অভিযোগ করলেন এবং বললেন ১৯৪৪-এর অভিযানে যেন আজাদ হিন্দ ফৌজের গোটা ১ম ডিভিশনকে পাঠান হয়। তিনি চাইলেন মালয়ে আরও দুটি ডিভিশন গড়তে, ভারতীয় গোয়েন্দা শিক্ষাকেন্দ্রগুলোকে তাঁবে আনতে এবং হিকারি-কিকানের অধীনে ভারতীয়দের গোপন কার্যকলাপ বন্ধ করতে। তিনি তাঁর নিজের প্রধান কর্মস্থল রেঙ্গুণে সরিয়ে নিয়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং বললেন জাপ-অধিকৃত একমাত্র ভারতীয় এলাকা—আন্দামান আর নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ—তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হোক। জাপবাহিনী ভারতের মাটিতে যেমন যেমন অগ্রসর হবে, সেইমত তাদের অধিকৃত এলাকা তাঁর কর্তৃত্বে আসবে—এ বিষয়েও তিনি সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি চাইলেন।

২২ সুভাষচন্দ্রের বরাবরকার মত ছিল হিন্দী ও উর্দুর পার্থক্যটা কৃত্রিম। তিনি রোমান লিপি গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন কেননা তাতে ভারতবর্ষে সংহতি আসবে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক সহজ হবে

ব্যাঙ্কনোট ছাপানো এবং ভারতীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত পুরনো অমীমাংসিত প্রশ্ন—এ সব নিয়েও আলোচনা হল।

এর মধ্যে মাত্র দু তিনটি বিষয়ে তোজো নিজে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। তিনি কথা দিলেন আন্দামানের হস্তান্তর সম্পর্কে অচিরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং অধিকৃত এলাকাগুলোর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরে ভাবা হবে। ব্যাঙ্কনোট ছাপানোব ব্যাপারে তাঁর আপত্তি নেই এবং পাকাপাকিভাবে জানিয়ে দিলেন যে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরেরকার ভারতীয়-দের পরিত্যক্ত ধনসম্পত্তি অস্থায়ী সরকারের পরিচালনাধীন হবে। বাদ বাকি ব্যাপাবগুলোতে তিনি সাহায্য করবেন ব'লে সুভাষচন্দ্রকে প্রতিশ্রুতি দিলেন; তবে এসব বিষয়ে তার সেনাপতিমণ্ডলী ও সমর-দপ্তরের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে হবে।

৫ই ও ৬ই নভেম্বর পরিষদ ভবনে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। সুভাষচন্দ্রের স্থান দর্শকের আসনে। সহ-সমৃদ্ধি অঞ্চলে ভারতবর্ষকে শরিক করতে পারেনি ব'লেই তাঁর প্রতিনিধি হওয়ার পূর্ণ অধিকার মেলেনি। তা সত্ত্বেও তোজো ও প্রতিনিধিরা বলবার পর সুভাষচন্দ্র যে বক্তৃতা দিলেন তাতে ব্যক্তিগতভাবে তিনি সকলের প্রশংসাভাজন হলেন। বক্তৃতায় তিনি বললেন, সহ-সমৃদ্ধি অঞ্চল গঠনেব তাৎপর্য সারা বিশ্ব জুড়ে। এই ধবণের আঞ্চলিক সংগঠন থেকেই কালক্রমে বিশ্বব্যবস্থা গড়ে উঠবে। বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জাপানের যে যুদ্ধ, তার সঙ্গে বিশ্ব-স্বার্থও জড়িত :

> ভারতবর্ষ থেকে যদি ইঙ্গ-মাকিন সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করা নাযায়, তাহলে পদানত মুসলিম জাতিগুলির পক্ষে বৃটিশের নাগপাশ ছিন্ন ক'রে হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করা শুধু দুঃসাধ্য নয়, হয়ত অসম্ভবও বটে।

ভারতবর্ষসহ সকলেরই ভাগ্য জাপানীদের যুদ্ধজয়ের ওপর নির্ভর করছে :

> যদি আমাদের মিত্রপক্ষ পরাস্ত হয়, তাহলে আগামী একশো বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের আর স্বাধীন হবার কোন আশা থাকবে না।... ভারতের সামনে একটিই পথ...বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে

> আপোষহীন লড়াই চালিয়ে যাওয়া। যদি-বা অন্য দেশের পক্ষে ইংলণ্ডের সঙ্গে আপোষ করবার কথা ভাবা সম্ভব হয়, ভারতীয় জনসাধারণ তো সে কথা মনেও স্থান দিতে পারে না। বৃটেনের সঙ্গে আপোষ করার মানেই হল দাসত্বের সঙ্গে রফা করা; আমরা পণ করেছি আর আমরা দাসত্বের সঙ্গে আপোষ করব না।

সুতরাং ভারতের এই দৃঢ়তা সম্পর্কে জাপানকে ভরসা দেওয়া যায়। সংগ্রাম হবে তীব্র। মূল্যও দিতে হবে অনেক, সম্মেলনে আর যেসব দেশ এসেছে তাদের চেয়ে ভারতকে হয়ত ঢের বেশী মূল্যই দিতে হবেঃ তাদের কাছে প্রশ্ন হল স্বাধীনতা রক্ষা করার, ভারতের কাছে প্রশ্ন স্বাধীনতা অর্জনের। ভারতের ভাগ্য পরিবর্তনে ও জাপানের অপরাজেয়তায় অবশ্যই তাঁর পুরোপুরি আস্থা আছে। মরি আর বাঁচি, ভারতবর্ষ স্বাধীন হলেই হল এবং পূর্ব-এশিয়া থেকে ইঙ্গ-মাকিন সাম্রাজ্যবাদের আপদ চিরতরে বিদায় হলেই হল।

সঙ্গে সঙ্গে তোজোর কাছ থেকে ঘোষণা এল, জাপান যে সাহায্য করতে ব্যগ্র তার প্রমাণ হিসেবে অচিরে অস্থায়ী সরকারেব হাতে আন্দামান আর নিকোবব দ্বীপপুঞ্জের ভার অর্পণ করা হবে। আন্দামান-নিকোবর ছিল জাপানের গুরুত্বপূর্ণ নৌ-ঘাঁটি; যুদ্ধ চলাকালে এই এলাকার শাসন পরহস্তে ছেড়ে দেবার কোন অভিপ্রায় জাপানের ছিল না; তাছাড়া আন্তর্জাতিক আইনের দিক থেকেও বাধা ছিল।[২৩] এসব ব্যাপার পরে বোঝা গেল। প্রকৃতপক্ষে সুভাষচন্দ্র ঠকেননি; বরং তিনি নববিধান সূচিত করার জন্যে এই রঙীন ফানুসটিকে কাজে লাগালেন; তাঁর রাজ্যের নামকরণ করলেন যথাক্রমে 'শহীদ' ও 'স্বরাজ' দ্বীপ।

আনুষ্ঠানিকভাবে এই দ্বীপ দুটিতে সফর করবার জন্যে এবং হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত সেখানে একজন ভারতীয় চীফ কমিশনার নিয়োগের জন্যে নৌ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অতিকষ্টে তিনি অনুমতি যোগাড় করলেন। নৌদপ্তর এর বেশী যেতে রাজী নয়।

সৈন্যবাহিনীর বড় কর্তা সুগিয়ামাকে ধ'রে তিনি রাজী করালেন যে, ১৯৪৪-এর অভিযানে জাপানী সেনাপত্যের অধীনে মিত্র বাহিনী হিসেবে

২৩ 'ইণ্টার ন্যাশনাল ল', ওপেন হাইমার, ২য় খণ্ড, ৩৪১ পৃঃ

আজাদ হিন্দ ফৌজকে সঙ্গে নেওয়া হবে। সুতরাং তার ভূমিকা ও কর্তব্য স্থির করবে বর্মার সেনাধ্যক্ষ। ২য় ডিভিশন গঠনের জন্যে সৈন্যভর্তি, ৩য় ডিভিশনের পরিকল্পনা নেওয়া এবং জাপানে নিয়ে গিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়া—এসব ব্যাপারে সুগিয়ামার সম্মতি পাওয়া গেল। আজাদ হিন্দ ফৌজে যারা প্রাক্তন যুদ্ধবন্দী, তাদের ব্যয়-ভার বহন করবে জাপানীরা এবং বেসামরিকদের ভেতর থেকে যারা সৈন্যদলে এসেছে তাদের খরচ জোটাবেন সুভাষচন্দ্র। অস্ত্রশস্ত্রের দিক থেকে কিছু ভাববার নেই; বৃটিশের যে পরিমাণ অস্ত্র তাদের হাতে এসেছে তাতে হেসে খেলে এখন অনেকদিন চলবে।

এবার সিঙ্গাপুরে ফেরবার পালা। টোকিও থেকে সুভাষচন্দ্র রওনা হলেন ১৯৪৩-এর ১৮ই নভেম্বর। আসার পথে পড়ল নানকিং, শাংহাই, ম্যানিলা আর সাইগন। সফর তো নয়, এ যেন সুভাষচন্দ্রের দিগ্বিজয়ে বার হওয়া: টোকিওতে দ্বিতীয় আর কোন বিদেশী রাষ্ট্রনেতা ছিল না রাজনৈতিক খ্যাতিতে কিংবা ব্যক্তিত্বের জোরে যে সুভাষচন্দ্রের ধারে কাছে দাঁড়াতে পারে। নিমন্ত্রণ কর্তাদের কাছ থেকে তিনি সমাদরও পেলেন প্রচুর। জাপানী জনসভায় তাঁকে বক্তৃতা দেবার জন্যে ডাকা হল; আকাডেমি, ক্যাডেট কলেজ, অস্ত্র কারখানা—এ সমস্ত তাঁকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখানো হল; জাপান ও অন্যান্য দেশের নেতারা তাঁর গুণগান করল, জাপ সম্রাটের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের একজন বড় নেতার ভাব নিয়েই তিনি প্রাচ্যের অন্যান্য রাজধানীতে গেলেন। শাংহাই থেকে এক বেতার বক্তৃতায় তিনি চিয়াং কাই-শেকের কাছে এই মর্মে আবেদন জানালেন যে, জাপানের সঙ্গে চীন এমন একটা সম্মানজনক চুক্তি করুক যাতে চীন থেকে বিদেশী সৈন্য অপসারিত হয়। সুভাষচন্দ্র বললেন, 'লড়াই শেষ না হওয়া পর্যন্ত চুক্তির জন্যে অপেক্ষা করতে হবে, এমন কোন মানে নেই।' জাপানের কাছ থেকে সহৃদয় সাহায্য নিয়ে চীন এখুনি তার জাতীয় পুনর্গঠনের কাজে হাত লাগাতে পারে। সুভাষচন্দ্র পরে বলেছিলেন নানকিং গিয়ে চিয়াং কাই-শেকের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল, বোধহয় সেই কারণেই তিনি ভেবেছিলেন আলোচনার ভেতর দিয়ে আপোষ হওয়া সম্ভব।

ম্যানিলায় তাঁকে রাষ্ট্রীয় সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। তারপর ২৪শে

নভেম্বর তিনি সাইগনে তেরাউচির সদর ঘাঁটিতে গেলেন। সিদ্ধান্ত হল ১৯৪৪-এর জানুয়ারীতে ১ম ডিভিশন ও তাঁর নিজস্ব বেসামরিক হেডকোয়র্টার বর্মায় স্থানান্তরিত হবে। সাইগনের ভারতীয় সম্প্রদায় মিলিত হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল। তিনি তাঁর অর্থভাণ্ডারে তাদের বরাদ্দ চাঁদা ধার্য করলেন এক কোটি বিশ লক্ষ পিয়াস্তার; মোড়লেরা গাঁইগুঁই করায় তিনি মালয়ে যে ভাবে গলা চড়িয়ে বলেছিলেন সেই ভাবেই বললেন: 'যুদ্ধে যদি প্রাণটি যায়, তাহলে সর্বস্ব দিয়েও সে প্রাণ আর ফিরে পাবে না। আমি এখন তোমাদের হর্তাকর্তা, ইচ্ছে করলেই তোমাদের যুদ্ধে পাঠাতে পারি।'

বর্মায়

২৫শে নভেম্বর সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে ফিরলেন। ফিরেই তিনি গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো কাজে পরিণত করতে লেগে গেলেন। অস্থায়ী সরকার সরে গেলেও তাতে সিঙ্গাপুরে লীগের সদর দপ্তরের কোন নড়চড় হবে না; কাজ হবে সিঙ্গাপুরে লীগের বাহিনীর 'পিছন দিক'টা দেখা। সুভাষচন্দ্রের প্ল্যান হল, স্রেফ মন্ত্রিসভাকে রেঙ্গুণে তুলে নিয়ে গিয়ে বর্মার লীগ হেডকোয়ার্টারে বসিয়ে দেওয়া; বর্মায় লীগের কাজ দেখাশুনো করার জন্যে যাহোক একটা ছোট খাটো কমিটি ঠেকিয়ে দেওয়া। সুপ্রীমকম্যাণ্ড-এর সদর ঘাঁটি সরানোর কাজটা ঠিক অমন চট ক'রে হবার নয়; তখনও মালয় থেকে রেজিমেণ্ট যেতে শুরু করেছে মোটে একটি, সুতরাং তেমন তাড়া ছিল না।

১৯৪৩-এর ডিসেম্বরে আজাদ হিন্দ ফৌজের ২য় ডিভিশন গঠিত হল; বিভিন্ন শিক্ষা-কেন্দ্র থেকে এমন হুহু ক'রে রংরুট আসতে আরম্ভ করল যে, ৩য় ডিভিশন গড়বার পরিকল্পনাও অচিরে নেওয়া যায়। কিন্তু আসলে শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতেই ছিল গলদ। অনভ্যস্ত দৈহিক কষ্ট ও কঠোর শৃঙ্খলা সহ্য করতে না পেরে এবং সম্ভবত শারীরিক সামর্থ্যের অভাবে নভেম্বর মাসে সিঙ্গাপুরে রংরুটের দল রীতিমত বেঁকে বসেছিল। তাছাড়া সাধারণভাবে সৈন্যদল থেকে পালানোর হারও খুব বেশী হওয়ায় ভবিষ্যতের প্ল্যান নেওয়া দুষ্কর হয়ে উঠল; সেই সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের উদ্দেশে প্রচারিত একটি হুকুমনামায় এই ব'লে হুঁশিয়ার করতে হল যে, 'অন্যান্য বাহিনীর মত আজাদ হিন্দ ফৌজেও দল ত্যাগ ও ঘোঁট পাকানো

মৃত্যুদণ্ডনীয় অপরাধ।' সুভাষচন্দ্র তাঁর মন্ত্রিসভার সঙ্গে বসে এ ব্যাপারে পরামর্শ করলেন এবং একতার ভাব এনে সকলের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা জাগাবার জন্যে প্রচার অভিযান চালালেন। ১৯৪৪-এর মাঝামাঝি নাগাদ অবস্থার খানিকটা উন্নতি হল ; তবে সে অবস্থাও বেশীদিন টিকল না।

চ্যাটার্জী যে তত্ত্বাবধায়ক বোর্ড গঠন করেছিলেন, সুভাষচন্দ্র টোকিও থেকে ফিরে অনুমোদন করবার পর তার কাজ পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছিল। ডিসেম্বরে সুভাষচন্দ্র জাভা আর সুমাত্রায় পাঁচদিনের সফরে গেলে ঐ দুটি দ্বীপেও বোর্ড কাজ আরম্ভ ক'রে দিল। সুভাষচন্দ্রকে ঐ অল্প সময়ের মধ্যে ভারতীয়দের বহু জনসভায় গিয়ে বক্তৃতা দিতে হল এবং বহু ধনী ভারতীয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে তিনি দেখা করলেন ; নগদ ও প্রতিশ্রুতি মিলিয়ে তিনি প্রায় পনেরো লক্ষ গিল্ডার চাঁদা তুললেন। সরকারী প্রত্যাশার চেয়ে টাকার এই অঙ্ক ঢের কম হলেও এটাকে লীগের শক্তিরই পরিচয় ব'লে মনে করা হল।

নিজেদের দখল সূচিত করার জন্যে সুভাষচন্দ্রকে একবার আন্দামানে যেতে হবে এবং ১৯৪৪-এর জানুয়ারীতে রেঙ্গুণে ফেরার পথে তিনি শ্যামে সরকারী সফরে যাবেন। কিন্তু সিঙ্গাপুর ত্যাগ করার আগে আজাদ হিন্দ ফৌজের তরফ থেকে তাঁকে অনুরোধ জানানো হল—তিনি যেন মোহন সিং-এর সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁকে আজাদ হিন্দ ফৌজের কাজে লাগাবার কথা ভেবে দেখেন। সুভাষচন্দ্র তাদের এই অনুরোধ ঠেলতে পারলেন না। মোহন সিং মাস কয়েক ধ'রে অসুস্থ ছিলেন এবং যখন সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর দেখা হল তখনও তাঁর শরীর খুব দুর্বল। তা সত্ত্বেও তিনি কী ছিলেন এবং আবার কী হতে পারেন তাঁকে দেখে তা অনায়াসে ধরা গেল। ১৯৪২ সালে তাঁর মনোগত উদ্দেশ্য কী ছিল, তিনি কী করেছিলেন সমস্তই সুভাষচন্দ্রকে বললেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, সুভাষচন্দ্রের কাছ থেকে কোন রকম সাড়া তো পাওয়া গেলই না—আজাদ হিন্দ আন্দোলনে মোহন সিং-এর যে কোন রকম দান আছে, তেমন কোন বোধও তাঁর কথাবার্তায় প্রকাশ পেল না ; সুভাষচন্দ্র বলতে চাইলেন মোহন সিং চালে ভুল করেছিলেন এবং মাথা ঠিক রাখতে পারেননি। মোহন সিং বললেন যোগ্য পদ পেলে তিনি সুভাষচন্দ্রের অধীনে সানন্দে কাজ করবেন

এবং লীগ সংগঠনে তাঁর একটি কাজ সম্বন্ধে কথাও হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু ঠিকঠাক না ক'রেই সুভাষচন্দ্র চলে গেলেন। অসুবিধে ছিল ১৯৪২ সালের ঘটনাবলী তিনি মার্জনার চোখে দেখেছেন, এ রকম কোন ভাব দেখানো তাঁর দিক থেকে উচিত হবে না। তাছাড়া, মোহন সিং নিজের মতে চলেন; তাঁকে ঠিক জোহুকুমের দলে ফেলা যাবে না, আবার তার হাতে ক্ষমতা দেওয়াও বিপদ। সুভাষচন্দ্র তাঁকে সুমাত্রায় স্বাস্থ্যকর পরিবেশে পাঠিয়ে দিলেন, তাঁর কিছুটা সুখসুবিধার ব্যবস্থা করলেন; তবে ঐ পর্যন্তই—তাঁর সঙ্গে তিনি আর কোন সম্বন্ধ রাখলেন না।

২৯শে ডিসেম্বর আন্দামান দ্বীপের পোর্ট ব্লেয়ারে জাপানী নৌসেনাধ্যক্ষ সুভাষচন্দ্রকে স্বাগত জানালেন। প্রাক্তন বৃটিশ চীফ কমিশনারের কুঠিতে তাঁকে রাখা হল; পৌরপ্রধানের কাছ থেকে তিনি পোর্টব্লেয়ারের স্বাধীনতা স্বহস্তে গ্রহণ করলেন, দ্বীপের রক্ষাব্যবস্থা পরিদর্শন করলেন এবং যেখানে এক সময়ে ভারতের বিপ্লবীরা সাজা খেটেছেন সুভাষচন্দ্র সেই প্রসিদ্ধ জেলখানা দেখতে গেলেন। ভারতীয় চীফ কমিশনার নিয়োগের প্রস্তাবে নৌসেনাধ্যক্ষের আপত্তি নেই; কিন্তু সুভাষচন্দ্রকে তিনি জানালেন, যুদ্ধ চলাকালে সামরিক কারণেই পুরো ক্ষমতা হস্তান্তর হওয়া সম্ভব নয়; তবে চীফ কমিশনার যদি সাহায্য করতে রাজী থাকেন, তাহলে বেসামরিক শাসন পরিচালনার কোন কোন বিভাগ ভারতীয়দের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায়।

ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিস-এর একজন প্রবীণ অফিসার ছিলেন লেফটেনান্ট-কর্ণেল লোকনাথন; দিন কয়েক পরে সুভাষচন্দ্র ব্যাঙ্ককে গিয়ে তাঁকে জানালেন যে, পোর্টব্লেয়ারের চীফ কমিশনার তাঁকে করা হবে। ২২শে ফেব্রুয়ারী তিনি কর্মভার গ্রহণ করলেন। বর্মায় ফিরে গিয়ে কর্তব্যকর্মে জড়িয়ে পড়বার আগে শ্যামদেশের সরকারের রাজ-অতিথি হয়ে আরও এক সপ্তাহ তাঁর মহাসমারোহে কাটল। শ্যামদেশে তখন সবাই ভাবছিল সুভাষচন্দ্র আর অল্পদিনের মধ্যেই নিঃসন্দেহে বিজয়ীর বেশে ভারতে পৌছুবেন; তাঁকে তারা মাথায় ক'রে রাখল—তাঁকে ঘিরে আদরযত্ন, সাজসজ্জা, আনন্দ-উৎসবের ধুম প'ড়ে গেল। পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদে রাজার হালে কাটানো সেই দিনগুলো তাঁর জীবনে আর কখনই ফিরে এল না।

৬

সর্বোচ্চ সেনাধিনায়ক

'ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লেশ, পথশ্রম আর মৃত্যু—আজ এ ছাড়া তোমাদের আর আমার কিছুই দেবার নেই, তবে যদি জীবনে ও মরণে আমাকে তোমরা অনুসরণ করো ·· আমি তোমাদের স্বাধীনতা ও জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেব।'[১]

বর্মায় জাপানীদের অভিযান শুরু করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে ১৯৪৪-এর জানুয়ারী হল। ১৯৪৩-এর এপ্রিলের পর উত্তর বর্মায় জাপ বাহিনীর সেনাপতি হন জেনারেল মুতাগুচি। যে এলাকা তাঁর কাছে দুর্ভেদ্য ব'লে মনে হয়েছিল যেখানে উইনগেটের প্রথম চিন্দিট অভিযান সফল হতে দেখে তাঁর দৃঢ় ধারণা হল এবার ইম্ফল আক্রমণ করা উচিত। তাঁর পীড়াপীড়িতে ১৯৪৩-এর শেষার্ধে আক্রমণের ছক তৈরী হল। ১৯৪৩ সালে চিন্দউইন নদী বরাবর ছিল জাপানীদের ঘাঁটি, সীমান্তবর্তী পর্বতশ্রেণীতে তার চেয়েও মজবুত রক্ষাব্যূহ গড়ে তোলা এবং ১৯৪৪ সালে বৃটিশের বর্মা-আক্রমণ রদ করা—এই ছিল জাপ অভিযানের দুটি লক্ষ্য। তার জন্যে প্রথমে আরাকানে বৃটিশের প্রাণ ওষ্ঠাগত ক'রে তুলতে হবে, তাহলে তাদের যাবতীয় রিজার্ভ সৈন্য চট্টগ্রাম আর পূর্ববঙ্গের প্রবেশপথ রক্ষার সংগ্রামে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। তখন এপ্রিলে ধীরে সুস্থে ইম্ফল আর কোহিমা দখল করা যাবে, শত্রুপক্ষের সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাবার ভয় থাকবে না। মে মাসে বর্ষা শুরু হয়ে গেলে তখন আর লড়াই করা চলবে না। এটা তারা ভাবেনি যে, বৃটিশ ব্রহ্মপুত্রের পুবদিকে নতুন ক'রে রক্ষাব্যূহ তৈরি করতে পারে, যাতে বর্ষা

১ ১৯৪৩-এর ৫ই জুলাই সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজ সমাবেশে বক্তৃতা

শেষ হলে সারা আসাম আর পূর্ববঙ্গে জাপানীরা অবাধে চলে আসতে পারে। ১৯৪৪-এর জানুয়ারীতে এই সংযুক্ত পরিকল্পনা টোকিওতে অনুমোদিত হল এবং ফেব্রুয়ারী মাসে এ বিষয়ে নির্দেশপত্র মুতাগুচির হাতে এসে গেল।

এই যুদ্ধাভিযানে আজাদ হিন্দ ফৌজ দুভাবে সাহায্য করবে: প্রত্যেক জাপ ডিভিশনের সঙ্গে যেমন গুপ্তচর ও প্রচারকের একটি ক'রে দল থাকবে, তেমনি সুভাষ-রেজিমেণ্টের ভূমিকা হবে স্বতন্ত্র। জাপানীদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে এই ভূমিকা ঠিক করবার ভার সুভাষচন্দ্রের ওপর ছেড়ে দেওয়া হল, কিন্তু সুভাষচন্দ্র বর্মায় এসে পৌছুবার অনেক আগেই বিশেষ বিশেষ দল তৈরী ক'রে তাদের তালিম দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। মালয় থেকে যখন নতুন নতুন লোক আসতে লাগল তখনই আরাকানের দলটিতে আড়াই শো লোক ভর্তি হয়ে গেছে। ইম্ফল আক্রমণের জন্যে এই রকম আরও তিনটি ইউনিট তৈরি হল; বাহাদুর, সংবাদ-সংগ্রহ আর সৈন্য সংগ্রহ—এই তিন দলের লোকজন প্রত্যেকটা ইউনিটের মধ্যে থাকল। ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বরে তালিম নেবার জন্যে এদের স্ব স্ব জাপানী বাহিনীতে যোগ দিতে পাঠানো হল।

সুভাষচন্দ্র তাঁর সদর-দপ্তর আর মন্ত্রিসভার প্রধানদের নিয়ে ১৯৪৪-এর ৭ই জানুয়ারী রেঙ্গুণে এসে পৌছুলেন। সরকারী সংগঠন সাজিয়ে গুছিয়ে বসতে তাঁর প্রায় পুরো জানুয়ারী মাস লেগে গেল। ইত্যবসরে জাপ প্রধান সেনাপতি জেনারেল কাওয়াবের সঙ্গে ব'সে সুভাষচন্দ্র আসন্ন ভারত আক্রমণ নিয়ে আলোচনা চালাতে লাগলেন, কেননা ইতিমধ্যেই রওনা হবার জন্যে সুভাষ-রেজিমেণ্টে তখন সাজো-সাজো রব পড়েছে।

কাওয়াবে প্রস্তাব করলেন, বিশেষ বিশেষ গ্রুপগুলোকে যেভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সেইভাবে রেজিমেণ্টকেও ছোট ছোট দলে ভাগ ক'রে অভিযানে অংশগ্রহণকারী জাপানী বাহিনীগুলোর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হোক। সুভাষচন্দ্র কিন্তু নাছোড়বান্দা। কাওয়াবে বোধ হয় জানেন না এই রেজিমেণ্টকে দিয়ে গোটা আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধক্ষমতা যাচাই করা হবে। তাই, সুভাষচন্দ্র বললেন, এই রেজিমেণ্টের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব চাই; ব্যাটালিয়নের চেয়ে ছোট ইউনিট হলে ওভাবে পরখ করা সম্ভব নয়। সুভাষচন্দ্র সত্যিই একান্তভাবে চান যেন ভারত অভিযানে আজাদ হিন্দ ফৌজ আগাগোড়া

আক্রমণের পুরোভাগে থাকে : 'যেন ভারতের মাটিতে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকেরই প্রথম রক্তবিন্দু পড়ে।'[২]

সুভাষ রেজিমেণ্টের তিনটি ব্যাটালিয়ানের জন্যে কমাণ্ডার-ইন-চীফ তাঁর কর্মীদের এমন সব কাজ বাছতে বললেন যেসব কাজের ভার তাদের ওপর নির্বিঘ্নে ছেড়ে দেওয়া যায়। তবে যেহেতু এখনও যাচাই হয়নি সেইহেতু এ অবস্থায় আজাদ হিন্দ ফৌজকে আক্রমণের পুরোভাগে রাখার কথাই উঠতে পারে না। সুভাষচন্দ্রের নিজের মনকে চোখ ঠারা উচিত নয়। আক্রমণ অভিযানে তাঁর সৈন্যবল হবে তিন হাজার ; বর্মায় জাপানীদের সৈন্যসংখ্যা দু লক্ষ ত্রিশ হাজার ; কাজেই তার হেস্তনেস্ত করার কোন ক্ষমতা নেই। হতে পারে, রেজিমেণ্টকে ভাগ ভাগ ক'রে সারা জাপ বাহিনীর মধ্যে কাওয়াবে হয়ত এই ভেবে ছড়িয়ে দিতে চাইছিলেন যে, তার ফলে ইউনিট হিসেবে কম নয় বরং বেশী কাজই তারা করতে পারবে। কিন্তু সুভাষচন্দ্র তখন স্বপ্ন দেখছেন প্রথমে একটি, তাবপব পুরো দুটি ডিভিশন যুদ্ধে নামবে, এবং নতুন ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে আরও পাঁচটি ডিভিশন তিনি গড়ে তুলবেন ; আর সেইমত তিনি তালে তালে লীগকে চালিয়ে নিয়ে চলেছেন। ইম্ফলে, কোহিমায়, এমন কি ব্রহ্মপুত্রের তীরেও তাঁর জাতীয় পতাকা উঠেছে, ভারতের জনসাধারণ তাঁকে স্বাগত জানাতে দু হাত বাড়িয়ে দিয়েছে— সুভাষচন্দ্র মনে মনে দেখতে পাচ্ছেন। সুভাষ-রেজিমেণ্ট হবে তাঁর অগ্রবাহিনী। ২৪শে জানুয়ারী দুটি কাজ দিয়ে রেজিমেণ্টকে যাচাই করবার প্রস্তাবে সুভাষচন্দ্র সম্মতি দিলেন : একদিকে কালাদান উপত্যকায় বৃটিশ পশ্চিম-আফ্রিকান ডিভিশনের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত বাহিনীর অঙ্গীভূত হবে প্রথম ব্যাটালিয়ন, অন্যদিকে চিন পাহাড় এলাকার পথ পাহারা দিচ্ছে যে জাপানী বাহিনী তাদের বদ্‌লী হিসেবে কাজ করবে বাকি দুটি ব্যাটালিয়ন।

টাকা তোলা আর সৈন্যসংগ্রহের কাজ জোরসে চালানো, বেসামরিক শিবির ও শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন, প্রচার-অভিযান নতুন ক'রে শুরু করা : ইত্যাকার নানা ব্যাপারে তখন সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। কিন্তু তা সত্ত্বেও একেকদিন তিনি উদয়াস্ত সুভাষ-রেজিমেণ্ট নিয়ে মত্ত ; কখনও তাদের কুচকাওয়াজ দেখছেন, কখনও দেখছেন তাদের মহড়া ;

২ 'মাই মেমোরিজ অব দি আই, এন, এ অ্যাণ্ড ইটস্ নেতাজী', শাহ নওয়াজ ৭৫ পৃঃ

কখনও অফিসারদের সঙ্গে কথা বলছেন ; এমন ক'রে আগে কখনই তিনি ফৌজের মধ্যে নিজের মন্ত্রজাল বিস্তার করতে চাননি। সৈনিকেরা তাঁর সঙ্গীসাথী ; তাদের দিয়েই তিনি ভারতের মানমর্যাদা বাড়াবেন। যুদ্ধে তাদের সাফল্যের ওপর সব কিছু নির্ভর করছে ; তাঁর আত্মবিশ্বাস যেন পুরোপুরি তাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তারা যেন তাঁর প্রাণশক্তির স্পর্শ পায়। ৩রা ফেব্রুয়ারী তিনি তাদের এই ব'লে বিদায় দিলেন ঃ

> রক্তের ডাক এসেছে। ওঠো জাগো! এক মুহূর্ত দেরি নয় আর। অস্ত্র হাতে নাও। তোমার সামনে আমাদের পথপ্রদর্শকদের গড়া রাস্তা। সেই পথ দিয়েই আমরা যাব। শত্রুপক্ষের সারি ভেদ ক'রে আমরা পথ ক'রে নেব। আর যদি ঈশ্বরের মনে এই থাকে, আমরা মৃত্যুবরণ ক'রে শহীদ হব। আমাদের বাহিনী যে পথে দিল্লী যাবে, চিরনিদ্রায় শায়িত হয়ে সেই পথ আমরা চুম্বন করব। দিল্লীর পথ স্বাধীনতার পথ। দিল্লী চলো।[৩]

পরবর্তী তিনদিনের মধ্যে গোটা রেজিমেণ্টই রণাঙ্গনে রওয়ানা হ'য়ে গেল। ট্রেণ একটি একটি ক'রে ছেড়ে চলে যাচ্ছে ; অফিসাররা যখন বিদায় নিয়ে চলে গেল সুভাষচন্দ্র অশ্রু সম্বরণ করতে পারলেন না। এদিকে ভাল খবর এসেছে। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী আরাকানে যে অভিযান শুরু হয়, তার ফলে মায়ু উপত্যকায় ৭ম ভারতীয় ডিভিশন অল্প সময়ের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে। এই সাফল্যের অন্যতম কারণ ছিল আরাকানে আই-এন-এ কমাণ্ডার মেজর এল এস মিশ্র কর্তৃক একটি ভারতীয় ফাঁড়ির সুলুক-সন্ধান ও নাশকতা। এই ঘটনাকে সুভাষচন্দ্র জাপানের একটি বিরাট জয়ের 'কার্যকরী ও গুরুত্বপূর্ণ' অংশ ব'লে অভিহিত করলেন।

মাষ্টার চোপরার যে গুপ্তচর দলটিকে ডিসেম্বরে ডুবোজাহাজে ক'রে ভারতবর্ষে পাঠানো হয়েছিল, তাদের কাছ থেকে প্রায় এই সময়েই সংবাদ এসে গেল। এ থেকেও মনে অনেকখানি জোর বাড়ল। সুভাষচন্দ্র জাপানীদের বললেন তাঁর উপদেশপ্রাপ্ত গুপ্তচরেরাই যে প্রথম সাফল্য অর্জন

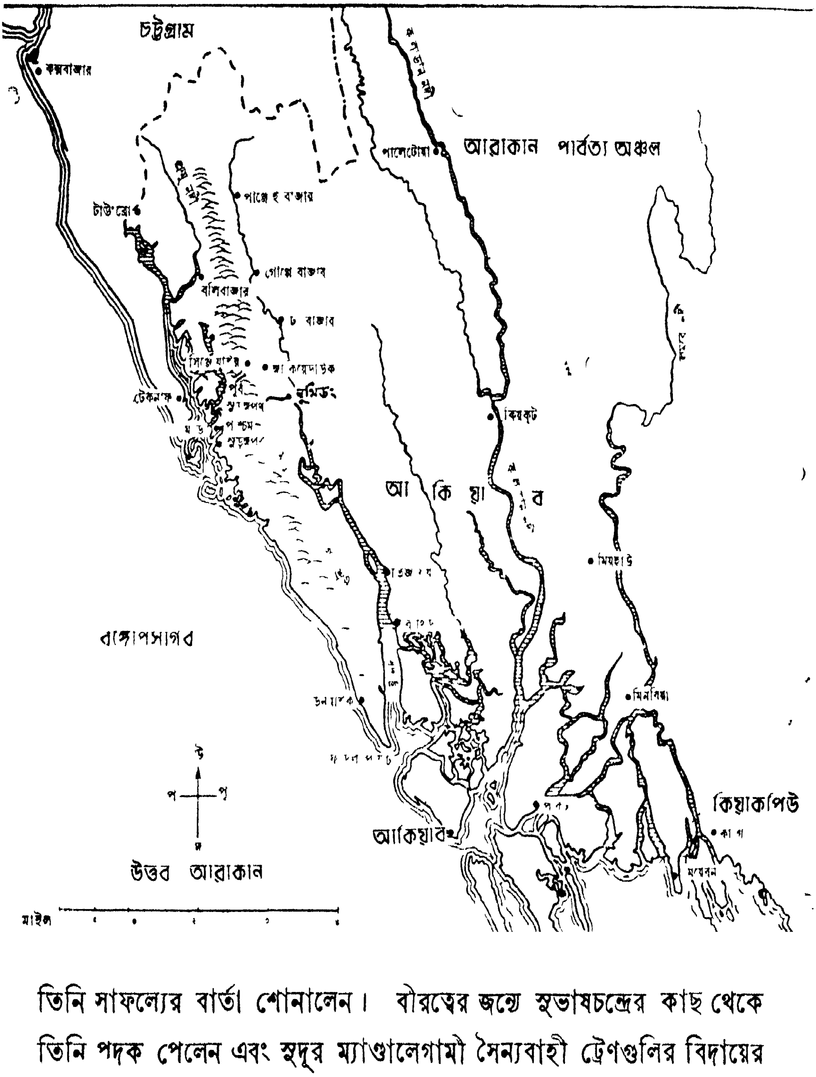
৩ 'অন ডেল্হি', প্রচ্ছদ

করেছে, এ ব্যাপারটা হঠাৎ ঘটেনি। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে গোপন কাজকর্মের সম্পর্ক রাখতে হবে: যোগ্য লোক বাছাই ও সঠিক নির্দেশই হল মূলকথা—সে কাজ একমাত্র তাঁকে দিয়েই সম্ভব। চোখের ওপর এত বড় প্রমাণ দেখে গুপ্তচরদের শিক্ষাকেন্দ্র ও সংগঠনের ওপর সুভাষচন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে জাপানীদের এতদিনের আপত্তি টিঁকল না। সুভাষচন্দ্র এবার রেঙ্গুণে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং স্বামীকেও সেই উদ্দেশ্যে পেনাঙে পাঠালেন।

যুদ্ধে যারা জাপানীদের হাতে ধরা পড়েছিল তারা বহু সময় এটা লক্ষ্য করেছিল যে, জাপানীদের সঙ্গে ব্যবহারের দিক থেকে কড়া এবং এমন কি একগুঁয়ে হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। জাপানীরা সাহসীকে খাতির করে এবং তারা দেখেছিল সুভাষচন্দ্রের বুকের পাটা আছে। বেইমানিকে তারা ঘৃণা করে এবং তাদের চোখে আজাদ হিন্দ ফৌজের এই কলঙ্ক দুরপনেয়। এ থেকেই এসেছিল একদিকে নেতাজীর প্রতি তাদের শ্রদ্ধা এবং অন্যদিকে তাঁর সেনাপতিদের অনুরোধ ও মতামতের প্রতি উপেক্ষার ভাব। সুভাষচন্দ্র কখনও তাদের পরোয়া ক'রে চলেননি, বরং কখনও কখনও তাদের প্রতি তাচ্ছিল্যের ভাবও দেখিয়েছেন; সত্যি বলতে কি, অধিকারের ব্যাপারে সামান্য মতের অমিল হলে যেভাবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠতেন, তার জন্যে তাঁর রীতিমত সুনাম ছিল। হিকারি-কিকান দলের নতুন কর্তা জেনারেল ইসোদার সঙ্গে তাঁর ছিল দা-কুমড়ো সম্পর্ক। যেমন ১৯৪৪-এর এপ্রিলে ভারতীয় পল্টনের উদ্দেশ্যে হিকারি-কিকান কয়েকটি ইস্তাহার ছাপায়: যে এলাকায় বিলি করার কথা, ইস্তাহারে সেই এলাকার জাপানী সেনাপতির নাম স্বাক্ষরিত ছিল এবং সুভাষচন্দ্রকে সে ইস্তাহার আদৌ দেখানো হয়নি। ১৯৪৩ সালেও এই ধরনের ইস্তাহার ছাড়া হয়েছিল, কিন্তু যখন এইসব ইস্তাহার সুভাষচন্দ্রের নজরে এল তখন তিনি ইসোদাকে গালাগাল দিয়ে, এমন ভূত ভাগিয়ে দিলেন যে তারপর থেকে জেনারেল ইসোদা তাঁকে দেখলেই একটু জড়সড় হয়ে থাকত।

আরাকানের যুদ্ধে জাপানীরা যে হেরে ভূত হয়েছে, এ খবর বেশ কয়েক মাস পরে সুভাষচন্দ্র জানতে পারেন এবং তাঁর জঙ্গী মনোভাবের কোন হেরফের হয়নি। প্রথম ডিভিশনের ২য় ও ৩য় রেজিমেণ্ট যখন ইম্ফল যাত্রার

তোড়জোড় করছে, তখন মার্চ মাসে তিনি আবার বক্তৃতা, পরিদর্শন ও ব্যক্তিগত মেলামেশা মারফত সৈন্যদের মধ্যে মনোবল সঞ্চার ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির চেষ্টা করলেন। মার্চের শেষাশেষি রেঙ্গুণ থেকে উত্তরাভিমুখে যাত্রা শুরু হল। আবার সেই আগের মতই বিদায়কালীন বক্তৃতাঃ মেজর মিশ্রকে খবর দিয়ে আনা হল, আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের কাছে



তিনি সাফল্যের বার্তা শোনালেন। বীরত্বের জন্যে সুভাষচন্দ্রের কাছ থেকে তিনি পদক পেলেন এবং সুদূর ম্যাণ্ডালেগামী সৈন্যবাহী ট্রেণগুলির বিদায়ের প্রাক্কালে তিনি উপস্থিত থাকলেন। কিন্তু উচ্ছ্বাস আগের চেয়ে কম। জাপানীরা দস্তুরমত আক্রমণ চালাচ্ছে এবং কেউই ভাবেনি যে এইসব

সৈন্যকে লড়াই করতে হবে। সুভাষচন্দ্র যখন ইম্ফলে প্রবেশ করবেন, তখন এরা দুপাশে সার বেঁধে দাঁড়াবে এবং সেখানে নতুন নতুন ডিভিশন গড়ে তোলার ব্যাপারে সাহায্য করবে।

ইম্ফলে পৌছুবার পর বেসামরিক শাসনব্যবস্থার দায়িত্ব ঘাড়ে এসে পড়বে। সিঙ্গাপুরের পুনর্গঠন কলেজের শিক্ষাপ্রাপ্ত একটি লোকও তখন বর্মায় এসে পৌছোয়নি। কেননা তাঁর ইম্ফলে পৌছুবার আগে তাদের দরকার আছে ব'লে তিনি মনে করেননি। কিন্তু ১লা মার্চ মেমিওতে জেনারেল মুতাগুচির সঙ্গে দেখা ক'রে তিনি জানতে পারেন যে, ভারতের যে-এলাকায় জাপানীরা প্রবেশ করতে চলেছে সে-এলাকায় তাদের কোন সামরিক শাসনব্যবস্থা থাকবে না এবং কিছুটা দায়িত্ব এই মুহূর্তে তাঁর ঘাড়ে এসে পড়েছে। ৮ই মার্চ ইম্ফল অভিযান শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে যাতে বেসামরিক ব্যবস্থাপকদের একটি দল রওনা হয় তার জন্যে সুভাষচন্দ্রকে তিনি অনুরোধ করেন। সুভাষচন্দ্রের ইচ্ছে ছিল ক্রমশ সুশিক্ষিত লোকদের নিয়ে প্রশাসনিক কর্মীদল তৈরী করা; তার বদলে তিনি এখন রেঙ্গুণ থেকে চটপট একদল কর্মী যোগাড় করতে বাধ্য হলেন। বেসামরিক শাসনকর্তা পাওয়া যাচ্ছিল না। চ্যাটার্জীকে তিনি খবর পাঠালেন; ১৬ই মার্চ চ্যাটার্জী শশব্যস্ত হয়ে এসে শুনলেন তাঁকে 'অধিকৃত অঞ্চলের প্রধান প্রশাসক' করা হয়েছে।

সুভাষচন্দ্র বেসামরিক শাসনব্যবস্থার দুটি পর্যায় ঠিক করেছিলেন। প্রথমে সামরিক অগ্রগামী বাহিনীর অনুগমন করবে তাঁর আজাদ হিন্দ দলের কয়েকটি বিভাগ; আশ্রয় প্রার্থীদের তত্ত্বাবধান, নতুন অধিকৃত অঞ্চলগুলির খাদ্যসংগঠন, অত্যাবশ্যক বিভাগ পুনঃপ্রবর্তন, শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা এবং ভারতীয় জনসাধারণের সন্তুষ্টি বিধান—এই জরুরী কাজগুলি তারা সম্পন্ন করবে। তারপর যেই কোন এলাকা সামরিক সংঘর্ষমুক্ত হবে, তখনই তাব ভার নেবে অস্থায়ী প্রাদেশিক প্রশাসনবিভাগ—স্বাধীন ভারতের ভাবী সরকার স্থায়ী হয়ে না বসা পর্যন্ত এইভাবেই শাসনব্যবস্থা চলবে।

গণতন্ত্রকে জীইয়ে তোলার আগে পর্যন্ত ভারতবর্ষে আজাদ হিন্দ দলের প্রকৃত কাজ হবে 'বিপ্লবের নীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণাযুক্ত একটি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব'[৪] প্রতিষ্ঠার জন্যে চেষ্টা করা। 'দি ইণ্ডিয়ান

৪ রেঙ্গুণে সামরিক শিক্ষার্থীদের সমাবেশে বক্তৃতা

ষ্ট্রাগল' লেখবার সময় যে 'সুস্পষ্ট মতবাদ, কর্মসূচী ও কর্মপন্থা' যে দলের মধ্যে তিনি ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলেন, এ হল সেই দল। তিনি এই আজাদ হিন্দ দলের জন্যে নিয়মানুবর্তিতার একটি বিধান তৈরি করেছিলেন, পদমর্যাদার স্তরভেদ করেছিলেন এবং একটি বিশিষ্ট পোষাকের ব্যবস্থা করেছিলেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মত এই দলের রাজনৈতিক শক্তির ভিত্তি হবে সমাজসেবা ও আর্তত্রাণ ; এইসব কাজে কর্মীদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও সততার দরকার হবে। আর শেষ পর্যন্ত কিনা তাড়াহুড়ো ক'রে সেই দল গঠন করতে হল ! এর চেয়ে দুঃখের আর কিছু হতে পারে না। ৮ই মার্চ মেমিওর পথে সত্তর জনের যে দলটি রওনা হল, সুভাষচন্দ্র তাতে যাকে পেয়েছিলেন তাকেই ভর্তি ক'রে নিয়েছিলেন।

১৯শে মার্চ জাপানী বাহিনী ও আই-এন-এর অনিয়মিত দল ভারত সীমান্ত অতিক্রম করে। দুদিন পরে পরিষদে তোজো ঘোষণা করেন যে, অধিকৃত অঞ্চল অস্থায়ী সরকারের শাসনাধীন হবে। অন্যদিকে সুভাষচন্দ্রও ভারতীয় জনগণের কাছে আবেদন জানালেন তারা যেন আক্রমণকারীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে ; সর্বোচ্চ সেনাধিনায়ক ও রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তিনি কয়েকটি সনদও তৈরি করলেন। এরপর ২৪শে মার্চ দখলের প্রশ্নে অস্থায়ী সরকার ও জাপানী বাহিনীর মধ্যে যে পূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল, তাতে জেনারেল কাওয়াবের সঙ্গে তিনি যোগদান করলেন। আলোচনা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ভারত-জাপ শ্রমিক বোর্ড ও সরবরাহ বোর্ডের সভাপতি কে হবে এই নিয়ে প্রশ্ন উঠল ; অধিকৃত অঞ্চলে সুভাষচন্দ্রের শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর বোর্ড মারফত জাপানীদের দাবিদাওয়া পেশ করবার কথা। এই সভায় তুমুল বাদবিতণ্ডা হল। জাপানীরা বোর্ডের সভাপতি হবে এ প্রস্তাবে সুভাষচন্দ্র মোটেই রাজী নন এবং এ ব্যাপারটা কখনই নিষ্পত্তি হয়নি।

জাপানীরা আসলে বর্মাকে যেভাবে মুঠোয় পুরে রেখেছিল, ভারতবর্ষকেও নিশ্চয় সেই ভাবেই তাঁবে রাখতে চাইছিল ; যুদ্ধ চালাতে হলে না চেয়ে তাদের উপায়ও ছিল না। মেমিওতে এসে আজাদ হিন্দ দল দেখল জাপানীদের একটি অর্থনৈতিক কমিশন ভারত যাত্রার উদ্যোগ আয়োজন করছে এবং দলের কয়েকজন নেতার চোখে এমন একটি দলিল পড়ল যাতে জাপানীদের মতলব পরিষ্কারভাবে লেখা আছে। সুভাষচন্দ্রকে এসব কথা

জানানো হল ; কিন্তু তাঁর বরাবরের ধারণা ভারতবর্ষ সম্পর্কে জাপানীদের অভিসন্ধি যাই থাক ঘাবড়াবার কারণ নেই—কেননা আজাদ হিন্দ ফৌজ আছে এবং তাঁর নিজের যা রাজনৈতিক প্রভাব, তার জোরে তিনি জাপানীদের মতলব বানচাল ক'রে দিতে পারবেন।

১৯৪৪-এর ৭ই এপ্রিল ম্যাণ্ডালের কাছে ছোট্ট পাহাড়ী শহর মেমিওতে সুভাষচন্দ্র ছোটখাটো একটা হেডকোয়ার্টার নিয়ে গিয়ে বসলেন ; ইম্ফল অভিযান তখন বেশ ভাল মতই শুরু হয়ে গেছে, তাঁর সৈন্যদলের একাংশ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছে এবং একাংশ যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ধাবমান। খুব বেশী হলে আর তিন সপ্তাহের মধ্যে ইম্ফলের পতন হবে ব'লে আশা করা যাচ্ছে। তারপরই সেখানে তাঁর কাজ শুরু হবে ; প্রথমে বেসামরিক শাসন, তারপর আজাদ হিন্দ ফৌজকে বিরাট বড় ক'রে তুলে নতুন অভিযান পরিচালনা করা। সেই হবে সুভাষচন্দ্রের জীবনের পরম দিন ; কাজের অন্ত থাকবে না, চাপও পড়বে অসম্ভব। তার আগে রেঙ্গুণের কাঠফাটা গুমট গরমের হাত এড়িয়ে কয়েকটা দিন বেশ ঠাণ্ডায় শান্তিতে কাটানো যাবে।

ভারতীয় সম্প্রদায় এ পযন্ত কাজের ডাকে বরাবর যেভাবে সাড়া দিয়ে এসেছে, তাতে সুভাষচন্দ্রের মনঃক্ষুণ্ণ হওয়ার বিশেষ কোন কারণ ঘটেনি। এমন কি জোড়াতাড়া দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো আজাদ হিন্দ দলকে দেখে মনে হয়েছিল কাজের দিক থেকে তাদের কোন ত্রুটি হবে না। মনোবলের অভাব ও বিভ্রান্তির যে ভাব রয়েছে, যুদ্ধ জিতলেই তা দূর হয়ে যাবে ; ইম্ফলে গিয়ে সমস্ত কিছু ঠিক ক'রে নেবেন। ইতিমধ্যে একটা দুঃখের কারণ ঘটল। রেঙ্গুণ ত্যাগ করবার ঠিক পূর্বমুহূর্তে সুভাষচন্দ্র অবাধ্যতা ও বিশ্বাস ভঙ্গের অভিযোগে কর্নেল এন, এস, ভগৎকে[৫] মালয়স্থ ২য় ডিভিশনের সেনাপতি পদ থেকে অপসারিত করেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের সংস্পর্শে আসার পর থেকেই এই ফৌজ সম্পর্কে ভগৎ বীতশ্রদ্ধ হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের জাপানী শ্রমিকশিবিরে গোড়ায় তাকে চালান করা হয়েছিল, সেখান থেকে মোহন সিং তাঁর কাজে সাহায্যের জন্যে ভগৎকে ডেকে পাঠান। এই ভেবে শেষ পর্যন্ত ভগৎ আসতে রাজী হয় যে, সে হয়ত মোহন সিংকে বাগ মানাতে পারবে। দ্বিতীয় আজাদ হিন্দ ফৌজেও সে

৫ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে পদমর্যাদায় তিনি ছিলেন মেজর

এই আশা নিয়ে ছিল যে, তাদের খানিকটা রাশ টেনে চালাতে পারবে। সুভাষচন্দ্র তার ওপর ২য় ডিভিশন গড়ে তোলার ভার দিলেন এবং সেই সঙ্গে তাকে চোখে চোখে রাখার ব্যবস্থা করলেন। এপ্রিল মাসে রেঙ্গুণে ডেকে পাঠিয়ে তার হাতে একটা চিঠি দেওয়া হল। তাতে সুভাষচন্দ্র বলেছেন, তোমার মধ্যে অবিশ্বস্ততা ও অবাধ্যতা দেখা গেছে ; তোমার আচরণ মার্জনা করা যায় না। ভারতীয় সেনাবাহিনী এসে মুক্ত না করা পর্যন্ত ভগৎকে নজরবন্দী হয়ে থাকতে হল।

এই মনঃক্ষুণ্ণ হওয়ার ব্যাপারটা তখন নিতান্তই গৌণ ; কেননা নানা দিকে তখন সিদ্ধিলাভ হচ্ছে। সুভাষচন্দ্র সবে ঘোষণা করেছেন যে, ইউ-রোপের স্বেচ্ছাবাহিনী হবে আজাদ হিন্দ ফৌজেরই অংশ—নাম্বিয়ারকে অস্থায়ী সরকারে মন্ত্রীপদ দেওয়া হয়েছে ; আন্দামানে সুভাষচন্দ্রের প্রতিনিধি চীফ কমিশনার হয়ে বসেছেন, আরাকান যুদ্ধের বীরযোদ্ধাদের প্রথম দলকে সম্মানিত করা হয়েছে, সুভাষচন্দ্রের সৈন্যবাহিনী ভারতের মাটিতে পা দিয়েছে। ইম্ফল আর মোটেই দূরে নয়। মেমিওতে থাকাকালে সুভাষচন্দ্র শত্রুকবলমুক্ত অঞ্চলের ভারতবাসীদের উদ্দেশে ঘোষণাপত্র জারী করলেন : 'ভারতীয় জনসাধারণের একমাত্র বৈধ সরকার হল অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার। আজাদ হিন্দ ফৌজকে ও অস্থায়ী সরকারের নিযুক্ত বেসামরিক কর্মচারীদের সর্বতোভাবে সাহায্য ও সহায়তা করার জন্যে···ভারতীয় জনসাধারণের কাছে অস্থায়ী সরকার আহ্বান জানাচ্ছে।'[৬] সরকার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে, ভারতীয়দের ধনপ্রাণ রক্ষা করা হবে ; তবে যারা বৃটিশের হাত-ধরা হয়ে চলবে কিম্বা অস্থায়ী সরকারের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে, তাদের কঠোর শাস্তি পেতে হবে। অস্থায়ী সরকার ও আজাদ হিন্দ ফৌজের বিশ্বস্ত মিত্র জাপানী সেনাবাহিনীর সঙ্গেও ভারতীয় জনসাধারণ যেন সহযোগিতা করে। তিনি বললেন, 'নিজেদের সরকারের পাশে সকলে সামিল হও।··· এইভাবে নিজেদের নব-অর্জিত স্বাধীনতা বজায় রাখতে ও রক্ষা করতে সাহায্য করো।'

অধিকৃত অঞ্চলে চ্যাটার্জীর অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনব্যবস্থা, খসড়া বিধান ও অর্ডিনান্স, প্রস্তাবিত নিয়োগ তালিকা এই সময় ভাল ক'রে

৬ 'আজাদ হিন্দ গেজেট,' ২ নং, ৩০শে এপ্রিল, ১৯৪৪ : পরিশিষ্ট ২ (৫)

খতিয়ে দেখা হল। নিয়োগের ব্যাপারটা জরুরী ছিল, কারণ সুভাষচন্দ্র চাইছিলেন প্রাদেশিক প্রশাসনের কাজে প্রথম যারা নিযুক্ত হবে ভারতবর্ষে তাঁর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তারা বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণর হয়ে বসবে। সমস্তই খুব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিপিবদ্ধ হল। জাপানী ব্যাঙ্ক মারফত কাজ চলবে না—মুদ্রাপ্রচলন ও অন্যান্য আর্থিক ব্যাপার তত্ত্বাবধান করবে আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্ক। বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের নাম দেওয়া হল। অস্থায়ী সরকার ও আনুক্রমিক প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করা হল এবং জেলা ও গ্রাম্য শাসনবিধি বর্ণিত হল। অস্থায়ী সরকারের ডাকটিকিট তখন ছাপা হচ্ছে, ব্যাঙ্কনোটের ছাপা নমুনাও প্রায় তৈরি হওয়ার মুখে। লেফটেনাণ্ট-কর্নেল চ্যাটার্জী অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং ভারতীয় ও জাপানী বিশেষজ্ঞেরা তাঁকে এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। মেমিওতে সুভাষচন্দ্রও জনসভা ডেকে ক্ষুদ্র শৈলাবাসের অধিবাসীদের কাছে সমানে বলেছেন ভারতের সংগ্রামের কথা, সামগ্রিক যুদ্ধায়োজনের কথা এবং এখনই বা তাঁর কী লক্ষ্য। ২১শে এপ্রিল এই রকমের এক সভায় তিনি 'ভারতীয় নিপ্পন' ফৌজ কর্তৃক কোহিমা অধিকারের সংবাদ ঘোষণা করেন।

মুতাগুচি সপার্ষদ তখনও মেমিওতে; সুভাষচন্দ্র তাঁর কাছ থেকেই লড়াই সংক্রান্ত খবরাখবর পেতেন। যুদ্ধস্থল বহু দূরের পথ হলেও মুতাগুচির কোন ভাবনাচিন্তা নেই। মুতাগুচি সেনাপতি, তাঁর বাহিনীকে তিনি রণক্ষেত্রে রওনা ক'রে দিয়েছেন, যুদ্ধ ভালভাবেই চলেছে—তাঁর আর নিজে গিয়ে দেখবার দরকার কী? বাইরে থেকে একজন দেখা করতে এসেছিল, মুতাগুচি তখন ফুলের বাগানে; তিনি তাকে বললেন, 'আমার অফিসাররাই যা করার করে, আমি আছি আমার গোলাপ গাছ নিয়ে।' আগে একদিন অভিযান সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র মুতাগুচিকে বলেছিলেন ইম্ফল-কোহিমা সংযোগ-পথ যেন বিচ্ছিন্ন না করা হয়। পালাবার রাস্তা খোলা পেলে বৃটিশ পক্ষ বরাবরের মতই পশ্চাদপসরণ করবে। কিন্তু মুতাগুচি তাতে রাজী হননি, তাঁর মতে, ইম্ফল হল এমন একটা বিল যেখানে আছে প্রকাণ্ড এক রাঘববোয়াল। তিনি বললেন, 'জাল ফেলে মাছটাকে আমি তুলতে চাই'।

সর্বত্রই এই আশাভরসার ভাব। ইম্ফলের পতন যে হবে এটা সবাই

ধরেই নিয়েছে। জাপান যুদ্ধে জিতবে সে-বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই। বৃটিশ-ভারতীয় সেনাবাহিনীর নাজেহাল অবস্থা সম্পর্কে মেমিওর লীগ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ শুরু করে দিল; বৃটিশ অফিসারদের নামে চালানো নিম্নোক্ত ধরনের বুলেটিন শুনে ভারতীয় শ্রোতারা খুব হাসাহাসি করতে লাগল:

> মণিপুরের ভেতর দিয়ে জাপানীদের অগ্রগতি এখনও অব্যাহত। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যেরা কালাদান পার হয়ে এগিয়ে চলেছে; পালেতোয়া তাদের দখলে। টিড্ডিম, তোংজাং, পালাম আর ফোর্ট হোয়াইট এখন শত্রুপক্ষের হাতে। আমাদের ১৭ নং ডিভিশন্ পুরোপুরিভাবে পশ্চাদপসরণরত। ইম্ফল-শিলচর সংযোগ-পথ বিচ্ছিন্ন। অবস্থা গুরুতর হলেও সংকটাপন্ন নয়।

কিন্তু একটা সময় এল যখন মুতাগুচিকে স্বীকার করতে হল ইম্ফলের বিলে যে মাছ তিনি কল্পনা করেছিলেন আসলে সেটা একটা কুমীর এবং সেই কুমীর তাঁর জাল ছিঁড়ে কুটি-কুটি করেছে। এপ্রিল মাসের শেষাশেষি বোঝা গেল ইম্ফলে প্রবেশ করার আগে ২য় ও ৩য় আই-এন-এ রেজিমেণ্টকে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে হবে। সুভাষচন্দ্র এই ভেবে খুশী হয়েছিলেন যে, জাপানীরা যুদ্ধে জয়ী হলে এর ফলে তাঁর দাবির জোর বাড়বে। জাপানী সেনাবাহিনীর হেডকোয়ার্টার[৭] যুদ্ধক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হবার ঠিক আগে ২৫শে এপ্রিল তারিখে মুতাগুচি স্বীকার করেন যে, একটা কোন বিঘ্ন ঘটেছে। ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্রের কাছেও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কিছু কিছু সংবাদ এল। ইম্ফলের মাইল পঁয়ত্রিশ দূর থেকে আই-এন-এর ডিভিশনাল কমাণ্ডার কর্নেল এম. জেড. কিয়ানি লিখে পাঠালেন যে, তাঁর পুরো ডিভিশনকেই এবার লড়াইতে নামতে হচ্ছে—সুতরাং এইসঙ্গে প্রথম (সুভাষ) রেজিমেণ্টেরও পুনরায় যোগ দেওয়া উচিত। চিন পাহাড় এলাকায় সুভাষ রেজিমেণ্টের দুটি ব্যাটালিয়ন পরিচালনা করছিলেন শাহ্ নওয়াজ। তিনি তাঁর সৈন্যদের দুর্গতির কথা জানালেন। দুর্গম জায়গা, খাওয়াদাওয়া যেমন খারাপ তেমনি পরিমাণে

৭ জাপানীদের একটি সেনাবাহিনী একটি বৃটিশ-কোর এর সমান। উত্তর পশ্চিম বর্মায় জেনারেল মুতাগুচির অধীনে ছিল ৩টী ডিভিশন

কম। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ও ওষুধপত্রের অভাব, মালবাহী জন্তুর অভাবে দীর্ঘ পাহাড়ী পথে অর্ধেক লোককে মোট বইবার কাজে লাগাতে হয়েছে। এসব ব্যাপার নিয়ে সুভাষচন্দ্র মুতাগুচির সঙ্গে কথা বললেন; মুতাগুচি স্বীকার করলেন যে, সরবরাহে টান পড়ায় ও যানবাহনের অভাবে গোটা সৈন্যদলকেই মুস্কিলে পড়তে হচ্ছে। তবে তিনি কথা দিলেন যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সুভাষ রেজিমেণ্ট যাতে কিয়ানির সঙ্গে মূল ইম্ফল রণাঙ্গনে যোগ দিতে পারে তার ব্যবস্থা তিনি করবেন।

কত বড় বিপর্যয় ঘটে গেছে, সে বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের হুঁশ হতে বেশ কয়েক মাস লাগল। জাপ সেনাবাহিনীর কমাণ্ডার মেমিওতে না থাকায় নিজের সৈন্যদলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা নেতাজীর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ল, আরও কঠিন হল তাদের চাহিদা মেটানো। সরবরাহের অভাব পূরণ করার জন্যে অবশ্য তাঁর নিজস্ব ব্যবস্থা ছিল। প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সংগ্রহ করার জন্যে লীগের উদ্যোগে রেঙ্গুণে একটি সরবরাহ বোর্ড তৈরি হয়েছিল এবং সরবরাহ-মন্ত্রী লেফটেনাণ্ট-কর্নেল আলাগাপ্পানকে বলা হয়েছিল ম্যাণ্ডালের লীগ হেডকোয়ার্টার মারফত আজাদ হিন্দ ফৌজকে যেন স্থানীয় ফসল যোগানো হয়। এর পর মে মাসের মাঝামাঝি নাগাদ চ্যাটার্জী, আলাগাপ্পান ও সচিব এ. এম. সহায়কে তিনি টামুতে পাঠালেন—ইম্ফল প্রবেশের সময় যাতে তাঁদের হাতের কাছে পাওয়া যায় এবং তাঁরা যেন যেকোন উপায়ে জিনিস খরিদ ক'রে আজাদ হিন্দ ফৌজের মুস্কিল আসান করেন আর সেই সঙ্গে গোটা অবস্থার একটা নির্ভুল বিবরণ আনেন। এই বিবরণ শেষ পর্যন্ত যখন এসে পৌছুল তখন জুন মাস শেষ হতে চলেছে।

ইতিমধ্যে বর্ষা শুরু হয়ে গেল। ২১শে মে সুভাষচন্দ্র রেঙ্গুণে ফিরে এলেন; অন্তত এখানে তিনি যুদ্ধের খবরাখবর রাখতে পারবেন। জাপানীরা তাঁকে এগারো-আসনযুক্ত 'আজাদ হিন্দ' বিমান সবে উপহার দিয়েছে; মেমিও থেকে যেতে যে সময় লাগত, এই বিমানে ক'রে সেই সময়ের মধ্যেই তিনি ইম্ফলে পৌছে যাবেন। তাছাড়া যুদ্ধজয়ে কেন দেরি হচ্ছে সে বিষয়ে লীগের কাছে খানিকটা ব্যাখ্যা দেওয়া এবং এই বেলা এই উত্তেজনার মুহূর্তে আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্যে যথাসম্ভব সৈন্যবল ও অর্থবল বাড়িয়ে নেওয়া

দরকার

রেঙ্গুণে তখনও খুব ভরসার ভাব। ভারতীয় তরুণদের মধ্যে কেউ কেউ আসন্ন জয়ের মুহূর্তে উপস্থিত থাকতে পারবে ব'লে, কেউ কেউ নিতান্ত পেটের ধান্ধায় না হলেও দলে দলে শিক্ষাকেন্দ্রে এসে সমানে ভিড় করতে লাগল। ২৯শে মে তারিখে একটি জনসভায় সুভাষচন্দ্র নগদ ও দামী জিনিষ মিলিয়ে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার মত তুললেন। একজন ব্যবসায়ী অনুপ্রাণিত হয়ে তার সমস্ত সম্পত্তি দান করল; মেয়েরা দিল গলার হার, সোনার দুল আর টাকাকড়ি। টৌঙ্গুর কাছে ভারতীয় মালিকানাধীন জেয়াওয়াড্‌ডি সুগার এষ্টেটের ম্যানেজার এষ্টেট্‌টি সুভাষচন্দ্রের হাতে তুলে দিলেন: সুভাষ-চন্দ্র এটিকে অতঃপর স্বাধীন ভারতের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করতে লাগলেন এবং এষ্টেটের সমস্ত মুনাফা অস্থায়ী সরকারের রাজস্ব ব'লে ধরা হতে লাগল। এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। এই সময়ে বর্মায় আই-এন-এর খরচ মাসে বিশ লক্ষ টাকা, অধিকৃত অঞ্চলে পুনর্গঠন বাবদ ধার্য ব্যয় ক্রমশ বাড়ছে এবং জাপানী টাকার মূল্য ক্রমশ কমছে। সুতরাং বেশী বেশী টাকা তোলা দরকার। সুভাষচন্দ্র সংগ্রাম-পরিষদের নেতৃস্থানীয় সদস্য শ্রীযুক্ত এন. রাঘবনকে কিছুকাল আগে ব'লে ক'য়ে মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে রাজী করিয়ে-ছিলেন; রাঘবনকে তিনি এবার অর্থমন্ত্রীর দপ্তর দিলেন।

ছ' সপ্তাহের অনুপস্থিতির ফলে রেঙ্গুণে সুভাষচন্দ্রের যেসব কাজ জমে ছিল একে একে সে সব কাজ সেরে ফেলতে হল; মালয় থেকে সদ্য আগত সৈন্যদল পরিদর্শন করতে হল এবং চতুর্থ আই-এন-এ রেজিমেণ্টের রেঙ্গুণ ছেড়ে যাওয়ার সময় তাঁকে উপস্থিত থাকতে হল। এ ছাড়া একটি বিশেষ ব্যাপারে এই সময়ে তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল: রেঙ্গুণের একটি শিক্ষাকেন্দ্রে সামরিক শাস্তি দানের ফলে একজন তামিলভাষী রং রুটের প্রাণহানি হয়। ঘটনাটিতে উৎপীড়ন ও নিষ্ঠুরতার পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া যায়। তদন্তের জন্যে যে বিচারসভা বসে তার সভাপতি ছিলেন সুভাষচন্দ্র; বিচারে মেডিকেল অফিসার নির্দোষ ব'লে বিবেচিত হন এবং কমাণ্ডাণ্টকে ভর্ৎসনা ক'রে সরিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনাটি সুভাষচন্দ্রকে রীতিমত ভাবিত ক'রে তোলে; মোহন সিং-এর আমলে দলে টানার জন্যে যে ভাবে বলপ্রয়োগ করা হত তার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় তার জন্যে এতদিন তিনি তীক্ষ্ণ নজর রেখে এসেছেন; এটা এমন একটা ঘটনা যা তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করতে

পারেন না। এ ব্যাপারে আশ্বস্ত হওয়ার জন্যে রেঙ্গুণের প্রত্যেকটি শিক্ষাকেন্দ্র তিনি খুঁটিয়ে দেখে বেড়াতে লাগলেন।

জুন মাসে তাঁকে বিমানযোগে সিঙ্গাপুরে যেতে হল—তারও প্রধান কারণ শাস্তিবিধান। পেনাঙে এ সময়ে একটি মুসলিম গোয়েন্দা শিক্ষাকেন্দ্র ছিল, এই কেন্দ্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত একদল লোক মার্চের শেষে ভারতবর্ষে আত্ম-সমর্পণ করে এবং দিল্লী থেকে বেতারে প্রচার করে। জাপানী ব্যবস্থাধীনে শিক্ষা দেওয়ার পর তাদের ডুবোজাহাজে ক'রে চালান করা হয় এবং এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পালানো। পেনাঙে জাপানী নিরাপত্তা বিভাগের তদন্তের ফলে জানা যায় যে, শিক্ষাকেন্দ্রের একজন ভূতপূর্ব অফিসার ক্যাপ্টেন দুররানি ছুটি নিয়ে যখন পেনাঙে এসে-ছিলেন, সেই সময়ে তাঁর প্রাক্তন ছাত্রেরা ট্রেণিং নিচ্ছিল। এই দুটি ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক আছে ব'লে জাপানীরা ঘোরতর ভাবে সন্দেহ করেছিল। আসলে দুররানি ঐ দলটাকে শুধু আত্মসমর্পণ করবার পরামর্শই দেননি, সেইসঙ্গে ভারতের সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে পৌঁছে দেবার জন্যে তাদের মারফত কিছু খবরাখবরও পাঠিয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন দুররানিকে ধ'রে এনে জেরা করা হয়। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে কোন কথা বার করা যায়নি।

/ রেঙ্গুণে এসে সুভাষচন্দ্র এই ব্যাপারটা সম্পর্কে স্বামীর কাছ থেকে একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিলেন এবং এ ব্যাপারে তিনি নিজস্ব পন্থায় তদন্ত চালাবেন ব'লে স্থির করলেন। এই ঘটনাটি সম্পর্কে তিনি নিজের ঘাড়ে কোন দায়িত্ব নেননি, কারণ গুপ্তচরের দলটি সমুদ্র যাত্রা করবার আগে স্বামী যখন তাদের সঙ্গে দেখা করতে যান তখন তাঁকে দেখা করবার অনুমতি দেওয়া হয়নি। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সুভাষচন্দ্রের দৃঢ় ধারণা হল যে দুররানি প্রকৃতই দোষী। বিদ্যাধরী বন্দীশিবিরে একদিন মধ্যরাত্রের এক গোপন বিচারসভায় তিনি চাপা বিদ্বেষ নিয়ে দুররানির সম্মুখীন হলেন। তার আগে দশ দিন সমানে জাপানীরা দুররানির ওপর অত্যাচার চালিয়েছে; তাঁর শরীর দুর্বল এবং বেসামাল অবস্থা। নিজের দোষ অস্বীকার করলেও তাঁকে সুভাষচন্দ্র ছাড়বেন না। বললেন, 'জাপানী ফায়ারিং স্কোয়াডের হাত থেকে তোমাকে আমি বাঁচিয়েছি, ভারতীয়েরা তোমাকে গুলী করে মারবে—এ জন্যে আমার প্রতি তোমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।' দুররানি তার জবাবে নিজেকে নির্দোষ

বললেন ; আজাদ হিন্দ ফৌজের উচ্চপদস্থ অফিসাররা তাঁকে নিয়ে গিয়ে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। দ্বিতীয় বারের সাক্ষাৎকারের সময়ে সুভাষচন্দ্র বললেন দুররানিকে প্রাণদণ্ড দেবার আগে যে ক'রেই হোক স্বীকারোক্তি আদায় করা হবে।

পরদিন সুভাষচন্দ্র চলে গেলে আবার নতুন ক'রে চেষ্টা হতে লাগল ; ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে জেরা চালানোর পর আস্তে আস্তে শুরু হল শারীরিক নিগ্রহ। অন্ততপক্ষে বার চারেক 'আঙুলে চাপ দেওয়া' এবং বীভৎস 'জল চিকিৎসা'র পর দুররানির নাড়ী ছেড়ে যাওয়ার উপক্রম হল। পালানোর ব্যাপারে সাহায্য ও পরে তাঁর অবিচল সাহসের জন্যে দুররানি ১৯৪৬ সালে জর্জ ক্রশ পুরস্কার পান। মেনে নেওয়া গেল যে, নির্যাতন করতে সুভাষচন্দ্র ব'লে দেননি ; কিন্তু তা'হলেও বিশ্বাসঘাতকতা হয়েছে ধরে নিয়ে তিনি হয়ত একেবারেই লাগাম ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং যাকে তিনি দোষী বলে মনে করেছিলেন তার প্রতি তাঁর কোনরকম দয়ামায়া থাকেনি। ক্যাপ্টেন দুররানির যে হাল হয়েছিল, সে ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র তাঁর দায়িত্ব এড়াতে পারেন না।

সাজা দেওয়ার আরও একটা ঘটনা ঘটেছিল ; তবে তাতে হয়ত সুভাষচন্দ্রের এতটা হাত ছিল না। ব্যাপারটা চরম আকার নেয় মাসখানেক আগে। ২২শে এপ্রিল জাপানী নিরাপত্তা পুলিশ কে. পি. কে. মেননকে গ্রেপ্তার করে ; ১৯৪২-এর ডিসেম্বরে সংগ্রাম পরিষদ থেকে পদত্যাগ করবার পর লীগের কাজকর্মে মেনন কোনরকম অংশ গ্রহণ করেননি। জাপানীদের তিনি বিশ্বাস করতেন না এবং সুভাষচন্দ্র সম্পর্কেও তিনি সন্দেহ ও বিদ্বেষ পোষণ করতেন, জাপানীদের সঙ্গে ও সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কড়া ব্যবহারের কথা সবাই জানত : তাদের উভয়ের সম্পর্কে তাঁর বিভিন্ন কটু মন্তব্য মুখে মুখে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। একবার তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা বলো সুভাষচন্দ্র কাজের লোক, আমার পোষা বাঁদরটাও তাই : কাজের লোকই বটে : আগে কাজ করে, ভাবে তার পরে।' ভারতে সুভাষচন্দ্রের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মতবাদটা মেননের কাছে একেবারেই অসহ্য ছিল : 'নেতাজী ?' মেনন চেঁচিয়ে বলতেন, 'নেদাজী !' (কোন কর্মের নয়)।

জাপানীদের কাছে যেমন, তেমনি সুভাষচন্দ্রের কাছেও এই আচরণ

অসহ্য ঠেকেছিল। ষাট বছরের বুড়ো মেননকে দুমাস ধ'রে জেরা করার পর জাপানের প্রতি অনাস্থা ও সুভাষচন্দ্রকে ফ্যাশিষ্ট ডিক্টেটর বলার অভিযোগে সামরিক আদালতে ছ' বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হল। সুভাষচন্দ্র এ ব্যাপারে কোন রকম হস্তক্ষেপ করতে রাজী হলেন না।

মালয়ে থাকাকালে সুভাষচন্দ্র স্বামীর কাছ থেকে পেনাঙের বিভিন্ন গুপ্তচর শিক্ষাকেন্দ্র সম্পর্কে খবরাখবর পেলেন এবং লীগ ও আই-এন-এ সংগঠন পরিদর্শন করলেন। তত্ত্বাবধায়ক বোর্ডগুলির কাজে কোন ত্রুটি নেই; সৈন্য, অর্থ ও লীগের সদস্য সংগ্রহের জন্যে সমানে চেষ্টা চলেছে। কিন্তু তা'সত্ত্বেও বর্মার তুলনায় অনেক কম ফল পাওয়া গেছে। সুভাষচন্দ্র মালয়, জাভা ও সুমাত্রা থেকে লীগের সমস্ত সভাপতিকে এবং ধনী ব্যবসায়ীদের একাংশকে ডেকে পাঠালেন; তাতে নগদ ও প্রতিশ্রুতি মিলিয়ে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ ডলার উঠল। উত্তর-মালয়ের শিক্ষাশিবিরে অবস্থিত ২য় ডিভিশনকে এই ব'লে তিনি হুঁশিয়ার ক'রে দিলেন যে, জুলাই-আগস্ট নাগাদ বর্মায় রওনা হবার জন্যে যেন তারা তৈরি থাকে। জোহোরে গিয়ে তিনি ৩য় ডিভিশন গড়বার প্রস্তুতিপর্ব পরিদর্শন করলেন। ডিভিশনাল কমাণ্ডার জানালেন যে, তামিল কুলিমজুরদের সেপাই বানাবার আশা এখন তাঁর কাছে একেবারেই দুরাশা ব'লে মনে হচ্ছে। সুভাষচন্দ্র তাঁর দিকে ফিরে বললেন, নেতৃত্বের গুণই হল আসল। ভাল অফিসার হলে তার পক্ষে একাজ সম্ভব; তাদের ওপরই একাজের ভার দেওয়া হোক।

পেনাঙের গুপ্তচরশিক্ষাকেন্দ্রগুলি এতদিনে একজোট ক'রে ভারতীয়দের হাতে দেওয়া হয়েছে। মে মাসে স্বামী তাঁর নিজের পরিকল্পনা-মত একটি দলকে দক্ষিণ-ভারতে পাঠালেন এবং ডুবোজাহাজ পাওয়া গেলেই অন্যান্যদের যাতে চালান করা যায় তার জন্যে জাপানী নৌবহরের সঙ্গে তাঁর একটা ব্যবস্থা হল। কিন্তু সুভাষচন্দ্র তখন ইম্ফল থেকে সরাসরি ভারতে প্রবেশের কথা ভাবছিলেন: ভারতবর্ষে বিদ্রোহ জাগিয়ে তোলার ব্যাপারটা অনেক বেশী প্রত্যক্ষ ও তার পথও আগের চেয়ে ঢের বেশী প্রশস্ত হবে। ২৯শে জুন বর্মায় ফেরবার সময় স্বামীকে তিনি সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

বর্মায় এসে মনে হল ইম্ফল অভিযান ভালভাবেই চলেছে, তবে যে রকম আশা করা গিয়েছিল সে রকম নয়—তার চেয়ে ধীরগতিতে। রেঙ্গুনে

খবর আসতে দেরি হচ্ছে। মে মাসের মাঝামাঝি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কিয়ানি অনুরোধ জানিয়ে যে চিঠি লিখেছিলেন আই-এন-এ হেডকোয়ার্টার থেকে তার উত্তর গেল ১৬ই জুন, তবে ১ম ডিভিশন এখন যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছে এবং চতুর্দিকে মহা উৎসাহ। 'প্রত্যেকেই ২৪শে এপ্রিল থেকে ৬ই মে পর্যন্ত ২য় গেরিলা রেজিমেণ্টের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কথা পাঠ ক'রে উল্লসিত।'[৮] রেঙ্গুণস্থ জাপানীরা যুধ্যমান আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, কিয়ানির নেতৃত্ব ও তাঁর সৈন্যদলের অসাধারণ কর্মকুশলতা সম্পর্কে আরও অনেক খবর এল। সহায় রণাঙ্গন থেকে ফিরে ২য় গেরিলা রেজিমেণ্ট সম্পর্কে জাপানীদের উৎসাহ-উদ্দীপনার কথা জানালেন। এমন কি মে মাসেও যে সব সাঙ্ঘাতিক প্রশাসনিক মুস্কিল দেখা দিয়েছিল, সে সম্বন্ধে সহায় বেশী কিছু বললেন না ; চ্যাটার্জীকে তার কিছু কিছু ঠেলা সামলাতে হয়েছিল। কিন্তু চ্যাটার্জী তখন অসুস্থ অবস্থায় মেমিওতে। এমন কি ১০ই জুলাই যখন সুভাষচন্দ্রকে বলা হল যে, জাপানীরা ইম্ফল অভিযান পরিত্যাগ করছে—তখনও এই বিপর্যয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁর বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল ব'লে মনে হয়নি।

সুতরাং শুরুতে রেঙ্গুণে আবার সব কেল্লা ফতে হওয়ার ভাব দেখা গেল এবং বর্ষাগমে যখন জাপানীদের নিশ্চিন্ত জয়ের আশা একে একে ধুয়ে মুছে যাচ্ছে তখন লীগ নেতাজী-সপ্তাহ পালনে ব্যস্ত এবং সুভাষচন্দ্র তখনও যুদ্ধজয়ের ধারণা নিয়ে সরকার পুনর্গঠনের কথা চিন্তা করছেন। লীগের অবস্থা এই এবং সুভাষচন্দ্র তখন মানমর্যাদা, আত্মবিশ্বাস, ও ওজস্বিতার শিখরে। আই-এন-এ সামরিক আদালতে একজনকে প্রাণদণ্ড দিয়েছিল, সাজা মকুব ক'রে কারাদণ্ড করা হল ; সরকারী সম্বর্ধনাসভা অনুষ্ঠিত হতে লাগল ; বর্মার পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকিন নু অভিনন্দনবাণী পাঠালেন ; সুভাষচন্দ্র একটি সমাবর্তন অনুষ্ঠানে একজন পঙ্গু শিখ সৈনিককে বীরত্বের জন্য শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত করলেন, শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহের সমাধিস্থলে আই-এন-এ'র প্যারেড হল এবং লীগের উদ্যোগে আরও অসংখ্য উৎসব অনুষ্ঠিত হল।

সুভাষচন্দ্র একটি সালতামামি উপস্থিত করলেন। তাঁর মতে,

৮ পালেল বিমানঘাটির ওপর আক্রমণ প্রচেষ্টা, পরিশিষ্ট ৩ দ্রষ্টব্য

অপ্রত্যাশিত সাফল্য ঘটেছে; এক বছর আগে যে আর্থিক লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয়েছিল, সে-লক্ষ্য সাধিত হয়েছে। শুধু শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবেই আরও বেশী রংরুট সংগ্রহ করা যায়নি। কিন্তু কাজে ঢিলে দিলে চলবে না, লড়াই চালিয়ে যেতে হবে, যুদ্ধক্ষেত্রে আরও সৈন্য ও আরও সরবরাহ পাঠাতে হবে, সামগ্রিক যুদ্ধায়োজনে দেরি করলে চলবে না। ভারতবর্ষে বিদ্রোহ বাধানো, ভারতীয় সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে প্রচার এবং আই-এন-এর প্রশাসনিক কাজে সাহায্য—এইসব ব্যাপারে এখন বেশী ক'রে নজর দিতে হবে। বিশেষ ক'রে প্রশাসনিক দায়িত্ব ক্রমশ বাড়ছে। এই কাজে সামাল দেবার জন্যে মন্ত্রিসভাকে এই তিনটি কমিটিতে ভাগ ক'রে দিতে হবে—পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধঘাঁটি, শত্রুকবলমুক্ত এলাকা ও বৃটিশ-অধিকৃত ভারতবর্ষ। ঘাঁটি সংক্রান্ত সংগঠন সবচেয়ে জরুরী। সৈন্য সংগ্রহ ও ট্রেণিংয়ের কাজে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত সরবরাহ দপ্তর, অর্থদপ্তর ও নতুন রাজস্ব দপ্তরের সঙ্গে আরও একটি নতুন সৈন্যবল দপ্তর যোগ ক'রে দায়িত্ব ভাগ ক'রে দেওয়া হল।

বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে যুদ্ধ পরিস্থিতি ও ভারতের ভেতরকার অবস্থা সম্পর্কিত বেতারবক্তৃতায় কথার বাঁধুনি লক্ষ্য করবার মত ছিল।[১] প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় মার্কিণ সাফল্যে কিংবা ইউরোপে মিত্রপক্ষের আক্রমণেও সুভাষচন্দ্র মোটেই বিচলিত হননি। দিল্লী অভিযানে আরও দু'বছর সময় লাগতে পারে; তবে 'আমরা যে ভারতবর্ষকে শত্রুকবলমুক্ত করতে পারব' তাতে তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না—অবশ্য ইতিমধ্যে যদি গান্ধীজী ও বৃটিশের মধ্যে কোন আপোষরফা না হয়। তিনি স্বীকার করলেন যে, তেমন কোন আপোষরফা হলে তাঁর পক্ষে ভারতবর্ষকে মুক্ত করা আরও কঠিন হয়ে পড়বে। মিত্রপক্ষের প্রচার অভিযান সম্পর্কে তিনি কটুকাটব্য করলেন, তাদের দুটি বেতারকেন্দ্রের একটিকে 'ব্লাফ অ্যাণ্ড ব্লাস্টার কর্পোরেশন' (বি, বি, সি,) এবং অন্যটিকে 'অ্যান্টি-ইণ্ডিয়া রেডিও' (এ, আই, আর) বলে টিটকারি করলেন; তাঁর সম্পর্কে ঐসব বেতারকেন্দ্র থেকে যেসব কথা বলা হয়েছে তার উল্লেখ ক'রে তিনি তাদের বক্তব্যের জবাব দিলেন। ওদের

১ এই সপ্তাহে প্রদত্ত বক্তৃতা ও বিবৃতি 'ব্লাড বাথ' পুস্তিকায় সন্নিবেশিত হয়; এস্থলে ও পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠায় উদ্ধৃতিগুলি সেই পুস্তিকা থেকে গৃহীত

প্রচার মিথ্যা, সমস্ত প্রতিশ্রুতিই তিনি রক্ষা করেছেন। 'এবার ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে'; ভারতবর্ষকে মুক্ত করবার উপযুক্ত শক্তি ও সংগঠন তাঁর আছে; এই শক্তির উৎস ভাল রসদ ও ভাল পরিচ্ছদ নয়—বিশ্বাস ও আত্মোৎসর্গ, বীরত্ব ও কষ্টসহিষ্ণুতাই এই শক্তির উৎস। ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হবে,

> মনে মনে যারা বৃটিশের পক্ষপাতী নয়, এবং······স্বাধীনতা আন্দোলনে যারা ওপরপড়া হয়ে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেনি······ বৃটিশ সরকারের কর্মে নিযুক্ত সেইসব লোক যদি দক্ষ হয় তাহলে তারা সবাই নতুন সরকারের অধীনে বহাল হবে।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর লোকদেরও একই শর্তে গ্রহণ করা হবে এবং আজাদ হিন্দ. ফৌজে পেন্সনের যোগ্যতা নির্ণয় করবার সময় ভারতীয় বাহিনীতে কাজ করবার মেয়াদও হিসেবের মধ্যে ধরা হবে। বৃটিশ এইবার 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব মেনে নিয়ে সেই অনুসারে কাজ করুক এবং 'আমি কথা দিচ্ছি একজন জাপানী সৈন্যও ভারতের মাটিতে পা দেবে না'। অবশ্য:

> বৃটিশকে তাদের অপরাধের জন্যে শাস্তি পেতে হবে···তারা মুক্তিপ্রিয় নিরীহ ভারতবাসীর রক্তপাত করেছে, তাদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছে। আমরা ভারতবাসীরা আমাদের শত্রুকে যথেষ্ট ঘৃণা করি না। যদি তোমরা তোমাদের দেশবাসীর কাছ থেকে অসামান্য শৌর্যবীর্যের পরিচয় পেতে চাও—তাহলে তাদের শেখাতে হবে— শুধু দেশকে ভালবাসতে নয়—সেইসঙ্গে শত্রুকে ঘৃণা করতে।

গান্ধীজী তখন ভারতবর্ষে সবে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন; ৬ই জুলাই গান্ধীজীর উদ্দেশ্যে প্রচারিত সুভাষচন্দ্রের বেতারভাষণে আগেকার আত্মবিশ্বাসের সে দৃপ্ত স্বর ফুটে উঠল না। তার বদলে দেখা গেল কুণ্ঠিত সমীহ ভাব এবং আস্থা অর্জনের ঐকান্তিক চেষ্টা; সুভাষচন্দ্র বললেন,

'মহাত্মাজী, আমাকে বিশ্বাস করুন; ব্রতসাধনের উদ্দেশ্যে শেষ পর্যন্ত বিপদ মাথায় ক'রে বেরিয়ে পড়বার আগে আমি দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস লাভলোকসানের কথা খুঁটিয়ে ভেবে দেখেছি।' তাঁকে দেশদ্রোহী বলবার কোন হেতু থাকতে পারে না; ভারতবর্ষ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে তাঁকে সর্বস্ব পণ করতে হয়েছে; তিনি তা করেছেন এই বিশ্বাসে যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে বাইরে থেকে সাহায্য পাওয়া নিতান্ত দরকার। তাঁর অতীতের কার্যকলাপ বিচার করলেই তাঁর আন্তরিকতা ও সততার নিঃসন্দেহে প্রমাণ মিলবে। অক্ষশক্তির কাছ থেকে তাঁর নিজের পাবার কিছু নেই; যাকে তিনি শ্রেষ্ঠ সম্মান ব'লে মনে করেন, তা ভারতবর্ষে আগেই তাঁর মিলেছে। তিনি এমন বোকা নন যে, অন্যেরা তাঁকে ঠকাবে: ভারতের স্বার্থ ও সম্মান কখনই তিনি পরের হাতে সঁপে দেননি, ভবিষ্যতেও দেবেন না।

তিনি স্বচক্ষে দেখে এসেছেন জাপান আর এখন সে জাপান নেই: জাপানী জনসাধারণের এখন 'এশিয়া অন্ত প্রাণ' এবং এশিয়া সম্পর্কে জাপানের বর্তমান নীতির 'মূলে রয়েছে আন্তরিকতা'। অস্থায়ী সরকারের ব্যাপারে কথা হল:

> ভারতবর্ষ থেকে আমাদের শত্রুদের বিতাড়িত ক'রে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই অস্থায়ী সরকারের ব্রত সমাধা হবে। তখন কী ধরনের সরকার হবে এবং সেই সরকার পরিচালনার দায়িত্ব কারা নেবে—ভারতের জনসাধারণই তা ঠিক করবে।

তিনি নিজে ও তাঁর সহকর্মীরা যেমন, অস্থায়ী সরকারও তেমনি ভারতীয় জনসাধারণের সেবক; এই সরকারের নিজস্ব কোন দাবি দাওয়া থাকবে না: 'আমাদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণের পক্ষপাতী।...' ইতিমধ্যে বৃটিশ যদি কোন না কোনভাবে ভারত ত্যাগ না করে, লড়াই চলতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত 'আমাদের জয়' অনিবার্য।

এর দ্বারা অবশ্যই একথা বোঝা যায় না যে, সুভাষচন্দ্র জাপান কিংবা অক্ষশক্তির জয়ের কথা বলতে চাইছেন। ভারতবর্ষ থেকে বৃটিশকে

তাড়াতে পারলেই তাঁর জয় হবে এবং গান্ধীজী ও ভারতের জনসাধারণের সঙ্গে সেই গৌরব তিনি ভাগ ক'রে নেবেন। জাপানের কাছ থেকে তিনি এখন শুধু সময় চান, দু বছরের মত সময় —আজাদ হিন্দ ফৌজ ও বর্মায় তার সৈন্যদল সেই লক্ষ্য সফল করবে। যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক, অন্তত এর পর বৃটিশের পক্ষে আর ভারতবর্ষে নতুন ক'রে গেড়ে বসা সম্ভব হবে না। ১৯৪৬ সালে ইন্দোনেশিয়ায় যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছিল—দেশ অধিকার করতে গিয়ে মিত্রপক্ষ শত চেষ্টা ক'রেও সেখানে জাপানীদের সাহায্যে গড়া দেশীয় সরকারকে উচ্ছেদ করতে পারেনি—প্রকৃতপক্ষে সেই রকমের একটা পরিস্থিতির কথা সুভাষচন্দ্র তখন কল্পনা করতে আরম্ভ করেছিলেন।

জাপানের জয় সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ ক'রে রেঙ্গুণে কিছু বলা সম্ভব হয়নি। কেননা তার ফলে শেষটায় আই-এন-এ'র মনোবল ক্ষুণ্ন হ'বে এবং সুভাষচন্দ্র চাইছিলেন তাঁর অনুগামীদের মধ্যে আরও বেশী বিশ্বাসের ভাব জাগাতে। নেতাজী-সপ্তাহে বর্মার রাজধানীতে ভারতীয়দের সামনে যথাসম্ভব জাঁক দেখানো হল। সমাবর্তন অনুষ্ঠানটি আবেগে গদ গদ হয়ে উঠেছিল : সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, 'এমন এক বীর অফিসারকে সম্মানিত ক'রে আমি নিজেকে, আমার সেনাবাহিনীকে ও আমার সরকারকে সম্মানিত করছি'। এরপর ১০ই জুলাই সাম্প্রতিক লড়াইতে বন্দী হওয়া ভারতীয় পল্টনের কিছু সেপাইকে—সংখ্যায় শতখানেক হবে—প্রকাশ্য জনসমাবেশে 'নতুন সাথী' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হল। জুলাই মাস পর্যন্ত জনসাধারণের মনে কোন রকমে বিশ্বাস টিঁকিয়ে রাখা গেল। অবিরাম কাজ হচ্ছে : সুভাষচন্দ্র বড় গলা করে বললেন, সমানে রংরুট আসছে, টাকা আসছে। যারা তাদের সমস্ত সম্পত্তি দান করেছে সুভাষচন্দ্র তাদের জন্যে একটি নতুন উপাধির প্রবর্তন করলেন—'সেবক-ই-হিন্দ'। রেঙ্গুণে একাধিক লোক এই উপাধি পেল।

এতদিনে সুভাষচন্দ্র নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিলেন ইম্ফল অভিযান ব্যর্থ হয়েছে ; কিন্তু সামরিক দিক থেকে যে একটা প্রলয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেছে, সে উপলব্ধি তখনও তাঁর হয়নি। রণাঙ্গন থেকে আসা চিঠি প'ড়ে অবস্থা আঁচ করা সম্ভব ছিল না ; কেননা জাপানীদের চোখ এড়িয়ে চিঠি পাঠানো যেত না। মে মাসে যে গুরুতর রকমের প্রশাসনিক গোলযোগ দেখা দিয়ে-

ছিল চ্যাটার্জীর রিপোর্টে তার উল্লেখ ছিল ; কিন্তু সঙ্গতভাবেই তখন আশা করা গিয়েছিল যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে আসবার পর যাদের ওপর কাজের দায়িত্ব ছিল ১ম ডিভিশনের পশ্চাদ্‌বর্তী সেই হেডকোয়ার্টার এই গোলযোগ মিটিয়ে ফেলতে পারবে। কিন্তু জাপানীরা ১ম ডিভিশনকে তলব ক'রে পাঠানোর ফলে মুস্কিল দেখা দিল ; এপ্রিলের মধ্যভাগে 'চার্চিল রেশন' দখলের ভিত্তিতে তাদের যে প্রশাসনিক পরিকল্পনা তৈরী হয়েছিল, সেদিক থেকে তাদের তখন নিঃসম্বল অবস্থা। যে জাপানী প্রশাসকদলের ওপর আজাদ হিন্দ ফৌজের রসদ মেটাবার ভার পড়ল, তারা তখন নিজেদের তিনটির মধ্যে দুটো ডিভিশনেরই রসদ যোগাতে অক্ষম। ফলে, নেহাৎ আত্মরক্ষার তাগিদেও যেটুকু লড়াই দরকার তার উপযোগী রসদ, যানবাহন আর গোলা-বারুদের অভাব ঘটল। হিকারি-কিকানের হাতে ছিল সরবরাহের ভার ; তাদের কাজ হল এখন অজুহাত দেখানো। আই-এন-এ'র জন্যে পাঠানো মালপত্র প্রায়ই তারা জাপানীদের ভাঁড়ারে নিয়ে গিয়ে তুলতে লাগল। স্থানীয়ভাবে সাড়ে ছ'লক্ষ টাকার রসদ খরিদ ক'রে চ্যাটার্জী অবস্থা আয়ত্তে আনতে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের কাছে তিনি এই ব'লে সুপারিশ করেছিলেন যে, হিকারি-কিকান দল উঠিয়ে দেওয়া হোক, অবিলম্বে যথাসম্ভব উচ্চ মহলে সরবরাহ ও যানবাহনের অভাবের কথা জানানো হোক এবং এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক যাতে ভবিষ্যতে আই-এন-এ আরও বেশী নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে।

কিন্তু ইম্ফল অভিযানের তখন দফা রফা হয়ে গেছে ; কোন ওষুধেই আর কাজ হল না। ২৬শে জুলাই প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করা হল ইম্ফল অভিযান আপাতত শিকেয় তোলা থাকবে ; ঐদিনই তোজো অন্য একটি কারণে পদত্যাগ করলেন। আগষ্ট মাসে করালমূর্তিতে দেখা দিল বিপর্যয়। পশ্চাদপসরণরত জাপানী সৈন্যবাহিনীকে অনুসরণ করবার সময় ভারতীয় বাহিনীর চোখে পড়ল এক করুণ হৃদয়বিদারক দৃশ্য : 'বুভুক্ষু, বুক-ভাঙা আই-এন-এ সৈন্যেরা হামাগুড়ি দিয়ে আমাদের সৈন্যদলের কাছে আসছে দলের চলৎশক্তিহীন অন্য সঙ্গীসাথীদের দেখিয়ে দেবার জন্যে। শত শত জাপানীর মৃতদেহ ইতস্তত ছড়ানো,'[১০] তার মধ্যে অনাহারে মৃত বহু আই-এন-এ

১০ চতুর্দ্দশ বাহিনীর রিপোর্ট

সৈন্য। খাবার দাবার, জামাকাপড়, কম্বল আর বুট পাঠাবার জন্যে ১২ই আগষ্ট ম্যাণ্ডালে থেকে সুভাষচন্দ্রের কাছে খবর পাঠানো হল। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রাণ নিয়ে যারা ফিরেছে, বার্তাবাহক তাদের কাউকে কাউকে দেখেছে ; তার মুখ থেকে বিবরণ শুনে সুভাষচন্দ্র এই প্রথম উপলব্ধি করলেন যে তাঁর ১ম ডিভিশনের ভরাডুবি হয়েছে। সুভাষচন্দ্রের মুখ শুকিয়ে গেল : আর্তত্রাণের কাজে তিনি তৎক্ষণাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লেন। উত্তর বর্মায় আজাদ হিন্দ ফৌজ ইতিমধ্যে পর্যায়ক্রমে শিবির, চিকিৎসা ও বিশ্রামকেন্দ্র খাড়া করেছে; যানবাহনেরও যৎকিঞ্চিৎ ব্যবস্থা হয়েছে। এবার রেঙ্গুণ থেকে গুদামজাত উদ্বৃত্ত রসদ ও বাজারের জিনিসপত্র পাঠানো হতে লাগল, গাড়িঘোড়া জোটানো হল, জামা কাপড় আর বুট যোগাড় করা হল এবং নতুন একটি জরুরী হাসপাতাল খোলা হল। সুভাষচন্দ্র তাঁর নিজস্ব মেডিকেল অফিসারকে পাঠিয়ে দিলেন এবং সেইসঙ্গে, যে সব ডাক্তারকে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব তাদেরও বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। ১৯শে আগষ্ট কিয়ানির কাছ থেকে এল মর্মান্তিক আবেদন : পশ্চাদপসরণের পথে বন্যার ফলে আটক তাঁর দলের কয়েক শো অসুস্থ লোককে উদ্ধার করবার জন্যে সুভাষচন্দ্র যেন অবিলম্বে জাপানীদের শরণাপন্ন হন। সুভাষচন্দ্র এ ব্যাপারে নিরুপায় ; কেননা জাপানীরাও হালে পানি পাচ্ছে না, তাদের কিছুই করবার ক্ষমতা নেই।

সুভাষচন্দ্র নিজে তখনও রেঙ্গুণ ছেড়ে গেলেন না : কোন রকম ব্যস্ততার ভাব যেন প্রকাশ না পায়, যা ঘটেছে জাপানীরা তা স্বীকার করতে দেবে না এবং ভারতীয় জনসাধারণ যেন ব্যাপারটা আঁচ করতে না পারে। ১৪ই আগষ্ট-এর বিশেষ ঘোষণাপত্রে[১১] সুভাষচন্দ্র শুধু যুদ্ধাভিযান স্থগিত রাখা ও কৌশলগত পশ্চাদপসরণের কথা বললেন। বৃটিশ সৈন্যবাহিনী অনেক বেশী সুসজ্জিত, কিন্তু 'প্রত্যেকটি লড়াইতে আমরা তাদের হারিয়েছি। ভাল ট্রেণিং ও নিয়মানুবর্তিতার জোরে আমাদের ইউনিটগুলি...অল্প সময়ের মধ্যেই শত্রু পক্ষের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে, ওরা যতই পরাজয় বরণ করতে থাকে ততই ওদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে।' আই-এন-এ'র বীর যোদ্ধাদের সাহস দেখে সকলেই প্রশংসা করেছে এবং তাদের ওপর ভরসা রাখা যায়। বর্মা শুরু

১১ পরিশিষ্ট ২, ৬ নং

হয়ে যাওয়ায় ইম্ফলে বৃটিশ খুব জোর বেঁচে গেছে, কিন্তু আবহাওয়া ভাল হওয়ার পর নতুন ক'রে যখন প্রচণ্ড অভিযান আবার শুরু হবে তখন পরাজয় বরণ করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকবে না। যারা কর্তব্য পালন করেছে তাদের পুরস্কৃত করবারও সেইসঙ্গে ব্যবস্থা হল।[১২] যারা বৃটিশ সৈন্যদের হত্যা কিম্বা বন্দী করেছে, তাদের নতুন একটি পদক দেওয়া হবে ব'লে ২৮শে আগষ্ট সুভাষচন্দ্র ঘোষণা করলেন। ৮ই সেপ্টেম্বর একটি সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি এপ্রিল ও জুলাই মাসের ঘোষণা অনুযায়ী কয়েকটি পদক দান করলেন; ১৯৪৩ সালের ভারতবর্ষে যে প্যারাসুটবাহী গুপ্তচরদের ফাঁসী হয়েছিল, তাদের স্মৃতিতে ২১শে সেপ্টেম্বর 'শহীদ দিবস' ঘোষিত হল।

এ সমস্তই ছিল বাইরের লোক-দেখানো ব্যাপার। নিজেদের মধ্যে যখন কথা হয়েছে, তখন আজাদ হিন্দ ফৌজের আচরণ সম্পর্কে তিনি তাঁর ক্রোধ গোপন রাখেননি। তিনি জানতেন শত শত লোক দলত্যাগী হয়েছে, তার জন্যে সেনাপতিদেরই তিনি দোষ দিয়েছেন। সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে রেঙ্গুণে সমস্ত আই-এন-এ অফিসারদের ডেকে তিনি কঠোর সমালোচনা করলেন। বললেন, অফিসারদের নীতিহীনতা, বিলাসপ্রিয়তা আর দুর্নীতির ফলে সৈন্যদের মন ভেঙে যাওয়ার দরুনই এইভাবে দলত্যাগ সম্ভব হয়েছে। নায়কদের ব্যর্থতাই এই বিপর্যয়ের কারণ। সৈন্যদের দিকে না তাকিয়ে নিজেদের আরাম খোঁজা, তছরুপ আর তঞ্চকতা করা — এর জন্যে সেনাপতিদের তিনি গালাগাল দিয়ে ভূত ভাগালেন। বার বার এই বলে শাসালেন যে, যারা লড়াই করতে চায় না তারা এই মুহূর্তে আই-এন এ থেকে বেরিয়ে যাক। দু ঘণ্টা ধ'রে সমানে ধমকাবার পর সুভাষচন্দ্র তাদের বিদায় ক'রে দিলেন।

অফিসাররা নিম্নস্তরের, এ কথা জোর দিয়ে বলাতে সুভাষচন্দ্রের হয়ত কোন ভুল হয়নি; কিন্তু ইম্ফলের বিপর্যয়ের জন্যে তাদের অতখানি দোষের ভাগী করার অর্থ হল ব্যাপারটাকে অতি সরল ক'রে দেখা, তাদের কুলশীল ও ট্রেণিংয়ের ধরনধারণের কথা ভুলে যাওয়া। ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার ও তার ঊর্ধ্বতন অফিসাররা আগে ভারতীয় সেনাবাহিনীতেও অফিসার

১২ মৃত্যুর পর পদোন্নতি সহ এগারোটি পুরস্কার আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল, অক্টোবরে আরও চব্বিশটি এবং নভেম্বরে আরও ষোলটি ঘোষণা প্রকাশিত হল; ১৯৪৫ সালে আরও তেত্রিশটি পুরস্কার দান করা হয়

ছিল: তাদের মধ্যে কেউ কেউ ভারতীয় মিলিটারি আকাদেমির যুদ্ধ-পূর্ব গ্র্যাজুয়েট, একজন ছিল স্যাণ্ডহার্স্ট'-ফেরত। কিন্তু ১ম আই-এন-এ ডিভিশনের প্লেটুন ও কোম্পানী অফিসারদের মধ্যে অফিসার হিসেবে ট্রেণিংপ্রাপ্ত লোক খুব কম ছিল: তাদের মধ্যে বেশির ভাগকেই মোহন সিং সাধারণ সৈনিকের পর্যায় থেকে সরাসরি অফিসার পদে উন্নীত করেছিলেন। তার মধ্যে খুব কম লোকই আই-এন-এ অফিসারদের ট্রেণিং স্কুলে তিন-মাসের কোর্স অনুযায়ী শিক্ষালাভ করেছিল; এই স্কুলে আবার ১৯৪০ ও ১৯৪১-এর বৃটিশ ট্রেণিং ম্যানুয়লের ভিত্তিতে শিক্ষা দেওয়া হত; ট্রেণিংয়ের ব্যাপারে জাপানীরা খুব সামান্যই সাহায্য করেছিল। যে অফিসারদের নিজেদের এই হাল, ১৯৪৪ সালের যুদ্ধে তাদের কাছ থেকে আর এর চেয়ে কত ভাল নেতৃত্ব আশা করা যেতে পারে?

সুভাষচন্দ্র এসব তেমন ধর্তব্যের মধ্যেই আনেননি: বরং অভিযানের কথা যতই তিনি জানতে লাগলেন ততই রাগ আর ব্যক্তিগত ব্যর্থতা-প্রসূত হতবুদ্ধির ভাবই তাঁর মধ্যে প্রবল হয়ে উঠতে লাগল। এইসব যোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করবার কাজে তিনি একেবারে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে কুলোয়নি। ইম্ফল রণাঙ্গনে তাঁর পাঠানো ছ' হাজার সৈন্যের মধ্যে অন্ততপক্ষে দেড় হাজার হয় দলত্যাগী নয় বন্দী হয়েছে। সুভাষচন্দ্রের খুব বড় রকমের ভরসা ছিল যে, আই-এন-এ'র প্রভাবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে ভাঙন ধরানো যাবে—কিন্তু দেখা গেল সে প্রভাব একেবারেই নগণ্য। বিশ্বাস আর সংগ্রামস্পৃহার দিক থেকে এই যে সমস্যা, কিভাবে এর সমাধান হবে? তাঁর দ্বিতীয় ডিভিশন এখন বর্মায় এসে জড়ো হচ্ছে: এরও কি ঐ একই পরিণাম হবে? একদিন রাত্রে দ্বিতীয় ডিভিশনের কয়েকজন অফিসারের সঙ্গে তাঁর কথা হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, যদি কাউকে মনে হয় যে সে দলত্যাগ করতে যাচ্ছে, তার পদমর্যাদা যাই হোক, তাকে গুলী ক'রে মারার ঢালাও নির্দেশ কি প্রত্যেক সৈনিককে দেওয়া যায়? কী মনে হয় আপনাদের? উত্তরে তাঁরা বললেন, না; ও ধরনের নির্দেশের কদর্থ হতে পারে: বরং দলত্যাগের কারণগুলো খুঁজে বার ক'রে তার প্রতিকার করা হোক। সুভাষচন্দ্রের ধারণা, কারণগুলো সবই তাঁর জানা—অর্থাৎ, আই-এন-এ'র সরবরাহ ও খোরপোষের ব্যবস্থা করতে জাপানীদের ব্যর্থতা, যুক্তভাবে যুদ্ধ

চালানোর দিক থেকে তাদের অক্ষমতা, এবং সর্বোপরি, ট্রেনিংয়ের সময় যথার্থ জাতীয়তাবাদী প্রেরণা সৃষ্টি ও সংগ্রামের প্রবৃত্তি জাগাবার ব্যাপারে তাঁর অফিসারদের ব্যর্থতা। সম্ভবত তাঁর দিক থেকেও কর্তব্যে ত্রুটি হয়েছে—যুদ্ধক্ষেত্রে জাপানীরা যাতে তাঁকে যেতে দেয় তার জন্যে তাঁর জেদ ধরা উচিত ছিল ঃ এরপর যাতে তাঁকে এভাবে আর ঠেকিয়ে রাখা না হয়, সেটা দেখতে হবে।

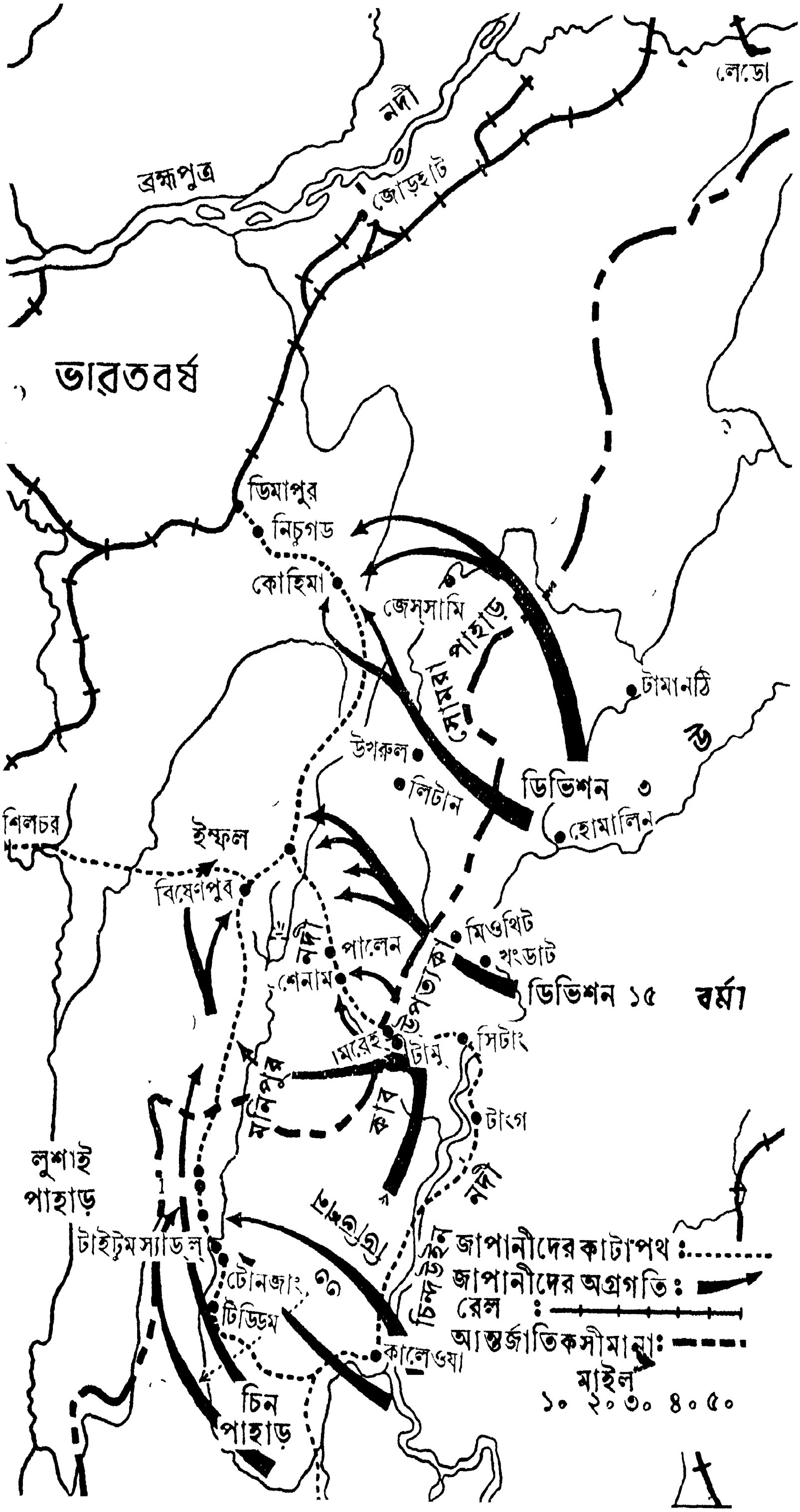
জাপানীদের বিরুদ্ধে তীব্র রাগ, আপন সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে খিন্ন হতাশ ভাব, নিজের ভূমিকা সম্পর্কে অসন্তোষ—এই রকমের মেজাজ নিয়ে সুভাষচন্দ্র ১৮ই সেপ্টেম্বর উত্তর বর্মার পথে রওনা হলেন এবং শেষ পর্যন্ত স্বচক্ষে সব দেখতে লাগলেন। সমস্ত ভারতীয় কমাণ্ডার এবং যে কয়েকজন জাপানী সেনাপতি তখনও স্ব স্ব স্থানে বহাল ছিল, তাদের সকলের সঙ্গেই তাঁর দেখাসাক্ষাৎ হল। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যারা প্রাণ নিয়ে ফিরেছে, তাদের পাঁচ ভাগের চার ভাগই তখন আই-এন-এ ক্যাম্প আর হাসপাতালে প'ড়ে রয়েছে, যেখানেই যান চোখে পড়ে দুর্গতের বেদনা, শুনতে পান পলায়নপথের করুণ কাহিনী আর সেইসঙ্গে সকলেই তাকে কাছে পেয়ে ধন্য হয়, কেননা এই উৎসর্গীকৃতপ্রাণ মানুষটির স্বভাবের মধ্যে এমন একটা বিস্ময়কর প্রচণ্ড সরলতা আছে যা আপনা থেকেই মনের মধ্যে ভক্তি ভালবাসা এনে দেয়।

৭

বর্মায় পরাভব

জাপানীদের ১৯৪৪ সালের অভিযানপর্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের কাহিনী যেমন দীর্ঘ তেমনি জটিল, এবং তার সৈন্যেরা জাপানীদের যেসব রেজিমেণ্ট ও ডিভিশনের সঙ্গে একযোগে অভিযান চালিয়েছিল, তাদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত পরে কখনও সে ইতিহাস লেখা হবে। তবে সুভাষচন্দ্র শুধু ততটুকুই জানতেন জাপানী গোয়েন্দা বিভাগ থেকে যতটুকু তাঁকে জানতে দেওয়া হয়েছিল, তাঁর নিজের ভূমিকা এক্ষেত্রে খুব কমই ছিল। এখানে সেই বাহিনীর মোটামুটি একটা আভাস দিলেই যথেষ্ট হবে।

জাপানীদের ইম্ফল অভিযানের ভার ছিল তিনটি ডিভিশনের ওপর, সে তুলনায় আরাকানের যুক্ত যুদ্ধ প্রচেষ্টায় রত ছিল মাত্র এক ডিভিশন। ইম্ফলের প্রত্যেকটি ডিভিশনের সঙ্গে ছিল দেড়শো দুশো অনিয়মিত সৈন্যসমন্বিত আই-এন-এ'র বিশেষ কয়েকটি গ্রুপ, আক্রমণকারীরা বিশাল পার্বত্যজঙ্গল ভেদ ক'রে এগোবার সময় এরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গিয়ে পথপ্রদর্শক, দোভাষী, প্রচারক ও গুপ্তচর হিসেবে কাজ করবে। আরাকানস্থ বাহিনীরও আড়াইশো সৈন্যসমন্বিত এই রকমের একটি গ্রুপ ছিল। বৃটিশ-ভারতীয় সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় তারস্বরে প্রচার করা কিংবা উল্টোপাল্টা হুকুম দিয়ে ধোঁকা লাগানো কখনও কখনও তাদের ভুলিয়ে ভালিয়ে জাপানীদের গুপ্ত ঘাটিতে নিয়ে গিয়ে তোলা এবং তাদের ব্যূহব্যবস্থার গোপন খবর যোগাড় করা—এই ধরনের উৎপাত সৃষ্টির ব্যাপারে ছোট ছোট দলগুলো জাপানীদের খানিকটা



জাপ-আক্রমনের পথ, বর্মা, ১৯৪৪

কাজে লাগত। চারটি ক্ষেত্রে ভারতীয় সেপাইদের সদলে বন্দী করতে প্রচার খানিকটা সহায় হয়, তাও সংখ্যায় এক প্লেটুনের বেশী কখনই নয়। আরাকানে এই রকম একটি ঘটনা ঘটেছিল; গোয়ালিয়র লান্সার-এর একটি ঘাটিয়াল প্লেটুনের অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপের ফলেই বোধহয় সেখানে জাপানীরা গোড়ার দিকে অপ্রত্যাশিতভাবে সাফল্যলাভ করে। নৃশংসতাও সংঘটিত হয়েছে: ১৯শে মার্চ নাগাদ লামটং-এ জাপানীদের নির্দেশে দুজন ভারতীয় সঙ্গীন দিয়ে খুঁচিয়ে একজন বন্দীকে হত্যা করে। ব্যস্, মোট কাজ বলতে এই, জাপানীরা যতক্ষণ সামনে আছে, ততক্ষণ তারা প্রধানত দায় সেরেছে—কিন্তু যখনই পালাবার কোন একটা সুযোগ পেয়েছে, তখনই সরে পড়েছে।

বরং আই-এন-এ রেজিমেণ্ট নানা দিকে বীরত্ব দেখিয়েছে। রেজিমেণ্ট বলতে তিনটি, ১ম ('সুভাষ') রেজিমেণ্টে সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় তিন হাজার, ২য় ও ৩য় রেজিমেণ্টের প্রত্যেকটিতেই দু হাজার। ৮১ নং পশ্চিম আফ্রিকান বাহিনী যখন পশ্চাদপসরণ করছে, তখন ১ম রেজিমেণ্টের একটি ব্যাটালিয়ন ২৪শে মাচ কালাদান উপত্যকায় এসে পৌছোয়। আফ্রিকান বাহিনীব পশ্চাদ্ভাগের সৈন্যদের সঙ্গে দু তিন দিনের খণ্ডযুদ্ধে রেজিমেণ্টের কিছু সৈন্য হতাহত হয়। এরপর আর কোন যুদ্ধবিগ্রহ না হওয়ায় সেপ্টেম্বর পযন্ত তারা এই এলাকায় অক্ষত অবস্থায় থাকে; বর্ষার মরশুমে ভারতীয় ভূখণ্ডে সাঙ্গু উপত্যকার মোডোকে তারা একদল সৈন্য মোতায়েন করে।

রেজিমেণ্টের দপ্তরসহ শাহ্ নওয়াজের নেতৃত্বে আর দুইটি ব্যাটালিয়ন মার্চ মাসের গোড়া থেকে চিন পাহাড়ের হাকা ও ফালাম গাঁয়ে খুব বেশী তো দু কোম্পানী সৈন্য রাখে। বৃটিশ পরিচালিত চিন পাহাড়ী সৈন্যদলেব সঙ্গে বাব তিন চার সংঘর্ষ হয় এবং বৃটিশের একটি টহলদার ঘাঁটি দখলের জন্যে ছোটখাটো একটি অভিযানের ব্যবস্থা হয়। মে মাসের শেষে ছ'টি কোম্পানীর লোকবল যখন ক'মে অর্ধেক হয়ে গেছে, তখন কোহিমাতে জাপানীদের শক্তিবৃদ্ধির জন্যে তাদের তুলে নিয়ে যাওয়া হল। কোহিমা পর্যন্ত তারা কেউই যায়নি: একমাত্র শাহ্ নওয়াজ তার দলের জন কয়েককে নিয়ে উখরুল পেরিয়ে গিয়েছিলেন, তাও শুধু ঘুরে দেখে আসার জন্যে।

টামু-পালেল সরকে মে, জুন ও জুলাই মাসে আই-এন-এর ডিভিশনাল কমাণ্ডারের অধীনে ২য় ও ৩য় রেজিমেণ্ট যথাক্রমে জাপ বাহিনীর দক্ষিণ ও বামে থেকে পার্শ্বরক্ষার কাজ করে। ২য় রেজিমেণ্ট প্যালেল বিমানঘাঁটি আক্রমণের চেষ্টা করে; এই প্রথম প্রচেষ্টাতেই তারা ভীষণভাবে হেরে যায়। এরপর থেকে তাদের কাজ হয় শুধু আত্মরক্ষা করা; যুদ্ধে, ব্যাধিতে, দলত্যাগে ও অনাহারে তাদের এমন বলক্ষয় হতে থাকে যে, যখন পিছু হটার পালা এল তখন ২য় রেজিমেণ্টের লোক সংখ্যা বড় জোর ছশো। ৩য় রেজিমেণ্ট রণাঙ্গনে পৌঁছুতে পৌঁছুতে মে মাসের শেষাশেষি হল; তখন বর্ষা শুরু হয়ে গেছে। লড়াই তখন প্রায় বন্ধ: তবে অসুখে আর অনাহারে তাদেরও যা দুর্গতি হল, তা দ্বিতীয় রেজিমেণ্টের চেয়ে কিছু কম নয়। এই দুটি রেজিমেণ্টের কাযকলাপের আরও বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট ৩, ইয়ামামাতো বাহিনী ও ১ম আই-এন-এ ডিভিশন।

শাহ্ নওয়াজ ২০শে জুন উখরুল থেকে সৈন্য অপসারণের নির্দেশ দিলেন যাতে তারা ডিভিশনের বাকি অংশের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে; তিনি এমন একটা বিপযয়ের মধ্যে পড়ে গেলেন যে, তাঁর নির্দেশ কার্যকরী করার উপায় থাকল না। ৪ঠা জুন পর্যন্ত জাপানীরা তাঁর রেজিমেণ্টকে 'ম্যালেরিয়া বাহিনী' ব'লে এসেছে: এখন অবস্থা আরও শোচনীয় হল:

> তখন এমনি অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, প্রশাসনিক ব্যবস্থা বলতে আর কিছু নেই। ডাক্তাররা চিকিৎসা করবেন কি এক ফোঁটা ওষুধ নেই এবং তাঁরা অধিকাংশই…নিজেরা ম্যালেরিয়া আর আমাশয় রোগে ভুগছেন।[১]

শবের ওপর ভন ভন করছে লক্ষ কোটি মাছি। রসদ একদম ফুরিয়ে গেছে; এমন কি টামু আর কালেওয়াতেও লোকে না খেয়ে মরতে লাগল। ইয়ু নদীর ধারে টেরাউনে শো চারেক রুগ্ন লোককে নিয়ে যাওয়া হল এবং জলপথে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হলে তারা সেখান থেকে রওনা হবে; বাকি সবাই পায়ে হেঁটে চলল। রুগ্ন লোকদের নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে

১ শাহ্ নওয়াজের 'মাই মেমারিজ অব দি আই এন-এ অ্যাণ্ড ইট্স নেতাজী' ১০৬ পৃঃ

একমাস লেগে গেল; এই এক মাসে দুশো লোককে প্রাণ হারাতে হল। শাহ্‌ নওয়াজ ফেব্রুয়ারী মাসে চিন পাহাড়ে রওনা হন দু হাজার সৈন্য নিয়ে আর ৮ই সেপ্টেম্বর যখন তিনি নিরাপদে ফিরে এলেন তখন দেখা গেল তাঁর দলে মাত্র মাত্র পাঁচ শো লোক টিঁকে আছে।

আই-এন-এর ডিভিশনাল কমাণ্ডার ১৮ই জুলাই তারিখে তার অধীনস্থ রেজিমেন্টের পিছু হটবার নির্দেশ দিলেন। কী সাংঘাতিক অবস্থার মধ্যে জাপানীদের পশ্চাদপসরণ করতে হয়েছিল তা সকলেরই জানা আছে। জাপানীদের মোট সৈন্য সংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী, পঞ্চাশ হাজার লোক মারা পড়লেও তখনও তাদের সংগ্রামী সত্তা অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজ একেবারে ছন্নছাড়া হয়ে পড়ল এবং তারা কোন রকম সহানুভূতি পেল না: এতদিন জাপানীরা তাদের 'ভারতীয় সাথী' ব'লে ডাকত, এবার থেকে তারা 'ওহে চশমখোর ভারতবাসী' ব'লে সম্বোধন করতে লাগল। সম্পর্ক দ্রুত খারাপ হয়ে চলল। জাপানীদের ভাঁড়ার থেকে ভারতীয়রা অসঙ্কোচে চুরি করতে লাগল এবং অন্তত একটি ক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের চর ব'লে আই-এন-এ সৈন্যদের সঙ্গীন দিয়ে খুঁচিয়ে মারা হল। পিছু হটা যখন শুরু হল, তখন সকলেই প্রায় অশক্ত: অসুখে আর অনাহারে মৃত্যু সারা রাস্তায় প্রতিদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়াল।

সেপ্টেম্বর আর অক্টোবরে বিশ্রামস্থলে পৌঁছবার পর তবেই মৃত ও নিখোঁজের পুরো হিসেব পাওয়া সম্ভব হল। হিসেব দেখে মন ভারাক্রান্ত হল। ইম্ফল যাত্রার সময় আই-এন-এ ডিভিশনে সৈন্যসংখ্যা ছিল ছ'হাজার: ফিরে এসেছে মোটে দু হাজার ছ শো এবং তার মধ্যে আবার দু হাজার লোককে পত্রপাঠ হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছে। অভিযানকালে ৭১৫ জন দলত্যাগ করেছে, যুদ্ধে প্রায় চার শো লোক নিহত হয়েছে, প্রায় আট শো শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং প্রায় পনেরো শো লোক রোগে ও অনাহারে প্রাণ হারিয়েছে।[২]

১৯৪৪-এর সেপ্টেম্বরে উত্তর বর্মার ভেপসা জলমগ্ন সমতলের ওপর দিয়ে মোটরযোগে ম্যাণ্ডালে থেকে চিন্দউইন পর্যন্ত হাসপাতাল আর আশ্রয়শিবির পরিদর্শন করতে করতে সুভাষচন্দ্র এই সমস্ত ও আরও অনেক

২ ১৯৪৫-সালে নয়া দিল্লীর সরকারী দপ্তরের প্রদত্ত তথ্য

বৃত্তান্ত জানতে পারলেন। এমন কি দরদী ফুজিহারাও হতাশ হয়েছিলেন; অভিযানের সময় তিনি জেনারেল মুতাগুচির সংযোগকর্তা অফিসার হিসেবে জাপ বাহিনীর সঙ্গে ছিলেন। আই-এন-এ ডিভিশন ছিল সেই বাহিনীর অংশ; ফুজিহারা বললেন, 'বিপ্লবী সৈন্যদল হিসেবে এর মনোবল ভাল ছিল এবং বেশ সুসংগঠিতও ছিল; কিন্তু এর রণকৌশল, শিক্ষা ও নেতৃত্ব ছিল নিচুস্তরের। ...তাছাড়া বিশেষভাবে অভাব ছিল আক্রমণ ক্ষমতার ও দৃঢ়তার।' যুদ্ধের উপকরণের কথা তিনি বলেন নি, কিন্তু সেদিক থেকেও অভাব ছিল। আই-এন-এ যখন লড়াই করছে, তখন তার না আছে বেতার যন্ত্র, না আছে টেলিফোন, না আছে যানবাহন। হাল্কা মেশিনগাদ ছাড়া আর কোন ভারী অস্ত্রই নেই। জাপানী আর বৃটিশ-ভারতীয়দের পরনে থাকত জঙ্গলে গা-ঢাকা দেওয়ার মত সবুজ উর্দি; কিন্তু আই-এন-এ সৈন্যের ছিল সেদিক দিয়ে মার্কামারা—তাদের পরনে পুরনো বৃটিশ খাকি উর্দি। অবশ্য ফুজিহারা স্বীকার করলেন: যে সময়ে প্যালেল সরকে জাপ বাহিনী ধরাশায়ী হলে অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ত সেই সময়ে ২য় ও ৩য় আই-এন-এ রেজিমেণ্টের সাহায্য পাওয়ায় তার পক্ষে দাড়িয়ে যুঝতে পারা সম্ভব হয়েছিল। এর চেয়ে বেশী প্রশংসা আই-এন-এ সম্পর্কে করা যায় না। আই-এন-এ যা করেছে, তাতে সুভাষচন্দ্রের মনগড়া ধারণাগুলো ভেঙে চুরমার হল। তিনি না পেরেছেন তাঁর সৈন্যদের বীরযোদ্ধা করে তুলতে, না পেরেছেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর আনুগত্য টলাতে। ফিল্ড-মার্শাল স্লিম-এর বিবরণে জানা যায়, ভারতীয় সেপাইরা আই-এন-এ থেকে ভেঙে-আসা সৈন্যদের এমন বিষ নজরে দেখতে আরম্ভ করল যে, শেষ পর্যন্ত চতুর্দশ বাহিনী থেকে ফতোয়া দিতে হল যেন তারা আরও সদয় ব্যবহার করে। এতদিন ধ'রেই নেওয়া হয়েছিল যে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর ভগ্নচিত্ত অবস্থা; সে ধারণা লুপ্ত হল। স্বপ্ন দেখেছিল ব্রহ্মপুত্রের তীরে দাড়ানো আই-এন-এ'র তিন লক্ষ সৈন্যবল; সে স্বপ্ন ধূলিসাৎ হল।

আরও কয়েকটা ব্যাপারে চোখ খুলল। প্রথমত, যে আজাদ হিন্দ দলকে সেরা স্বাধীনতাকর্মীদের নিয়ে গড়া একটি হীরের টুকরো দল ব'লে ভাবা হয়েছিল, আসলে দেখা গেল তাতে এলোপাতাড়ি জোটানো হয়েছে যত সব নিকৃষ্ট কারিগর। এতে কাজ হবে না। সুভাষচন্দ্র বললেন, আজাদ হিন্দ

দলকে 'গড়তে হবে জার্মানির এস্‌-এস্‌ দল অথবা রাশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির কায়দায়।' অবিলম্বে যাতে দল থেকে অবাঞ্ছিতদের ভাগানো হয় এবং নতুন ব্যবস্থা শুরু করা হয়, তার জন্যে তিনি নির্দেশ দিলেন। দ্বিতীয়ত, সরবরাহের ব্যাপারে কিংবা যুদ্ধে গোলন্দাজ বাহিনীর কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার ব্যাপারে জাপানীদের ভরসায় থেকে কোন লাভ নেই। রেজিমেণ্টের কমাণ্ডাররা বলল জাপানীরা তাদের ডুবিয়েছে। সুভাষচন্দ্র ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলেন। জাপানীদের প্রশাসনিক ও সরবরাহের ব্যর্থতায় তাঁর সৈন্যবাহিনী বিপদে পড়েছে। অনিবার্য ফল হিসেবে দেখা দিয়েছে হিকারি-কিকানের অকর্মণ্যতা এবং তার সঙ্গে তাঁর সেনাপতিদের সম্পর্কের তিক্ততা। হিকারি-কিকানের জন্যে কোন রেশন মেলেনি। আজাদ হিন্দ ফৌজ যখন এসে হাজির হল তার আগেই সমস্ত কামান এবং গোলাগুলি ভাগ বাঁটোয়ারা হয়ে গেছে। চক্ষুলজ্জায় প'ড়ে হিকারি কিকান এসব কথা অকপটে স্বীকার করতে পারেনি, কাজেই তাদের টালবাহানায় আই-এন-এ'র কমাণ্ডাররা শেষটায় সংকটের মধ্যে পড়েছে। সুভাষচন্দ্র মনে মনে ঠিক করলেন যে, অতঃপর এ সব জিনিসের প্রতি তিনি স্বয়ং নজর রাখবেন এবং আই-এন-এ আর জাপানী কমাণ্ডারদের মধ্যবর্তী হিকারি-কিকানের কর্তৃত্বের অবসান ঘটাবেন। সামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা সুসংগঠিত করা ও জাপানীদের উচ্চতর সামরিক কর্তৃমহলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা—এই দুই উদ্দেশ্যে একটি 'সমর পরিষদ' গড়ে তুলবেন।

ঠিক এই সময়, ৯ই অক্টোবর জাপানের নতুন প্রধান মন্ত্রী জেনারেল কোইসোর কাছ থেকে একটি আমন্ত্রণ এল—সুভাষচন্দ্র ও ডাঃ বা ম-র সঙ্গে টোকিওতে তিনি দেখা করতে চান। সুভাষচন্দ্র রেঙ্গুণে ফিরে এলেন এবং ১৪ই অক্টোবর তাঁর রেজিমেণ্টের কমাণ্ডারদের বৈঠক ডেকে হিকারি-কিকানের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করলেন। গোড়ায় তিনি আশা করেছিলেন এইসব অফিসারকে তিনি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে পারবেন, কিন্তু দেখা গেল তা সম্ভব নয়। এগারোজন অফিসার সংবলিত 'সমর পরিষদে'র উদ্বোধন ক'রে সুভাষচন্দ্র ২৯শে অক্টোবর চ্যাটার্জী ও কিয়ানিকে সঙ্গে নিয়ে টোকিও যাত্রা করলেন: এঁরা দুজনে মিলে হিকারি-কিকানের বিরুদ্ধে বেশ জোরালোভাবেই অভিযোগ পেশ করতে পারবেন।

সুভাষচন্দ্র আবার দেখতে পেলেন টোকিওর জাপানী কর্তৃমহল বেশ সহানুভূতিশীল এবং তাঁর দৃঢ় ধারণা হল, যুদ্ধক্ষেত্রে আই-এন-এ'কে যে মুস্কিলে পড়তে হয়েছিল তার জন্যে জাপানীকর্তারা দায়ী নয়। নিচের স্তরে জাতিবিদ্বেষ ও ফৌজী মেজাজই এর মূলে ; ডাঃ বা ম-র মত তাঁরও যদি একজন জাপানী রাষ্ট্রদূত মারফত টোকিওর সান্নিধ্যলাভের উপায় থাকত, তাহলে তিনি ব্যাপারটার সুরাহা করতে পারতেন। সুতরাং আই-এন-এ'র জন্যে সরবরাহ ও যুদ্ধের সময় গোলন্দাজদের সাহায্যের দাবি জানানো ছাড়াও তিনি জাপান ও অস্থায়ী সরকারের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের অনুরোধ জানালেন। ২৬শে নভেম্বর জাপানের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে সম্মতি ঘোষণা করা হল : ডিসেম্বরের শেষে মিঃ হাচিয়া রাষ্ট্রদূত মনোনীত হলেন।

জাপানীরা এও মেনে নিল যে, হিকারি-কিকারির কাজ হবে শুধু সামরিক সংযোগ রক্ষা করা। অস্থায়ী সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে জাপানী রাষ্ট্রদূত রাজনৈতিক বিষয়গুলি দেখাশুনা করবেন এবং সামরিক নির্দেশাবলী আসবে সরাসরি জাপানী কমাণ্ডারদের কাছ থেকে। এ থেকে আরও নানা চুক্তির ডালপালা বার হল : আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপানী সামরিক আইনের আওতায় মধ্যে পড়বে না ; তাদের নিজস্ব সামরিক বিধি তারা মেনে চলবে, এমন কি জাপানী সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে অপরাধ করলেও এর অন্যথা হবে না। আই-এন-এ'র সৈন্যসংখ্যার ব্যাপারেও সুস্পষ্ট বোঝাপড়া হল। সুভাষচন্দ্রের বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা এই সময় প্রায় ৩৩,০০০ ; বর্মায় আনুমানিক ১৬,৯০০ সৈন্য, মালয়ে ১৩,৭৫০ আর রংরুটদের ট্রেনিং ক্যাম্পে নিযুক্ত ২,০০০—এইসব ক্যাম্পে থাকতে পারে মোট ১৫০০০। সেইমত জাপানীরা এই ব্যবস্থায় রাজী হল যে, সশস্ত্র সৈন্যবল হবে ৩৫,০০০—তাদের খরচ জাপানীরাই বহন করবে ; এছাড়া শিক্ষারত সৈন্য হবে ১৫,০০০—তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা সুভাষচন্দ্রই চালিয়ে যাবেন।

সরবরাহ ব্যবস্থারও অনেক অদলবদল হবে। আই-এন-এ'র ওপর বিলিবন্দোবস্তের ভার থাকলেও এতদিন সমস্ত সরবরাহ আসত জাপানী মারফত। ঠিক হল, এরপর থেকে একমাত্র প্রধান খাদ্যদ্রব্য—চাল, ডাল, চিনি—জাপানীরা যোগাবে : মাছ, মাংস, তরিতরকারি যোগাবে সুভাষচন্দ্রের সরবরাহ বিভাগ। তার জন্যে ১৯৪৫-এর মার্চ মাস থেকে

জাপানীরা তাঁকে মাসে মাসে এক কোটি টাকা দেবে ব'লে কথা দিল। জাপানী টাকার দ্রুত মূল্যহ্রাস হচ্ছিল—বর্মার সীমান্ত অঞ্চলে বিনিময়ের হার তখন কুড়িটি জাপানী টাকায় একটি ভারতীয় টাকা—ফলে, যখন প্রথম কিস্তি দেবার সময় এল তখন সেই বিপুল পরিমাণ টাকার অঙ্কও বাড়িয়ে দ্বিগুণ করতে হল।

এই সময়ে সুভাষচন্দ্র টোকিওতে যেসব বক্তৃতা দিয়েছিলেন[৩] তাতে এমন কোন লক্ষণ নেই যাতে বোঝা যায় যে, তাঁর সরকারী কথাবার্তার মধ্যে আরেকটি আশাভঙের দিকও ছিল। ভারতবর্ষ, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণকে সম্বোধন করে তিনি বেতার বক্তৃতা দিলেন: কেবল শেষের বেতার বক্তৃতা ও টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত দীর্ঘ ভাষণ ছাড়া আর কোন বক্তৃতা দেখেই মনে হয় না যে, আসন্ন বিপর্যয় সম্পর্কে তাঁর কোন রকম হুঁশ ছিল। তিনি ভারতবর্ষের শ্রোতাদের কাছে বললেন যে, যুগসন্ধিক্ষণে তিনি এসেছেন ভারত-জাপানের সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে, বর্মায় যুদ্ধাভিযান অচিরেই শুরু হবে: চীনের শ্রোতাদের তিনি আবারও বললেন যে, ১৯৩৭ সালের পর জাপানের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটেছে: জাপানের শ্রোতাদের তিনি বললেন সমস্বার্থের লড়াইতে তাঁর সংগ্রাম-স্পৃহার কথা, তাঁর ও জাপানী জাতির মধ্যে বর্তমান সংহতির কথা। 'এ বিষয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত হতে পারো, সুদিনে কিংবা দুর্দিনে বরাবর আমরা তোমাদের পাশে থাকব…।' এর কোনটাই নতুন কথা নয়, প্রচারের এই একই ধরাবাঁধা বুলির আশ্রয় তিনি শত শত বার নিয়েছেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে যে বক্তৃতা তিনি দিলেন, তাতে তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থনের এবং জাপান কর্তৃক লালিত নতুন এশীয় জাতীয়তাবাদ সমর্থনের রীতিমত চেষ্টা ছিল। তিনি বললেন, আমরা চাই প্রকৃত জাতীয় স্বাধীনতা, আমাদের সেই লক্ষ্যসাধনে সাহায্য করতে যুদ্ধের আগে তোমরা অসমর্থ হয়েছ; জাপানের সাহায্য নিয়ে আমরা নিজেরা আজ সেই চেষ্টা করছি। বর্মা আর মালয় বৃটিশের প্রত্যাবর্তন চায় না, চীন চায় না চিয়াং কাই-শেককে এবং ফিলিপাইন চায় না তোমাদের:

মার্কিন বন্ধুদের আমি বলতে চাই যে, এশিয়ার সারা প্রান্তে

৩ অমর লাহিড়ীর 'সেড সুভাষ বোস' গ্রন্থে সন্নিবেশিত

> আজ বিপ্লবের উন্মাদনা।…আমরা তোমাদেরই মত মানুষ। আমরা চাই স্বাধীনতা, যেকোন পন্থায় আমরা তা অর্জন করব। আমাদের সাহায্য করবার তোমাদের সুযোগ ছিল, তোমরা করোনি। জাপান এখন আমাদের সহায় হতে চাইছে এবং তাদের আন্তরিকতায় বিশ্বাসী হবার আমাদের কারণ আছে। তাই আমরা তার পাশে থেকে লড়াইতে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। তোমাদের বিরুদ্ধে এবং আমাদের মারাত্মক শত্রু ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে আমরা সাহায্য করছি জাপানকে নয়। আমরা নিজেদেরই সাহায্য করছি—সাহায্য করছি এশিয়াকে।…

তখনও তাঁর ক্ষমতা ছিল না অবাধে মনের কথা বলবার, ত'বে এমন কথা বলা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল এবং তিনি বলেছিলেন, বেঁচে থাকলে যার ভিত্তিতে তিনি নিজেকে সমর্থন করতে পারতেন।

টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বক্তৃতাটি ছিল মৃত্যুর আগে অন্তিম ইচ্ছা জানাবার ধরনে। কেননা তাতে আবাব তিনি তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস প্রচার করলেন এবং ভারতের অধিকাংশ সমস্যা সম্পর্কে নতুন ক'রে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করলেন। তিনি গান্ধীর নেতৃত্ব স্বীকার ক'রে নিয়ে তাঁর সঙ্গে কোথায় নিজের মত পার্থক্য তা বললেন। ভারতবর্ষকে শিল্পসমৃদ্ধ ক'রে তুলতে হবে এবং একমাত্র তাহলেই সে তার আত্মরক্ষার জন্যে আধুনিক সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতে পারবে; বিদেশ থেকে সাহায্য নিতে পারলে তবেই তা সম্ভব। দেশ রক্ষার পরই দরকার দারিদ্র্য ও অশিক্ষার বিরুদ্ধে লড়াই। ব্যক্তিগত উদ্যোগে দারিদ্র্য ও অশিক্ষা দূর করা যাবে না; এ দুটি বিষয়ের ভার রাষ্ট্রকে নিতে হবে। অর্থাৎ, চাই দ্রুত ও মৌলিক সংস্কার সাধনের ক্ষমতাযুক্ত সমাজতন্ত্র, চাই এমন একটি জবরদস্ত সরকার 'যা কাজ করবে… কোন একটি গোষ্ঠীর স্বার্থে নয়, জনসাধারণের সেবক হিসেবে।' তেমন রাষ্ট্রে বর্ণবৈষম্য আর সাম্প্রদায়িকতাবাদের সমস্যা থাকবে না। জাতীয় সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম-এর মধ্যে যতটুকু ভাল—জাতীয় ঐক্য আর পরিকল্পনামূলক অর্থনীতি—স্বাধীন ভারতে মেলাতে হবে; এবং একদিকে ধনতন্ত্রবাদ ও অন্যদিকে মানুষের জীবনের অর্থ নৈতিক দিকের ওপর

অতিরিক্ত জোর—এ দুটা বিপদই এড়িয়ে চলতে হবে। জবরদস্ত সরকারের খুঁটি হিসেবে নতুন কোন দল গড়তে তিনি আর চাইলেন না, কেননা এই সময়ে তাঁর মনে হল ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে আর ভারতীয় জনস্বার্থে কোন প্রভেদ নেই।

পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র আন্তর্জাতিকতার পক্ষপাতী ছিলেন: লীগ অব নেশনস্-এর অনুসৃত আন্তর্জাতিকতা নয়, কেননা তার পাণ্ডারা নিজেদের জাতীয় স্বার্থে আন্তর্জাতিকতাকে ব্যবহার করার ফলেই লীগ অব নেশনস্ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। সম স্বার্থ ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে সুভাষচন্দ্র আঞ্চলিক ভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যা ক্রমশ ব্যাপকতর হয়ে শেষ পর্যন্ত একটি বিশ্ব সংগঠনের রূপ নেবে। এটাই ছিল সুভাষচন্দ্রের প্রকৃত মত। তিনি কতবার বলেছেন যে, বৃটিশ কমনওয়েল্থকে স্বাধীন জাতি সমূহের সঙ্ঘে পরিণত হতে হবে, তা নইলে কমনওয়েল্থ ধ্বসে যাবে: জাপান যদি নিঃস্বার্থভাবে পরিচালনা করে, তা হলে অন্যতম আঞ্চলিক সংগঠন হিসেবে 'সম সমৃদ্ধির এলাকা' বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার সহায়ক হতে পারে।

কিন্তু ১৯৪৪-এর নভেম্বরে দেখা গেল, 'সম-সমৃদ্ধির এলাকা'র ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে আসছে। বিশেষভাবে এটা তখনই সুভাষচন্দ্রের উপলব্ধিতে এল যখন এই সিদ্ধান্তে তাঁকে মত দিতে হল যে, ৩য় আই-এন-এ ডিভিশন মালয়ে থেকে প্রতিরক্ষার কাজে অংশ নেবে। পরবর্তী অভিযান সম্পর্কে লোকের কাছে তিনি খানিকটা আশার ভাব দেখাচ্ছিলেন এবং টোকিও রওনা হওয়ার আগে পযন্ত বলছিলেন যে, বর্মার ২য় রেজিমেণ্টের পিঠোপিঠি ৩য় রেজিমেণ্টকেও পাঠানো হবে। কিন্তু যখন প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে বিপযয়ের আরও বড় বড় লক্ষণ এবং জাপানের ওপর বারংবার প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ তিনি দেখতে পেলেন, যখন তিনি শুনলেন বর্মায় বলবৃদ্ধি করা দূরের কথা বরং সেখান থেকে সৈন্যদের সরিয়ে অন্যত্র পাঠানো হচ্ছে—তখন তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারলেন জাপানীদের কপাল পুড়েছে। সুভাষচন্দ্র ভাবলেন, বর্মা থেকে ভারতের ওপর অন্তত ফিরে আক্রমণ করা পর্যন্ত প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় জাপানীরা শত্রুপক্ষকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে।

টোকিও থেকে চলে আসবার আগে সুভাষচন্দ্র জাপানীদের অনুরোধ

করেছিলেন যে, সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে তাঁকে কথাবার্তা বলতে দেওয়া হোক। তাঁর বিশ্বাস ছিল, ইউরোপের লড়াই চুকে গেলেই পশ্চিমের সঙ্গে রাশিয়ার ভাব ছুটে যাবে; কাজেই তার পর তারা তাঁর সহায় হতে রাজী হবে—তাঁর এই বিশ্বাসের কথা আই-এন-এ অফিসারদের বক্তৃতা প্রসঙ্গে আগেই তিনি ব্যক্ত করেছিলেন। জাপানীদের কাছে তিনি প্রস্তাব দিলেন যে, তাঁকে বেসরকারী দূত হিসেবে পাঠালে চক্ষুলজ্জার কোন ভয় থাকবে না—রাশিয়ার সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক ভাল করবার ব্যাপারে হয়ত তিনি সমর্থ হবেন। জাপানীরা রাজী হয়নি।

সপ্তাহব্যাপী ঝড়ঝঞ্ঝার ফলে মালয়ে এসে পৌছুতে তাঁর ১৪ই ডিসেম্বর হল। সিঙ্গাপুরে তাঁর সঙ্গে প্রথমেই যাদের দেখা হল, তার মধ্যে ছিলেন আন্দামানের চীফ কমিশনার। অসুস্থ শরীরে তিনি ফিরে এসেছেন আলাপ-আলোচনার জন্যে; প্রশাসনের কাজ চালাতে না পেরে তাঁর মন ভেঙে গেছে। শিক্ষাদপ্তরই হল একমাত্র বিভাগ যার পরিচালনা ভার তাঁরা পেয়েছেন; অন্যান্য কাজে জাপানীরা হয় তাঁদের হাত দিতে দেয়নি, নয় বাধা সৃষ্টি করেছে এবং দ্বীপের অধিবাসীদের তারা সমানে যন্ত্রণা দিচ্ছে। সব চেয়ে বেশী অত্যাচার হচ্ছে তাদের গুপ্তচর-ভীতির জন্যে। তারা বৃটিশের গুপ্তচর বলে ১৯৪৪-এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতীয়দের মধ্যে পঞ্চান্ন জনকে প্রাণদণ্ড আর তেত্রিশ জনকে কারাদণ্ড দিয়েছে এবং অক্টোবরে দুশো জনকে গ্রেপ্তার ও তদন্তাধীন করেছে। বর্বরোচিত নির্যাতন আর ভয় দেখিয়ে বাড়ির লোকদের কাছ থেকে টাকা আদায়—এইভাবে যে সন্ত্রাসের রাজত্ব চালানো হয়েছে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ই হয়েছে তার প্রধান বলি। চীফ কমিশনার বহু চেষ্টা করেও এই অত্যাচার বন্ধ করতে পারেননি—যদিও মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি হয়ত তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব খাটাতে পেরেছেন। টোকিওর কর্তারা যে যাই বলুন, স্থানীয় জাপানীরা কোনদিক দিয়েই তাদের কর্তৃত্ব ছেড়ে দেবে না। সুভাষচন্দ্র ভেবে আসছিলেন নতুন কাউকে চীফ কমিশনার করবেন; অতঃপর তিনি মত বদলালেন। রণনীতি যেভাবে বদলে গেছে, তাতে আন্দামান রক্ষা করা যাবে না: অস্থায়ী সরকারকে ওখান থেকে হাত গুটিয়ে নিতে হবে এবং আন্দামানের চেয়ে বরং কোন দামী জিনিস বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে।

মালয়ে মনঃক্ষুণ্ণ হওয়ার আরও কয়েকটা কারণ ঘটল। আই-এন-এ যাতে প্রশাসনিক দিক থেকে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে, তার জন্যে কয়েকটি পরিবহন কোম্পানী তৈরী করা হয়েছিল— তারাই গরু ঘোড়া ও গাড়ীর ব্যবস্থা করবে। এরপর লড়াই শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই দল-গুলোকে ও সেই সঙ্গে চলতি গোলন্দাজ ও এ. এফ. ভি[৪] ব্যাটালিয়নকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেবেন ব'লে সুভাষচন্দ্র মনস্থ করেছিলেন। এমন সময় জাপানীরা জানাল যে দুটো কারণে তা সম্ভব নয় ; প্রথমত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মিত্রপক্ষের বিমান আক্রমণের দরুন যানবাহনের সমস্যা ; দ্বিতীয়ত, মালয় রক্ষার জন্যে প্রত্যেকটি লোকের দরকার হবে। যুদ্ধের সময় আই-এন-এ'র যানবাহনের সমস্যা ও কামান দাগার প্রয়োজন জাপানীরাই মিটিয়ে দেবে। মালয়ে আই-এন-এ যে সব এলাকা অধিকার ক'রে আছে, সেই সব এলাকায় আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

মিত্রশক্তির জয় অবধারিত—এই ক্রমবর্ধমান মনোভাব সারা পূর্ব-এশিয়ার লীগের মধ্যে তখন প্রতিফলিত হচ্ছিল। নতুন সদস্য হচ্ছিল কম : সিঙ্গাপুরে মে মাসে যেখানে নতুন ভর্তির সংখ্যা প্রায় দশ হাজার হয়েছিল, নভেম্বরে সেই সংখ্যা কমে গিয়ে হল মোটে পাঁচশো ষাট। রংরুট আসাও প্রায় বন্ধ হয়ে এল : মালয়ে সেই সময়ে হাজার দুই ফেরারী ফৌজ ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং প্রতি মাসেই শ' দুই ক'রে সৈন্য শিক্ষা-শিবির ছেড়ে উধাও হচ্ছে। এপ্রিল মাসে মালয়ে মোট টাকা উঠেছিল ২০ লক্ষ ডলার, নভেম্বরে ৬ লক্ষ ১৭ হাজার ডলার ; এমন কি জুন মাসে ১ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার দেওয়া হবে ব'লে সুভাষচন্দ্রকে যে কথা দেওয়া হয়েছিল, সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পুরো টাকা তখনও দেওয়া হয়নি : মাত্র একটি তহবিলের বাবদেই তখন সিঙ্গাপুরে প্রতিশ্রুতি মত ৭২ হাজার ডলার পাওনা প'ড়ে আছে। সম্পত্তির ওপর ধার্য কর আদায়ে মুস্কিল দেখা দিল —লোকে সমানে তাদের সম্পত্তি গোপন ক'রে যেতে লাগল এবং কালের হাওয়া তখন স্পষ্টত তাদের অনুকূলে হওয়ায় টাকা জমা দেওয়ায় দেরি হতে লাগল।

সুভাষচন্দ্র আরেকবার চেষ্টা করলেন নতুন ক'রে উৎসাহ জাগাতে।

৪ ১৯৪১-এর বৃটিশের ব্রেন-বন্দুক সজ্জিত গাড়ী

১৬ই ডিসেম্বর তিনি আই-এন-এ'র পদস্থ অফিসারদের কাছে যে বক্তৃতা দিলেন তাতে সমস্ত নতুন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলেন। তারপর দেশ সফরে বেরোলেন। যেখানেই যান বলেন, তাঁর সৈন্যেরা রক্ত ঢালছে—কাজেই বেসামরিকদের কাছে তিনি আলবৎ দাবি জানাবেন; যারা বড় লোক এবং যাদের গায়ে আঁচড় লাগছে না তারা নিরাপত্তার দাম দিক। টাকা দেয়নি ব'লে পেনাঙে একজনকে তিনি গ্রেপ্তার করবার হুকুম দিলেন—এভাবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করায় সঙ্গে সঙ্গে ফল ফলল—এবং টাকা তোলার নতুন উপায় বার করার ব্যাপারে রাঘবনের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হল। বাকি বকেয়া আদায়ের চেষ্টায় সুভাষচন্দ্র যখন সুমাত্রায় গেলেন, তখন সেখানে 'ভারতকে নববর্ষের সওগাত' নাম দিয়ে একটি তহবিল খোলা হল। রাঘবন বললেন, 'নিজেদের বজায় রাখার জন্যে যতটুকু দরকার, ততটুকু রেখে···বাকি সমস্তই মাতৃভূমির সেবায় উৎসর্গ করো।'[৫] সিঙ্গাপুরে ফিরে এসে সুভাষচন্দ্র দশজন লোককে গ্রেপ্তারের ভয় দেখালেন।

যারা টাকা বাকি ফেলেছে তাদের সম্পর্কে তত্ত্বাবধায়ক বোর্ড কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করল :

> দুঃখের সঙ্গে জানানো হচ্ছে যে, আজাদ হিন্দ তহবিলে আপনাকে বাকি পাঁচশো ডলার জমা দেবার অনুরোধ জানিয়ে ১২ই জানুয়ারী যে চিঠি দেওয়া হয়েছিল, আপনি তা অগ্রাহ্য করেছেন। দয়া ক'রে মনে রাখবেন, উপরোক্ত টাকা তিন দিনের মধ্যে দিতে হবে। আপনাকে এই শেষ বারের মত সাবধান করা হচ্ছে।
>
> আপনার বর্তমান একশো ডলারের চেক ফেরত পাঠাতে এবং এক সপ্তাহের মধ্যে আপনার কাছ থেকে বকেয়া তিন হাজার ডলার আদায় করতে আমার ওপর নির্দেশ হয়েছে।···এর খেলাপ হলে জবাবদিহির জন্যে আপনাকে এখানে তলব করা হবে।[৬]

পরবর্তী সপ্তাহে এই রকমের বহু চিঠি সিঙ্গাপুর লীগের তরফ থেকে পাঠানো

৫ ৪ঠা জানুয়ারী সিঙ্গাপুরের বক্তৃতা

৬ ১৬ই ও ১৭ই জানুয়ারীর লেখা চিঠি

হল ; প্রত্যেকটি চিঠিতেই হুমকি দেওয়া হল। সুভাষচন্দ্র বার বার শুধু মুখে যেসব হুমকি দেখিয়ে এসেছেন, এতদিনে তিনি তা কার্যত প্রয়োগ করতে লাগলেন।

চ্যাটার্জী থেকে গিয়েছিলেন ব্যাঙ্ককে। তার ওপর ভার পড়েছিল লীগের মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করবার—কেননা দলাদলি আর পরাজিত মনোভাবের দরুন লীগের কাজ বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। শুধু টাকা জমা দেবার ব্যাপারেই নয়, টাকা আদায় করার ব্যাপারেও উৎসাহের অভাব দেখা গেল। রেঙ্গুণে ফেরার পথে ১১ই জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র নিজে একটি জনসভায় বক্তৃতা করলেন। সরাসরি তীব্র ভাষায় তিনি বললেন : যারা তাঁর বিপক্ষে তারা খোলাখুলি সে কথা বলুক, তাহলে, বৃটিশের সঙ্গে তাদেরও বন্দী শিবিরে রাখা হবে এবং তাদের বিষয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে : যদি তারা রেহাই পেতে চায়, তাহলে সম্পত্তির ওপর ধার্য কর জমা দিতে হবে। সুভাষচন্দ্র যাবার আগে জাপানী নিরাপত্তা পুলিশের কাছে নামের একটি তালিকা দিয়ে গেলেন, তার মধ্যে দশ জনকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং আশী জনের ওপর কম বেশী নজর রাখতে ও চাপ দিতে হবে। পরবর্তী দু সপ্তাহের মধ্যে ঐ দশজন লোককে গ্রেপ্তার করা হল। ফলে, চ্যাটার্জীর খানিকটা সুবিধে হয়ে গেল। ১৯শে জানুয়ারী ত্রিশ লক্ষ টাকার ওপর অর্থদানের প্রতিশ্রুতি মিলল এবং ৮ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে প্রতিশ্রুত টাকার এক-তৃতীয়াংশ ওঠানো গেল—লীগকে ঢেলে সাজার কাজও ততদিনে তিনি সমাধা ক'রে ফেললেন।

দ্বিতীয় যুদ্ধাভিযান

এদিকে তখন আই-এন-এ'র সৈন্যদের দিয়ে লড়াই করাবার তোড়জোড় চলছে ইরাবতীর তীরে, যেখানে ১৯৪৪-এর শেষ তিন মাসে জাপানীরা ক্রমশ পিছু হটে এসে দাড়িয়েছে। গোড়ায় ঠিক হয়েছিল যে, নদী বরাবর ১ম আই-এন-এ ডিভিশনের দুটি রেজিমেণ্ট ও সেই সঙ্গে গোটা ২য় ডিভিশনকে লাগানো হবে। ইতিপূর্বে লড়াই-না-করা শুধু ৪র্থ গেরিলা রেজিমেণ্টকেই যথা সময়ে পাওয়া যাচ্ছিল ব'লে মিংইয়ানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনটি ইম্ফল-ফেরত রেজিমেণ্টের অবশিষ্ট ম্রিয়মাণ সৈন্যদের এমনই

কাহিল অবস্থা যে, তাদের নিয়ে একটি বাহিনী তৈরী ক'রে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো যায় না ; ডিসেম্বরে তাদের সরিয়ে পিন্‌মানায় আনা হল। ২য় ডিভিশনের দুটি রেজিমেণ্ট তাদের ভারী সাজসরঞ্জাম এবং মালয় থেকে তাদের বাকি দলবল এসে পড়ার জন্যে রেঙ্গুণে অপেক্ষা করছে।

সুভাষচন্দ্রের নির্দেশমত এই আনকোরা সৈন্যদের মনোবল বাড়াবার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করা হয়নি। ইম্ফল-ফেরত সৈন্যদের সংস্পর্শে তারা যাতে না আসতে পারে, তার ব্যবস্থা হল, যুদ্ধে আই-এন-এ'র শৌর্যবীর্যের কথা ব'লে, পদক দান ও দ্রুত পদোন্নতির বন্দোবস্ত করে এবং কঠোরতর শৃঙ্খলার মধ্যে এনে তাদের উৎসাহিত করবাব চেষ্টা করা হল। বিশেষভাবে নজর দেওয়া হল আর যাতে ভবিষ্যতে ব্যাপকভাবে দলত্যাগের ঘটনা না ঘটে : ১৯৪৪ সালের আত্মসমর্পণের কথা নতুন সৈন্যদের জানতে না দিয়ে তার বদলে তাদের বলা হল বৃটিশের হাতে পড়ে আই-এন-এ'র সৈন্যদের কিভাবে প্রাণদণ্ড হয়েছে এবং কিরকম দুর্ব্যবহার তারা পেয়েছে। ঠিক হল যে, ২য় ডিভিশন যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করবার আগে প্রত্যেকটি লোককে বাজিয়ে দেখে নিতে হবে কার কি রকম মনোবল। লড়াইয়ের এলাকায় নিয়ে যাবার আগে প্রত্যেক সেনাপতিকে এই নিশ্চয়তা দিতে হবে যে, তাঁর সৈন্যেরা 'মনের দিক থেকে প্রস্তুত'। কোন সৈনিক যদি নিজেকে অনুপযুক্ত বলে মনে করে তাহলে সে পেছনে থেকে যাবার সুযোগ পাবে এবং তাতে তার সামরিক জীবনের ক্ষতি হবে না।

তা সত্ত্বেও, সৈন্য চলাচল শুরু হওয়ার আগেই সুভাষচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে ২৭শে নভেম্বর ঠেকায় পড়ে এই আদেশ জারি করতে হল :

> লক্ষ্য করা গেছে যে, আজাদ হিন্দ ফৌজে দলত্যাগের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে ; বিপ্লবী বাহিনীর পক্ষে এটা লজ্জার কথা।… ভবিষ্যতে যাতে আর দলত্যাগ না হয় তার জন্যে সেনাপতিরা সৈন্যদের চিত্তোৎকর্ষের দিকে বিশেষভাবে নজর দেবেন।

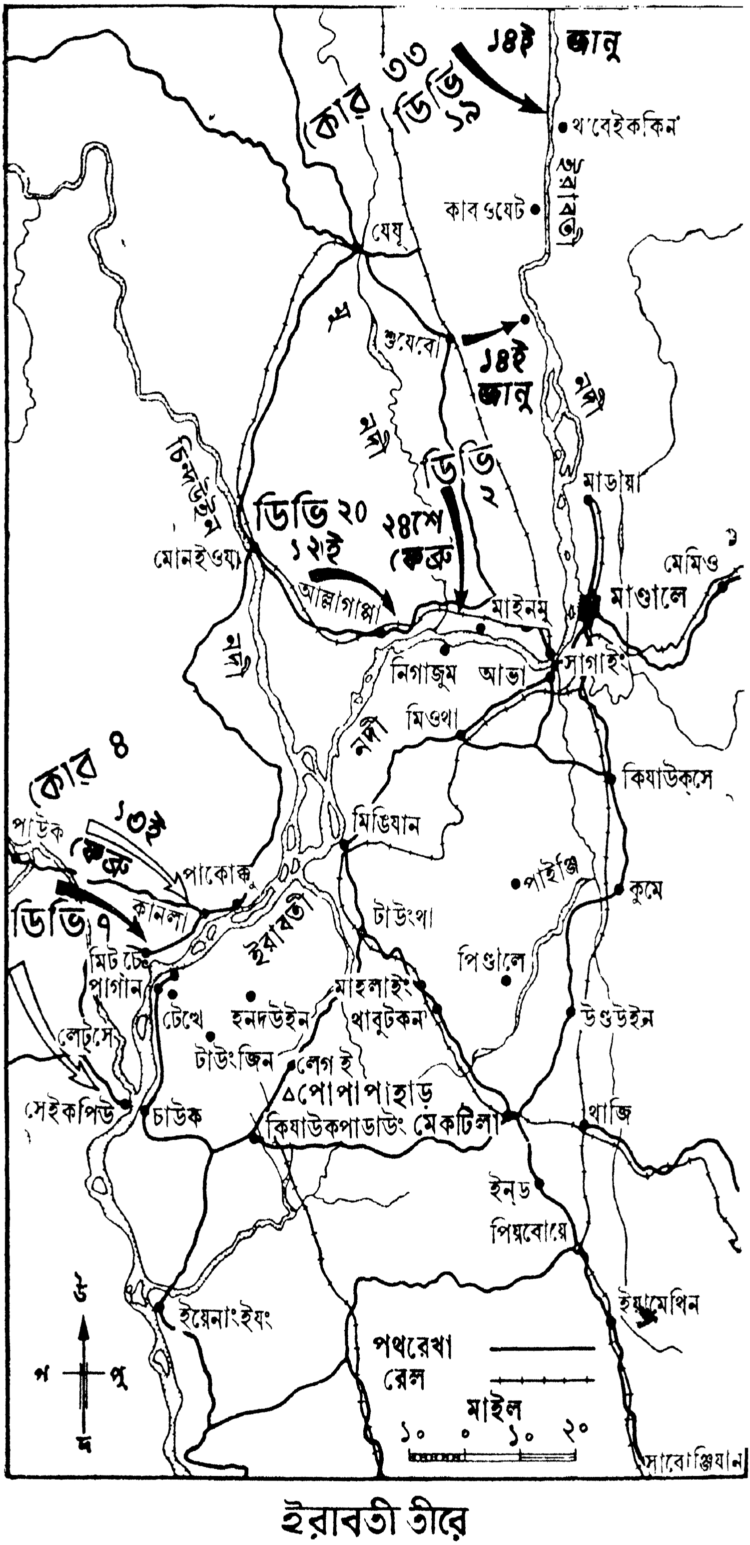
ডিসেম্বর মাসে ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডারদের বলা হল, তাঁরা যেন এমন সব সৈনিকের নামের তালিকা দেন যারা ঠিক বিশ্বাসভাজন নয় : শুধু ৪র্থ গেরিলা

রেজিমেণ্ট থেকেই দেড় শো লোককে অপসারিত করে পেছনে পাঠিয়ে দেওয়া হল। আমরা দেখেছি, ইতিমধ্যে মালয়ে সৈন্যদের দলত্যাগের খবর সুভাষচন্দ্রের কানে আসতে আরম্ভ করেছে এবং তিনি এই ভেবে মন শক্ত করছেন যে, কিছুতেই ১৯৪৪-এর কলঙ্কের পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেওয়া হবে না।

১৯৪৪-এর বর্ষা কালটা আরাকান যুদ্ধক্ষেত্র অচল অবস্থায় ছিল, আসল লড়াই হয়েছিল ইম্ফলে। কারণ পশ্চিমে সমুদ্রগামী অসংখ্য নদী কানায় কানায় ভরে ওঠায় এবং সেই সঙ্গে দেশের ভেতরে নানা পথের ওপর দিয়ে যায় আর কালাদান নদীতে গিয়ে সেই জল পড়ায় উত্তর-পশ্চিম বর্মার চেয়েও এই জায়গা বর্ষার সময় ঢের বেশী দুর্গম। মায় উপত্যকা ও উপকূলস্থিত গ্রাম মংড রক্ষার জন্যে শুধু একটি ডিভিশন মোতায়েন করে কালাদান উপত্যকা থেকে বৃটিশ তার সমস্ত ফৌজ এনেছিল। জাপানীরা পুরোমাত্রায় পিছু হটে এসেছিল, কিন্তু এই অবস্থায় উত্তর বর্মায় তাদের সৈন্যবাহিনীর বলবৃদ্ধির জন্যে একটি পুরো ডিভিশনকে তাদের পাঠিয়ে দিতে হল। বৃটিশের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে এখানে তাদের হাতে থাকল মাত্র তিনটি দুর্বল ব্যাটালিয়ান—তারা বড় জোর শত্রুপক্ষকে কিছু সময় আটকে রাখতে পারে।

ডিসেম্বরে জাপানীরা খড়কুটোর মত উড়ে গেল। মায় উপত্যকা শত্রুকবলমুক্ত করে পশ্চিম আফ্রিকান বাহিনী আবার নিম্ন কালাদানে এসে উপস্থিত হল। ১লা জানুয়ারী আকিয়াব অধিকৃত হল এবং জানুয়ারীর মাঝামাঝি কালাদান নদীর পুবদিকে মিওহাউঙ্গ বিপন্ন হল। বৃটিশেরা অবিরাম এগিয়ে চলল এবং পথে আই-এন-এ'র লোকজন এসে জুটতে লাগল। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পঞ্চাশ জন আই-এন-এ সৈন্য 'পালিয়ে যায়'; জানুয়ারীর শেষাশেষি গোড়াকার একশো যাট জনের মধ্যে যে চল্লিশ জন মাত্র টিঁকে রইল তারা পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে রেঙ্গুণে গিয়ে উপস্থিত হল।

উত্তর-পশ্চিম বর্মায় বৃটিশই তার শত্রুপক্ষের পশ্চাদ্ধাবন করে ইরাবতী নদীর ওপার হটিয়ে দিয়েছে। ম্যাণ্ডালের পঞ্চাশ মাইল উত্তরে ১৪ই জানুয়ারী বৃটিশ পক্ষ যখন থাব্বেইক্কিনে এসে ইরাবতী নদী অতিক্রম করে, জাপানীরা তখন প্রতিরক্ষার ব্যাপারে তৈরী ছিল না বললেই হয়। ঠিক এই জায়গায় জাপানীরা তাদের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করল এই ভেবে যে, তাতে ক'রে



১৪ই জানু
কোর ৩৩
ডিভি ১৯
খ'বেইককিন
কাবওযেট
যেযু
শ্বযেবো
১৪ই জানু
ডিভি ২
ডিভি ২০
১২ই
২৪শে ফেব্রু
মোনইওযা
মাডায়া
মেমিও
মাণ্ডালে
আল্লাগাপ্পা
মাইনমু
নিগাজুম
আভা
সাগাইং
মিওথা
নদী
কিযাউক্সে
কোর ৪
১৩ই ফেব্রু
পাউক
মিঙিযান
পাকোক্কু
কানলা
ডিভি ৭
ইরাবতী
টাউংথা
পাইঞ্জি
কুমে
মিট চৈ
প্যাগান
পিণ্ডালে
মাহলাইং
টেথ্যে
হনদউইন
থাবুটকন
উণ্ডউইন
লেট্সে
টাউংজিন
লেগ ই
পোপাপাহাড়
সেইকপিউ
চাউক
কিযাউকপাডাউং
মেকটিলা
থাজি
ইনড
পিয়বোয়ে
ইয়ামেথিন
ইয়েনাংইযং
উ
প
পু
দ
পথরেখা
রেল
মাইল
১০ ০ ১০ ২০
সাবোঞ্জিযান

ইরাবতী তীরে

বৃটিশ-ভারতীয় ৪র্থ কোর-এর প্রধান চোট সামলানো যাবে। জেনারেল স্লিম এই কৌশল অবলম্বন করেছিলেন জাপানীদের ঠকাবার জন্যে। তিনি এমন চাল চেলেছিলেন যাতে জাপানীরা মনে করে যে, খারেরইক্কিন অতিক্রমে পুরো ৪র্থ কোর সাহায্য করতে প্রস্তুত অথচ আসলে তিনি ৪র্থ কোর-কে এমনভাবে তাঁর অগ্রগতি পথের দক্ষিণ পাশে চালনা কর'লেন যাতে নিওঙ্গুতে ইরাবতী পার হওয়া যায় এবং মেকটিলা দখল করা যায়।

সুভাষচন্দ্র ব্যগ্র হয়ে বর্মা ছুটে এলেন—জাপানীরা যুদ্ধ জয়ের যে নতুন ছক তৈরী করেছে, তাতে তাঁর ২য় ডিভিশন অংশ নেবে। রেঙ্গুণ থেকে ফেব্রুয়ারী মাসে ১ম ও ২য় ডিভিশন রওনা হবে। বাকি ডিভিশন যে পর্যন্ত না এসে পৌঁছোয়, সে পর্যন্ত ৪র্থ গেরিলা রেজিমেণ্টকে নিওঙ্গু থেকে দক্ষিণে প্রায় বারো মাইল জুড়ে আই-এন-এর ঘাঁটি আগলাতে হবে—সেনাপতি জি এস. ধীলন ২৯শে জানুয়ারী সিংইয়ানে এই মর্মে আদেশ পেলেন। মেজর ধীলন আগে ছিলেন ১৷১৪ নং পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের লেফটেনাণ্ট। আদেশ পাবার পর তিনি একটুও সময় নষ্ট করেননি, চার দিনের মধ্যেই সৈন্যদলকে তিনি গন্তব্যস্থলে রওনা ক'রে দিলেন, আই-এন-এ'র অন্য যে কোন বাহিনীর চেয়ে আগে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পৌঁছনোর কাজ যখন শেষ হচ্ছিল, সেই সময় মেক্‌টিলা অভিমুখী বৃটিশের অগ্রবাহিনী তাঁর রেজিমেণ্টের নির্দিষ্ট এলাকার ঠিক উত্তরে নদী অতিক্রম করল।

নিওঙ্গু নিয়ে জাপানীরা অত মাথা ঘামায়নি। তারা জানত যে, বৃটিশের একটি বাহিনী নিওঙ্গুর দিকে এগোচ্ছে, তবে সংখ্যায় তারা মোটে এক ব্রিগেড—তাও তাদের লক্ষ্য সম্ভবত য়েনানজাওঙ্গ। সুতরাং ধীলনকে বিশেষভাবে হুশিয়ার ক'রে দেওয়া হয়নি। তাঁকে বলা হয়েছিল নদীর আড়াআড়ি সৈন্য জুড়তে এবং তাঁর ডানদিকে জাপানী কোম্পানীর সঙ্গে সহযোগিতা করতে। কিন্তু ধীলনের সৈন্যদলে লোক ছিল মোটে ১,২০০, বারো মাইলব্যাপী নদীতীর রক্ষার পক্ষে এই সৈন্যবল নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর। ধীলন তিনটি ব্যাটেলিয়ন পাঠালেন—একটি নিওঙ্গুতে, একটি পাগানে এবং তৃতীয় ব্যাটেলিয়নের হেডকোয়ার্টার হল টেংখে। ৮ই ফেব্রুয়ারী প্রধান ঘাঁটি স্থাপন শুরু হল, পর্দিন ঠেলা খেয়ে আই-এন-এ টহলদারদের নদীর

এপারে চলে আসতে হল এবং নদীর পূর্বতীরে দেখা গেল বৃটিশ সৈন্যদের একটা ছোট দল।

৭ম ভারতীয় ডিভিশনের ইরাবতী অতিক্রম শুরু হয় ১৪ই ফেব্রুয়ারী। ভোর হবার আগেই একটি বৃটিশ পদাতিক সৈন্যদল নিঃশব্দে নিওঙ্গুর মাইল খানেক উত্তর-পূর্বে নদী পার হয়ে ঘাঁটি গেড়ে বসে ; কিন্তু ব্যাটেলিয়নের বাকি সৈন্যদের জলপথে রওনা হতে বিলম্ব ঘটে ; সৈন্যবাহী নৌবহর যখন নদীর পূর্বতীরে পৌছবার উপক্রম করল, তখন রীতিমত দিনের আলো।

নিওঙ্গুতে আই-এন-এ'র একেবারে ডানদিকে থেকে এবং জাপানী কোম্পানীর ঘাঁটি থেকে মাঝারি কামান দাগা শুরু হল সকাল ৬টা ১০ মিঃ নাগাদ। দেখতে দেখতে বেশ কিছু নৌকো বেসামাল হয়ে প'ড়ে স্রোতের টানে ভেসে যেতে লাগল ; পাশেই পড়ল আই-এন-এ ট্রেঞ্চ, তাদের নিশানা ব্যর্থ হল না। কিছু কিছু নৌকো পশ্চিম তীরে ফিরে যেতে পারলেও এবং অনেকে সাঁতার কেটে পালালেও বহু লোক হতাহত হল। অবশ্য এতে খুব বড় রকমের ক্ষতি হয়নি ; ঐদিন সকালে খানিক পরে দ্বিতীয় আরেকটি ব্যাটেলিয়ন আরও একটু উজিয়ে নিরাপদে নদী পার হল এবং সন্ধ্যার আগে আরও দুটি ব্যাটালিয়ান নির্বিঘ্নে ওপারে পৌছুল। নিওঙ্গুতে আই-এন-এ'র যে শত খানেক সৈন্য টিঁকে ছিল, তারা আত্মসমর্পণ করল।

পাগানেও নদী অতিক্রমের প্রারম্ভিক চেষ্টা সফল হয়নি। সৈন্যেরা আবার যখন নদী পার হবার তোড়জোড় করছে, তখন তারা দেখতে পেল জাপানীদের দিক থেকে একটা নৌকো শাদা নিশান উড়িয়ে এপারে আসছে। নৌকোয় ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের ছজন প্রতিনিধি ; তারা এসে জানাল যে, জাপানীরা পাগান ছেড়ে চলে গেছে এবং সেখানকার আই-এন-এ সৈন্যেরা আত্মসমর্পণ করতে চায়। একশো চল্লিশজন ধরা দিল এবং বৃটিশ পক্ষ বিনা বাধায় এবার নদী পার হল। ১৬ই ফেব্রুয়ারী ধীলন তাঁর রেজিমেণ্টের ছত্রভঙ্গ সৈন্যদের জড়ো করলেন, কিন্তু অবস্থা তখন তাঁর আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী নিওঙ্গু ও পাগানে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে ; বাকি সৈন্যদের নিয়ে মেক্‌টিলার পথে পঁয়ত্রিশ মাইল

দক্ষিণ-পুবে আই-এন-এ ডিভিশনের নতুন এলাকা কিওকপাদোং-এ পিছু হটে যাওয়া ছাড়া ধীলনের আর গত্যন্তর রইলো না।

এই সময়ে মেকৃটিলার পথরোধ করার জন্যে এবং নদী অতিক্রমের কঠোর মুহূর্তে শত্রুকে দুর্বল অবস্থায় ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে জাপানী সৈন্যেরা য়েনানজাউঙ্গ থেকে উত্তরদিকে ধাওয়া ক'রে এল। লেফটেনাণ্ট-কর্ণেল পি. কে. সাহ্‌গল-এর (২।১০ নং বেলুচ রেজিমেণ্টের প্রাক্তন ক্যাপ্টেন) নেতৃত্বাধীনে নবাগত ২য় আই-এন-এ পদাতিক রেজিমেণ্টের ওপর হুকুম হল. কিওকপাদোং-এর আট মাইল উত্তর-পুবে খাড়া বিচ্ছিন্ন ৫,০০০ ফুট উঁচু পাহাড় মাউণ্ট পোপা-র পশ্চিম ঢালুতে অবস্থিত আত্মরক্ষাব্যূহ থেকে পশ্চিমে ও উত্তরে টহল দিতে হবে। জাপানীরা এই এলাকাটি দৃঢভাবে দখলে রাখতে চেয়েছিল এবং য়েনানজাউঙ্গ-এর ৭২তম স্বতন্ত্র মিশ্রিত ব্রিগেডের ওপর সে ভার অর্পিত হয়েছিল। ১৭ই ফেব্রুয়ারী সাহ্‌গল কমাণ্ডারের সঙ্গে দেখা করলেন, কমাণ্ডার কথা দিলেন যে, জাপানী গোলন্দাজবাহিনী কামান দেগে তাঁকে সাহায্য করবে এবং তিনি যথারীতি সরবরাহ পাবেন।

এই অবস্থায় সুভাষচন্দ্র জাপানী ও ভারতীয় অফিসারবাহিনী নিয়ে রণাঙ্গন পরিদর্শনের জন্যে ১৮ই ফেব্রুয়ারী রেঙ্গুণ থেকে রওনা হলেন। তার আগে আরেকবার সরকারী সফরে তাঁর শ্যামদেশ ঘোরা হয়েছে এবং বর্মার রাজধানীতে বিজয়গর্বে তাঁর দিন কেটেছে। শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে বেতারবাহী গুপ্তচর পাঠিয়ে যুদ্ধ-এলাকার খবর সংগ্রহ করবার জন্যে সুভাষচন্দ্র এক দূর প্রসারিত গুপ্ত পরিকল্পনার সূত্রপাত করেন। উত্তর বর্মায় মার্কিণ পাইপ-লাইন ধ্বসিয়ে দেবার জন্যে স্বামী তখন বিশেষ একটি দলকে তালিম দিচ্ছিল, তাছাড়া ভারতবর্ষে পাঠানো জনকয়েক গুপ্তচরের সঙ্গে তখনও তার যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। ২৩শে জানুয়ারী খুব ঘটা ক'রে সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন পালন করা হয়। খানিকটা তাঁর অমতেই তাঁকে সোনা দিয়ে ওজন করা হয়। টাকা ওঠে দু'কোটির ওপর; একদল তরুণ তরুণী তাঁর ব্রত সফল করার জন্যে নিজেদের রক্ত দিয়ে প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করে—এমন কাজ তারা হাতে নিতে প্রস্তুত, যে কাজে নিশ্চিত মৃত্যু। ২য় পদাতিক রেজিমেণ্টকে ভাবাবেগের সঙ্গে বিদায় ও ব্যগ্রতা জানানো হয় এবং ৪ঠা

ফেব্রুয়ারী 'সৈন্যবাহিনী দিবসে' চারজন অফিসারকে প্রথম ভাবতীয় মেজর-জেনারেল পদে উন্নীত করা হয়। আই-এন-এ যাতে জাপানীদের কাছ থেকে বেশী পরিমাণে সরবরাহ ও সাজসবঞ্জাম পায়, সুভাষচন্দ্র তার ব্যবস্থা করেন; যুদ্ধযাত্রার আগে প্রত্যেককে তিনি সুযোগ দেন—কোন কারণে 'কেউ যদি যেতে অপরাগ ব'লে নিজেকে মনে করে', তাহলে সে থেকে যেতে পারে। এবার নিশ্চয়ই তাঁর সৈন্যবাহিনী দাঁড়িয়ে লড়াই করবে, কোন সংশয় থেকে গেলে যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং তাঁর উপস্থিতিতে নিশ্চয় তা দূর হবে। সুতরাং খুশী মনে নতুন বিশ্বাস নিয়ে তিনি পিনমানার ইম্ফল-ফেরত যোদ্ধাদের পরিদর্শন করলেন এবং নিওঙ্গুর লড়াইয়ের খবর পেয়ে শাহ নওয়াজকে সঙ্গে নিয়ে তিনি মেক্‌টিলার পথে ছুটে চললেন। ২য় ডিভিশনকে এবার চালনা করলেন শাহ্‌ নওয়াজ।

মেক্‌টিলায় এদিকে হুলস্থূল ব্যাপার, অনবরত প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ চলেছে, তার মধ্যে দাঁড়িয়ে মরিয়া হয়ে জাপানীরা কোন রকমে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। বৃটিশ ইতিমধ্যে নিওঙ্গুব সেতু মুখের ব্যূহভেদ ক'রে ফেলেছে, যে কোন মুহূর্তে তারা মেকটিলার দিকে এগিয়ে আসবে। নিওঙ্গুতে আই-এন-এ সৈন্যদের দলত্যাগের খবর শুনে সুভাষচন্দ্র রেগে আগুন হলেন এবং তৎক্ষণাৎ কিওকপাদোঙে চলে যেতে চাইলেন—সেখানে নাকি ধীলন তাঁর রেজিমেণ্ট নতুন ক'রে গড়ে তুলতে ব্যস্ত। যদিও মনে হচ্ছিল যে, বৃটিশপক্ষ মাউণ্ট পোপায় জাপানীদের শক্ত ঘাঁটির পাশ কাটিয়ে চলেছে, জোর ক'রে কিছু বলা যাচ্ছিল না, শাহ্‌ নওয়াজকে পাঠানো হল কী ব্যাপার আগে জেনে আসার জন্যে। তাঁর হাতে ধীলনকে একটা কড়া চিঠি দেওয়া হল:

> দুঃখ, বেদনা ও লজ্জার সঙ্গে লেফটেনাণ্ট হরিরাম ও অন্যান্যদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা শুনলাম। আমি আশা করি, ৪র্থ রেজিমেণ্টের সৈন্যেরা তাদের রক্ত দিয়ে আই-এন-এ'র কলঙ্ক মোচন করবে।

সুভাষচন্দ্র এই সময় আরেকটি চিঠি লেখেন ম্যাণ্ডালের একজন আই-এন-এ পুলিশ কর্তার কাছে; দলত্যাগীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার ব্যাপারটা

কিভাবে তিনি তাঁর মুঠোর মধ্যে রেখেছিলেন, তা এই চিঠি থেকে বোঝা যায় :

ম্যাণ্ডালে থেকে যে সব ফৌজ ফেরার হয়েছে···এখনও তারা ম্যাণ্ডালে অঞ্চলেই আছে—এই মর্মে আমার কাছে খবর এসেছে। এই ফেরারী ফৌজদের গ্রেপ্তার করতে হবে এবং পাহারাধীনে রেঙ্গুণে পাঠাতে হবে। যদি তাদের গ্রেপ্তার না করতে পারেন, দেখামাত্র যেন তাদের গুলি করা হয়। ওদের গ্রেপ্তার অথবা গুলি করতে চেষ্টার ত্রুটি করবেন না।

শাহ্ নওয়াজের অনুপস্থিতিতে সুভাষচন্দ্র কাল্‌অ ও টাউঙ্গিতে আই-এন-এ'র হাসপাতাল পবিদর্শন করলেন এবং ঐ সমস্ত হাসপাতাল জেয়াওয়াড্ডিতে স্থানান্তরিত করবার নির্দেশ দিলেন—কেননা যদি মেক্‌টিলার পতন হয়, সেদিক থেকে জেয়াওয়াড্ডি জায়গাটা হবে নিরাপদ।

২২শে ফেব্রুয়ারী পোপা গ্রামে গিয়ে শাহ্ নওয়াজ দেখলেন সাহ্‌গল ২য় ডিভিশনের হেড কোয়ার্টার এবং তাঁর রেজিমেণ্টের যেসব সৈন্য এসে পৌঁছেছে তাদের বেশ সামলে রেখেছেন। সুভাষচন্দ্র অসন্তুষ্ট হয়েছেন, সেই লজ্জায় ধীলন তাঁর দলছুট সৈন্যদের জোটাবার জন্যে মরিয়া হয়ে লাগলেন : ১৮ই ফেব্রুয়ারী তিনি আশা করেছিলেন তাঁর বারো শো লোকের মধ্যে শ'পাঁচেক লোককে তিনি জুটিয়ে ফেলতে পারবেন, কিন্তু মেরে কেটে শ' চারেক এসে জুটল। শাহ্ নওয়াজ তাঁর ডায়েরিতে লিখলেন, 'ব্যাপারটা দুঃখের'। আর সাহ্‌গল লিখলেন : 'না আছে শৃঙ্খলা, না আছে নৈতিক বল। ওদের নিয়ে হয়েছে আর এক জ্বালা ; ওরা ইতস্তত ঘুরে বেড়ানোর ফলে আমরা কোথায় আছি না আছি শত্রুরা টের পেয়ে যায়।' এ সব সত্ত্বেও শাহ্‌নওয়াজ বুঝতে পারলেন যে, ধীলনকে নিওঙ্গুতে অসাধ্য সাধন করবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ; শাহ্ নওয়াজ তাঁর এই ধারণার কথা ২৫শে ফেব্রুয়ারী মেক্‌টিলায় গিয়ে সুভাষচন্দ্রকে বললেন।

এ বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের আর কোন সন্দেহ রইল না যে, মাউণ্ট পোপায় তাঁর নিজের যাওয়া এখন একান্ত দরকার। তিনি বললেন, এবার আর তিনি কোন বারণ মানবেন না ; বিপদ আছে তো হয়েছে কী ? বোঝাই

যাচ্ছে যে, জাপানীরা বর্মা রক্ষা করতে পারবে না এবং তাঁর একমাত্র মনস্কামনা হল বৃটিশের সঙ্গে যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করা। এই হল তার উপযুক্ত সময়। আই-এন-এ'কে হয় জয় নয় মৃত্যুতে তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন—এই সঙ্কল্পই কি তিনি করেননি? দিল্লীর পথে জয়যাত্রা আপাতত শেষ; কিন্তু তাঁর সৈন্যদের শৌর্যবীর্যের এমন এক ইতিহাস সৃষ্টি করতে হবে, যাতে তাদের স্বদেশবাসীরা ভারতবর্ষে আবার বিপ্লবের ধ্বজা তুলে ধরবার প্রেরণা পায়। কত মানুষের প্রাণের মূল্যে সে উজ্জ্বল ইতিহাস রচিত হল, এখানে সে হিসেব তুচ্ছ। ২৬শে ফেব্রুয়ারী, তখনও রাত ভোর হয়নি; সুভাষচন্দ্র সমানে তাঁর অফিসারদের সঙ্গে তর্ক ক'রে চলেছেন। চাঁদনী রাত; উত্তর-পশ্চিম দিগন্তে কামানের গোলা কিংবা বোমার আগুনে ক্ষণে ক্ষণে মাউণ্ট পোপার কৃষ্ণকায়মূর্তি নজরে আসছে। শাহ্ নওয়াজ আর থাকতে না পেরে যা বললেন,[৭]—তার মর্ম হল: 'শুধু নিজের বীরত্ব ফলাবার জন্যেই আপনি বিপদের মধ্যে গলা বাড়াচ্ছেন; কিন্তু এটা করলে স্বার্থপরতা হবে, তা করবার অধিকার আপনার নেই; আপনার জীবন আপনার নিজের নয়, ভারতের মূল্যবান সম্পদ হিসেবে তা আমাদের হাতে সঁপে দেওয়া হয়েছে: দায়িত্বটা আমাদের।' সুভাষচন্দ্র তবু নাছোড়বান্দা; হেসে বললেন, 'কিছু ভেবো না, আমাকে মারবার মত বোমা আজও ইংলণ্ডে তৈরি হয়নি।' যখন দেখা গেল যুক্তিতর্ক দিয়ে কিছু হবার নয়, তখন অফিসারদের চেষ্টা হল কোন রকমে দেরি করিয়ে দেওয়া—যাতে অন্ধকার থাকতে সুভাষচন্দ্র রওনা হতে না পারেন। সুভাষচন্দ্র মেজাজ গরম করতে লাগলেন, কিন্তু সময় মত গাড়ী পাওয়া গেল না এবং ভোর হবার আগে মেক্‌টিলা থেকে রওনা হওয়া সম্ভব হল না।

২৫শে ফেব্রুয়ারী বেশ কয়েকবার প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ হয়েছিল; ছাব্বিশ তারিখ সকালেও আরেকবার তার পুনরাবৃত্তি ঘটল। বোমাবর্ষণ ক্ষান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে একজন জাপানী সংযোগ অফিসার এসে জানাল যে, বৃটিশ সাঁজোয়া বাহিনী আর ষোল মাইল দূরে। সে বলল, মেক্‌টিলায় তাদের আসা রোধ করা যাবে না; মাউণ্ট পোপায় যাওয়ার পথ সম্ভবত বিচ্ছিন্ন এবং রেঙ্গুণ-গামী রাস্তাতেও বাধা পেতে হতে পারে। আই-এন-এ'র পুরোভাগে থেকে ল ড়াইতে মৃত্যুবরণ করা আর মেক্‌টিলায় জাপানীদের সঙ্গে থেকে আট্‌কা পড়া

৭ 'মাই মেমারিজ অব দি আই এন-এ অ্যাণ্ড ইট্‌স্ নেতাজী', শাহ্ নওয়াজ, ১৪৪ পৃঃ

—এ দুটো এক জিনিস নয়। সুভাষচন্দ্র ঠিক করলেন কোন মতে এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করবেন। শাহ্ নওয়াজ এইভাবে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন :

> আমি···গাড়িতে হাতবোমা ও গোলা ভ'রে নিলাম।··· [সকাল ৯টা নাগাদ] গাড়িতে উঠে আমরা রওনা হলাম; নেতাজী বসলেন কোলের ওপর গুলিভর্তি টমিগান নিয়ে। রাজু (সুভাষচন্দ্রের চিকিৎসক) দুটো হাতবোমা নিয়ে তৈরি। জাপানী অফিসারের হাতে আরেকটি টমিগান এবং আমার হাতে গুলিভর্তি ব্রেনগান।··· যাতে দরকার হলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা গুলি ছুঁড়তে পারি। জাপানী অফিসারটি গাড়ির ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে শত্রুপক্ষের বিমানের প্রতি নজর রাখতে লাগল।[৮]

ইন্‌ডো পর্যন্ত কুড়ি মাইল পথ যেতে কোন দুর্ঘটনার মধ্যে পড়তে হয়নি; সন্ধ্যা না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা গা ঢাকা দিয়ে থাকলেন। বহুবার বিপদসঙ্কেত হল, শত্রুবিমানে আকাশ ছেয়ে গেছে বলে মনে হল এবং গ্রামগুলো মনে হল বৃটিশের চরে ভর্তি। তাঁদের গতিবিধি কি জানাজানি হয়ে গেছে? মাথার ওপর বিমানগুলো এখনও কি আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্তা, জাপানী ক্রীড়নক ও দেশদ্রোহী নামজাদা বসুকে খুঁজছে?' পালাবার সময় যখন বিমান আক্রমণ হয় তখন নিজেদের এই রকমই অসহায় লাগে; মনে হয় ওপর থেকে শত্রুর চোখ যেন গাছের পত্রজাল ভেদ করে দেখছে।

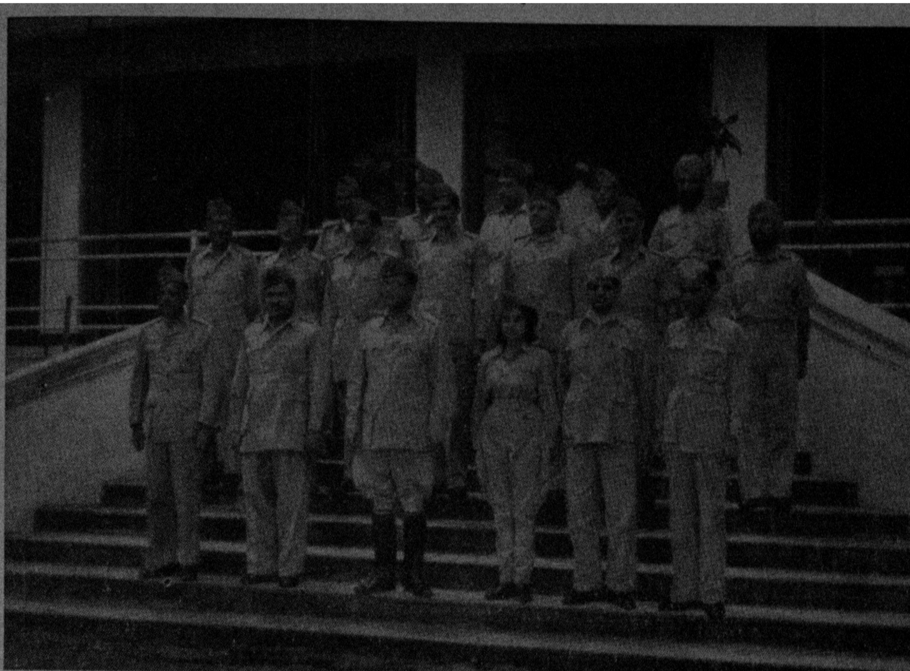
সুভাষচন্দ্র ২৭শে ফেব্রুয়ারী পিনমানায় পৌছলেন, স্থানীয় শিবিরস্থ ১ম ডিভিশনের অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে একটি রেজিমেণ্ট তৈরী করবার জন্যে তিনি নির্দেশ দিলেন। এই নতুন অনামী রেজিমেণ্ট উত্তরে মাইল কয়েক দূরে ইয়েজিনে শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখবে : বাকি আড়াই হাজার অসুস্থ ও আরোগ্যলাভকারী সৈন্যকে টঙ্গুর দক্ষিণে জেওয়াডিতে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সুভাষচন্দ্র পিনমানায় তাঁর সৈন্যদলের সঙ্গে দুদিন কাটালেন; সব সময় তিনি সৈন্যদের মধ্যে ঘুরে বেড়ালেন, নতুন সংগঠনের ব্যাপারে সাহায্য করলেন এবং ইয়েজিনের রক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে অফিসারদের

৮ 'মাই মেমারিজ অব দি আই-এন-এ অ্যাণ্ড ইট্‌স্ নেতাজী' শাহ্ নওয়াজ, ১৪৪ পৃঃ

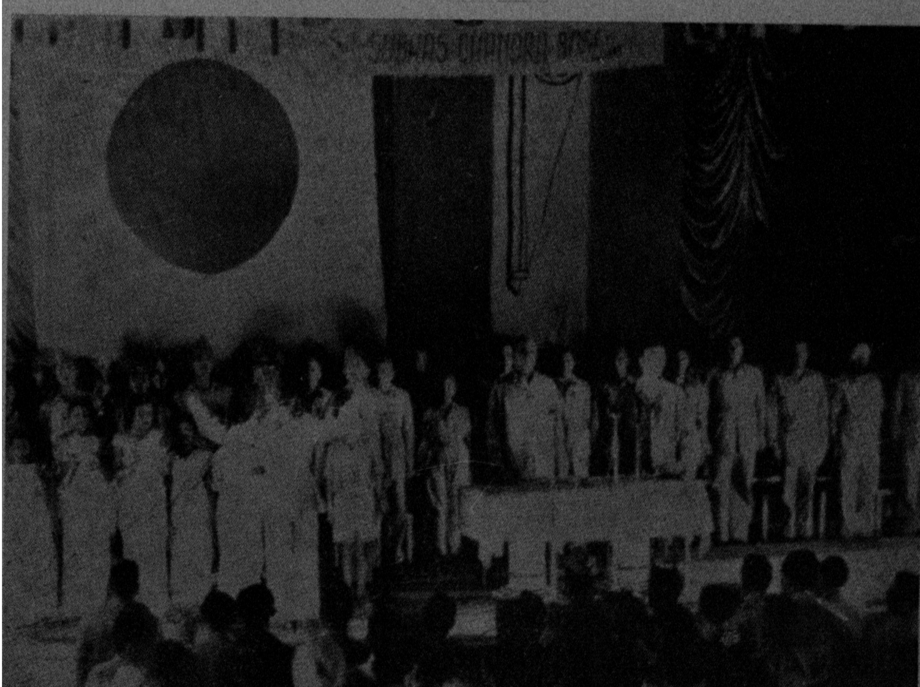
পরামর্শ দিলেন। বললেন, এবার এখানে থেকে তিনি শেষ লড়াই লড়বেন ; যতক্ষণ একজনও বেঁচে থাকবে, একটি গুলিও থাকবে—ততক্ষণ লড়াই থামবে না।

২রা মার্চ রেঙ্গুণের হেডকোয়ার্টার থেকে জরুরী খবর এল অবিলম্বে তাঁর রেঙ্গুণ আসা দরকার। সেখানে গিয়ে তিনি চরম দুঃসংবাদ পেলেন। মাউণ্ট পোপার ২য় ডিভিশনের পাঁচজন স্টাফ অফিসার দলত্যাগ করেছে : তাদের স্বাক্ষরিত আত্মসমর্পণপত্র ছাপিয়ে শত্রুবিমান থেকে আই-এন-এ'র ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে ফেলা হয়েছে : আশঙ্কা হয়েছে এবার আরও বহু লোক দল থেকে খসবে। খবর শুনে সুভাষচন্দ্র থ' হয়ে গেলেন : আঘাতটা তাঁর বুকে এমনভাবে বেজেছিল যে, কয়েকটা দিন তিনি ঘর ছেড়ে বার হননি। নিজেকে তিনি অনুশোচনায় দগ্ধ করলেন। দোষ তাঁরই : তাঁর সৈন্যেরা তাঁর জন্যে প্রাণ দিতে পারত। যদি তিনি স্বয়ং মাউণ্ট পোপায় যেতেন, তাহলে এই বিপর্যয় ঘটতে পারত না। তাঁর মন তাঁকে যেতে প্রবৃত্ত করেছিল, কিন্তু অন্যেরা ভয় পেয়ে তাঁকে নিবৃত্ত করেছে—তাদের বাধা ঠেলে ফেলে তাঁর যাওয়া উচিত ছিল। এখন তিনি বুঝতে পারছেন যে, তখন ভয়ের কোন কারণ ছিল না ; যুক্তিতর্কে কান দিতে গিয়ে এবং অত সহজে হাল ছেড়ে দিয়ে আসলে তাঁর দুর্বলতাই প্রকাশ পেয়েছে।

ক্ষণকালের জন্যে এই সময় সুভাষচন্দ্র সত্যিকারের পরাজয় অনুভব করেছিলেন এবং বরাবরের মত এবারও নির্জনতার মধ্যে ডুবে গিয়ে আত্মস্থ হবার চেষ্টা করলেন। জীবনে তাঁর অন্তরঙ্গের সংখ্যা বেশী নয় : দিলীপ কুমার রায়, বাল্যজীবনে অগ্রজ শরৎচন্দ্র এবং সেই রাণী যাঁর গোপন চিঠি মাঝে মাঝে ভিয়েনা থেকে আসত। আজ সকলেই তাঁর কাছ থেকে বল-ভরসা চাইছে : একজনও নেই যার সঙ্গে বন্ধুভাবে মন খুলে কথা বলতে পারেন : থাকবার মধ্যে তাঁর আছে শুধু নিত্যসঙ্গী জপের মালা, পকেট গীতা, অন্তরাশ্রয়ী স্তব্ধতা। আস্তে আস্তে সেভাব কেটে গিয়ে আবার তিনি মনের শান্তি ফিরে পেলেন। কোন দুর্দৈবই এখন তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না। মার্চ মাসে কেবলি জাপানীদের দৈবদুর্বিপাকের খবর আসতে লাগল—কিন্তু সুভাষচন্দ্রকে দেখি শান্ত, আত্মস্থ ; নির্বিকার ব'লে মনে হল। একমাত্র বিশ্বাসঘাতকতার কথা ভেবেই তিনি বিচলিত হতেন এবং তখন তাঁর মন



মন্ত্রিবর্গ ও উপদেষ্টা পরিষদসহ সুভাষচন্দ্র



জাতীয় সঙ্গীত : সিঙ্গাপুর, অক্টোবর ১৯৪৩



তোজোর সঙ্গে সদলবলে সুভাষচন্দ্র : নভেম্বর, ১৯৪৩



বর্মার বা-ম ও ফিলিপাইনের জোসেফ লরেল-এর সঙ্গে সুভাষচন্দ্র

এলোমেলো হয়ে পড়ত · বলতেন, আবার যদি তেমন কোন ঘটনা ঘটে, তাহলে তিনি আত্মঘাতী হবেন।

দুটি বিশেষ হুকুমনামায় এই রকমের বিচলিতভাব ফুটে উঠল . এই দুটি হুকুমনামায় দলত্যাগের ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রের সবকারী মনোভাব গ্রথিত হয়েছিল। দলত্যাগের অপবাধে ইতিপূর্বেই তিনি প্রাণদণ্ড অনুমোদন করেছিলেন, এবং যে সব 'অবাঞ্ছিত অফিসার' এখনও দলের মধ্যে সন্দেহ এড়িয়ে থেকে গেছে, তাদের তালিকা তৈরি করবার জন্যে আই-এন-এ পুলিশকে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন। এখন তিনি ঘোষণা করলেন যে, একটা দিন 'দেশদ্রোহী দিবস' পালিত হবে, এই দিন আই-এন এ ইউনিট-গুলি প্রকাশ্যে দলত্যাগীদের মুণ্ড পাত করবার ব্যাপারে পরস্পবের সঙ্গে পাল্লা দেবে। বহুদিন থেকে তিনি যে ব্যবস্থা অবলম্বন কববার কথা ভেবে আস ছিলেন, এইবাব তিনি সেই বিধান জাবি কবলেন·

> আই-এন-এ'ব দলভুক্ত যে কেউ—অফিসার, এন সি. ও অথবা সেপাই—অতঃপব উর্ধ্বতন অধস্তন নির্বিশেষে আই এন-এ দলভুক্ত যে কাউকে কাপুরুষোচিত আচবণের জন্যে গ্রেপ্তার কিংবা বিশ্বাসঘা:ক-তার জন্যে গুলি করতে পারবে।

সুভাষচন্দ্র আবাব বললেন কেউ যদি যথারীতি কাজ করতে কিংবা লড়াই কবতে অনিচ্ছুক হয়, তাহলে সে স্বচ্ছন্দে আই-এন-এ ছেড়ে চলে যেতে পারে ; সেই সঙ্গে তিনি নির্দেশ দিলেন যে, সন্দেহভাজন একটি লোককেও যেন দলে রাখা না হয়। পববর্তী কয়েক দিনে যে খোঁজ-খোঁজ রব পড়ল, তাব ফলে কয়েকজন অফিসারকে কর্তৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হল এবং রেঙ্গুণে তখনও যে সব 'সন্দেহভাজনে'রা ঘুরে বেড়াচ্ছিল তাদের আটক করা হল। ফিল্ড কমাণ্ডারদের কাছে অধীনস্থ সন্দেহভাজনদের নামের তালিকা পাঠানো হল, যাতে তাদের দলে রাখা না হয়। সেই সঙ্গে সুভাষচন্দ্র আক্রমণাত্মক মনোভাব জাগিয়ে ও ব্যক্তিগতভাবে চিঠি লিখে দলবলকে উৎসাহিত করবার চেষ্টা করলেন। নিওঙ্গুব ব্যর্থতাব ব্যাপারে ধীলনকে

১ পরিশিষ্ট ২, ৮ ও ৯ নং

তিনি ক্ষমা করলেন এবং পদোন্নতি ঘটিয়ে ও আস্থাজ্ঞাপক দুটি চিঠি লিখে তিনি ধীলনের হৃদয় জয় করলেন :

> আমরা সকলেই আনন্দ ও গর্ব অনুভব করছি। তুমি ও তোমার রেজিমেণ্ট মহৎ কাজ ও ত্যাগের ভেতর দিয়ে জনকয়েক দেশদ্রোহীর পাপ ধুয়ে মুছে ফেলবে, তাতে আমার সন্দেহ নেই।

এত কিছু ক'রেও কোন ফল হল না। মার্চ মাসে আই-এন-এ'র পক্ষে লড়াই করা আরও বেশী দুষ্কর হয়ে পড়ল এবং দু চার জন ছাড়া আর সকলেরই লড়াই করবার শখ মিটে গিয়েছিল। বেতারে যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা নেই, নিওঙ্গুতে সাজসরঞ্জামের যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার পূরণ হয়নি। ডিভিশনের হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে রেজিমেণ্টের কোন টেলিফোন সংযোগ নেই, এমন কি রেজিমেণ্টের হেডকোয়ার্টারে একজন সংবাদ-বাহক পর্যন্ত নেই—একটি হুকুমে বিশেষভাবে বলা হয়েছিল ৪র্থ গেরিলা রেজিমেণ্ট যেন জরুরী অবস্থায় ব্যবহারের জন্যে একটি মোটর সাইকেল যোগাড় করে নেয়। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, 'আমরা হলাম বিপ্লবী বাহিনী'—যেন শুধু বিপ্লবী ইচ্ছাশক্তির জোরেই বাস্তবের সব অভাব পূরণ হয়ে যাবে। এই ধারণার বশেই যোগাযোগের ব্যবস্থা না করে, নামমাত্র যানবাহন দু'চারটে সহায়ক অস্ত্রশস্ত্র আর যৎসামান্য গুলিগোলা সঙ্গে দিয়ে সৈন্যদের লড়তে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সৈন্যদের এমন হাল হল যে, পায়ে জুতো নেই আর পরণে শতছিন্ন পোশাক। সুতরাং তারা যে দলে দলে পালাবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যদি তাদের নেতার কথামত ধ'রেও নেওয়া যায় যে, তাদের মনে দেশপ্রেমের আগুন ছিল—তাহলেও ঐ অবস্থায় পালানো ছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিল না। অবশ্য এখন তো তাদের মধ্যে দেশপ্রেমিক উৎসাহের ছিটেফোঁটাও প্রায় নেই—আছে শুধু ভয়, লজ্জা আর ঘরে ফেরবার নীরব তীব্র বাসনা।

মার্চ মাসে জাপানীরা নদীতীরে বৃটিশ রক্ষাব্যূহের ওপর বার কয়েক হামলা করবার চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল; এই সময়ে আই-এন-এ খুচখাচ কিছু লড়াই করেছিল। ১৫ই থেকে ১৭ই মার্চ ধীলনের রেজিমেণ্ট

টংজিন-এর কাছে দাঁতে দাঁত দিয়ে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করল ; এই সংঘর্ষে দলের প্রচুর সৈন্য হতাহত হল। দ্বিতীয় পদাতিক বাহিনীকে লড়াই করতে হল সে তুলনায় সামান্য, আর ১ম পদাতিক বাহিনীর ওপর ভার ছিল যুদ্ধক্ষেত্রের অনেক তফাতে নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে টহল দেবার। কাজেই যুদ্ধের মধ্যে তাদের থাকতেই হয়নি। মার্চের শেষাশেষি ধীলনের একজন ব্যাটালিয়ান-কমাণ্ডার দল ছেড়ে পালায়। ধীলন বললেন, ওতে কিছু যায় আসে না—'আমরা প্রাণ দিয়ে আই-এন-এ'র মান বাঁচাব।'

কিন্তু এদিকে ভারতীয় সেনাবাহিনী মাউণ্ট পোপা থেকে শত্রুপক্ষকে ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করবার জন্যে তৈরী। ২রা এপ্রিল সারাদিন প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ চালাবার পর সৈন্যদের একটা জবরদস্ত দল উত্তর থেকে লেগিই গ্রামের দিকে অগ্রসর হল, সেখানে গেড়ে বসেছিল ২য় পদাতিক বাহিনী। বেশ বোঝা গেল, পরদিন পুরোদমে আক্রমণ শুরু হবে। রাত্রে তিন জন অফিসার ও জনকয়েক এন-সি-ও ফেরার হল। সকালে সাহ্‌গল বললেন, দেখা দিল 'নিদারুণ আতঙ্ক আর আশাভঙ্গ। প্রত্যেকে যেন মনে মনে বুঝতে পারছে যে, আমাদের কোথায় কত শক্তি সমস্তই শত্রুর নখদর্পণে, আমাদের চেয়ে শত্রুপক্ষ যখন এত পরাক্রান্ত, আমাদের আর কোন আশা নেই।'[১০] দুপুরের ঠিক পরেই গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ি ও লরীবাহিত পদাতিক সৈন্যেরা লেগিইর ওপর আক্রমণ চালায়। বিকেলের দিকেও আরো দুটো আক্রমণ হয়। এরপর প্রশাসন এলাকা হাতের বাইরে চলে যায়। সাহ্‌গল প্রতি-আক্রমণের হুকুম দিলেন কিন্তু সংশ্লিষ্ট প্লেটুন দুটি যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালায়। সন্ধ্যার অন্ধকারের পর দ্বিতীয় প্রতি-আক্রমণ সফল হয়, কিন্তু সাহ্‌গল তখন শুনতে পেলেন : কমাণ্ডার, সমস্ত কোম্পানী কমাণ্ডার ও প্রায় তিন শো লোকসহ বলতে গেলে তার গোটা ২য় ব্যাটালিয়ন ফেরার হয়েছে। বাকি যারা আছে তাদের পক্ষে আর কোন আক্রমণের সামনে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। সাহ্‌গল সেই রাত্রেই নিজের উদ্যোগে তাদের নিয়ে পশ্চাদপসরণ করলেন।

এখন শুধু পিছু হটা আর ছত্রভঙ্গ হওয়া। মাউণ্ট পোপা থেকে অবশিষ্ট যে সৈন্যেরা ১২ই এপ্রিল দক্ষিণ দিকে রওনা হয়েছিল, বর্মায় ধাবমান

১০ পি. কে. সাহ্‌গল 'রিপোর্ট অন [illegible]', আই এন এ কোর্ট মার্শাল [illegible]

চতুর্দশ বাহিনী এসে পড়ে তাঁদের ঘিরে ফেলে হয় বন্দী করল নয়ত বেকায়দায় ফেলে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করল। সবাই যে বিনা যুদ্ধে ধরা দিল তা নয়। বাগড়ি ব'লে এক ক্যাপ্টেনের অধীনে ছিল ছ'শো লোকের একটি সৈন্যদল, বৃটিশ ট্যাঙ্ক বাহিনী অতর্কিতে তাদের ঘিরে ফেলে। শোনা যায়, বাগড়ি নিজে ও তাঁর প্রায় শত খানেক লোক শেষ পর্যন্ত হাত বোমা আর পেট্রোলের বোতল নিয়ে লড়াই করতে করতে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দেন। কিন্তু তাতেও কিছু হয়নি। এপ্রিলের শেষে দেখা যায়, লড়াই-পালানো লোকজনেরা ছাড়া আর কেউই বাইরে নেই: ১৩ই মে শাহ্ নওয়াজ, ধীলন ও সেই সঙ্গে আরও জন বারো লোক পেগুতে আত্মসমর্পণ করল: আই-এন-এ ডিভিশনের এখানেও হল ইতি।

শেষ কথাটা বোধহয় একজন জাপানীই বলেছিল ভাল ৪র্থ গেরিলা রেজিমেণ্টের সঙ্গে যুক্ত সংযোগ অফিসার ক্যাপ্টেন ইজুমি তার উর্দ্ধতন অফিসারদের কাছে ৮ই এপ্রিল এই বিবরণ পেশ করেছিল:

> যে সব কমাণ্ডিং অফিসার (রেজিমেণ্ট ও ডিভিশনের কমাণ্ডার) ব্যক্তিগতভাবে চন্দ্র বসুর বিশ্বাসভাজন, যারা তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে ও পত্রযোগে সাহায্য পায়—আই-এন-এ'র মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে তারা নিষ্ঠাবান ও যুদ্ধ সম্পর্কে পরম উৎসাহী। অবশ্য ব্যাটালিয়ন ও কোম্পানীর কমাণ্ডারদের সম্পর্কে এ কথা খাটে না।
>
> রেজিমেণ্টের কমাণ্ডার ও তাঁর অধস্তনেরা··· নৈশ যুদ্ধে রাজকীয় বাহিনীর পরাক্রম, তার সাংঘাতিক সাঁড়াশী আক্রমণ ও ঘাড়ে প'ড়ে লড়াই করবার ধরন সম্পর্কে বিলক্ষণ জানে। তাদের খাঁই খুব বেশী—বন্দুক চাই, এরোপ্লেন চাই, এটা চাই, সেটা চাই, ওদের অতীতের কথা মনে রাখলে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। টেঞ্চের কঠোর জীবন ও নৈশ সংগ্রামের প্রচণ্ডতা—এর কিছুই তাদের ধাতে সয় না।
>
> সাধারণভাবে বলতে গেলে, আত্মরক্ষার লড়াইতে তারা অনুপযুক্ত এবং এই রণাঙ্গনে যদিও তারা আক্রমণাত্মক লড়াইতে লিপ্ত, তাহলেও সামগ্রিক যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে তারা বড়বেশী মাথা ঘামায়, অতিশয়োক্তি না ক'রেও একথা বলা যায় যে, তীব্র বীরত্বপূর্ণ

আক্রমণ আই-এন-এ'র দিক থেকে আকাশকুসুম মাত্র। অবশ্য আই-এন-এ'র কিছু কিছু ইউনিট লড়াইতে উঁচুদরের কৃতিত্ব দেখিয়েছে।

বর্মায় যবনিকাপাত

একদিকে পশ্চাদপসরণকারী আই-এন-এ'র ভগ্নদশা, অন্যদিকে চতুর্দশ বাহিনী সবেগে রেঙ্গুনের দিকে ধাবমান। ১৫ই এপ্রিল নাগাদ ৫ম ভারতীয় ডিভিশন ইয়েজিনের উপকণ্ঠে পৌঁছে গেল; ইয়েজিনস্থ অনামী রেজিমেন্টের দুটি ব্যাটালিয়নের ওপর ভার পড়েছে প্রাণ দিয়ে শত্রুকে প্রতিরোধ করবার। শেষ মুহূর্তে হঠাৎ তাদের কমাণ্ডারের কাছে নির্দেশ গেল য়েনিতে পশ্চাদপসরণ ক'রে সেখানে জাপানীদের প্রতিরোধকার্যে সাহায্য করতে। এক্ষেত্রে তো বটেই, অন্যান্য ক্ষেত্রেও দেখা গেল--আই-এন-এ'র সৈন্যেরা দ্রুতপদে পিছু হটতে গিয়েও যন্ত্রসজ্জিত বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না; ২৪শে এপ্রিল নাগাদ অবস্থা এমন হল যে, শত্রু-কবলিত পাহাড়ী অঞ্চল ভেদ ক'রে এবং সালউইন উপত্যকা দিয়ে মলমেয়াঞ্জির দিকে পালাতে হল। মধ্য বর্মায় সব জাপানীই এবার এই পথ নেবার চেষ্টা করল এবং ফলে যে আর জুনে হ'ল 'চাচা আপন বাঁচার লড়াই'।

সুভাষচন্দ্রের সরকারের সঙ্গে যুক্ত জাপানী রাষ্ট্রদূত মিঃ হাচিয়া মার্চ মাসে রেঙ্গুণে এসে পৌঁছুলেন। সুভাষচন্দ্র জানতে পারলেন যে, হাচিয়া কোন 'পরিচয়পত্র' সঙ্গে ক'রে আনেননি, পরিচয়পত্র না দেখানো পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র তাঁকে স্বীকৃতি দিতে অসম্মত হলেন। তিনি তাঁর নিজের সমস্যার কথা বার বার ভেবে দেখেছেন। তিনি ধ'রে নিয়েছিলেন জাপানীরা হারবে। মার্চের গোড়ায় শাহ্‌নওয়াজ তাঁর কাছে বিদায় নিতে এলে তিনি বলেছিলেন, 'আমি জানি বর্মায় আমাদের হার হয়েছে, কিন্তু তাতে আমাদের মুষড়ে পড়লে চলবে না।···ভারতবর্ষের মান বাঁচাবার জন্যে আমাদের উচিত লড়াই চালিয়ে যাওয়া।' ২৫শে মার্চ আউঙ্গসান-এর বর্মী জাতীয় বাহিনী জাপানীদের বিরুদ্ধে যখন বিদ্রোহ করে তখন চাওয়া হয়েছিল বর্মী জাতীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে আই-এন-এ লড়াই করুক—তাতে সুভাষচন্দ্র রাজী হননি। যখন তাঁর একজন মন্ত্রী তাঁকে বলে যে, তাঁরও উচিত জাপানীদের বিরুদ্ধে

ঘুরে দাঁড়ানো—তার উত্তরে তিনি শুধু বলেন যে, তিনি যদি ঘুরে দাঁড়ান তাহলে মালয়ের ভারতীয়দের তার জন্যে প্রচুর শাস্তি পেতে হবে। যারা বিশেষ পরিচিত, তাদের কাছে তিনি বলতেন: ঢের রাজনীতি হয়েছে, এবার দেশের কাজে জীবন দিতে পারলেই তিনি বর্তে যান।

কাজই ছিল তার সান্ত্বনা। প্রথমত, ঝাঁসীর রাণী বাহিনীর শত-খানেক মেয়েকে বর্মার বাইরে তাদের বাড়িঘরে পাঠিয়ে দিতে হবে, তাদের বাবা মা-র কাছে তাঁর তো এতটা দায়িত্ব আছে—তিনি বলতেন। জেয়াওয়াডি আর রেঙ্গুণ থেকে দু'তিন হাজার পঙ্গু সৈন্যকে ক্রমান্বয়ে শ্যামে সরাবারও তিনি চেষ্টা করলেন। এ ছাড়া, জাপানীরা যতদিন রেঙ্গুণ রক্ষা করতে বদ্ধ-পরিকর, ততদিন বর্মায় তিনি শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে চাইলেন। ভারতীয়দের মনোবল ভাঙার চেষ্টা তিনি বরদাস্ত করেননি, তাঁর বোধহয় এই সময় কানে এসেছিল যে, রেঙ্গুণে একদল মুসলমান গোপনে গোপনে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ রটনা করেছে—তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে জরুরী তদন্তের জন্যে ১৭ই এপ্রিল তিনি এক নির্দেশ জারি করলেন। শহরের বাইরে আই-এন-এ'র বড় বড় ছাউনিতে তখন ছ'হাজার সৈন্য বাস করছিল, শেষ সংগ্রামে সাহায্যের জন্যে তাদের সংগঠিত করা হল।

এরপর ২০শে এপ্রিল স্পষ্ট বোঝা গেল, জাপানীরা তাদের কথার খেলাপ ক'রে বর্মার রাজধানী ত্যাগ ক'রে যাচ্ছে। ভারতীয়দের প্রতিরোধ এখন অর্থহীন হবে। অনেক দেরী হয়ে গেছে, এখন আর আই এন এ সৈন্যদের ব্যাপকভাবে অপসারণ করবার সময় নেই, সুতরাং প্রত্যেক কোম্পানীতে আড়াই শো ক'রে লোক নিয়ে শুধু দুটি 'আত্মহন্তা বাহিনী'কে মলমেয়াক্রিতে পাঠানো হল—এরা সবাই ছিল সুভাষ রেজি-মেণ্টের প্রথম ব্যাটালিয়নে, যার একটি লোকও খোয়া যায়নি। সুভাষচন্দ্র শ্যাম ও মালয়ের কয়েকজন বেসামরিক কর্মীর সঙ্গে ঝাঁসীর রাণী বাহিনীর বাকি মেয়েদের পাঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত করলেন এবং যানবাহনের জন্যে জাপানীদের ওপর চাপ দিলেন। মাত্র ২৩শে এপ্রিল তাঁকে জাপানী পশ্চাদপসরণের কথা সরকারীভাবে জানানো হল, ডাঃ বা ম তাদের সঙ্গে যাচ্ছেন, তারা জিজ্ঞাসা করল, এক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র কী করবেন? সুভাষচন্দ্র সিদ্ধান্ত ক'রেই রেখেছিলেন, তবে উদ্যোগটা মন্ত্রিসভার পক্ষ

থেকেই এল। ২৪শে এপ্রিল রাত্রে সুভাষচন্দ্র রেঙ্গুণ থেকে পাড়ি দিলেন—তাঁর সঙ্গে জনকয়েক মন্ত্রী ও হোমরা চোমরা অফিসার, জনপঞ্চাশেক লীগ কর্মী ও মেয়েদের শেষ দল।

রেঙ্গুণে আই-এন-এ'র আত্মসমর্পণে পৌরোহিত্য করবার জন্যে থেকে গেলেন মেজর-জেনারেল লোকনাথন। নেতাজীর সঙ্গে গেলেন সরকারের প্রধান সদস্যেরা, অন্য তিন জন মেজর-জেনারেল ও স্বামী। সুভাষচন্দ্র তাঁর শেষ বাণীতে বললেন, 'আমি নিজের ইচ্ছায় বর্মা ছেড়ে যাচ্ছি না, তোমাদের সঙ্গে এখানে থাকতে পারলে, সাময়িক পরাজয়ের দুঃখ তোমাদের সঙ্গে ভাগ ক'রে নিতে পারলে আমি সুখী হতাম।'[১১] কিন্তু তাঁর উপদেষ্টারা তাঁকে থাকতে দিতে রাজী হয়নি; শ্যাম ও মালয়ে তাঁর অনেক দায়িত্ব আছে, আর কারো পক্ষে তা পালন করা সম্ভব হবে না, এবং এ পরাজয় ভারতীয়দের দিক থেকে সংগ্রামের একটি গৌণ অধ্যায় মাত্র। সুভাষচন্দ্র বললেন, 'বীরের মত পরাজয় মানো। পরম সম্মান ও শৃঙ্খলার সঙ্গে ব্যর্থতা বরণ করো।'[১২]

৪ঠা মে ২৬তম ভারতীয় ডিভিশনের প্রথম ব্রিগেড রেঙ্গুণ নদী উজিয়ে এসে নৌকো থেকে অবতরণ করল এবং সেই সঙ্গে রেঙ্গুণে লোকনাথনের কর্তৃত্বের অবসান হল। ৩রা মে তারিখেই রেঙ্গুণ জেলে বৃটিশ বন্দী প্রধান মিত্রপক্ষের প্রতিনিধি হিসেবে ইতিমধ্যেই আই-এন-এ সৈন্যদের নিরস্ত্র করবার ও এক জায়গায় সমবেত হবার আদেশ জারি করেছিলেন। সৈন্যদের প্রথম দল অবতরণ ক'রেই দেখতে পেল সেই আদেশ পালিত হচ্ছে। বর্মায় ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন এইভাবে আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে গেল; আন্দোলনের নেতাদের আচরণে মর্যাদা প্রকাশ পেল এবং তাঁরা বৃটিশ সেনাপতিদের যথাসাধ্য সাহায্য করলেন। তা সত্ত্বেও, কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য ছিল। ভারতীয় বাহিনীর সাড়ে সাতশো প্রাক্তন অফিসার ও সৈনিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে মে মাসে জাহাজযোগে ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এরপর কয়েক মাস ধ'রে আরও দশ সহস্রকে প্রথমে রেঙ্গুণ ও তারপর মালয় ও ব্যাঙ্কক থেকে ভারতে চালান করা হল।

১১ পরিশিষ্ট ২, ১০ন

১২ পরিশিষ্ট ২, ১০ন

৮

ভারত স্বাধীন হবেই

কখনও মুহূর্তের জন্যও ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভরসা হারিও না। জগতে এমন শক্তি নেই যে ভারতবর্ষকে গোলাম ক'রে রাখতে পারে। ভারত স্বাধীন হবেই, সেদিন দূর নয়।
(১৫ আগস্ট ১৯৪৫)

জার্মানীতে থাকার সময়ে সুভাষচন্দ্র ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের বলেছিলেন, 'এ যুদ্ধে বৃটিশ হেরে গেছে, তাতে সন্দেহ নেই।' আর এখন তিনি ও তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজের মার-খাওয়া হতভাগ্য বাকি সৈন্যেরা যখন বর্মা ছেড়ে পালাতে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়ে ইউরোপে মিত্রশক্তির যুদ্ধজয় সম্পূর্ণ। শ্যামদেশে পৌঁছেও সুভাষচন্দ্র মোটামুটি একই কথা বলছিলেন, জাপানীদের কাছে তার একরকমের অর্থ আর তাঁর স্বদেশবাসীর কাছে অন্য রকমের অর্থ। তখনও তিনি বিশ্বাস করছেন: জয় হবে, ভারত জয়ী হবে, বৃটিশের দাসত্ব থেকে ভারতবর্ষ মুক্তি পাবে। জাপানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তখন তিনি কোন মতামত দিচ্ছিলেন না। এদিকে নাম্বিয়ারের কিন্তু হতাশায় ডুবে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না—কেন না তিনি চোখের ওপর দেখছেন জার্মানীতে সমস্ত সংগঠন—তাঁর নিজস্ব সংগঠনও—তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ছে। আজাদ হিন্দ কেন্দ্র ও স্বেচ্ছাবাহিনীর ছিন্নভিন্ন টুকরোগুলো জার্মান বিপর্যয়ের মধ্যে তলিয়ে গেল এবং তাঁর জগৎ এসে ঠেকল গ্রাম, বাড়ি ও ঘরের মধ্যে, যেখান থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

১৯৪৩ সালে নাম্বিয়ার একটি চালু প্রতিষ্ঠান হাতে পেয়েছিলেন; তখনও তাঁর আশা ছিল শেষ পর্যন্ত জয়ী হওয়া যাবে। তিনি চটপট তাঁর কর্তৃত্ব

প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। আজাদ হিন্দ কেন্দ্র সহজেই তাঁর হাতে এসে গিয়েছিল; বেতার-প্রচার বাড়িয়ে দিনে দু ঘণ্টায় তিনি দাড় করিয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে ১৯৪৩ এর আগস্টে সরকারী জার্মান বেতার মারফত আমেরিকা ও আয়াল্যাণ্ডেও সাপ্তাহিক প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন। এপ্রিল মাসে স্বেচ্ছাবাহিনীর সৈন্যদের হল্যাণ্ডে পাঠানোর সময়ে স্বেচ্ছাবাহিনীতে যে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয়, সে ব্যাপারে নাম্বিয়ারের হস্তক্ষেপ কাযকরী হয়েছিল। অনেক চেষ্টা ক'রে তিনি প্যারিসে একটি আজাদ হিন্দ কেন্দ্র স্থাপন করেন ও বার্লিনে কেন্দ্রের কর্মীদের জন্যে জার্মানদের কাছ থেকে প্রচুর সুযোগ সুবিধা আদায় ক'রে দেন। আজাদ হিন্দ ডাকটিকিট ছাপানোর ব্যাপারে তিনি উদ্যোগ নেন। কিছু কিছু আজাদ হিন্দ মেডেল তৈরী করা হয়, তখনও জার্মানির অধিকাংশ ভারতীয়দের সঙ্গে থাকত বৃটিশ পরিচয়পত্র, তার বদলে আজাদ হিন্দ ছাড়পত্রের প্রবর্তন করা হ'ল।

জার্মানির ওপর বোমাবর্ষণ যখন চরম আকার ধারণ করল, তখন আজাদ হিন্দ কেন্দ্রের কাজে ক্রমশ ব্যাঘাত ঘটতে লাগল। ১৯৪০-এর আগস্টের শেষে বেতার বিভাগটি হিলভেরসামে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। যে বাড়িতে সাধারণ দপ্তর অবস্থিত ছিল, সেই বাড়িটি এবং নাম্বিয়ারের বাসস্থল বোমাবিধ্বস্ত হওয়ায় সাধারণ দপ্তরটিও হিলভেরসামে স্থানান্তরিত হল। সুভাষচন্দ্রের সরকারী প্রতিনিধি হিসেবে নাম্বিয়ার নিজে বার্লিনে থেকে গেলেন। ১৯৪৪-এর মার্চ মাসে অস্থায়ী সরকারের 'রাষ্ট্রীয় মন্ত্রী' নিযুক্ত হওয়ার পর তার বিনিময়ে একজন জার্মান রাষ্ট্রদূত নিয়োগের জন্যে তাঁকে চাপ দিতে বলা হয়। জার্মানরা রাজী ছিল, কিন্তু জাপানীরা আপত্তি করল; জাপানীরা তখন অক্ষশক্তির বড় অংশীদার ব'লে নিজেদের মনে করছিল জার্মানদের তুলনায় তাদের বড বড় জয় হচ্ছিল ব'লে নয়, তুলনায় ছোট ছোট হার হচ্ছিল ব'লে।

সুভাষচন্দ্র নাম্বিয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন সাবমেরিন কিম্বা জাপানী কূটনৈতিক-ঝোলা মারফত চিঠি লিখে, কালেভদ্রে আফগানিস্থানের গোপন বেতার মারফত খবর পাঠিয়ে এবং কখনও কখনও রেডিও-টেলিফোনে কথাবার্তা ব'লে। জার্মানি থেকে বেতারে যে প্রচার হত, সে সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র খুবই খুঁতখুঁতে ছিলেন; সর্বদা তিনি চেষ্টা

করতেন যাতে তারা তাদের মন তাজা রাখে, ভারতবর্ষের ঘটনাবলীর সুরে সুর মিলিয়ে চলে—সেই ঘটনাবলী সম্পর্কে তাদের তিনি তাঁর নিজস্ব ভাষ্য যোগাতেন। জনে জনে ধ'রে তিনি খুঁটিয়ে সমালোচনা করতেন : অমুক বক্তার কণ্ঠস্বর আরও ভাল হওয়া উচিত, অমুক ঘোষককে সরিয়ে অন্য কোন অনুষ্ঠানে লাগানো হোক : অভিযানের লক্ষ্য এখনও দিল্লী, যেন একটুও সুর নরম করা না হয়। তিনি তাঁর নিজের অগ্রগতির খবরাখবর নিয়মিত ভাবে নাম্বিয়ারকে সরবরাহ করতেন এবং দূর-প্রাচ্যের বেতার-প্রচার রেডিওতে ধ'রে জার্মানরা তার বিবরণ যোগাত।

মিত্রশক্তির অগ্রগতির ফলে ১৯৪৪-এর সেপ্টেম্বরে আজাদ হিন্দ কেন্দ্র অগত্যা পশ্চিম জার্মানির হেল্‌মস্টেডে সরিয়ে ফেলতে হল। বেতার প্রচার যাতে অক্ষুণ্ণভাবে চালিয়ে যাওয়া যায়, সেদিকে দৃষ্টি রেখে অপসারণের কাজ অবকাশ বুঝে করা হল।

মাত্র ১৯৪৩-এর আগস্ট পর্যন্ত ভারতীয় স্বেচ্ছাবাহিনী হল্যাণ্ডে ছিল, তারপর এই বাহিনীকে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে প্রথমে এর তিনটি ব্যাটালিয়নকে বোর্দো-র উপকূল রক্ষার জন্যে তিন জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়। যখন আরও জার্মান সৈন্য এসে পড়ল, তখন স্বেচ্ছাবাহিনীর সৈন্যদের একত্র ক'রে তাদের ওপর জিরোন্দ্ খাড়ি ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী উপদ্বীপ রক্ষার ভার দেওয়া হল। হল্যাণ্ডের চেয়ে কষ্ট কম, জার্মানির মত অত কনকনে ঠাণ্ডা নয় এবং রেড ক্রশ-এর পার্শেল পুরো পাওয়া যায়—কাজেই ভারতীয়দের এখানে এসে ভাল লাগল। জার্মান ইউনিটগুলোর সঙ্গে সমবেত ভাবে ট্রেনিং, চাঁদমারি ও আরও নানা বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা হল। স্বেচ্ছাবাহিনীর হকি দল স্থানীয়ভাবে বহু খেলায় জেতার পর বার্লিনে একটি শক্তিশালী জার্মান মিলিটারি টিমকে হারিয়ে দিল। ১৯৪৩-এর অক্টোবরে প্রথম একদল ভারতীয় অফিসার-পদে উন্নীত হল। রণকৌশল ও আদবকায়দা সংক্রান্ত প্রাথমিক শিক্ষা তাদের দেওয়া হল; জার্মান অফিসারদের তরফ থেকে ভাই-ভাই ভাব সযত্নে দেখানো হতে লাগল এবং জার্মান এন-সি-ও'রা নিষ্ঠার সঙ্গে কুর্নিশ ঠুকতে লাগল। ভারতীয় অফিসাররা খাতিরটাকে সত্যিকার ব'লে মনে করল : ভারতবর্ষ এর মর্ম বুঝবে এবং বাহবা দেবে।

এই কিন্তু সব নয়। সুভাষচন্দ্র জার্মানি ছেড়ে যাবার পর স্বেচ্ছাবাহিনীর কাজের গোটা ভিত্তিই গেল বদলে। সুভাষচন্দ্র বাহিনীর লোকদের বলেছিলেন যে, বৃটিশদের বিরুদ্ধে তাদের লড়তে হবে ভারতবর্ষে কিংবা বড়জোর, উত্তর আফ্রিকায়। যাবার আগে নাম্বিয়ারকে তিনি শুধু ব'লে গিয়েছিলেন স্বেচ্ছাবাহিনীকে যেন বৃটিশ-ভারতীয় সৈন্যদের বিরুদ্ধে লাগানো হয়। স্বেচ্ছাবাহিনীর লোকজন নীতি পরিবর্তনের প্রথম লক্ষণ বুঝতে পারল যখন তাদের ওপর হল্যাণ্ড যাবার হুকুম হল। নাম্বিয়ার ব্যাপারটা এইভাবে ব্যাখ্যা করলেন যে, 'উপকূল রক্ষার ট্রেনিং' দেওয়া হবে। কিন্তু এ ব্যাপার চুকে যাবার আগেই সৈন্যরা এমন বেঁকে বসল যে, তার ঠেকাবার মুরোদ হল না। পশ্চিমী প্রাচীরের প্রান্তবর্তী দেশ ফ্রান্সে এসেও অচিরে এই ভণ্ডামির মুখোশ খুলে গেল এবং স্বেচ্ছাবাহিনীর সৈন্যদের মধ্যে বিপদের আশঙ্কা ও একটা গা-ছাড়া ভাব দেখা দিল। বিরুদ্ধ প্রচার ও অসন্তোষ মাথা তুলে দাড়াল। স্বেচ্ছাবাহিনীর সৈন্যেরা তাদের ফরাসী বন্ধুদের বাড়িতে গিয়ে রেডিওতে বি. বি. সি'র খবর শুনতে লাগল। জার্মান অফিসারদের মধ্যে অন্তত একজন ছিল নাৎসাবিরোধী, সে সচেতনভাবে অন্তর্ঘাতী কাযকলাপ চালাচ্ছিল। ভারতীয়দের ধ'রে ধ'রে সে জিজ্ঞেস করত 'স্বেচ্ছাবাহিনীতে তুমি আছ কি জন্যে? বৃটিশের হাতে যখন পড়বে, তখন করবে কী?' ফরাসী প্রতিরোধ আন্দোলনের লোকজনদের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ার ফলে কিছু ভারতীয় সৈন্য পালিয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিল, তবে স্বেচ্ছাবাহিনীর দিক থেকে ঠিক এই মুহূর্তে সরাসরিভাবে বিদ্রোহ করলে খুবই বিপদ ঘটতে পারত।

এর প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে দেখা গেল, ১৯৪৪-এর প্রথমার্ধে ভারতীয়-জার্মান সম্বন্ধের অবনতি ঘটেছে। মার্চ মাসে যখন এই ব'লে সতর্ক ক'রে দেওয়া হল যে, মিত্রপক্ষের আক্রমণ আসন্ন—স্বেচ্ছাবাহিনীর মনোবল দ্রুত ভেঙে গেল। প্রয়োজনের সময় যাতে আশ্রয় মেলে তার জন্যে ফরাসীদের সঙ্গে আরও বেশী ভাব করবার চেষ্টা হল। ভারতীয় এন. সি. ও'রা ছুতোয় নাতায় হল্লা বাধাতে লাগল; জার্মান অফিসাররা বুঝতেই পারছিল না তলে তলে কী ঘটছে—তারা কোনরকম কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সাহস পেল না। এপ্রিল মাসে রোমেল এল রক্ষাব্যবস্থা পরিদর্শন করতে এবং মে মাসে

নাম্বিয়ারকে ডেকে পাঠানো হল। নাম্বিয়ার এসে দেখলেন স্বেচ্ছাবাহিনীর লোকজনেরা মুষড়ে পড়েছে, একদিকে বর্ণবৈষম্য আর অন্যদিকে ভারতীয়দের পদোন্নতিতে গড়িমসির ব্যাপারে তাদের পুঞ্জীভূত অভিযোগ। তাঁর মনে হল, যুদ্ধপরিস্থিতি অংশত এর জন্যে দায়ী, লড়াইতে নেমে পড়লেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ক্র্যাপ্ কিংবা তার ওপরওয়ালারা কেউই স্বেচ্ছাবাহিনীকে লড়াইতে নিতে রাজী ছিল না, তবে চাপে প'ড়ে তারা পরীক্ষা ক'রে দেখতে শেষ পর্যন্ত রাজী হল : মে মাসের শেষে শুধু ৯নং কোম্পানীকে তারা ইতালীতে পাঠিয়ে দিল।

স্বেচ্ছাবাহিনী থেকে কোন সৈন্যদলকে ইতালীতে পাঠানো এই প্রথম নয়। রণক্ষেত্রে সম্মুখপ্রচারের কাজ নিয়ে এর আগেই দশজনের একটি দল ১৯৪৪-এর জানুয়ারীতে এবং আরও কম লোকের একটি দল মে মাসে নাশকতামূলক কাজের জন্যে ইতালীতে গিয়েছিল। বেতারে প্রচার করা, ভারতীয় সৈন্যদের এলাকায় ছড়িয়ে দেবার জন্যে ইস্তাহারের বাণ্ডিল তৈরি করা এবং জার্মানদের হয়ে পলাতক বৃটিশ ও ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের খুঁজে বার করা—এইসব কাজে প্রথম দলটিকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। যুদ্ধবন্দীদের খুঁজে বার করবার কাজটি তাদের চালিয়ে যেতে হয়েছিল যতদিন যুদ্ধ চলেছিল প্রায় ততদিন। দ্বিতীয় দলটির ওপর ভার পড়েছিল যুধ্যমান ভারতীয় সেপাইদের ভাঙিয়ে আনবার ; বর্মায় বনজঙ্গলের সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সেখানে কদাচিৎ সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে—আর পর্বতসঙ্কুল ইতালীতে সে কাজ তো প্রায় অসম্ভব ছিল। বার তিনেক দায়-সারাগোছের চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু কোন ফল হয়নি ; ১৯৪৫-এর গোড়ার দিকে দলটিকে স্বেচ্ছাবাহিনীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

৯নং কোম্পানীর কাহিনী দু কথায় সেরে দেওয়া যায়। এই সৈন্যদলকে পোলদের বিরুদ্ধে লড়তে পাঠানো হয় : শত্রুপক্ষের অবস্থান জানবার জন্যে প্রথম যে দলটিকে পাঠানো হয়, তারা দলত্যাগ করে ; এরপর গোটা কোম্পানী এই ব'লে বেঁকে বসে যে, পোলদের সঙ্গে যুদ্ধ করা তাদের চুক্তির মধ্যে পড়ে না। জার্মানরা তখন ৯নং কোম্পানীকে সরিয়ে স্বেচ্ছাবাহিনীতে ফিরিয়ে আনে।

ইতিমধ্যে ১৯৪৪-এর জুন মাসে মিত্রপক্ষ ফ্রান্স আক্রমণ করায়

স্বেচ্ছাবাহিনীর মোটা অংশ এই প্রথম লড়াই করবার সুযোগ পেল। আক্রমণ-অঞ্চল ভেদ ক'রে এগোতে মিত্রপক্ষের সাত সপ্তাহ লেগে গেল, এই সময়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ স্বেচ্ছাবাহিনী উপকূলে মোতায়েন থাকল। এরপর জুলাইয়ের শেষাশেষি বোর্দো-র চারপাশে ফরাসী প্রতিরোধ বাহিনীকে ঠেকাবার কাজে জার্মান সৈন্যদের সঙ্গে স্বেচ্ছাবাহিনীকে নিয়োগ করা হল। অস্ত্রাগার ও সন্দেহজনক বিতরণকেন্দ্রে তারা হানা দিতে লাগল, এই সমস্ত ক্ষেত্রে আচরণের দিক থেকে ভারতীয়দের সঙ্গে তাদের জার্মান সঙ্গী-সাথীদের বেশ মিল দেখা গেল, এবং তার ফলে জার্মানদের মতই তাদেরও কলঙ্কভাগী হতে হল। এরপর মিত্রশক্তি যখন ফ্রান্সের ওপর দিয়ে ঝঞ্ঝাবেগে অগ্রসর হতে লাগল। তখন পথ ও রেলযোগে ১১ই আগস্ট শুরু হল জার্মানিতে স্বেচ্ছাবাহিনীর ধীরগতিতে পশ্চাদপসরণ। মার্কিণ সপ্তম বাহিনী পৌঁছুবার পূর্বমুহূর্তে স্বেচ্ছাবাহিনী বেলফোর্ট গিরিসঙ্কট পার হয় এবং ষ্ট্রাসবুর্গের উত্তর-পশ্চিমে হাগেনাউতে এসে আবার দলবদ্ধ হয়।

পশ্চাদপসরণ করবার সময় স্বেচ্ছাবাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির সংখ্যা দাঁড়াল কয়েকশো, তার মধ্যে প্রায় আড়াইশো ছিল দলত্যাগী। মার্কিণ ট্যাঙ্কের আক্রমণ ঠেকাতে গিয়ে পশ্চাদ্ভাগের কিছু সৈন্য নিহত হয়, তার চেয়েও বেশী হত হয় ফরাসী গেরিলা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে। স্বেচ্ছাবাহিনীর সৈন্যেরা ফরাসীদের ওপর যে দুর্ব্যবহার করেছিল পশ্চাদপসরণের সময় তার শোধ নেওয়া হয়, ফলে বিস্তর ভারতীয় প্রাণ হারায়। অন্যেরা দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে ফরাসী বন্ধুদের সঙ্গে থেকে যায়, তাদের মধ্যে অনেকে ফরাসী গেরিলা দলে যোগ দিয়ে শৌর্যবীর্যের পরিচয় দেয়।

সেপ্টেম্বরে জার্মানরা স্বেচ্ছাবাহিনীর সৈন্যদের ওয়াফেন অথবা সশস্ত্র এস-এস দলের সঙ্গে ভিড়িয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিল। ওপরওয়ালাদের ক্র্যাপ আগেই জানিয়ে দিয়েছিল যে, এ ধরনের কিছু করলে গণ্ডগোল দেখা দেবে, ক্র্যাপ ঠিকই বলেছিল। স্বেচ্ছাবাহিনীর সৈন্যেরা মনে করল এবার বোধহয় প্রকৃতপক্ষেই তাদের লড়াই করতে পাঠানো হবে এবং জার্মান কর্মকর্তাদের সংখ্যা বাড়বে। যখন এস্-এস দলের পোশাক এসে গেল, তখন আগের মতই অবাধ্যতা দেখা দিল এবং লোকজনদের বুঝিয়ে শান্ত করবার জন্যে নাম্বিয়ারকে প্রতিনিধি পাঠাতে হল। রাইন নদী পার হয়ে

ওবেরহোফেনে যাবার সময় স্বেচ্ছাবাহিনীর সৈন্যদের সঙ্গে নাম্বিয়ারের প্রতিনিধির দেখা হল: তারা তখন সন্ত্রস্ত হয়ে আছে এবং তাদের মধ্যে আবার সেই খুঁতখুঁতে ভাব দেখা গেল; তাদের একটি অভিযোগ হল, ফ্রান্স থেকে তারা যেসব মনের মত জিনিসপত্র হাতিয়ে এনেছিল জার্মানরা তা বাজেয়াপ্ত ক'রে নিচ্ছে।

ওবেরহোফেনে এসে স্বেচ্ছাবাহিনী আবার খুশী হয়ে জমে বসল, কেন না স্বেচ্ছাবাহিনীর পুরনো ব্যাজ বজায় রইল, এস্-এস্ দলের পোশাক সংক্রান্ত অন্যান্য প্রশ্নে রেহাই পাওয়া গেল। পদোন্নতির নতুন ক'রে প্রতিশ্রুতি মিলল এবং অবশিষ্ট ২,৪৫০ জন সৈন্যের মধ্যে ১,১০০ জন পদক পুরস্কার পেল। সুভাষচন্দ্র আবারও লিখেছিলেন যেন স্বেচ্ছাবাহিনীকে যুদ্ধ করতে পাঠানো হয়। নভেম্বরে স্বেচ্ছাবাহিনীকে উত্তর ইতালীতে পাঠাবার কথা ছিল, কিন্তু হিমলার তা বরবাদ ক'রে ডিসেম্বরে স্বেচ্ছাবাহিনীকে হিউবের্গ অভিমুখে রওনা করিয়ে দেয়। মনে রাখা দরকার, স্বেচ্ছাবাহিনীকে পাঠানো হল সেই 'জাতীয় দুর্গ' অভিমুখে, যেখানে হিটলার একদা তাঁর এস্-এস ও বিদেশী সৈন্যদল নিয়ে শেষ রক্তবিন্দু দিয়া লড়বার পরিকল্পনা করেছিলেন। এখানে ১৯৪৫-এর এপ্রিলে ফরাসী সৈন্যেরা এসে পড়ায় স্বেচ্ছাবাহিনী ভেঙে চুরমার হল। সৈন্যদের মধ্যে অনেকে সুইজারল্যাণ্ডে পালিয়ে গেল, অনেকে ফরাসীদের কাছে ধরা দিল এবং কেউ কেউ সাময়িকভাবে গা ঢাকা দিল। জুলাইয়ের গোড়ায় ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ স্বেচ্ছাবাহিনীর ৩,১১৫ জন সৈন্যের মধ্যে মাত্র শ'দুই লোকের পাত্তা করতে পারল।

ইউরোপস্থ ভারতীয় রাজনৈতিক শরণার্থীদের গ্রহণ করতে রাশিয়া রাজী আছে কিনা জানবার জন্যে সুভাষচন্দ্র ১৯৪৪-এর শেষে নাম্বিয়ারকে উৎসাহিত করলেন। এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করতে জার্মানরা অক্ষম, জাপানীরা অনিচ্ছুক; সুতরাং এ প্রশ্ন তাঁর নিজের পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। ১৯৪৫-এর ফেব্রুয়ারী ও মার্চে আজাদ হিন্দ কেন্দ্রের ভারতীয়েরা রুশদের কাছে আত্মসমর্পণ করবার কথা ভেবেছিল। কিন্তু তখন অবস্থা খুব ঘোরালো হয়ে পড়ায় শেষ পর্যন্ত কেউই সে চেষ্টা করেনি। ১২ই এপ্রিল মার্কিণরা হেল্‌ম্‌স্টেডে পৌঁছায়; তার এক সপ্তাহ আগে কেন্দ্রের কর্মীরা নানা দিকে ছিট্‌কে পড়ে। অষ্ট্রীয়ার বাডগাস্টেইনে নাম্বিয়ার সুভাষচন্দ্রের কাছ থেকে

শেষ চিঠি পেলেন। তাতে সুভাষচন্দ্র বলেছেন যে, স্বেচ্ছাবাহিনীকে যদি যুদ্ধে পাঠানো না যায় তাহলে যেন এমন কোন অঞ্চলে পাঠানো হয় যেখানে তারা বৃটিশের বদলে রুশদের হাতে পড়বে। কিন্তু এখন যা হবার হয়ে গেছে। কয়েকজন মাত্র পালাতে পারল, ভারতবর্ষ নিরাপদ হওয়ার পর কিছু লোক সেখানে আত্মপ্রকাশ করল; কিছু লোক নিঃসন্দেহে লৌহ যবনিকার ওপারে গিয়ে বাঁচলো কিংবা মৃত্যু বরণ করল।

রেঙ্গুণ থেকে শ্যাম। দীর্ঘ কষ্টকর পথ। দেখতে পাই, সুভাষচন্দ্র সারা পথ বলতে বলতে চলেছেন এমন কি তিনিও এরপর রাশিয়ার আশ্রয়প্রার্থী হবেন। বিষাদে ভারাক্রান্ত তার মন; তিনি চান সর্বদা কাজের মধ্যে মগ্ন থাকতে—তাঁর সে চাহিদা পূরণ হয় সঙ্গীসাথীদের সযত্ন তত্ত্বাবধানের ভেতর দিয়ে। ছোট দল; মোট একুশটি গাড়ি। চতুর্দশ বাহিনী গিয়ে পড়বার ঠিক আগের দিন সকালে পুরো দলটি নির্বিঘ্নে মলমেয়াক্তি রোডে পৌছেছিল, কিন্তু তিন চার দিন বাদে সিটাং নদী পার হওয়ার পর দেখা গেল দুটি মাত্র টাক টিঁকে আছে—বাকি সমস্তই হয় বিমান আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়েছে, নয় পাঁকের মধ্যে এমনভাবে আটকে গেছে যে শেষ পর্যন্ত ফেলে চলে আসতে হয়েছে।

অন্ধকার নামলেই শুরু হয় পলাতকদের যাত্রা। ভোর হলেই তারা এমন একটা আত্মগোপনের নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে, যেখানে সারাটা দিন তারা কাটাতে পারে। পানীয় জল আছে তো? খাবার দাবার? যান-বাহনগুলো যথেষ্ট দূরে দূরে লুকিয়ে রাখা আছে তো? যখনই কোথাও এসে বিশ্রাম নেওয়া হত সুভাষচন্দ্র দলের লোকজনদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে এইসব ব্যাপারে খোঁজখবর নিতেন, লোক গণনা করতেন; পায়ে ফোস্কা প'ড়ে যাদের ঘা হয়েছে ও যারা অসুস্থ তাদের শুশ্রূষার ব্যবস্থা করতেন এবং যাদের অবস্থা খুবই কাহিল হয়ে পড়ত, লরীতে শুধু তাদেরই তোলা হত। ফেরাতে নদী পার হবার সময় সুভাষচন্দ্র নিজে দাঁড়িয়ে থেকে নির্দেশ দিতেন, ওপারে গাড়িগুলো যাতে নির্বিঘ্নে পৌছুতে পারে তার জন্যে সুভাষচন্দ্র নিজ হাতে মেহনত করতেন। হতাহতের সংখ্যা খুবই সামান্য, ভারতীয়দের দলে মাত্র একজন নিহত হয়। তবে প্রায় সমস্ত লটবহর, সরকারী ফাইলপত্র ও দলিল দস্তাবেজ হারাতে হল।

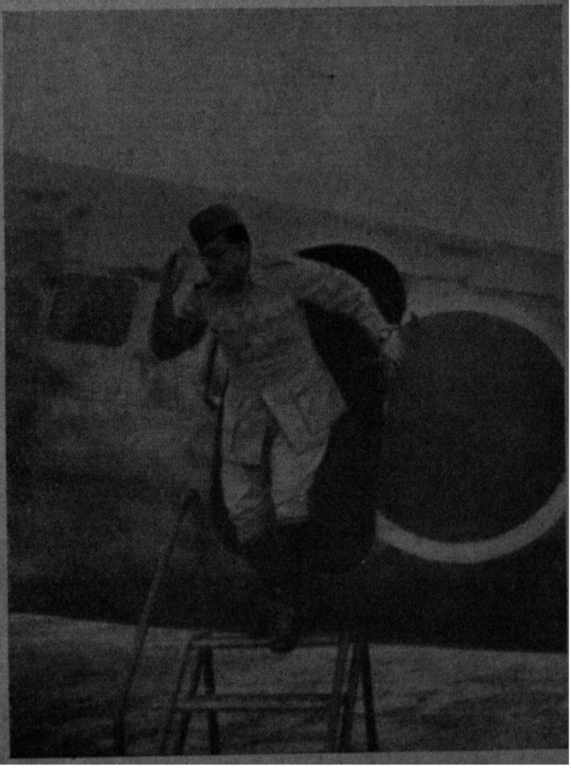
সিটাং নদীতে পৌঁছুবার আগে শেষ দশ মাইল রাস্তা সুভাষচন্দ্রকে পায়ে হাঁটতে হয়। নদীর পূর্বদিকে দীর্ঘ তিন রাত্রি ধ'রে পাড়ি দেবার পর জাপানীরা যথেষ্ট সংখ্যক লরীর ব্যবস্থা করল, ফলে, তখন লরীর পিঠে পুরো দলটির জায়গা হল। যতক্ষণ দলের একটি লোকও হাঁটছে, ততক্ষণ কিছুতেই লরীতে চড়বেন না: হাঁটা পথে সহযাত্রী একজন জাপানীর ওপর তম্বি ক'রে তিনি বলেছিলেন, 'আমাকে কী ভেবেছ? আমি কি বর্মার বা ম যে, দলের লোকজনকে ফেলে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ছুটব?' কখনও কখনও কঠিন অবস্থার মধ্যে প'ড়ে সুভাষচন্দ্রের মেজাজ ঠিক থাকত না—ভারতীয় সঙ্গীসাথীদের কাণ্ড কারখানা দেখে তিনি ক্ষেপে যেতেন। কিন্তু তেমন ঘটনা কালেভদ্রে ঘটত, তাঁর ক্লান্তিহীনতা, সকলের সঙ্গে দুঃখ ভাগ ক'রে নেবার ক্ষমতা এবং ব্যক্তিগত সাহস দেখে তারা সবাই মুগ্ধ হত।

মলমেয়াঞ্জিতে পৌঁছুতে ১রা মে হল। এখানে কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে দলের অর্ধেক লোক রওয়ানা হল ট্রেণে, অর্ধেক লোক মোটরে। রেলপথে যেতে কম কষ্ট পেতে হয়নি: ট্রেণ চলে শুধু রাত্রে, তাও খুব আস্তে আস্তে। দলের লোকজনদের গাড়িতে উঠিয়ে দেবার পর সুভাষচন্দ্র নিজেও রওনা হলেন—ব্যাঙ্ককের পথে বিভিন্ন ঘাটিতে থেমে দলের লোকজনদের সঙ্গে তিনি দেখাসাক্ষাৎ করলেন। ১৫ই মে শ্যামের রাজধানীতে পৌঁছে বর্মা প্রত্যাগত সৈন্যদের অভ্যর্থনার আয়োজন করলেন এবং তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের একত্রিত করলেন।

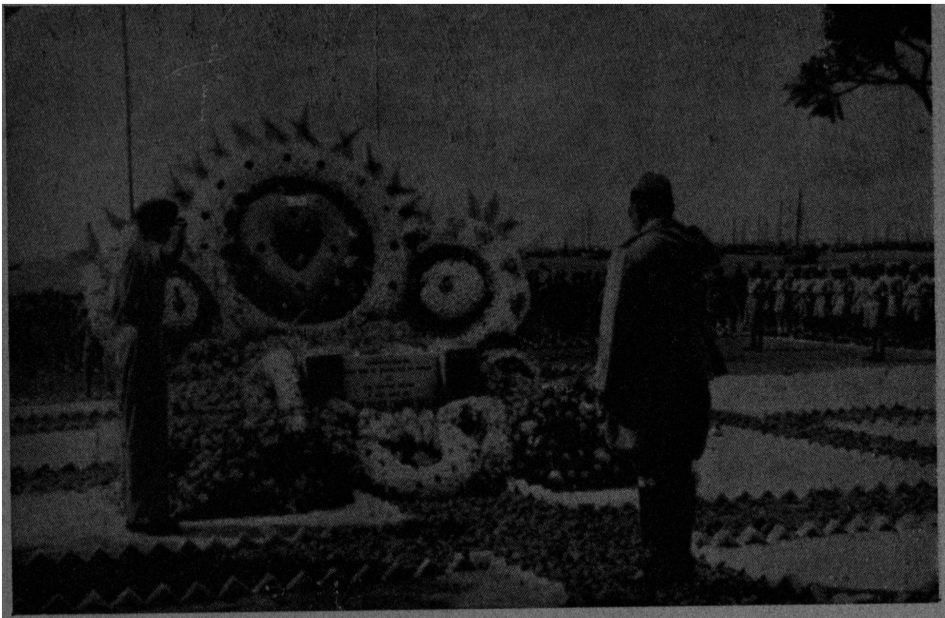
অক্ষশক্তির পরাজয়ের গভীর তাৎপর্য সম্পর্কে এখন ভাল ক'রে ভেবে দেখতে হবে। সুভাষচন্দ্র তখনও বলছেন যে, জাপানীরা সামলে নিতে পারবে, তাছাড়া যত যাই হোক, এখনও প্রচুর সময় ও প্রচুর জায়গা পড়ে আছে। সরাসরি জাপানে আক্রমণ না হলে জাপানকে কাবু করা যাবে না, প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় মার্কিণরা এগোচ্ছে বটে, তবে জাপান এখনও ঢের দূর। সুভাষচন্দ্রের মতে জাপানের উচিত ছড়ানো ছিটানো সৈন্যদের এক জায়গায় জড়ো ক'রে আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করা। জাভা ইত্যাদি জায়গায় সৈন্য রাখা হোক শুধুমাত্র ঠেকো দেবার জন্যে এবং আসল বল চীন ও জাপানে কেন্দ্রীভূত করা হোক। তিনি দেখতে পেলেন মালয়ের বিপদ আসন্ন, শ্যামে তখন বর্মাপ্রত্যাগত আজাদ হিন্দ ফৌজের অবশিষ্ট যে ১,৩০০



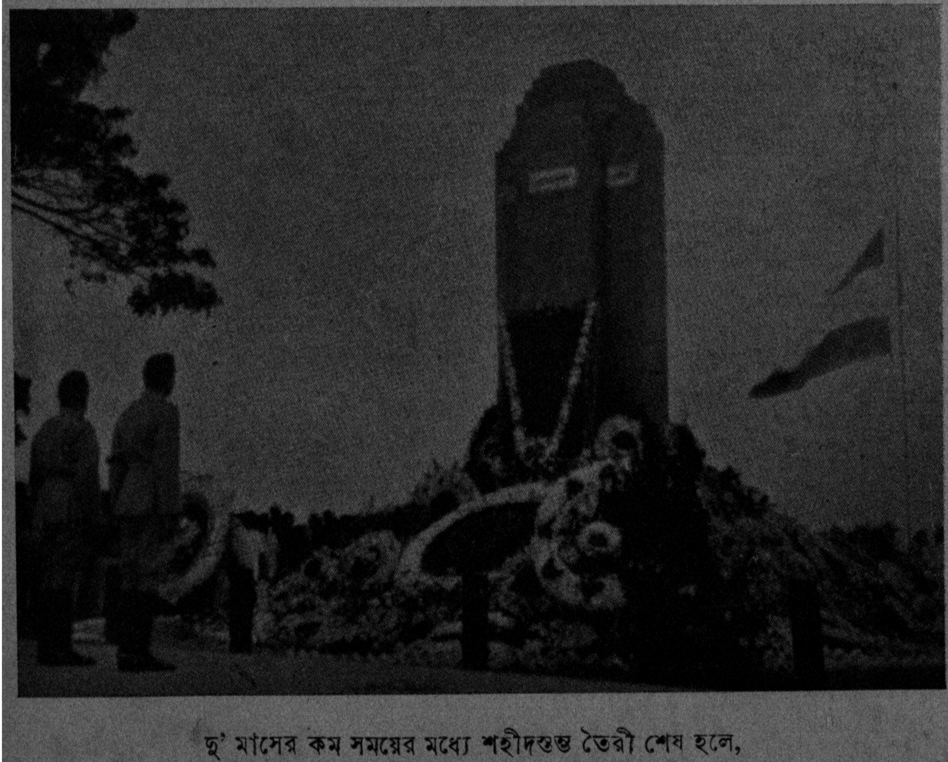
'ভারত-জাপ মিতালি' ঃ মূল ছবি
আই-এন-এ'র সিঙ্গাপুরস্থ সদর
ঘাঁটিতে রক্ষিত



সুভাষচন্দ্রের সিঙ্গাপুরে আগমন
জুন, ১৯৪৫



সুভাষচন্দ্র কর্তৃক সিঙ্গাপুরে আই-এন-এ শহীদ স্তম্ভের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন



দু' মাসের কম সময়ের মধ্যে শহীদস্তম্ভ তৈরী শেষ হলে,
এবার সেখানে স্বয়ং সুভাষচন্দ্রের উদ্দেশ্যেই স্মৃতিতর্পণ

সৈন্য এসে জড়ো হচ্ছিল, কিছুদিনের মধ্যেই পিছু হটে তাদের সঙ্গে এসে মিলবে ৩য় আই-এন-এ ডিভিশন।

তবে মিত্রপক্ষের আঘাতে যদি জাপানীদের প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে, ভবিষ্যৎ ভাবলে, তাহলে রাশিয়াই তাঁর একমাত্র ভরসাস্থল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম অবশ্য চলতে থাকবে: বাইরে থেকে তখনও ভারতবর্ষের পক্ষে সাহায্য দরকার হবে। সুভাষচন্দ্র বুঝলেন পশ্চিমের প্রতি রাশিয়া মূলত বৈরিভাব পোষণ করে এবং পূর্ব এশিয়ায় রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান প্রভাবও তাঁর নজরে পড়ল—এই এলাকার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে রাশিয়া যুদ্ধের আগেই অংশত প্রবেশ করেছিল। এমন কি মস্কোয় তাঁর পক্ষে হয়ত তাঁর অস্থায়ী সরকার বজায় রাখাও সম্ভব হবে, ইঙ্গ-মার্কিণদের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক কত তাড়াতাড়ি ও কত প্রকাশ্যে ফাটল ধরে তার ওপর অনেকটা নির্ভর করবে। কিন্তু সম-সমৃদ্ধি অঞ্চলে রাশিয়ার প্রভাব দেখে জাপানীদের চোখ টাটাত, তারা টোকিওতে সুভাষচন্দ্রকে কখনই রুশদের কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। রুশদের সঙ্গে যুদ্ধের বিপদ ঘনিয়ে আসছে; এ সময়ে কিছু বললে হয়ত জাপানীরা অল্পেতেই ক্ষেপে উঠতে পারে—কাজেই এখন তাঁকে খুব সাবধানে এগোতে হবে। সুতরাং জাপানী রক্ষাব্যবস্থার মধ্যেকার চক্রের কথা তুলে জুন মাসে সুভাষচন্দ্র প্রস্তাব করলেন যে, তাঁকে মাঞ্চুরিয়ায় সেই চক্রের মধ্যে একটি 'নিরাপদে রক্ষিত' সরকার গঠন করতে দেওয়া হোক। তিনি ভাবলেন যদি তারা এই প্রস্তাবে রাজী হয়, তাহলে তিনি নিশ্চিতভাবে একটানা কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন এবং শেষ পর্যন্ত এমন কি জাপানীদেরও রুখতে পারবেন, যখন দেখা যাবে আর উপায় নেই, তখন রুশ এলাকায় পালিয়ে যাওয়া যাবে। জাপানীরা এ প্রস্তাবে আপত্তি জানাল।

ইতিমধ্যে ১৯৪৫-এর ২১শে মে ব্যাঙ্ককে তিনি একটি বক্তৃতা দিলেন, এই বক্তৃতায় মস্কোর প্রতি প্রচ্ছন্ন আবেদন ছিল। তিনি বললেন যে, সানফ্রান্সিসকোতে রুশদের সঙ্গে পশ্চিমীদের গণ্ডগোল এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে:

> আর কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের শত্রুপক্ষের মালুম হবে যে, জার্মানিকে উৎখাত করতে সমর্থ হলেও পরোক্ষভাবে তারা ইউরোপীয়

> রাজনীতির ক্ষেত্রে অন্য একটি শক্তির পথ প্রশস্ত করেছে ; সে শক্তি হল সোভিয়েট রাশিয়া। বৃটিশ ও মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের দিক থেকে সোভিয়েট রাশিয়া জার্মানির চেয়েও বড় বিঘ্ন হিসেবে দেখা দিতে পারে। অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সাগ্রহে লক্ষ্য করতে থাকবে এবং এই অবস্থার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করবার চেষ্টা করবে। আমাদের বৈদেশিক নীতির বরাবরের মূলসূত্র হল—বৃটিশের **শত্রু যে, ভারতের বন্ধু সে: এই মূল নীতিতে আমরা অবিচলিত থাকব।**

সুভাষচন্দ্র মনে করলেন—বৃটেনের প্রতি বৈরিতার জোরে রাশিয়া যেহেতু ভারতের বন্ধুপদবাচ্য, সেই জন্যে সে সহজেই ধরতে পারবে তার কাছ থেকে কী আশা করা হচ্ছে।

ব্যাঙ্ককে এসে অস্থায়ী সরকারের আবার নিদারুণ আর্থিক অনটন দেখা দিল। বর্মায় সরবরাহের জন্যে শ্যামস্থ লীগকে বহু টাকা খরচ করতে হয়েছে ; দলে দলে এখন সৈন্য আসছে, তার ওপর নতুন ক'রে অস্থায়ী সরকারের পত্তন করতে হচ্ছে—লীগের তহবিলের যা অবস্থা, তাতে এই বিরাট খরচ মেটানো সম্ভব নয়। রাঘবনকে বলা হল সিঙ্গাপুর থেকে যথাসর্বস্ব তুলে নিয়ে চলে আসতে, শ্যামের সরকারের কাছ থেকে আয়ার কর্জ নেবার চেষ্টা করলেন, চ্যাটার্জীকে টাকা তোলার জন্যে সাইগনে পাঠানো হল এবং সহায়কে একই উদ্দেশ্যে হ্যানয়ে পাঠানো হল। মন্ত্রিসভার আসল লোকদের এইভাবে ছড়িয়ে দেবার দ্বিতীয় একটি মতলব ছিল। এরপর জাপানী অধিকৃত এশিয়ার কোন্ জায়গায় যে মিত্রপক্ষ ঘা দেবে কেউ বলতে পারে না। সুভাষচন্দ্র চাইছিলেন মন্ত্রিসভার সবাই যাতে একসঙ্গে ধরা না পড়ে এবং মিত্র পক্ষ যেখানেই আক্রমণ করুক সেখানে যাতে ভারতীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ কিছুটা রক্ষিত হয়। অন্যদের মালয়ে ও শ্যামে সেই দায়িত্ব দেওয়া হল।

ব্যাঙ্কক থেকে বেতার-বক্তৃতায় সুভাষচন্দ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের আবার দ্বিগুণ উৎসাহে উঠে পড়ে লাগবার জন্যে আহ্বান জানালেন। বললেন, 'ইম্ফল হয়ে দিল্লী যাওয়া যদি নাও ঘটে, আমরা দিল্লী যাবোই।' সম্পূর্ণ মার্কিণ খুঁটির জোরেই এখন বৃটেন কোন মতে দাঁড়িয়ে

আছে, ভারতবর্ষের মধ্যেই জনমত পাল্‌টাচ্ছে, এমন কি ভারতীয় সেনাবাহিনীর 'বেশ বড় অংশ মনে প্রাণে আই-এন-এ'র প্রতি সহানুভূতিশীল।' বর্মায় এসে আরও বেশী লোক সহানুভূতিশীল হবে: কেননা তারা বুঝবে এতদিন তাদের যা বলে আসা হয়েছিল, তা সত্যি নয়—আজাদ হিন্দ ফৌজ মোটেই হাতের পুতুল নয়; তারা দেখবে ভারতীয়েরা অবাধে 'জয়হিন্দ' ব'লে পরস্পরকে সম্ভাষণ জানাচ্ছে এবং অবাধে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হচ্ছে। তিনি রেঙ্গুণের ভারতীয়দের পষ্ট পষ্ট ক'রে ব'লে দিয়েছিলেন তারা যেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে মেলামেশা করে এবং 'প্রশংসনীয়ভাবে কাজ চালিয়ে যায়।' তারা তা করবে—আর আই-এন-এ সৈন্যেরা বন্দী হিসাবে তাতে সহায় হবে; বৃটিশের সাধ্য হ'বে না তাদের ওপর দুর্ব্যবহার করবার অথবা তাদের মুখ বন্ধ করবার—যদি তা করে তাহলে তার শোধ নেওয়া হবে ব'লে আগেই তিনি ভয় দেখিয়ে রেখেছেন।[১] বর্মার পরাজয় এক হিসেবে হবে ভগবানের আশীর্বাদ:

> এটা যেন কথার কথা কিংবা প্রচার ব'লে কেউ মনে না করে। এটা সহজ শাদা কথা। এর সত্যতায় যদি সন্দেহ থাকে, অপেক্ষা করলেই চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হবে। ইতিহাসের গতি, বিধির বিধানের মতই—অনেক সময়ে রহস্যময়। ...আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার জন্যে এটাই হয়ত দরকার ছিল যে, বৃটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনী বর্মায় এসে আজাদ হিন্দ ফৌজকে দেখতে পাবে।...বৃটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনী এখন আমাদের চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছে। ফলে কী হয়েছে? এখন আর ক্রীড়নক বাহিনী—জাপ-ভারতীয়-সৈন্যদল বা সংক্ষেপে জে. আই. এফ.—ইত্যাদি কথা শোনা যাচ্ছে না। এমন কি শত্রুপক্ষের প্রচারকেরাও এতদিন পরে আজ আই-এন-এ'র নামোচ্চারণ করছে...[২]

সুভাষচন্দ্র অনর্গল ব'লে চললেন: অতলান্তিকের ওপার থেকে

১ পরিশিষ্ট ২, ১২ নং

২ অন টুইথ 'দি ফাইট', ১০পৃ:

ইউরোপকে বাগে রাখা আমেরিকার পক্ষে কখনই সম্ভব নয়; ইউরোপে ক্ষমতার লড়াই চালানো বৃটেনের পক্ষে আর সম্ভব নয়। বৃটেন কিংবা আমেরিকা এমন কোন 'পরিকল্পনা রাখতে পারবে না যা ইউরোপের বিভিন্ন জাতির গ্রহণযোগ্য হবে।' তিনি বললেন, সেই জন্যেই শেষ পর্যন্ত কমিউনিজম জয়ী হবে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এখন আর কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা যাবে না: ১৯৪৬ সালের লড়াই হবে শেষ লড়াই। কথার ভাবে তিনি যেন এও ব'লে দিলেন যে, জাপানীদের ভাগ্যে যাই ঘটুক তাতে কিছু যাবে আসবে না। মন্ত্রিসভার সদস্যদের তিনি নেপথ্যে বললেন যে, জাপানীদের হারানো সহজ নয়—তবে যদি শেষ পর্যন্ত তাদের পরাজয় ঘটেই, তাহলেও আজাদ হিন্দ আন্দোলনের খাতাপত্রগুলো রেখে দিতে হবে এবং প্রত্যেককে যার যার জায়গায় থাকতে হবে।

এই সময়ে ভারতের বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানকল্পে কয়েকটি নতুন প্রস্তাব ঘোষণা করলেন। বৃটেনের সঙ্গে আপস-আলোচনা ভারতের স্বার্থের পরিপন্থী সুভাষচন্দ্রের এই ধারণা আগের চেয়েও বদ্ধমূল হয়েছে। এদিকে নানারকম নতুন অবস্থাও দেখা দিয়েছে: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাতীয়তাবাদের শক্তি-সঞ্চয় ও ইউরোপীয়দের মর্যাদা নাশ, বর্মার স্বাধীনতার আস্বাদলাভ, ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি নতুন ক'রে আবার আমেরিকার সহানুভূতি। এর চাপে প'ড়ে বৃটিশকে আবার নতুন ক'রে ভাবতে হবে, এই পুনর্বিবেচনার কাজ সাম্রাজ্যবাদী চার্চিলের আমলে হবে না—জুলাই মাসে নিশ্চিতভাবে গদিতে বসবে শ্রমিক সরকার, তারাই এ কাজ করবে; ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হয়েছিল যাঁদের, সেই ক্রীপস্, অ্যাটলি, বেভিন—তাঁরাই গদিতে ব'সে নতুন ক'রে ভাববেন। এইবার নতুন ক'রে ভারতের মুক্তি সংগ্রাম শুরু হলেই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে। রাজনৈতিক রফা যাতে না হয়, তার জন্যে ১৯৪২ সালের ক্রিপস্‌বিরোধী বক্তৃতার ধরনে, তিনি একসঙ্গে কয়েকটি বেতার-বক্তৃতা তৈরী করলেন। ব্যাঙ্কক বেতার-কেন্দ্র তখন আর চলছিল না; কাজেই ১৮ই জুন তিনি বিমানপথে সিঙ্গাপুরে চলে গেলেন।

এবার একটু পেছনে ফিরে গিয়ে দেখা যাক ভারতবর্ষের রাজনৈতিক

পরিস্থিতি কী দাঁড়িয়েছিল। ১৯৪২ সাল ছিল বিদ্রোহের বছর, ১৯৪৩ সাল এল আকাল নিয়ে। সে বছরে বাংলা দেশে দুর্ভিক্ষের ফলে একদিকে সাম্প্রদায়িক আর অন্যদিকে রাজনৈতিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হ'ল; কেননা কংগ্রেস এই দুর্ভিক্ষের জন্যে একদিকে বাংলার মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভাকে, অন্যদিকে দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারকে সমানভাবে দায়ী করল। ১৯৪৩-এর অক্টোবরে এলেন নতুন বড়লাট লর্ড ওয়াভেল; এর আগে আব কোন বড়লাটের মধ্যে এতটা উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং আটপৌরে ভাব দেখা যায়নি। ভারতের বিরাট অর্থনৈতিক সমস্যার এখুনি সমাধান চাই—এটা নতুন করে উপলব্ধি করা হ'ল; সমাধানের জন্যে যেসব নতুন গঠনমূলক ব্যবস্থা সাব্যস্ত হল, তাতে নতুন এক রাজনৈতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হতে পারে। সহযোগিতার জন্যে ১৯৪৪-এর ফেব্রুয়ারীতে লর্ড ওয়াভেলের আবেদন ও নতুন প্রস্তাব সকলেরই গ্রহণযোগ্য ব'লে মনে হচ্ছিল। কিন্তু গান্ধীজী তাঁর ১৯৪২-এর মনোভাব আঁকড়ে রইলেন; তখনও তাঁর কারারুদ্ধ থাকার ভেতব দিয়ে কংগ্রেসের দলবল সে কথা জেলের বাইরে থেকে স্পষ্ট বুঝতে পাবল। প্রভাবশালী কংগ্রেসনেতাদের মধ্যে একমাত্র শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচাবী মতামতের দিক থেকে ছিলেন নরমপন্থী—তাও গান্ধীর সঙ্গে দু' বছর আগে ছাডাছাড়ি হবার পর এখন তিনি সম্পূর্ণ একা। জিন্না সাহেবের নেতৃত্বে এদিকে মুসলমানেরা ক্রমবর্ধমানভাবে মুসলিম লীগের মধ্যে এসে জোট বাঁধছে; জিন্না সাহেব ভারতবিভাগের ব্যাপারে কৃতসঙ্কল্প এবং যে বডলাট ভারতের অখণ্ডতাকে ভৌগোলিক দিক থেকে অপরিহার্য ব'লে মনে করেন, তাঁর সঙ্গে জিন্না সাহেব কথাবার্তা বলতে রাজী নন।

১৯৪৪-এর ৬ই মে স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্যে গান্ধীজী যখন জেল থেকে ছাড়া পেলেন, তখন এই ছিল অবস্থা। সে সময়কার আবহাওয়া আশাজনক হওয়া সত্ত্বেও অল্প দিনের মধ্যেই এটা পরিষ্কার হল যে, গান্ধীজী সহযোগিতার যে সব শর্ত উপস্থিত করেছেন—মোটামুটি সেই সব শর্ত রাখার ফলেই সার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্‌-এর সঙ্গে আপস-আলোচনা ফেঁসে গিয়েছিল। তবে তাঁকে দেখে মনে হল, বৃটেন যাতে সম্মিলিত দাবির সম্মুখীন হয় তার জন্যে তিনি জিন্না সাহেবের সঙ্গে একটা রফা করতে চান; ৯ই সেপ্টেম্বর বোম্বাইতে এই দুই নেতাব একাদিক্রমে কয়েকটি বৈঠক শুরু হল।

পক্ষকাল ধ'রে আলোচনা চলল। গান্ধী যে সূত্র রাখলেন, এযাবৎ যত প্রস্তাব রাখা হয়েছে তার মধ্যে জিন্নার তা সব চেয়ে মনের মত ব'লে বোধ হল। সার রেজিনাল্ড কুপল্যাণ্ড এইভাবে তার সারার্থ করেছেন:

১. ভারতের স্বাধীনতার দাবি মুসলিম লীগ সমর্থন করবে এবং 'অন্তর্বর্তী কালে'র জন্যে একটি অস্থায়ী সরকার গঠনের কাজে মুসলিম লীগ কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করবে।

২. যুদ্ধের শেষে একটি কমিশন মারফৎ উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলির সীমা নির্দেশ করা হবে এবং ঐ সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা হিন্দুস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হবে কিনা তা গণভোটে সাব্যস্ত হবে।

৩. বিচ্ছিন্ন হলে প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য, যোগাযোগ ও অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।

৪. 'বৃটেন যদি ভারত শাসনের পূর্ণ ক্ষমতা ও দায়িত্ব হস্তান্তর করে, একমাত্র তা'হলেই এইসব শর্ত বাধ্যতামূলক হবে।'[৩]

এই আলোচনা-বৈঠকের ফলে দুটি বিপদ আছে ব'লে সুভাষচন্দ্রের কাছে মনে হয়েছিল; একদিকে ভারতের বাইরে তাঁর নিজের কাজে ব্যাঘাত ঘটবে, অন্যদিকে কংগ্রেসের ভেতরে মুস্কিল বাধবে। সুভাষচন্দ্র ১৯৩৮ সালের পুরনো দৃষ্টি নিয়ে এই আলোচনা-বৈঠক দেখছিলেন, যখন তিনি নিজেই চেষ্টা করছিলেন জিন্না সাহেবের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে, কিন্তু ইতিমধ্যে মুসলমানদের পাকিস্তানের দাবি যে কী ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, সুভাষচন্দ্র না রেখেছেন তার খবর, না পেরেছেন তা উপলব্ধি করতে। তাঁর ধারণা, কংগ্রেস দলের সর্বভারতীয় কর্তৃত্ব এখনও বজায় রাখা যায়; মুসলিম লীগের সঙ্গে কোন রকম আপসরফা হলে ষোল আনা কর্তৃত্ব আর থাকবে না এবং শেষ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ক্ষমতা ভাগ হয়ে পড়বে। এই ধরনের আপসরফার ফলে সত্যিই যদি কোন রাজনৈতিক মীমাংসা হয়, তা'হলে সুভাষচন্দ্রের নিজের অবস্থা সঙ্গিন হয়ে পড়বে। ১৯৪৪-এর জুলাই মাসেও

৩ 'ইণ্ডিয়া—এ রিস্টেটমেণ্ট', ২৩৭ পৃঃ

আপস-মীমাংসার তাৎপর্যের কথা ভেবে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন :

> যতক্ষণ পর্যন্ত মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে বৃটিশ সরকারের আপস না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দিক থেকে চিন্তা করবার কিছু নেই। যত যাই হোক, যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে এবং মহাত্মা গান্ধী যদি আপস করেন তা হলেও আমাদের লড়াই থামবে না, তবে আপস যদি না হয়…এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, আমাদের ভার অনেকটা লাঘব হবে। (৪ঠা জুলাই, ১৯৪৪)
>
> (আমার) পাল্টা একমাত্র পরিকল্পনা হল… 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত মহাত্মা গান্ধীর পরিকল্পনা। যদি সে পরিকল্পনা কৃতকার্য হয়, তা হলে আমাদের পরিকল্পনা ও কাজকর্ম নিরর্থক হয়ে পড়বে। অন্যদিকে, যদি মহাত্মা গান্ধীর পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়—তাহলে ভারতের স্বাধীনতার সমস্ত আশাভরসা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে আমাদের পরিকল্পনার সাফল্যের ওপর। (১২ই জুলাই, ১৯৪৪)

মোট কথা, সুভাষচন্দ্রের পক্ষে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা তখনই সম্ভব হবে, যখন তিনি জাপ আক্রমণের সময় ভারতীয় সেনাবাহিনীকে দলে টানতে পারবেন এবং দেশের লোককে স্বপক্ষে আনতে পারবেন। রাজনৈতিক অবস্থার রেষারেষির ভাব যত বেশী থাকবে, ততই সে কাজ সহজ হবে। যদি আপস-মীমাংসা হয়ে যায়, তাহলে তাঁর পক্ষে ভারতের মুক্তিদাতা সাজা কখনই সম্ভব হবে না।

এক্ষেত্রে তাঁর আর জাপানীদের স্বার্থ মিলে গিয়েছিল : ভারতবর্ষে যদি কোন মীমাংসা হয় তাহলে শুধু যে আরও সুদক্ষ ও সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে যুদ্ধ প্রচেষ্টা চলবে তাই নয়—ভারতে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দায় থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে জাপানের প্রতিপক্ষের সৈন্যবল ঢের বেশী বৃদ্ধি পাবে। তবে আমরা ধ'রে নিতে পারি যে, সুভাষচন্দ্রের কাছে সেটা ছিল গৌণ ব্যাপার। তিনি নিজের স্বাধীন ও সঙ্গতিপূর্ণ কার্যধারাই অনুসরণ ক'রে চলেছিলেন। বৃটিশের প্রতি অবিশ্বাস, কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা, আপসের পথে স্বাধীনতা পাওয়া যাবে না ব'লে তাঁর দৃঢ় ধারণা—এইসব সাবেকী কারণেই

এখন তিনি আপস ঠেকাতে চাইছিলেন। গান্ধী আর জিন্নার মধ্যে বোঝা-পড়া হয়ে যেতে পারে, তাহলে হয়ত আপসের পথ প্রশস্ত হতে পারে—তার সম্ভাবনা দেখে সুভাষচন্দ্র আতঙ্কিত হলেন। ইম্ফল-ফেরত আই-এন-এ সৈন্যদের নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ায় তিনি নিজে কিছু করতে অসমর্থ হলেন; তাঁর প্রচারমন্ত্রী শ্রীযুক্ত শিবরামের ওপর ভার পড়ল আপস-আলোচনার বিরুদ্ধে ও গান্ধীর বিরুদ্ধে পুরোদমে প্রচার-অভিযান চালাবার। কিন্তু এই কূট মতলব হাসিল করার চেয়ে শিবরাম বরং পদত্যাগ বাঞ্ছনীয় বলে মনে করলেন; শিবরাম এতদিনে নিঃসংশয় হলেন যে, সুভাষচন্দ্রের লক্ষ্য হল জাপানীদের সহায়তায় ভারতবর্ষের ডিক্টেটর সেজে বসা এবং তাঁর নীতির ফলে দেশের মধ্যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হবে।

শিবরামকে বাদ দিয়ে এই বিশেষ অভিযানটি শুরু করা সম্ভব হল না। প্রকৃতপক্ষে, তার কোন দরকারও ছিল না। একবার ক্ষমতা হস্তান্তরিত হলে গান্ধী যে তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন—সে বিষয়ে জিন্না ঠিক বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারেননি; জিন্না এই ব'লে জেদ ধরলেন যে, বৃটিশ মধ্যস্থ থেকে ভারত বিভাগের প্রস্তাব কার্যকরী করুক। অতএব আলাপ-আলোচনা এমনিতেই ফেঁসে গেল—সুভাষচন্দ্রকে কিছু করতে হল না, যত দিন যায় সাম্প্রদায়িক অচলাবস্থা আরও সুকঠিন হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বৃটেনের জনমতের প্রবল দাবীর ফলে নতুন ক'রে রাজনৈতিক উদ্যোগ দেখা দিল। ১৯৪৫-এর জুন মাসে লর্ড ওয়াভেল ভারতবর্ষে একটি অন্তর্বর্তী ব্যবস্থার প্রস্তাব নিয়ে গেলেন যাতে সংবিধান রচনা ও চূড়ান্তভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের আয়োজনও থাকবে। বড়লাটের কর্মপরিষদ পুনর্গঠিত করবার প্রস্তাব হল; তাতে বড়লাট ও জঙ্গীলাট ছাড়া আর সমস্ত সদস্যই হবে ভারতীয়। এই কাজ সম্পন্ন হলে প্রদেশে প্রদেশে আবার দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে—কংগ্রেসের অসহযোগিতার ফলে এতদিন যা বন্ধ হয়ে ছিল। এই প্রস্তাবে সম্মতি লাভের জন্যে লর্ড ওয়াভেল বিভিন্ন দলের নেতা ও প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীদের সভা ডাকবেন: আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ তাঁর কাছে বিভিন্ন নামের তালিকা পেশ করবেন, সেই তালিকা থেকে তিনি তাঁর নতুন পরিষদের সভ্যদের মনোনীত করবেন।

সত্যি বলতে কি, এই প্রস্তাবাবলী নিয়ে লর্ড ওয়াভেলের ভারত

আগমনের পর থেকে এটা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল—এবং ভারতের বেশির ভাগ মহলে ধ'রে নেওয়া হল যে, বৃটেন ক্ষমতা হস্তান্তর করবে কি করবে না এটা আর এখন প্রশ্ন নয়। এখন প্রশ্ন হল কত তাড়াতাড়ি সৌষ্ঠবের সঙ্গে সে কাজ সম্পন্ন হবে। সুভাষচন্দ্র নতুন প্রস্তাব উপস্থিত করার জন্যে বৃটেনকে এবং সে প্রস্তাব বিবেচনা করার জন্যে কংগ্রেসকে যৎপরোনাস্তি ভৎসনা করলেন; ভারতের জাতীয়তাবাদী লোকজন এবং মালয়ে তাঁর কিছুটা দায়িত্বসম্পন্ন অনুগামীদের মনোভাবের সঙ্গে তাঁর মতবাদ খাপ খেল না। নতুন প্রস্তাবাবলীকে তিনি বৃটিশের বরাবরকার চালবাজির অঙ্গ হিসেবে দেখালেন, এবারের উদ্দেশ্য হল সুদূর জাপানের যুদ্ধে আরও বেশী সৈন্য জুটিয়ে যুদ্ধক্লান্ত বৃটেনের জনবলকে খানিকটা হাঁফ ছাড়ার সুযোগ দেওয়া। ভারতীয়দের কাছ থেকে শেষ রক্তবিন্দু ও শেষ কপর্দক তারা শুষে নেবে এবং 'বড়লাটের কর্মপরিষদে কয়েকটি চাকরির বিনিময়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম চুলোয় দেওয়া হবে: এতে শুধু 'বড়লাটেরই স্বরাজ' হবে, আর কারো নয়। বৃটেন রাজনৈতিক বন্দীদের সবাইকে মুক্তি দেয়নি এবং যুদ্ধ চলাকালে কোন আইন তৈরি করতে রাজী হয়নি—এ থেকেই তার কাপট্য প্রমাণ হচ্ছে তাছাড়া, বৃটেনের বিরুদ্ধে জোর লড়াই চালিয়ে ভারতের মুক্তিকামীরা আমেরিকার কাছ থেকে সমর্থন লাভ করেছে এবং সোভিয়েট রাশিয়ার মত নতুন বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য লাভের সম্ভাবনা আছে—আপসরফা হয়ে গেলে এইসব সমর্থন ও সাহায্য হারাতে হবে। জার্মানিকে মিত্রপক্ষ যুদ্ধে হারিয়েছে বটে, কিন্তু তাতে অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি: এখনও স্বাধীনতা অর্জনের নিভুর্ল পদ্ধতি হল ভারতের অভ্যন্তরে প্রতিরোধ, বাইরে সশস্ত্র সংগ্রাম ও 'আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কূটনীতি'। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আজ যখন সফলতার মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছে, কিছুই হেলায় হারানো উচিত নয়। বৃটিশের এখন বেজায় গরজ: ৫ই জুলাই বৃটেনের সাধারণ নির্বাচন, রক্ষণশীল দল যাতে বেশী ভোট পেতে পারে তার জন্যে লর্ড ওয়াভেল চান নির্বাচনের আগেই মিটমাট করে ফেলতে। ভারতবর্ষ যেন ফাঁদে পা না দেয়; আর কিছুদিন অপেক্ষা করলে যখন শ্রমিকদলের সরকার হবে, তখন মওকা মিলবে।

বড়লাটের আহূত সিমলা সম্মেলনে কোনটা মূল বিষয় হবে অল্পদিনের

মধ্যেই তা পরিষ্কার হয়ে গেল। পরিষদে হিন্দু ও মুসলমানের সমপ্রতিনিধিত্বের প্রস্তাব করা হল। সর্ব সম্প্রদায়ের মিলিত সংগঠন হিসেবে কংগ্রেস মুসলিম আসনে কংগ্রেসী মুসলিম প্রার্থী মনোনীত করবে ব'লে দাবি জানাল, এদিকে মুসলিম লীগ নিজের দলের লোক ছাড়া অন্য কোন মুসলিমকে গ্রাহ্য করবে না। সুভাষচন্দ্র এই মৌলিক অনৈক্য চট্‌ ক'রে ধ'রে ফেললেন এবং চেষ্টা করলেন এই অনৈক্য প্রাণপণে বাড়িয়ে তুলতে। কংগ্রেস হল জাতীয় সংগঠন, কোন অংশবিশেষের নয়—এই কথার ওপর তিনি জোর দিতে লাগলেন। মুসলিম লীগের প্রতি বড়লাটের নেকনজর আছে, কাজেই পরিষদ যখন কাজ শুরু করবে তখন বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সরকার-মনোনীত প্রতিনিধিবৃন্দ সহ মুসলিম লীগ বড়লাটকে সমর্থন করবে। কংগ্রেসের পরিষদ সদস্যেরা তখন বৃটিশ ও মুসলিমদের সুবিধামত ভারতবিভাগ প্রতিরোধ করতে অপারগ হবেন:

> এই সঙ্কটমুহূর্তে ভারতের ভাগ্য আপনাদের হাতে। সারা দেশ জুড়ে 'ভারত ছাড়ো' অভিযান শুরু করবার এবং তার দ্বারা আপসের পথে কাঁটা দিয়ে রাখার এই হল উপযুক্ত সময়।

সুভাষচন্দ্র এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে, বামপন্থী কংগ্রেসীদের প্রতিনিধিবিহীন ওয়ার্কিং কমিটি যদি সকলের মত নিতে সাহস করে, তাহলে সমগ্রভাবে কংগ্রেস এই রায়ই দেবে।

কংগ্রেসের নেতারা যখন সিমলা সম্মেলনে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন সুভাষচন্দ্র আরও বিস্তারিত ক'রে কথাটা বললেন। গোটা কংগ্রেসের নামে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আপস-আলোচনা চালানো ওয়ার্কিং কমিটির ক্ষমতাবহির্ভূত। ওয়ার্কিং কমিটি সারা-ভারত কমিটিকে অগ্রাহ্য ক'রে চলছে এবং তার দ্বারা কংগ্রেসের সমগ্র নীতি ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধাচরণ করা হচ্ছে। আরও পাঁচ লক্ষ সৈন্যকে বৃটিশের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে আই-এন-এর আপনজনদের বিরুদ্ধে লড়তে পাঠাবার আগে তাঁরা আরেকবার ভেবে দেখুন। কেননা এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, বর্মার মতই পূর্ব-এশিয়ার ঘাটি মালয় রক্ষার জন্যেও আই-এন-এ লড়াই করবে।

রাতের পর রাত বেতারে সুভাষচন্দ্র ব'লে চললেন—কখনও যুক্তি দেখালেন, কখনও দোষ দিলেন, কখনও অনুনয় করলেন। শ্রীযুক্ত রাঘবন ও অন্যান্য মন্ত্রীরাও বেতার-বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তবে তাঁরা নেতাজীর আপসহীন মতামত সমর্থন করেননি, বরং যাঁরা আলোচনা চালাচ্ছিলেন তাঁদের বিচারবুদ্ধির প্রতি আস্থা রেখেছিলেন। কাজেই তাঁদের সুর ছিল কিছুটা নরম। কংগ্রেস নেতারা যতদিন মুখ খোলেননি, ততদিন সুভাষচন্দ্র ভারতের হয়ে বেশ করেছেন কথা বলেছেন : কিন্তু এখন তাঁর সঙ্গে গান্ধীজীর আবার যে মতের সংঘাত দেখা দিয়েছে ব'লে মনে হচ্ছে, তাতে গান্ধীজীর মতটাই গ্রহণ করতে হয়। তবে সুভাষচন্দ্রের ঘাবড়াবার কোন কারণ ছিল না ; আলোচনা ফেঁসে গেল। শেষ বারের মত সুভাষচন্দ্র এর জন্যে নিজেকে বাহবা দিবেন।

সিঙ্গাপুরের ভারতীয়েরা জুলাই মাসে আবার 'নেতাজী সপ্তাহ' পালন করল। সুভাষচন্দ্রের দু বছরের নেতৃত্ব উপলক্ষ ক'রে জনসভা হল : সেইসঙ্গে খেলাধূলা, আই-এন-এ'র সামরিক মহড়া, বিরাট বিরাট মিছিল। বড়লোকদের আবার এক জায়গায় জড়ো ক'রে টাকার দাবী জানানো হল : ধায্য টাকা দেওয়ার ব্যাপারে গাফিলতি করায় জানুয়ারী মাসে যাদের হুঁশিয়ার করা হয়েছিল, সুভাষচন্দ্র তাদের মধ্যে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করার হুকুম দিলেন ; গ্রেপ্তারের এই হুকুম তামিল করল জাপানী নিরাপত্তা পুলিশ। লীগের পক্ষ থেকে টাকা দাবি ক'রে বিস্তর চিঠি পাঠানো হল। একজন দশ হাজার ডলার দেবে বলেছিল, সে মাত্র অর্ধেক পাঠাল : 'দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমাদের ওপর নির্দেশ রয়েছে আংশিকভাবে টাকা না নেওয়ার। নেতাজী সাফ ব'লে দিয়েছেন যে, প্রতিশ্রুত টাকা দু এক দিনের মধ্যেই দিয়ে দিতে হবে। পত্রপাঠ প্রতিশ্রুত টাকা পাঠিয়ে দেওয়া আপনার অবশ্য কর্তব্য।' কুয়ালালামপুরেও অনুরূপভাবে সফর করা হল ; সেখানেও টাকা না দেওয়ার জন্যে পাঁচ জনের হাতে হাতকড়া পড়ল।

৮ই জুলাই সিঙ্গাপুরের বন্দর এলাকায় সুভাষচন্দ্র আই-এন-এ শহীদস্তম্ভের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। দিন কয়েক পরে তিনি মালয়ের ভারতীয়-অধ্যুষিত অঞ্চলে সফরে গেলেন ; ১৯৪৪-এর শরৎকাল থেকে উত্তর মালয়ে মোতায়েন ৩য় ডিভিশনের বিভিন্ন ইউনিট পরিদর্শন করাই ছিল তাঁর

এই ভ্রমণের বিশেষ উদ্দেশ্য। কোন্ কোন্ অঞ্চল রক্ষার জন্যে আই-এন-এ লড়াই করবে, সে বিষয়ে ডিভিশনাল কমাণ্ডার জাপানীদের সঙ্গে একটা রফা ক'রে নিয়েছিলেন ; কিন্তু তা সত্বেও তাঁকে নানা রকম মুস্কিলে পড়তে হচ্ছিল। দলত্যাগ আর অসন্তোষ তাঁর অধীনস্থ সৈন্যদের মধ্যে লেগেই ছিল। কমিউনিস্ট পরিচালিত জাপবিরোধী গেরিলারা তখন ক্রমশ মাথা তুলতে আরম্ভ করেছে, তাঁর অফিসার আর সৈন্যেরা গোপনে তাদের সঙ্গে যোগা-যোগ রাখছিল। অন্যদিকে জাপানীরা তাঁর ওপর অনবরত চাপ দিচ্ছিল তিনি যাতে তাঁর বাহিনীকে গেরিলাদের বিরুদ্ধে লাগাবার অনুমতি দেন। তিনি তা ঠেকিয়ে এসেছেন এবং সুভাষচন্দ্র এসে তাঁকে সমর্থন জানালেন ; কিন্তু এর ফলে জাপানীদের সঙ্গে যে মন-কষাকষি দেখা দিল, বহিঃশত্রু আক্রমণ করলে তা গুরুতর আকার ধারণ করত।

সিঙ্গাপুরে সুভাষচন্দ্রের প্রধান কাজ ছিল টাকাকড়ি সংক্রান্ত ; সেখানে ফিরে আসতে না আসতেই সেরেম্বানের আই-এন-এ শিক্ষাকেন্দ্রে বেশ বড় রকমের একটা বিদ্রোহ পেকে উঠলো। অবস্থা আয়ত্তে আনবার জন্যে সিঙ্গাপুর থেকে সৈন্যদল ও সাঁজোয়া গাড়ি পাঠানো হল, আসল মর্ম উদ্ঘাটন করবার জন্যে সুভাষচন্দ্র নিজে তাদের সঙ্গে গেলেন। ব্যাপারটা ছিল তুচ্ছ—একজন অফিসারকে নিয়ে, লোকটা যতটা না বদ্‌খেয়ালী, তার চেয়ে বেশী আয়েসী। তবে সুভাষচন্দ্র ব্যাপারটাতে খুবই আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন এবং ১১ই আগস্ট ভোরের দিকে যখন জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণা খবর এল তখন তিনি সেরেম্বানের গেষ্ট হাউসে। তাঁর সঙ্গে বেতারযন্ত্র না থাকায় টেলিফোনে সংক্ষেপে তিনি এই খবরটি পেলেন। শান্ত চিত্তে তিনি তাঁর হাতের কাজ ক'রে যেতে লাগলেন এবং যেন কাজের চাপে মাথা হেঁট ক'রে একজন অফিসারের অভিপ্রায় ও আচরণ সম্পর্কে সাবধানে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অনুসন্ধান চালাতে লাগলেন। পরদিন একটা চিঠি এল, তাতে তাঁকে সিঙ্গাপুরে যেতে বলা হয়েছে ; সুভাষচন্দ্র বিরক্ত হলেন : বললেন, 'এর সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক ? যে অবস্থাই হোক, আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে হবে।'[৪] অবশ্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার লোকজনদের ভাবনার সঙ্গে তাঁর ভাবনার

৪ সুভাষচন্দ্রের জীবনের শেষের কয়দিনের বৃত্তান্ত বিশেষভাবে নেওয়া হয়েছে এ, এস, আয়ারের লেখা 'আনটু হিম এ উইটনেস' গ্রন্থের ৪৯-৫৪ পৃঃ থেকে

মিল ছিল না। মাঞ্চুরিয়ায় রাশিয়ানদের অগ্রগতির সংবাদ তিনি সযত্নে অনুসরণ করছিলেন: বললেন, 'জাপানীরা কোথাও দাঁড়াতে পারবে কিনা সন্দেহ।' তাহলে কি দূর ভবিষ্যতে আবার তাঁর সুযোগ জুটে যাবে? এর ফলে সোভিয়েট শরণার্থী হওয়া তাঁর পক্ষে কি সহজতর হবে?

টেলিফোনের খবরের সঙ্গে রাশিয়ার অগ্রগতির কোন সম্পর্ক ছিল না। ১৩ই আগস্ট রাত্রি দুটোর সময় তাঁর দুজন মন্ত্রী এসে খবর দিল যে, জাপান আত্মসমর্পণ করবার উপক্রম করছে। রাতটা ছিল বেজায় গরম; সুভাষচন্দ্র ফতুয়া গায়ে দিয়ে পাখার নিচে ব'সে হাওয়া খাচ্ছিলেন। এক মুহূর্ত তাঁর মুখ দিয়ে কোন কথা সরল না; তারপর বললেন, 'ব্যস্, সব শেষ। এখন, এরপর কী?' পরে বললেন: 'একমাত্র আমরাই আত্মসমর্পণ করিনি, দেখছ না?' অস্থায়ী সরকারের এখন কী দশা? জাপান কি আশা করেছিল দু দিন আগে অস্থায়ী সরকার রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে? আশ্চর্য, এ কথা আগে তাঁর মাথায় খেলেনি। সংবাদবাহকেরা শুতে যাবার আগে পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র অনর্গল কথা ব'লে গেলেন। এরপর সুভাষচন্দ্রের প্রথম কাজ হল পেনাং থেকে স্বামী আর রাঘবনকে ডেকে পাঠানো। ঘরের বাইরে বারান্দায় ব'সে আয়ারের সঙ্গে তাঁর কথা হচ্ছিল; আয়ারকে তিনি আস্তে আস্তে বললেন, 'এবার আমরা কি করব না করব, ব'সে ঠিক করতে হবে। আয়ার চাইছিলেন সুভাষচন্দ্র খানিকটা ঘুমিয়ে নিক—কিন্তু সে রাত্রে কোন অবকাশ মিলল না—'দরকার নেই, কাল থেকে আমাদের প্রচুর বিশ্রামের দিন আসবে।'

সুভাষচন্দ্র ১৩ই আগস্ট সন্ধ্যায় সিঙ্গাপুরে পৌঁছুলেন। সঙ্গে সঙ্গে বেসামরিক ও সামরিক বড়কর্তাদের নিয়ে আলোচনা বৈঠক হল এবং লীগের বিভিন্ন শাখার কাছে কয়েকটি নির্দেশ পাঠাবার সিদ্ধান্ত হল। চৌদ্দ তারিখেও কয়েকবার বৈঠক বসল: কি ভাবে তহবিলের টাকার বিলিবন্দোবস্ত হবে এবং আপাতত কি ভাবে আই-এন-এ'র ব্যবস্থাপনা চলবে ইত্যাদি বাঁধাধরা বিষয়গুলো সহজেই স্থিরীকৃত হল। গুজবের বিরুদ্ধে সৈন্যদের হুঁশিয়ারি দিয়ে সুভাষচন্দ্র একটি বিশেষ হুকুমনামা জারি করলেন।[৫] জাপান আত্মসমর্পণ করছে, এ কথা সরকারীভাবে জানিয়ে হাচিয়া তাঁকে চিঠি দিলেন। মন্ত্রিসভা

৫ পরিশিষ্ট ২, ১৩ নং

আলোচনা চালাতে লাগল : যা অবস্থা, তাতে আই-এন-এ'কে আত্মসমর্পণ করতে হবে—এ বিষয়ে সবাই একমত—এবং সমস্ত নথিপত্র নষ্ট ক'রে ফেলতে হবে ; কিন্তু মন্ত্রীদের কথা আর শেষ হয় না ; তাঁদের নেতা কী করবেন ? এবারেও সুভাষচন্দ্র নিজে কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না ; বললেন বাকি সকলের সঙ্গে থেকে আত্মসমর্পণের সম্মুখীন হতেই তিনি চান ; তাঁর মন্ত্রীরা এই ব'লে চাপ দিতে লাগল যে, সুভাষচন্দ্র যেখানেই হউক কোন জায়গায় চলে যান—সুভাষচন্দ্র মন্ত্রীদের বাধা দিলেন না। ১৪ই আগস্ট সারাদিন কাটল। বিকেলের দিকে তাঁর একটা দাঁত তুলে ফেলা হল। সন্ধ্যেবেলায় ঝাঁসী রাণী বাহিনীর মেয়েদের অভিনীত 'ঝাঁসীর রাণী' নাটক দেখতে গেলেন। যা করবার ছিল, তার সবই প্রায় করা হয়ে গেছে ; সমস্ত রকম সম্ভাব্যতার কথা ভেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, অথচ এখনও পযন্ত কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হল না।

তবে সুভাষচন্দ্র সম্ভবত ঠিকই ক'রে রেখেছিলেন তিনি কী করবেন। তিনি লেখেননি কি : 'আমাকে সব চেয়ে বেশী টানে দুঃসাহসেভরা অভিযাত্রীর জীবন…অজ্ঞয়ের সন্ধানে'? আবারও সেই বীরত্বের মোহ যা তাঁকে বার বার পেয়ে বসত। যেমন ১৯৪০ সালে কারাগারে নিষ্ক্রিয় হয়ে ব'সে থাকার চেয়ে বরং মৃত্যুকেও তিনি বরণীয় ব'লে মনে করেছিলেন, তেমনি এবারেও হয়ত অনিশ্চয়তার সঙ্কটে প'ড়ে হাত গুটিয়ে ব'সে থাকা তাঁর কাছে অসহ্য ঠেকেছিল। বৃটিশ যুদ্ধে জিতেছে এবং সম্ভবত ভারতবর্ষে তারা যা খুশি তাই করবে ; কিন্তু ভারতের এখনও সেই একই কর্তব্য—ভেতরে প্রতিরোধ, বাইরে সশস্ত্র সংগ্রাম এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতি। শেষের কর্তব্য দুটি কি এখন কার্যত পরিহার করা হবে, না তিনি কাজ চালিয়ে যাবার কোন ব্যবস্থা করতে পারবেন ? আগের মাসে তিনি আবার রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করবার অনুমতি চেয়েছিলেন—জাপানীরা তাঁর প্রার্থনা না-মঞ্জুর করেছে ; কয়েকদিনের মধ্যেই যে গোলমাল দেখা দেবে, সেই সুযোগে রাশিয়ার আশ্রয় চাওয়া যায় না ? রুশরা এখন কত দূরে ? দাইরেণে তারা কবে নাগাদ পৌছুবে ? পনেরই তারিখে মন্ত্রিসভা আবার আলোচনা শুরু করল : বিকেলে টোকিও থেকে বেতারে আত্মসমর্পণের খবর বলা হল। শেষ হুকুমনামা [৬] লেখা হল ও বেতার-বক্তৃতা তৈরি হ'ল।

৬ পরিশিষ্ট ২, ১৪ নং

সিঙ্গাপুরের জাপানীদের কাছ থেকে স্বাভাবিক ভাবেই কোন রকম যুক্তি পরামর্শ পাওয়া গেল না। নিজেদের দেশের ভাগ্য বিড়ম্বনায় তারা তখন মুহ্যমান; প্রত্যেকটি অফিসারের মাথায় তখন হারাকিরির সমস্যা—পরাভূত অবস্থায় ভারতের ব্যাপারে তাদের এই তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের মনোভাব ক্ষমার্হ। তাদের মধ্যে কিছু লোক কেউ একা একা, কেউ দল বেঁধে হারাকিরি করল; কিছু লোক হতভম্ব অবস্থায় সম্রাটের সিদ্ধান্ত মেনে নিল; আই-এন-এ কি ভাবে আত্মসমর্পণ করবে না করবে, সেই বিষয়ে তারা কেউই কোন গা দেখাল না। সন্ধ্যের দিকে সুভাষচন্দ্র বেতার বক্তৃতা দিলেন। সেদিন অনেক রাত্রে মন্ত্রিসভার সদস্যেরা জোর ক'রে চেপে ধরায় তিনি চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন; ঊর্ধ্বতন জাপানী সদরদপ্তরে উপর্যুপরি চেষ্টার পর একজন সেনাধ্যক্ষকে পাওয়া গেল যিনি এ বিষয়ে তাঁকে কিছুটা সাহায্য করতে রাজী হলেন। দরকারটা ছিল আনুষ্ঠানিক দিক থেকে। প্রকৃতপক্ষে তিনি রুশ এলাকায় আশ্রয়প্রার্থী হয়ে সেখান থেকে সংগ্রাম আবার শুরু করবেন। ১৬ই আগস্ট ভোর পর্যন্ত মন্ত্রিসভার বৈঠক চলল। তাঁর শেষ নির্দেশগুলি কার্যকরী করবার জন্যে সুভাষচন্দ্র একটি কমিটি তৈরি ক'রে দিলেন এবং সিঙ্গাপুরে অস্থায়ী সরকারের প্রতিনিধি মনোনীত হলেন মেজর-জেনারেল কিয়ানি। এবার এল নতুন ব্রতসাধনে সঙ্গী নির্বাচনের পালা। মন্ত্রী ও সেনানায়কদের মধ্যে যাদের যাদের যাওয়া সম্ভব, তাদের সবাইকেই সুভাষচন্দ্র সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলেন—কিন্তু সবাই যেতে রাজী হল না। কিয়ানি যেতে পারবেন না আগেই জানিয়েছেন; স্বামী আর থিভি উত্তর মালয় থেকে এসে পৌঁছোয়নি—এদিকে ১৬ই আগস্ট সকাল সাড়ে ৯ টায় সুভাষচন্দ্রের বিমান ছাড়বার সময় হয়ে গেল। সুতরাং সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে গেলেন শ্রীযুক্ত আয়ার, আই-এন-এ'র সেনা-প্রধান লেফটেনাণ্ট-কর্নেল হবিবুর রহমান ও অন্য একজন অফিসার। সিঙ্গাপুরে পরে কিছু লোক এসে পৌঁছুবে, তাদের যাবার জন্যে তিনি নির্দেশ দিয়ে গেলেন; অন্যদের তিনি যাবার পথে তুলে নেবেন

ব্যাঙ্ককে সুভাষচন্দ্র আই-এন-এ'র মেজর জেনারেল ভোঁসলের সঙ্গে, জেনারেল ইসোদা প্রমুখ জাপানীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন: তাঁকে বলা হল দক্ষিণ সেনাদপ্তরে গিয়ে দরবার করতে। ১৭ই আগস্ট

সাইগন অভিমুখে এই উদ্দেশ্যে বেশ বড় একটি দল রওনা হল। ইসোদা ও হাচিয়া ছাড়া এই দলে ছিল আবিদ হাসান, অন্য একজন অফিসার ও দ্বিতীয় একজন বেসামরিক মন্ত্রী। সাইগনে এসে জানা গেল আই-এন-এ'র আত্মসমর্পণের ব্যাপারে টোকিও থেকে কোন নির্দেশ আসেনি। খবরটা দেবার পর জেনারেল ইসোদা সুভাষচন্দ্রকে বললেন যে, মাঞ্চুরিয়ার দাইরেন হয়ে তিনি বিমানপথে টোকিওতে যাচ্ছেন—একটি আসন আছে, সুভাষচন্দ্র তাঁর সঙ্গে যেতে পারেন। এরপর আবার নিজেদের মধ্যে খুঁটিয়ে আলোচনা হল: সুভাষচন্দ্রের কি একা যাওয়া উচিত? যেন মনে না হয় তিনি পালিয়ে যাচ্ছেন—আবার তাঁকে বুঝিয়ে রাজী করাতে হল: তাঁর ধরা পড়ার কোন মানে হয় না: একজনের জায়গা যখন পাওয়া যাচ্ছে, তাঁর নিশ্চয়ই যাওয়া উচিত। জাপানীরা তাঁর উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করছিল: সুভাষচন্দ্রের পীড়াপীড়িতে তারা হবিবুর রহমানের জন্যেও একটি আসন দিতে রাজী হল এবং কথা দিল দলের বাকি সবাইকে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি তারা পাঠিয়ে দেবে।

এই আকস্মিক আবেগ-বিহ্বল বিদায়ের জন্যে কেউ ঠিক তৈরি ছিল না। হাতে হাত মিলিয়ে বিদায় নেবার সময় সুভাষচন্দ্র বললেন, 'জয়হিন্দ, পরে আবার দেখা হবে।' ঊর্ধ্বতন জাপানী অফিসারদের নিয়ে দু'ইঞ্জিনযুক্ত এই বোমারু বিমান বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটে ছাড়ল; ফরাসী ইন্দো-চীনের অন্তর্গত তুরানের বিমানঘাঁটিতে পৌঁছুতে সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল। পরেরদিন ১৮ই আগস্ট বিমানপথে যাত্রা আবার শুরু হল; ফরমোজার তাইহোকুতে পৌঁছুতে দুপুর দুটো বাজল। বিমানে তেলভরা হল; তার মধ্যে যাত্রীরা দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে নিলেন। আড়াইটা নাগাদ প্লেন ছাড়বার ঠিক পরেই সামনের পাখার একটা অংশ খুলে প'ড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ আগুন ধ'রে গিয়ে বিমানটি সোজা মাটিতে এসে ধাক্কা খেল। যারা তখনও বেঁচে ছিল তারা কোনক্রমে ধ্বংসস্তূপের বাইরে স'রে এল; এই দলে ছিলেন সুভাষচন্দ্র আর হবিবুর রহমান। সুভাষচন্দ্রের জামাকাপড়ে আগুন ধ'রে গিয়েছিল; হবিবুর রহমান কোনরকমে তা নিভিয়ে ফেললেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের মুখ আর শরীর ভীষণভাবে পুড়ে যাওয়া ছাড়াও মাথায় বেশী রকম চোট লেগে ছিল, এমন কি হাসপাতালে নিয়ে যাবার আগেই মনে হল তিনি বুঝেছেন তাঁর সেরে উঠবার আশা নেই।

হবিবুর রহমান হাসপাতালে সারাদিন সুভাষচন্দ্রের শয্যার পার্শ্বে রইলেন; তাঁর জীবনদীপ আস্তে আস্তে নিভে আসছিল। কখনও ডাক্তারদের ওষুধের ফলে তাঁর অবস্থার একটু উন্নতি হচ্ছিল; কখনও আবার যন্ত্রণায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ছিলেন। খুব শান্ত ভাবেই তিনি কথাবার্তা বলছিলেন; ঠোঁট অস্বাভাবিক ভাবে ফুলে ওঠায় কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল; তাহলেও দোভাষীকে ডেকে তিনি ফিল্ড-মার্শাল তেরাউচির উদ্দেশ্যে একটি চিঠি মুখে মুখে তৈরি ক'রে লিখিয়ে নিলেন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার কয়েক মিনিট আগে হবিবুর রহমানকে ডেকে তিনি বললেন: 'হবিব, মনে হচ্ছে আমি আর বেশীক্ষণ নেই। শেষ পর্যন্ত আমি ভারতের স্বাধীনতার জন্যে লড়েছি। দেশের লোককে ব'লো "অদূর ভবিষ্যতে ভারত স্বাধীন হবে"। 'স্বাধীন ভারত জিন্দাবাদ।' কথা শেষ ক'রেই তিনি মর্ফিয়া চাইলেন। তার কিছুক্ষণ পরে, রাত্রি ৮ টা থেকে ৯টার মধ্যে, তাঁর ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা সারা শরীর প্রচণ্ড ভাবে কেঁপে উঠল; তারপরই সব স্থির হয়ে এল— সুভাষচন্দ্র চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন।

হবিব চেয়েছিলেন সুভাষচন্দ্রের মৃতদেহ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় রক্ষিত হোক অথবা সিঙ্গাপুরে স্থানান্তরিত করা হোক; কিন্তু জাপানীদের পক্ষে তার কোনটাই করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং নিরুপায় হয়ে ২০শে আগস্ট তাইহোকুতে সুভাষচন্দ্রকে দাহ করা হল এবং তাঁর ভস্মাবশেষ কয়েক সপ্তাহ পরে হবিবুর রহমান টকিওতে নিয়ে গেলেন। ১৪ই সেপ্টেম্বর রিওকোজু মন্দিরে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হল।

২১শে আগস্টের আগে সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ বাইরের কেউ জানতে পারেনি; ঐদিন দিল্লী বেতার কেন্দ্র থেকে দুর্ঘটনার খবর প্রচারিত হয়। যে ন'জন ঊর্ধ্বতন অফিসার ও মন্ত্রী সুভাষচন্দ্রের অনুগমন করবার চেষ্টা করছিলেন, খবর শুনে তাঁরা স্তম্ভিত ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন; তাঁরা যে যেখানে ছিলেন থেকে গেলেন। সমস্ত জায়গায় ভারতীয়েরা হায়-হায় করতে লাগল; হয়ত কোন অলৌকিক শক্তি বলে অপ্রত্যাশিত ভাবে আবার দেখা পাওয়া যাবে, এ হয়ত তাঁর অন্তর্ধানের নতুন কোন কৌশল—কিছুদিন এই রকমের একটা সন্দেহ লোকের মধ্যে টিঁকে থাকল। বহু বছর কেটে যাবার পর আজও কেউ কেউ তাঁকে খুঁজে বেড়ায়, স্বাধীন ভারতের পাহাড় পর্বতে

গ্রামদেশে তাঁকে চকিতে সন্ন্যাসীর বেশে দেখতে পায়। কিন্তু এটা স্থির নিশ্চিত যে, ১৯৪৫-এর ১৮ই আগস্ট তাইহোকুর জাপানী সামরিক হাসপাতালের নাম্বন ওয়ার্ডে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। যদি তিনি বেঁচে থাকতেন ও দাইরেনে পৌঁছুতে পারতেন, তাহলে তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধুদের একটি বড় অংশকে নিয়ে সুভাষচন্দ্র রুশদের আশ্রয়প্রার্থী হতেন। ভারতের মঙ্গলের জন্যে অন্তত এটুকু তাঁকে করতে হত—যে স্বাধীনতা ইতিমধ্যে অন্যেরা পেয়ে গেছে, ভারতকে তা মিলিয়ে দেবার জন্যে সেটাই হত তাঁব শেষ ও চরম কাজ।

৯

উপসংহার

১৯৪৬ এর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ওরা অপেক্ষা করুক. তার মধ্যে আমরা যদি ঠিক সময়ে কাজ ফতে করতে না পারি, তখন যেন ওরা আমাদের সমালোচনা করে। (১২ই জুলাই, ১৯৪৪)

১৯৪৫-এর আগস্টের মাঝামাঝি হঠাৎ এ ভাবে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে কেউ ভাবেনি—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিক্ষিপ্ত বৃটিশ ও মার্কিণ ফৌজও ভাবেনি, জাপ বাহিনীও ভাবেনি। কথা ছিল সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি মালয়ে সৈন্য নামানো হবে—কিন্তু তার আগেই চটপট ব্যবস্থা বদলে ফেলে মালয়, শ্যাম, ইন্দো-চীন, জাভা, সুমাত্রা ও মিত্রশক্তির অন্যান্য জায়গা শান্তিপূর্ণভাবে ও সাবধানে দখল করবার পরিকল্পনা নিতে হল। নতুন পরিকল্পনা সঙ্গে সঙ্গে চালু করা সম্ভব ছিল না; যখন তা কাযকরী করা হল, তখন প্রথমেই দরকার পড়ল যুদ্ধবন্দীদের উদ্ধার করবার দিকে নজর দেওয়ার। কাজেই মিত্রপক্ষের সৈন্যদের এসে পৌঁছুতে যেটুকু সময় লাগল, তার মধ্যে জাপানীরা বিদায় হবার মুখে ঐ সব জায়গায় রাজনৈতিক অশান্তির বীজ নিজেরা না বুনলেও বীজ বপনের সুযোগ ক'রে দিয়ে গেল- পরে সেই সব বীজ অঙ্কুরিত হতে লাগলো। মালয়ই প্রথম জবর দখল করা দেশ; সেখানে তিন সপ্তাহের অরাজক অবস্থা সব চেয়ে কম ক্ষতি করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও হিসেব করে দেখা গিয়েছিল যে, মালয়ে আগেকার শান্তিপূর্ণ অবস্থা ফিরিয়ে আনতে হলে সে দেশে বেশ কয়েক বছর ধ'রে দখলদার সৈন্য রেখে দিতে হবে। জাভা আর ইন্দো-চীনে বিলম্বের ফলে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির প্রত্যাবর্তনের পথ রীতিমত ভাবে কণ্টকিত হল, কেননা দখলদার সৈন্য এসে পড়বার আগে কয়েক সপ্তাহ ধ'রে এইসব জায়গায় অংশত শাসন করছে জাতীয়তাবাদী সরকার। আই-এন-এ'র ক্ষেত্রে এর ফল দাঁড়াল এই যে, স্থানীয়ভাবে যারা

পল্টনে নাম লিখিয়েছিলেন তারা প্রায় সবাই গা ঢাকা দিল। মালয়ে আর শ্যামে এসে বৃটিশেরা যখন উপস্থিত হল, তখন দেখা গেল আই-এন-এ শিবিরে যারা আছে তারা প্রায় সবাই ভূতপূর্ব যুদ্ধবন্দী। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে এবং দেশে ফেরত পাঠাতে বেশ কয়েক মাস সময় লেগে গেল।

এটা ছিল সমস্যার একটা দিক। যুদ্ধক্ষেত্রে ধরা-পড়া আই-এন-এ সৈন্যদের নিয়ে এর আগে ভারত সরকারকে কম ঝামেলায় পড়তে হয়নি। শুধু তো শৃঙ্খলা আর ন্যায়বিচারের প্রশ্ন নয়। তারা জাপানীদের সম্বন্ধে মূল্যবান সামরিক তথ্যের অধিকারী ও জাপানীদের কৌশল সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হওয়ায় সৈন্য হিসেবে কতকটা তাদের মূল্য বেড়ে গিয়েছিল। তথ্যগুলো লিখে নিয়ে যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া যায়; কিন্তু মাথার মধ্যে যাদের সুভাষচন্দ্র বসুর প্রচার গিজগিজ করছে, এমন কি শত্রুপক্ষের কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেও তাদের ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ফিরে আসতে দিলে বিপদ ঘটতে পারে, ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যাতে জাতীয়তাবাদীদের অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ ঢুকে পড়তে না পারে, তার জন্যে এতদিন কম সাবধানতা অবলম্বন করা হয়নি।

সুতরাং শত্রুপক্ষের খবরাখবরের জন্যে প্রত্যাগত সৈন্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করা ছাড়াও খতিয়ে দেখবার চেষ্টা করা হল ব্যাটালিয়ন বা রেজিমেণ্টে ফিরিয়ে নিলে কার দ্বারা কতটা বিপদের সম্ভাবনা আছে। দেখা গেল, অনেককেই ফেরত নেওয়া যায়। যাদের তেজ তখনও সম্পূর্ণভাবে লোপ পায়নি, সেইরকম অধিকাংশ লোককে সৈন্যবাহিনীতে ফিরিয়ে নেওয়ার আগে বিভিন্ন পুনর্বাসন কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছিল। যাদের মধ্যে এমনভাবে বিষ ঢুকিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল যে, তার ফলে তারা কার্যত অক্ষশক্তির জোরালো প্রচারযন্ত্রে পরিণত হয়ে পড়েছিল—তাদের হাজতে রেখে দেওয়া হল। যে সামরিক সংগঠন এইভাবে সৈন্যদের খতিয়ে দেখত এবং প্রায়ই তার আগে উপর্যুপরি ঘণ্টার পর ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ চালাত, সেই সংগঠন তার বন্দীদল সহ লাল কেল্লায় অধিষ্ঠিত ছিল—বিরাট প্রাকারবেষ্টিত যে লালকেল্লা একদা ছিল দিল্লীর রাজপ্রাসাদ, ১৮৫৭ সালের ভারতীয় সিপাহী-বিদ্রোহের বহু নাটকীয়তার রঙ্গভূমি, সুভাষচন্দ্রের আশাভরসার লক্ষ্যস্থল আর তাঁর সৈন্যদের রণধ্বনি, তারা হাজারে হাজারে সেখানে পৌঁছুল বন্দী হিসেবে।

মনে রাখা দরকার, ইম্ফল অভিযানে ধরা-পড়া ১,৫০০ আই-এন-এ সৈন্যের প্রত্যেকেই সামরিক আইনের দিক থেকে সব চেয়ে গুরুতর অপরাধে অপরাধী ছিল; কিন্তু শাস্তিবিধান হয়েছিল খুব কম ক্ষেত্রে। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচারপত্র বিলি, হেঁকে ডেকে প্রচার করা বৃটিশ-ভারতীয় সৈন্যদের ওপর গুলীবর্ষণ অথবা তাদের জাপানীদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া ইত্যাদি অভিযোগে সামরিক আদালতের বিচারে জনকয়েক পদস্থ অফিসার, এন-সি-ও ও নেতৃস্থানীয় সেপাইয়ের কারাদণ্ড অথবা প্রাণদণ্ড হয়। ডুবোজাহাজ অথবা প্যারাসুটের সাহায্যে যারা ভারতে এসে গুপ্তচর বৃত্তি চালাবার চেষ্টা করেছিল, তাদেরও কাউকে কাউকে এই রকম দণ্ড পেতে হয়েছিল। এই জাতীয় মামলার সংখ্যা ত্রিশটিরও কম এবং প্রাণদণ্ড হয় মাত্র ন'জনের। আর কাউকে কোন রকম শাস্তি দেওয়া হয়নি।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর যখন জেয়াওয়াডি, রেঙ্গুণ, সিঙ্গাপুর আর ব্যাঙ্ককে ব্যাপকভাবে সবাই আত্মসমর্পণ করতে লাগল, তখন আরেক দিকের সমস্যা দেখা দিল। নিরাপত্তার জন্যে অথবা ঐতিহাসিক উদ্দেশ্যে তখনও খবর সংগ্রহের দরকার ছিল, কিন্তু প্রত্যাগত যুদ্ধবন্দীরা আই-এন এ'র বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হওয়ায় শৃঙ্খলাবিধানের কিছুটা দরকার পড়ল। 'কালো' 'ফিকে' আর 'শাদা'—আগেকার এই নিরাপত্তামূলক শ্রেণীবিভাগ চালু থাকল, তবে এখন প্রশ্ন দাড়াল: কে কতটা দোষী এবং বাকি বেতন সহ অথবা বাকি বেতন ছাড়াই একজনকে ভারতীয় সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত করা হবে কিনা। ১৯৪৫-এর মে থেকে অক্টোবরের মধ্যে রেঙ্গুণ থেকে দশ সহস্রাধিক আই-এন-এ সৈন্যকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনা হল। সেপ্টেম্বরে মালয় ও ব্যাঙ্ককে আরও সাত হাজার আত্মসমর্পণ করল। মিত্র পক্ষের হাজার হাজার সৈন্য এতদিন বন্দীশিবিরে অকথ্য যন্ত্রণা সহ্য করেছে —তাদের স্বদেশে পাঠানোই হল প্রথম কাজ। প্রথম তাদের জন্যেই জাহাজের ব্যবস্থা করতে হল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে আই-এন-এ'র ষোল আনা লোককে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে ১৯৪৬-এর মার্চ মাস পর্যন্ত সময় লাগল। এর ফলে কতকগুলো উপসর্গ দেখা দিল। রেঙ্গুণে ভারতীয় স্থলবাহিনী, নৌবহর ও বিমান-বহরের সৈন্যেরা আজাদ হিন্দ ফৌজের সংস্পর্শে আসবার পর যে এগারো মাস সময় কেটে যায়, তার ভেতর দিয়ে তাদের

মধ্যে সম্প্রীতির ভাব গড়ে ওঠে। এটা এড়াবার কোন উপায় ছিল না--সবাই ভারতবর্ষের মানুষ, বিদেশ-বিভুঁইতে কাজ করতে এসে দেখা; তাছাড়া অনেকের ক্ষেত্রে আই-এন-এ'র সংস্রবে আসবার মানে দাঁড়াল: ১৯৪১ সালে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর নিকট-আত্মীয়দের সঙ্গে পুনর্মিলন। এর ফলে ভারতীয় সেপাইদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ হ'ল, যা তাদের কখনও ছিল না। আই-এন-এ সম্বন্ধে যে বিবরণ তারা পেল, তা একপেশে—যুদ্ধবন্দীদের অভিজ্ঞতা অথবা সরকারী বিবৃতির দ্বারা তা সংশোধিত নয়। তাদের ধারণা হ'ল আই-এন-এ যেন নিপীড়িত বীরের দল; দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অতিথিবৎসল ও ইদানীং পুরোপুরিভাবে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন বেসামরিক ভারতীয়দের কাছে ব'সে তারা সাগ্রহে শুনত আজাদ হিন্দ সরকার ও সুভাষচন্দ্রের অধুনালুপ্ত মন্ত্রিসভার গৌরবগাথা। ইম্ফলে লড়াই-করা যে সব ভারতীয় সৈন্য আই-এন-এ সম্পর্কে খাঁটি খবর রাখত, তারা পল্টন থেকে তখন দ্রুত বিদায় নিচ্ছিল; কাজেই লড়াইতে আই-এন-এ'র বীরত্ব সম্পর্কে যে সব গল্পগাথা লোকের মুখে মুখে চলছিল, কেই বা তার প্রতিবাদ করে? ফলে, ভারতবর্ষে আই-এন-এ'কে কেন্দ্র ক'রে যে গণদাবি মাথা তুলে দাঁড়াল, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর লোকজন আস্তে আস্তে তার প্রতি খানিকটা সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ল; এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, ১৯৪৬ সালের গোড়ার দিকে নৌবহরে সাংঘাতিক বিদ্রোহ ও অন্যান্য দুটি বাহিনীতে ফেটে-পড়া অসন্তোষের পেছনে এর কিছুটা প্রভাব ছিল। স্বয়ং বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী পর্যন্ত সৈন্যদের মধ্যে এই নতুন মনোভাব লক্ষ্য না ক'রে পারেননি: ১৯৪৬ এর ১৫ই মার্চ মিঃ অ্যাট্‌লী বললেন: 'আজ জাতীয় ভাবধারা ছড়িয়ে পড়েছে ... যেসব সৈন্যেরা যুদ্ধে আশ্চর্য কৃতিত্ব দেখিয়েছে, তাদের একাংশের মধ্যে এর সংক্রমণ বোধ হয় কম নয়।'

ভারতবর্ষে লোকের মধ্যে সে ভাবে সাড়া পড়তে অনেক সময় লাগল। ১৯৪৫-এর জুলাইতে একদিকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আর মুসলিম লীগের মধ্যে, অন্যদিকে কংগ্রেস আর বৃটিশের মধ্যে আবার বিরোধ শুরু হল। দিল্লীতে অবস্থা দেখে মনে হল সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে আপসরফা হবার নয়—ভারতের স্বাধীনতা হয়ত আরও দশ বছরের মত পিছিয়ে গেল। ভারতের জনসাধারণের ব্যাপক অংশের মধ্যে নিশ্চিন্ত শান্ত ভাব; কংগ্রেস বৃটিশকে

মত গালাগালিই দিক, লোক ক্ষ্যাপাবার মত কোন উপলক্ষ—জেনারেল ডায়ারের মত কোন লোক, জালিয়ানওয়ালাবাগের মত কোন ঘটনা—পাওয়া যাচ্ছিল না।

এরপর যুদ্ধ শেষ হল; আজাদ হিন্দ ফৌজের কাহিনী এতদিন সামরিক গোপন খবর হিসেবে চাপা ছিল—এবার সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে তা প্রকাশ পেল। শ্রীযুক্ত নেহ্‌রু ২০শে আগস্ট বিষয়টা উল্লেখ ক'রে বললেন :

> বর্তমানে আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সৈন্যদের বিরাট একটি অংশ…বন্দী হয়ে আছে এবং তাদের মধ্যে অন্তত কিছু লোকের ফাঁসী হয়েছে।…যে কোন সময়েই তাদের প্রতি অতিরিক্ত কঠোর ব্যবহার করলে ভুল হত, বিশেষ করে এখন—ভারতবর্ষে যখন অচিরে বড় রকমের পরিবর্তন ঘটবার কথা উঠেছে। তাদের সঙ্গে যদি সাধারণ বিদ্রোহীর মত ব্যবহার করা হয় তাহলে অত্যন্ত গুরুতর রকমের ভুল করা হবে এবং তার ফল হবে সুদূরপ্রসারী। তাদের দণ্ডিত করবার মানে হবে সারা ভারত এবং সমগ্র ভারত-বাসীকে দণ্ডিত করা, কোটি কোটি হৃদয় তার ফলে ক্ষতবিক্ষত হবে।

ঠিক সেই সময়ে জার্মানি থেকে দলে দলে আসছিল স্বেচ্ছাবাহিনীর সৈন্য; তারা কিছুমাত্র অনুতপ্ত নয়, দয়ামায়ার চিহ্ন নেই এবং তাদের কারো কারো পরনে জার্মান যুদ্ধসাজ; শিবিরে ও রেজিমেণ্টের কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার সময় ট্রেনে আর স্টেশনে তাদের দর্শন মিলছিল। সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু হওয়ায় আরও একদফা প্রচারের সুযোগ পাওয়া গেল। সিঙ্গাপুর থেকে একটি ফিল্ম লুকিয়ে চুরিয়ে এনে দিল্লীতে গোপনে দেখানো হল। বেসরকারী সূত্রে যোগাড়-করা প্রচুর খবরের সঙ্গে রেঙ্গুন আর মালয়ের মুক্তিপ্রাপ্ত যুদ্ধবন্দী ও বেসামরিক ভারতীয়দের গল্প-গুজব যোগ হ'য়ে সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি লোকের মুখে মুখে ব্যাপকভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের কথা ছড়িয়ে পড়ল।

ভারত সরকার ঘোষণা করেছিল যে, আই-এন-এ'র যে সব

সাধারণ সৈনিক 'চাপে প'ড়ে এবং বিপথচালিত হয়ে শত্রুপক্ষের সৈন্য-বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল', তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করা হবে। যারা দলের সর্দার ও যাদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতার অভিযোগ আছে, কেবল তাদেরই সামরিক আদালতে সোপরদ্দ করা হবে। গোড়ায় কংগ্রেসের দিক থেকে কোন রকম বিরূপতা দেখা যায়নি, কিন্তু সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি প্রস্তাব নিল যে, 'ভ্রান্তভাবে হলেও, ভারতের স্বাধীনতাব জন্যে ব্রতী হওয়ার অপরাধে এই পুরুষ ও নারী অফিসারদের যদি দণ্ডিত করা হয়, তাহলে তা হবে চরম দুঃখের ব্যাপার। ···সুতরাং এ-আই-সি-সি একান্তভাবে আশা করে যে, (তাদের) ··অব্যাহতি দেওয়া হবে।' বিচারাধীন আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্য ও ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের বেসামরিক সদস্যদের মামলা পরিচালনার জন্যে এর দুদিন পরে কংগ্রেস একটি ডিফেন্স কমিটি গঠন করে।

কিছুদিনের মধ্যেই জানা গেল, মাউণ্ট পোপার সংলগ্ন অঞ্চলে আই-এন-এ'র ১৯৪৫-এর অভিযানের সঙ্গে জড়িত তিনজন কমাণ্ডারের নভেম্বর মাসে সামরিক আদালতে বিচার হবে। সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর মধ্যে ব্যাপকভাবে সাড়া প'ড়ে গেল। সামরিক আদালতের এই বিচারকে বর্বর দমনপীডন ব'লে কংগ্রেস অভিহিত করল এবং এই গোটা ব্যাপারে বৃটিশের কার্যধারার তীব্র নিন্দা করা হল। আই-এন-এ যে ভাষায় এতদিন নিজের ঢাক নিজে পিটিয়েছিল, সেইসব অতিশয়োক্তির সাহায্যে আই-এন-এ'র প্রশংসা ও জয়গান করা হতে লাগল : বলা হল, আই-এন এ'র লক্ষ্য আর কংগ্রেসের লক্ষ্য এক, এবং একই ব্রত-সাধনের জন্যে তাকে লাঞ্ছনা পেতে হয়েছে। নেহ্রুর 'এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না যে, যেসব পুরুষ ও নারী এই বাহিনীতে নাম লিখিয়েছিল·· তারা একান্তভাবে চেয়েছিল ভারতের স্বাধীনতার পাদপদ্মে নিজেদের ঢেলে দিতে ; এবং এও ঠিক যে, সামরিক আইনের কোন সূত্র ধ'রে তাদের বেশ বড় একটা অংশকে যদি সাজা দেওয়া হয়. তাহলে ভারতের পক্ষে সেটা শোকাবহ ঘটনা হবে।'[১] এটা স্পষ্টতই একটা পরীক্ষামূলক মামলা হিসেবে গণ্য করা হল। ডিফেন্স কমিটি তৎক্ষণাৎ কাজে হাত দিল ;

১ শাহ্ নওয়াজ-এর 'মাই মেমারিজ অব দি আই-এন-এ অ্যাণ্ড ইট্স নেতাজী' গ্রন্থে জওহরলাল নেহ্রু লিখিত ভূমিকা

কমিটির উদ্যোগে ভারতের সবচেয়ে খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবীর দল লড়াইয়ের জন্যে তৈরি হতে লাগলেন। ঠিক হল, শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই আসামী-পক্ষের মামলা পরিচালনা করবেন।

শাহ্ নওয়াজ, সাহ্‌গল ও ধীলন এ মামলার আসামী. এরা তিনজনেই ছিলেন ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর স্থায়ী অফিসার। মাউণ্ট পোপা অঞ্চলে এদের যুদ্ধ পরিচালনার বর্ণনা 'বর্মায় পরাভব' অধ্যায়ে পাওয়া যাবে। আসামীপক্ষে কৌসুলী ছিলেন সতেরো জন, তার মধ্যে শ্রীনেহ্‌রু নিজেও ছিলেন; ৫ই নভেম্বর লালকেল্লায় বিচার আরম্ভ হল। অভিযোগগুলো ছিল জটিল, সাধারণভাবে 'রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা' ছাড়াও আই-এন-এ'র সৈন্যদের প্রাণদণ্ড বিধানের অভিযোগেও এইসব অফিসারদের অভিযুক্ত করা হয়। ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বিচার চলে। লম্বা লম্বা ভাষ্যসমেত এই মামলার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সারা ভারতে প্রতিদিন প্রকাশিত হতে থাকে। আসামী-পক্ষের সমর্থনে সরাসরি বিচারের বৈধতা সম্পর্কেই প্রশ্ন তোলা হয়। যুক্তি দেওয়া হয় যে, আই-এন-এ হল যথাযথভাবে গঠিত ও ব্যাপকভাবে স্বীকৃত সরকারের সামরিক বাহিনী; প্রকৃত দেশভক্ত হিসেবেই আসামীরা এই বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ঘটনা ও আন্তর্জাতিক আইন থেকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে লম্বা নজির খাড়া করা হয়। প্রাণদণ্ড সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে আসামীপক্ষ থেকে বলা হয় যে, এই অভিযোগের কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই; আসামীপক্ষের জেরার চোটে সরকারপক্ষের একজন সাক্ষী আদালতে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে যে, তাকে আগে থেকে শিখিয়ে পড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সরকার পক্ষে ছিল ত্রিশজন ও আসামীপক্ষে বারোজন সাক্ষী; সুভাষচন্দ্রের আমলের কিছু কিছু হোমরা-চোমরা ব্যক্তিও তার মধ্যে ছিলেন। প্রামাণ্য হিসেবে একশো পঁচিশটি জিনিস দেখানো হয় এবং ঠাসা ছাপা তিনশো সাতাশী পৃষ্ঠার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

প্রথম দিন থেকেই সারা ভারতের দৃষ্টি বিচারকক্ষ ও লালকেল্লায় নিবদ্ধ হয়েছিল; জাতীয় ইতিহাসে লালকেল্লার স্থানমাহাত্ম্য এর নাটকীয়তা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। বিচার শেষ হওয়ার ঢের আগেই সারা দেশে আবেগ উথলে উঠল। শ্রীযুক্ত দেশাই বললেন, 'এই বিচারশালায় যাচাই হচ্ছে আজাদ হিন্দ ফৌজের মানমর্যাদা ও বিধিবিধান এবং পরাধীন দেশের

পক্ষে স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করবার নিরঙ্কুশ অধিকার।' শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহের বিচারের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হল; সুভাষচন্দ্র নিজেও প্রায়ই সেকথা বলতেন। শ্রীযুক্ত নেহ্‌রু দেশবাসীর মনের কথা ব্যক্ত করলেন:

> আইনের পৃষ্ঠপটে ছিল গভীরতর ও আরও মূলগত এমন কিছু, যা ভারতীয়দের মনের অন্তর্লোকে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামরত ভারতবর্ষের প্রতীক হয়ে দাঁড়াল ঐ তিন জন অফিসার আর আই-এন-এ। অন্যান্য গৌণ সমস্যা আড়ালে পড়ে গেল।...ইংলণ্ড বনাম ভারত: এই পুরনো রেষারেষি...বিচারের ভেতর দিয়ে প্রাধান্য পেল। বাস্তবিকপক্ষে সেটা শুধু আইনগত প্রশ্ন কিংবা আদালতকক্ষের বাদবিতণ্ডার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না... তার বদলে হয়ে দাঁড়াল ভারতের জনসাধারণের সঙ্গে ভারতের শাসকমণ্ডলীর ইচ্ছাশক্তির লড়াই।[২]

বিচারকক্ষের চতুঃসীমায় আইনের কোন নড়চড় হল না। যুদ্ধকার্যের বিভিন্ন অভিযোগ এবং সেই সঙ্গে প্রাণদণ্ড সংক্রান্ত একটি অভিযোগও প্রমাণিত হল। তিনজন অফিসারকেই বরখাস্ত করা হল এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল।

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে, জল অনেকদূর গড়াবে। অন্যান্য কারণ ছাড়াও, একটা বড় ব্যাপার ছিল ইংলণ্ডের লোকজনদের হয়ত এ বিষয়ে অজ্ঞতাপ্রসূত একটা একগুঁয়ে মনোভাব। কমাণ্ডার-ইন-চীফ ফিল্ড-মার্শাল স্যার ক্লড অকিনলেক যাবজ্জীবন কারাদণ্ড মকুব ক'রে দিলেন, তবে অন্যান্য শাস্তি বলবৎ রাখলেন—'কেননা কোন অফিসার বা সৈন্যের পক্ষে যে কোন অবস্থাতেই সবচেয়ে গুরুতর অপরাধ হল বিশ্বাসঘাতকতা করা এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো।' যে কোন বৈধ সরকার টিকিয়ে রাখতে গেলেই এই নীতি অক্ষুণ্ণ রাখা দরকার।

২ আই-এন-এ সামরিক আদালতের প্রকাশিত কার্যবিবরণীতে জওহরলাল নেহ্‌রু লিখিত ভূমিকা

এই বিচক্ষণ ন্যায়নীতির মধ্যে সুবিবেচনার পরিচয় ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষে তাতে কোন কাজ হল না। লোকে মনে করল, প্রধান সেনাধ্যক্ষ বুঝি আসামীদের প্রকারান্তরে খালাস ক'রে দিলেন; তাছাড়া তার দিন কয়েক আগে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, নিষ্ঠুরতার অভিযোগ ব্যতিরেকে আই-এন-এ'র আর কাউকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে না—লোকে ভাবল, কোন মামলা দাঁড় করানো যাচ্ছে না, অতএব এই ব্যবস্থা। কংগ্রেসের তখন জয়জয়কার: ভারতের জনসাধারণকে একত্রিত ক'রে আইন অমান্য যুগের সেই পুরনো বৃটিশ-বিরোধী জঙ্গী মনোভাব নতুন ক'রে জাগিয়ে তোলা হয়েছিল। যাদের বিরুদ্ধে তখনও অভিযোগের তদন্ত হয়নি, তাদের অবিলম্বে মুক্তির দাবিতে কংগ্রেস সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলন শুরু ক'রে দিল, যারা তখনও বাইরে আটক হয়ে ছিল, তাদের সবাইকে দেশে ফিরিয়ে আনবার জন্যে সরকারকে চাপ দেওয়া হতে লাগল। গান্ধীজী লাল কেল্লায় অনবরত যাওয়া-আসা করতে লাগলেন এবং বন্দীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। অপরাধ নির্ণয়ের ভার যাদের ওপর ছিল, বন্দীরা ক্রমশ তাদের জীবন দুর্বিষহ ক'রে তুলছিল। এই বাকি কাজটা তাড়াতাড়ি চুকিয়ে ফেলা হল এবং ফিরে-আসা আই-এন-এ সৈন্যদের চট পট তাদের দেশঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

বিদ্যাধরী বন্দীশিবিরে অত্যাচারের অভিযোগে সামরিক আদালতে আরও কয়েকটি বিচারপর্ব অনুষ্ঠিত হল—কিন্তু ১৯৪৬-এর মে মাসে, ক্যাপ্টেন দুররানিকে যন্ত্রণা দেবার অভিযোগে অভিযুক্ত অফিসারদের বিচার যখন শুরু হতে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে অবশিষ্ট সমস্ত মামলা উঠিয়ে নেওয়া হল।

১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে শ্রীযুক্ত নেহ্‌রু যখন সিঙ্গাপুর সফরে গেলেন তখন আই-এন-এ'র ভূতপূর্ব সদস্য হাজার হাজার স্থানীয় অধিবাসী তাঁকে বেসরকারীভাবে সামরিক কায়দায় অভ্যর্থনা জানাল—তারা যে আই-এন-এ'র সদস্য ছিল একথা স্বীকার করতে তখন আর তাদের ভয় নেই। শ্রীযুক্ত নেহ্‌রু লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে যে পথ দিয়ে গাড়িতে ক'রে গেলেন, পুরনো উর্দি প'রে সেই পথের দুপাশে তারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল। শ্রীযুক্ত নেহ্‌রু খুব খুশি হননি; তাঁর হোটেলের সামনে উর্দি-পরা একদল লোক হৈ-হল্লা করায় তাদের তিনি ক'ষে ধমক লাগালেন। অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের মত তিনিও এ কথা ভেবে মনে মনে আশঙ্কিত হচ্ছিলেন যে, যুবকদের এইসব মাতামাতির

ফলে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে শৃঙ্খলার অভাব ঘটবে—অথচ সেই বাহিনীর দায়িত্ব তো একদিন তাঁকেই নিতে হবে। কিন্তু ভারতবর্ষে কংগ্রেসের হাতে আই-এন-এ হয়ে দাঁড়িয়েছিল মোক্ষম রাজনৈতিক অস্ত্র। এই অস্ত্র হাতে পেয়ে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করার ক্ষমতা কংগ্রেস লাভ করল, তাও এমন একটা সময়ে—যখন ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে কাজে লাগাবার সাহস সরকারের নাও হতে পারে। আসলে কিন্তু ভারতীয় সৈন্য-বাহিনী ছিল খুব শক্ত ঠাঁই—আই-এন-এ সংক্রান্ত আন্দোলনের চেয়েও যদি কোন বড় ধাক্কা আসত, তাহলেও তাকে টলানো যেত না। কিন্তু ১৯৪৬ সালে বোম্বাই আর করাচীতে নৌবিদ্রোহের স্মৃতি লোকের মনে তখনও তাজা, তাই সে বিষয়ে সৈন্যবাহিনীর বাইরে আর কারো তেমন ভরসা হচ্ছিল না।

কাজেই এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘনিয়ে তুলল যুদ্ধক্ষেত্রে ভাগ্য-বিড়ম্বনার ভেতর দিয়ে নয়, বজ্রনির্ঘোষে ভেঙে যাওয়ার ভেতর দিয়ে। বিচার-পর্ব উপলক্ষ ক'রে যে হৈ-চৈ সৃষ্টি হল, তার ফলে ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রশ্ন আবার এই মুহূর্তের সব চেয়ে জরুরী প্রশ্ন হয়ে দেখা দিল। দিলীপকুমার রায় লিখেছেন, 'দিল্লীর রাজপথে গান গেয়ে বীর বিক্রমে পা ফেলে চলেছে ভারতীয় ফৌজ, তার বিস্ময়কর চমকের সঙ্গে সুভাষের অকস্মাৎ মহামহিমান্বিত মূর্তি মিলে হতাশাগ্রস্ত জাতিকে যেন ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দিল; এতদিন নিজের চারদিকে ভারতীয় ফৌজ যে প্রাচীর তুলে রেখেছিল, অচিরে স্বাধীনতা লাভের দাবিতে জনসাধারণের উৎসাহের জোয়ারে সে প্রাচীর বহুলাংশে ধ্বসে পড়ল।'

এ কথা বললে বাড়াবাড়ি হবে যে, জাপানের পরাজয়ের পর কী অবস্থা ঘটবে সুভাষচন্দ্র তা পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পেরেছিলেন; তবে নিশ্চয়ই তাঁর ভরসা ছিল যে, তিনি চলে যাওয়ার পর বর্মায় ভারতীয় সৈন্য-বাহিনীর ওপর দলভাঙা আই-এন-এ'র প্রভাব পড়বে। তিনি জানতেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম অদূর ভবিষ্যতে আবার মাথা তুলবে; এই বিশ্বাসে তিনি তাঁর অনুগামীদের মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতনের মন্ত্র দিয়ে গেলেন যে, যে ভাবেই হোক একদিন না একদিন তাদের পালা আসবেই। বিচার

স্থল হয়েছিল লাল কেল্লা, যা ছিল জাতির আরাধনার বস্তু, বিদেশী সাম্রাজ্য-বাদী ক্ষমতার প্রতীক এবং ভারতীয়দের জীবনস্রোতের কেন্দ্র ; বিচারপর্বের আকস্মিক পরিণতিতে বোঝা গেল সুভাষচন্দ্রের কতখানি প্রভাব—তাঁর এত প্রভাব আগে কখনই দেখা যায় নি। সুভাষচন্দ্রের এই বিপুল প্রভাব কংগ্রেসের খুব কাজে লেগে গেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কথা মানতেই হবে যে, সুভাষচন্দ্রের প্রখর দূরদৃষ্টি ছিল।

ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতার দ্বারদেশে, তখন এমন একজন চক্ষুষ্মান ব্যক্তিকে হারানো দুর্ভাগ্য বলতে হবে ; গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার দিক থেকে একমাত্র ১৯৪৮ সালে গান্ধীজীর হত্যার সঙ্গে কতকাংশে এর তুলনা চলতে পারে। কেননা মৃত্যুকালে সুভাষচন্দ্রের বয়স ছিল মাত্র আটচল্লিশ ; শ্রীযুক্ত নেহ্‌রুর চেয়ে আট বছরের ছোট। চব্বিশ বছরের রাজনৈতিক জীবন সত্ত্বেও তুলনায় তিনি নবীন, তখন তিনি কতকটা তারুণ্যের মুখপাত্র, যুবকদের কাছে দুর্নিবার তাঁর আকর্ষণ এবং অবিসংবাদিত ভাবে তখনও তাঁর দিক থেকে স্মরণীয় বহু কিছু দেবার ছিল। কী তিনি দিয়েছেন এবং কী তিনি দিতে পারতেন—সে বিচার তাঁর স্বদেশবাসীদের করতে হবে : তাঁর অসাম্প্রদায়িকতার যাথার্থ্য, তাঁর আভ্যন্তরীণ নীতির যুক্তিযুক্ততা ও কার্যক্ষমতা খতিয়ে দেখতে হবে। এখানে শুধু সেই প্রসঙ্গের অবতারণা করা যাক, যে প্রশ্ন তিনি নিজেই তুলতেন : 'তিনি কি ইতিহাসে অমর হবেন ?'

ত্রুটি অনেক ছিল, তা অস্বীকার করা যায় না। তাঁর নবদীক্ষিতের আত্মপ্রত্যয় দিনে দিনে দুরন্ত আত্মম্ভরিতার রূপ নিয়েছিল। ১৯২৮ সালে তাঁর কতই বা বয়স—জেলের বাইরে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা অর্জনের খুব বেশী সুযোগ তখনও তিনি পাননি—অথচ তখনই বিনা দ্বিধায় জোরের সঙ্গে তিনি শুধু বৃটিশের ভুল হয়েছে ব'লেই ক্ষান্ত হননি, বলেছেন গান্ধী ভ্রান্ত, বলেছেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে রহস্যবাদী আর অসার তত্ত্বজ্ঞের কোন স্থান নেই। পরবর্তী দশ বছরে এ বিষয়ে তাঁর ধারণা আরও বদ্ধমূল হল যে, গান্ধী ভ্রান্ত এবং একমাত্র তিনিই সঠিক : গান্ধী হলেন 'সাবেকী, অকেজো আসবাব মাত্র'। ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস সভাপতি করা হয় ; গান্ধী বোধহয় আশা করেছিলেন যে, এর দ্বারা অসন্তুষ্ট তরুণকে কংগ্রেসের গতি-পথে টানা যাবে ; কিন্তু ১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র খোলাখুলিভাবে বিদ্রোহ

ঘোষণা করলেন। তাঁর জয় হল ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু তারই মধ্যে এমনভাবে তিনি গান্ধীর সঙ্গে কথা বললেন যেন গান্ধীকে তিনি ধরাশায়ী করেছেন। তাহা হেরে গিয়ে তিনি গদিচ্যুত হলেন, যে ব্যাপক গণসমর্থন পাবেন ব'লে তিনি ধ'রে রেখেছিলেন সে সমর্থন পাওয়া গেল না, নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে কংগ্রেস তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তি-বিধানের সিদ্ধান্ত নিল—এত কাণ্ডকারখানার পরেও তাঁর বিন্দুমাত্র চৈতন্যোদয় হল না। তখনও তিনি অভ্রান্ত, এত অভ্রান্ত যে, বৃটিশের হাত থেকে তো বটেই, দেশকে তার নিজের হাত থেকেই বাঁচাবার জন্যে তাঁর হুভাগা, শৃঙ্খলিত, বিপথচালিত ভারতবর্ষ থেকে পালানো ছাড়া উপায় নেই।

অক্ষশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর ব্যবহারে ক্রমশ বেশী ক'রে এক-নায়কত্বের ভাব ফুটে উঠতে লাগল। নিজে তিনি পয়লা-নম্বরের বিদ্রোহী, কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কোন রকম বিদ্রোহ, কোন রকম সমালোচনা, তাঁর মতানুযায়ী সহযোগিতার ব্যাপারে কোন রকম অক্ষমতা তিনি সহ্য করতে নারাজ, যে লোক এতদিন অন্য কারো দুঃখ সইতে পারত না; সে তাঁর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতা দেখেও দেখল না। রাজনৈতিক ঘটনাস্থল থেকে যখন তিনি এত বিচ্ছিন্ন যে, সেখান থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত করা যায় না, নিজের অসহিষ্ণু স্বভাবের জন্যে যখন তাঁর এমন বন্ধু নেই যে তাঁর ভুল ধরিয়ে দেয়—তখনও তিনি সমানে কংগ্রেস, জিন্না, লর্ড ওয়াভেলের দোষ দেখছেন, শেষে এই হল: গান্ধীজীকে বিশ্বাস করা গেল না যে, তাঁর দ্বারা ভারতের মঙ্গল হবে; আর কোথাকার কে রাশিয়া, তাকে বিশ্বাস করা হল যে, সে সাহায্য করবে।

অন্য কতকগুলো জিনিস তাঁর মধ্যে আমরা বৃথাই খুঁজি। হাস্য-পরিহাসের ক্ষমতা থাকলেও রসবোধের অভাব ছিল: তাঁর কৌতুকে থাকত জ্বালা, ধারের চেয়ে ভার বেশী। বন্ধু আর মোসাহেবের মধ্যে সব সময়ে তিনি তফাৎ করতে পারতেন না। তাঁর বক্তৃতা বাংলায় বা উর্দুতে হয়ত ওজস্বী হত—কিন্তু ইংরাজিতে হত শুধু ছকে-ফেলা ছেঁদো কথা, একঘেয়ে কথার পুনরাবৃত্তি। শরীরে তাঁর ভয় ডর ছিল না, অন্য যে কারো মত তিনি মাথা উঁচু ক'রে বোমাবর্ষণ কিংবা বুলেটের সামনে দাঁড়াতে পারতেন। যথেষ্ট মনের জোর না থাকলে ভারতবর্ষ থেকে পালানো কিংবা দূর প্রাচ্যে যাত্রা সম্ভব হত না। জাপানীদের হাত থেকে যথেষ্ট সাহসের সঙ্গে তিনি তাঁর

স্বাতন্ত্র্য বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু একেক সময়ে তিনি নিজেকে ঠিক রাখতে পারেননি—মেকটিলা থেকে তাঁর পালানো, ষ্টাফ অফিসারদের দল ত্যাগে ধৈর্য হারিয়ে ফেলা এবং বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারে ফতোয়া জারি করা। মাঞ্চুরিয়া অভিমুখে অগ্রসর রুশ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের চড়ান্ত পরিকল্পনার মধ্যে তাঁর যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় ছিল, কিন্তু তার আগে সাইগানে, সিঙ্গাপুরে, রেঙ্গুণে—এমন কি যে পিনমানাতে থাকার সময়ে তিনি বলেছিলেন আমৃত্যু লড়বেন, পিনমানাতেও তাঁর অনেক দ্বিধা দুর্বলতা দেখা গিয়াছিল। ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তিনি সাহসের সঙ্গে বিদ্রোহ করেছিলেন; কিন্তু তার আগেও তাঁর মধ্যে দ্বিধার ভাব দেখা গিয়েছিল। যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে, সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে, রাশিয়ার ব্যাপারে, ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ও আই-এন-এ'র মনোবল সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল মোহগ্রস্ত; তিনি সেটাই বিশ্বাস করতেন যেটাতে তাঁর সুবিধা; যুদ্ধের ভেতর দিয়ে যে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক, সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছে, সে ব্যাপারটা একেবারেই তাঁর মাথায় ঢোকেনি: সামরিক বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল অবিশ্বাস্য রকমের কম। ফুজিহারা তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন:

> সৈন্যবাহিনীর নেতা হিসাবে সুভাষচন্দ্র ছিলেন আই-এন-এ সংগঠনের প্রাণশক্তির উৎস ও খুঁটি। তা সত্ত্বেও সখেদে স্বীকার করতে হবে যে, তাঁর যুদ্ধের কৌশল ছিল অত্যন্ত নিম্নস্তরের। বাস্তবের দিকে না তাকিয়ে তিনি চাইতেন কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করতে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আই-এন-এ'র যুদ্ধ ক্ষমতা সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও তিনি সব সময় দাবি করতেন যে, আই-এন-এ'কে যেন স্বতন্ত্র-ভাবে ও চূড়ান্ত পর্যায়ের লড়াইতে নামানো হয়…এবং যখন অবস্থার ফেরে জাপানীরা পশ্চাদপসরণ করতে লাগল…তিনি বার বার বলতে লাগলেন যে, আই-এন-এ'র এখনও উচিত লক্ষ্য সাধনের জন্যে মিত্র-শক্তির সম্মুখীন হওয়া।

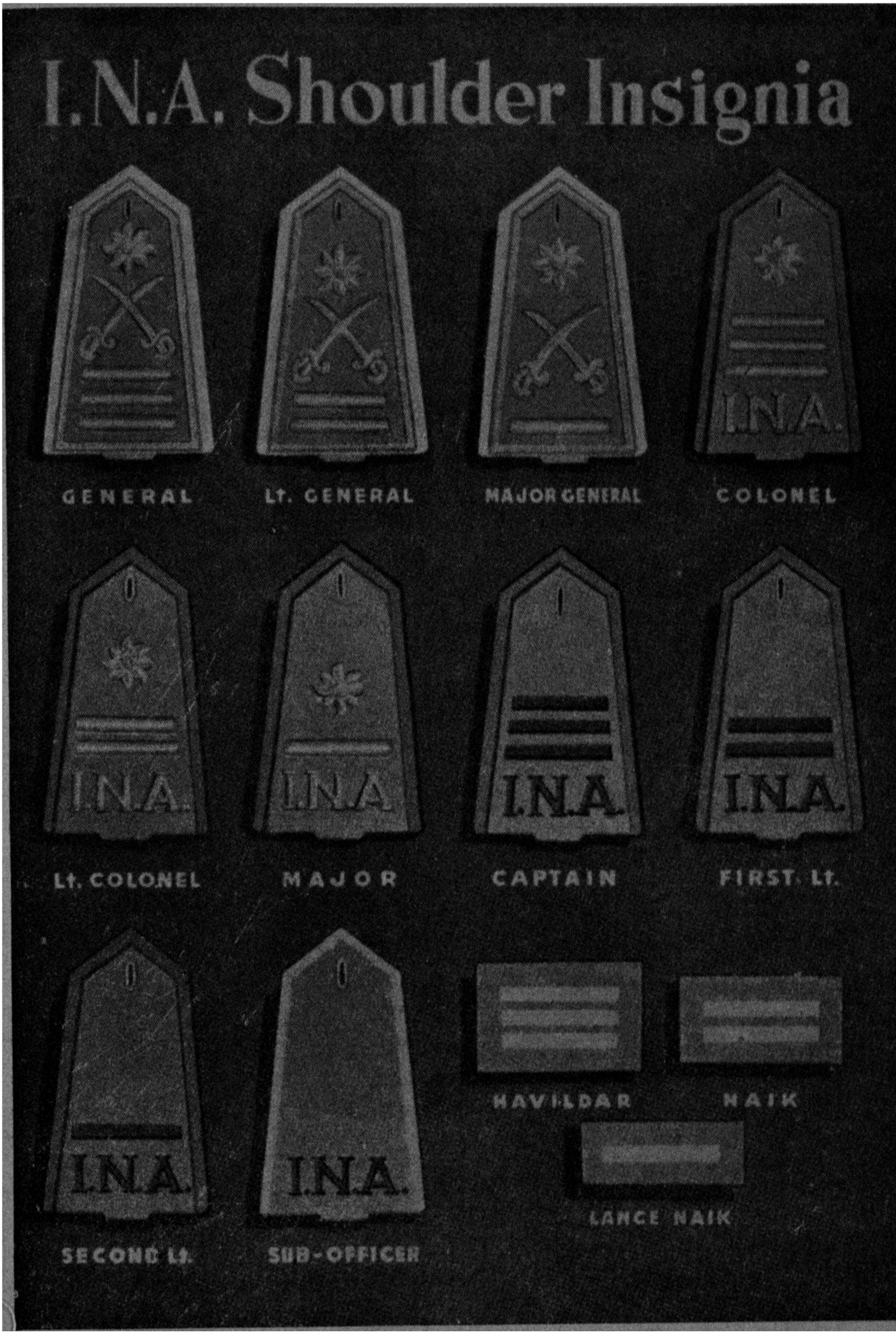
তবু নিজের ওপর আস্থা, নিজের বুদ্ধিবিচারের ওপর নির্ভর ক'রে সর্বস্ব পণ করা—এর একটা দাম আছে। সুভাষচন্দ্রের বড় গুণ ছিল তাঁর

একাগ্রচিত্ততা ; এই গুণ থেকেই তাঁর স্বভাবে বহু ত্রুটি দেখা দিয়েছিল। যারা তাঁর সংস্পর্শে আসত, তারা প্রায় সকলেই তাঁর ব্যক্তিত্বে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ত : তাঁর মধ্যে ছিল অসাধারণ উৎসাহ-উদ্দীপনা, অসামান্য প্রাণশক্তি। লোকে দেখত তাঁর কাছে থাকলে আদর্শ হয় ধ্যানজ্ঞান , তাঁর দৃষ্টিই সকলের দৃষ্টি, তাঁর চিন্তাই সকলের চিন্তা, তাঁর মুখের কথায় তারা সব কিছু করতে পারে। কী আই-এন-এ'র মধ্যে, কী বাংলাদেশে এমন কেউ ছিল না যে তাঁকে অমান্য করে। বাঙালী জাতির বহুবাঞ্ছিত ত্রাণকর্তা, যিনি সবাইকে এক করবেন, সবাইকে জাগিয়ে তুলবেন—এই ব'লে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার জয়গান করেছিলেন। আই-এন-এ'র অন্যান্য বহু অফিসার তাঁর সম্পর্কে কী মনোভাব পোষণ করতেন, শাহ্‌ নওয়াজের কথা থেকে তা বোঝা যায় :

> যখনই আমি তার সংস্পর্শে এলাম, তখন থেকেই আমার ওপর তিনি এক আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এখনও আমি স্পষ্ট করে জানি না—মানুষ, না সৈনিক, না রাজনীতিক হিসাবে তিনি বড়। ঘরোয়া পরিবেশে তাঁর মানবিক গুণগুলোই বড় হয়ে ফুটে উঠত : যুদ্ধক্ষেত্রে আর তাঁর সৈন্যদলের মাঝখানে সৈনিক হিসাবে আশ্চর্য মহিমা প্রকাশ পেত এবং সভাসম্মেলনে ও তাঁর দপ্তরে...... আমরা প্রত্যেকেই তাঁর অসামান্য রাজনৈতিক কুশলতা দেখে বিস্মিত হতাম।

প্রকৃতপক্ষে তিনি না ছিলেন ভাল সৈনিক, না ছিল তাঁর রাজনৈতিক হিসাবে অভ্রান্ত বিস্ময়কর প্রতিভা, যা আছে বলে তাঁর শিষ্যরা মনে করত—তার জন্যই তাঁর মোহবিস্তারের ক্ষমতা দেখে অবাক হতে হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় সম্প্রদায়কে তিনি প্রথম মিলিত হবার একটি ভাবাদর্শ দিলেন এবং তাঁর অধীনস্থ বহু সৈন্যের মধ্যে এমন এক আনুগত্য সৃষ্টি করলেন, যার ফলে তাদের মন থেকে সাময়িকভাবে দূরবর্তী রাজা সম্পর্কে ভাবনা চিন্তা মুছে গেল।

কেবল এরই মধ্যে ছিল মহত্ত্বের উপাদান, একাগ্রচিত্ত আত্মনিবেদনকারী নেতার মহত্ত্ব—অবশ্য আশা বলতে কিছু ছিল না। তা হলে কি এর


I.N.A. Shoulder Insignia
GENERAL
Lt. GENERAL
MAJOR GENERAL
COLONEL
Lt. COLONEL
MAJOR
CAPTAIN
FIRST Lt.
SECOND Lt.
SUB-OFFICER
HAVILDAR
NAIK
LANCE NAIK

№ 38914

INDIAN INDEPENDENCE LEAGUE

B No. 38914

INDIAN INDEPENDENCE LEAGUE

On behalf of the INDIAN INDEPENDENCE LEAGUE

NETAJI FUND

UNITY FAITH · SACRIFICE.

Indian Independence League Headquarters

P. O. Box No. 63
Tele { GRAMS JAYASHAKAT
PHONE 81500

No.7 Chancery Lane,

SYONAN 4th May, 1943.

Ref HQ/5/1

The Chairman,
The Indian Independence League,
MEDAN, SUMATRA.

Dear Sir,

An enormous amount of money is required for the purpose of the training of the Civil Volunteers and other expenditures connected with the Indian Independence Movement. You are hereby authorised to collect voluntary donations for the said purpose from the Indians of those places in Sumatra where the Indian Independence League Branches have not yet been opened.

Yours in Service,

Rash Behari Bose

President

INDIAN INDEPENDENCE LEAGUE
EAST ASIA

Provisional Government of
Azad Hind,
Head Office, Room No.306,
Nippon Hotel, Rue Catinat
Saigon, 9-9-44.

To Jnab J.M.Abdul Aziz Sahib,

Jai Hind,

Will you be kind enough to pay the promised amount for Netaji -und before the 11-9-44.

As Janab Shaik Mohamed advised me, the amounts of $3000.-of Abbasali and 25,000.-of A.T.E.Maskati of Pnem-Penh have been paid up with you.

Please pay pay the above 28,000.-as well as yours contribution

Yours truly,
S.C.Alagappan, Lt.Colonel,
Minister of Supplies
Department,

Provisional Government of
Azad Hind.

নেতাজী তহবিলের দলিল

চেয়েও তাঁর বড় পরিচয় আছে? ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, সেই স্বপ্নের ধরনের মধ্যেই এর জবাব মিলবে। কোন্ লক্ষ্যে তিনি নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন? এ বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে ভারতের ঐক্যের ব্যাপারে তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহের কথা মনে রাখতে হবে এবং তিনি এও মর্মে মর্মে বুঝতেন যে, ভারতবর্ষের ঘাড়ে ভর ক'রে আছে অন্তর্নিহিত নানা কুসংস্কার। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, ছুঁৎমার্গ এবং হিন্দুসমাজের কালজীর্ণ অন্যান্য কুপ্রথা আপনা আপনি দূর হবে না। যদি একটি জবরদস্ত সরকার সুচিন্তিত সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুযায়ী চলে একমাত্র তা হলেই বালাইগুলো দূর হতে পারে, বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী ও ধর্মসম্প্রদায় এক থাকতে পারে এবং আধুনিক শিল্প-সমৃদ্ধ গণতন্ত্র হিসেবে ভারতের রূপান্তর ঘটতে পারে। ভারতবর্ষে জবরদস্ত সরকার চাই—সুভাষচন্দ্রের এই বিশ্বাস পাশ্চাত্যে গড়ে উঠেছিল; তবে তাঁর আদর্শ ছিল মুস্তাফা কামালের আমলের তুর্কী—নাৎসী কিংবা ফ্যাসিস্টবাদের নকল নয়। ভারতবর্ষের সামনে সমাজে পরিবর্তন আনবার যে সমস্যা, মুস্তাফা কামালকেও সেই একই সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র ভেবেছিলেন যে, একটি জবরদস্ত কংগ্রেসী সরকার ভারতবর্ষে আগে বড় রকমের সামাজিক বিপ্লব ও শিল্পবিপ্লব সাধন করবে; তারপর হয়ত বছর কুড়ি পরে ভারতবর্ষের শাসনভার গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থার হাতে তুলে দেওয়া হবে।

অপর পক্ষে, স্বাধীনতার পরেকার ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন রকম পরিকল্পনা করতে গান্ধীজী শুধু যে অনিচ্ছুক ছিলেন তাই নয়—ক্ষমতা প্রয়োগ করবার ব্যাপারেও মনে হয়েছিল তাঁর মধ্যে দৃঢ়তার অভাব আছে। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর আসলে এই জায়গাতেই বিরোধ: এর অন্তরালে ছিল দামালস্বভাব বাঙালী ঐতিহ্য। সুভাষচন্দ্র মনে করতেন যে, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর হলে ভারতবর্ষ বিভক্ত হবে এবং নতুন শাসকপার্টির এমন কর্তৃত্ব ও প্রতিপত্তি থাকবে না যার জোরে সংস্কার চালু করতে পারবে। আসলে বৃটিশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ভেতর দিয়েই গড়ে উঠবে ভারতের ঐক্য এবং ভবিষ্যৎ শাসনকর্তাদের প্রভাবপ্রতিপত্তি। লড়াই যতই তীব্র হবে, গৌরব ততই বাড়বে। সেইজন্যেই সুভাষচন্দ্র বার বার বলতেন লড়াই শেষ পর্যন্ত চালু রাখতে হবে; ১৯৩৯ সালে তিনি বলেছিলেন, বিপ্লবের পথ গ্রহণ

করতে : আপসরফার কথা উঠলেই তিনি প্রবলভাবে আপত্তি করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত আপসরফা ঠেকাবার জন্যে সন্ত্রাসবাদের দিকেও ঝুঁকেছেন।

সুভাষচন্দ্রের বরাবরের ধারণা ছিল যে, যুদ্ধে বৃটিশের পরাজয়ের ফলে আসল ক্ষমতা লাভের পথ প্রশস্ত হতে পারে। ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসকে বিদ্রোহের পথে টেনে নিয়ে যেতে অপারগ হওয়ায় যখন সুভাষচন্দ্রের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল, তখন তাঁর প্রথমেই মনে হল জার্মানরা যুদ্ধ জয় করবার আগে ভারতের স্বাধীনতার স্বপক্ষে রাশিয়ার সাহায্যপ্রার্থী হতে হবে; তার ঠিক পরেই তাঁর মনে হল ভারতবর্ষ সম্পর্কে জার্মানদের আচরণ ঠিক করবার ব্যাপারে তিনি নিজে তাঁর প্রভাব খাটাবেন। গোড়ার দিকে যখন দেখা গেল জাপান ক্রমাগত জিতছে, তখনই তিনি দূর প্রাচ্যে চলে গেলেন। হিটলারের কাছ থেকে যা পাওয়া যায়নি, সুভাষচন্দ্র তা তোজোর কাছ থেকে আদায় করেছিলেন; জাপানী জঙ্গী সরকারের হাত থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করবার জন্যে তিনি ঠিক করেছিলেন যে, দরকার হলে তিনি নিজেই কংগ্রেসী একনায়কতন্ত্রের কর্তা হবেন। এমন কি যখন তিনি নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলেন যে, জাপান পরাজিত হবে—তখনও তিনি চেয়েছিলেন ভারতবর্ষে পা রাখার একটু জায়গা ক'রে সেখান থেকে আই-এন-এ'র বলবৃদ্ধি ঘটিয়ে ভারতে গোলযোগ জীইয়ে রাখতে।

বর্মা হাতছাড়া হল; তারপর ব্যাঙ্ককের পথে কায়ক্লেশে বেদনাময় যাত্রা—কিন্তু তাতেও তিনি হাল ছাড়েন নি। সুভাষচন্দ্র তখনও ভাবছিলেন যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যাই ঘটুক ভারতবর্ষে তাঁর আদর্শ জয়যুক্ত হবে। তিনি দেখলেন এবার আই-এন-এ'র মারফৎ ভারতীয় সৈন্যবাহিনী সংক্রামিত হবে, তার ফলে বৃটিশের মুঠো আরও আল্গা হবে এবং জাতীয়তাবাদীদের আত্মবিশ্বাস দৃঢ়তর হবে। ভারতবর্ষে রাজনৈতিক আপসের বিরুদ্ধে এখনও তাঁকে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে; তিনি আঁচ করতে পারছিলেন যে, আমেরিকা ভারতের প্রতি তখনও সহানুভূতিশীল এবং স্পষ্ট বুঝতে পারছিলেন যে, যুদ্ধ শেষ হলে রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমী দেশগুলোর বিরোধ বাধবে—কাজেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাইরে থেকে সাহায্য পেতে হবে—তা সে আমেরিকার কাছ থেকেই হোক, কিংবা রাশিয়ার কাছ থেকেই হোক। তিনি কখনই আশা ছাড়বেন না : যে ভাবেই হোক, তাঁর

ধারণা, স্বপ্ন সফল হবে। এই সাফল্যের পর আসবে সংস্কার সাধনের পালা। অশিক্ষা, জাতিভেদ, প্রকাশ্য দুর্নীতি ও মেয়েদের ক্রীতদাস-প্রায় অবস্থার নিরসন করতে না পারলে ভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। যতদিন না এই সব ব্যাপার ঠিক ঠাক হচ্ছে, কেন ভোট দিচ্ছে এ কথা লোকে যতক্ষণ না বুঝছে, পত্রপত্রিকাগুলোর যতক্ষণ না কিছুটা দায়িত্বজ্ঞান হচ্ছে—ততক্ষণ বৃটিশের মত কল্যাণকর স্বৈরতান্ত্রিক প্রথায় ছাড়া কোন প্রশাসন চলতে পারে না। স্বৈরতান্ত্রিক উপায় ছাড়া ঐ সব সংস্কার সাধন সম্ভবও নয়ঃ ব্যাধিগুলো জটিল, নানারকম কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে জড়ানো।

এই ধারণার বিশালতা, তাঁর দুরন্ত উৎসাহ যা অন্যকে টানে, তাঁর লেগে থাকার ক্ষমতা ও ব্যক্তিগত প্রাণশক্তি, তাঁর রেখে-যাওয়া আত্মোৎসর্গকারী দেশভক্তির ঐতিহ্য—এই দিয়েই সুভাষচন্দ্র বসুর মহত্ত্বের পরিমাপ করতে হবে। ভারতের ইতিহাসে তার স্থান অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের লোকে তাঁকে মাথায় ক'রে রেখেছিল; তার দুরন্ত সাহস, তাঁর বীরত্বব্যঞ্জক চালচলন, তাঁর বিপদ অগ্রাহ্য করা বেপরোয়া ভাবের জন্যে সারা ভারতবর্ষের হৃদয় তিনি জয় করেছিলেন। নিজের দেশকে তিনি বহু কিছু দিয়ে গেছেন। যা তিনি গড়েছিলেন তার সমস্তই ভেঙে পড়লেও কিছু কিছু সার জিনিস থেকে গেল। ভারতে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা যদি তিনি বেঁচে থেকে দেখে যেতে পারতেন, তাহলে তাঁর কাছ থেকে আরও অনেক কিছু পাওয়া যেত।

সুভাষচন্দ্রের বিয়োগান্ত পর্ব শেষ করবার আগে আরও কিছু বলবার আছে। স্বদেশের ইতিহাসে তিনি তাঁর ভূমিকা—কেউ কেউ বলবে, বীরের ভূমিকা—পালন করেছেন। যদি তাঁর প্রথম জীবন জাতিবিদ্বেষে কণ্টকিত না হত এবং যদি ১৯১৯ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত ভারতীয় রাজনীতি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হত, তাহলে ভারতের ইতিহাসে তিনি এক অতুলনীয় স্থান অধিকার করতে পারতেন। দীর্ঘকাল ধ'রে বৃটেন কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করেছে ভারতীয় জনসাধারণকে শাসন করতে; বৃটেন ও সেই ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে যাবতীয় বিসংবাদের প্রতীক হিসেবে সুভাষচন্দ্রকে দেখা যেতে পারে। কী সেই বিসংবাদ, তার সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টা না করলে এই পর্যালোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ভারতের জননেতাদের বিদ্রোহের যদি কোন

যুক্তি থেকে থাকে, তাহলে তা কী? আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়বার কী কারণ ঘটেছিল? বৃটেনের কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রকৃতপক্ষে আক্ষেপ করবার কী আছে?

এ কাহিনী বহুবার বলা হয়েছে। শতাধিক বছর ধ'রে ভারতে বৃটিশের শাসন পরিচালনায় ক্রমান্বয়ে প্রগতির পরিচয় পাওয়া গেছে। ১৮১৮ সালে ওয়ারেন হেষ্টিংস্, ১৮২৪ সালে সার টমাস মান্‌রো এবং ১৮৪৪ সালে সার হেন্‌রি লরেন্স আশা করেছিলেন এমন দিন আসবে যখন বৃটিশ রাজত্বের অবসান হবে। এঁরা এমন এক যুগের মানুষ যখন সাম্রাজ্যের অধিকারী হওয়ার জন্যে অর্ধেক পৃথিবীর কাছ থেকে কোন জাতিকে নিন্দা-ভৎসনা কুড়োতে হত না—বরং তখন পশ্চিমী সভ্যতার চূড়ান্ত আত্মপ্রত্যয়ের মধ্যে এই ধারণাই জন্মেছিল যে, পাশ্চাত্যের সঙ্গে সংস্পর্শের দরুণ পশ্চাৎপদ প্রাচ্যের কল্যাণ অবধারিত। ভারতবর্ষ তখন পশ্চাৎপদ, দুর্ভিক্ষ আর মহামারীতে বারে বারে সে দেশের মানুষ উজাড় হয়েছে, স্বেচ্ছাচারী আর নিষ্করুণ শাসকদের নাগপাশে তারা বন্দী, অর্থনীতি আর প্রশাসনের ক্ষেত্রে তখন অরাজকতা। ভারতবর্ষ 'বৃহৎ জাতিসভায় এক আলোকপ্রাপ্ত মহান মিত্র হবে—এ ছবি সেদিন শুধু স্বপ্নে দেখাই সম্ভব ছিল। তবু সেই আদর্শই অনুসরণ করা হয়েছিল। এরপর বৃটেনে একের পর এক যে সব সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তারা জাতীয়তাবাদী ধারার সঙ্গে সমানে তাল রেখে চলেছে এবং ক্রমান্বয়ে নিয়মতান্ত্রিকতার পথে অগ্রগতি মঞ্জুর করেছে। শেষ পর্যন্ত আবির্ভূত হয়েছে দুটি আলোকপ্রাপ্ত স্বাধীন দেশ। বৃটেনের পক্ষে তার শাসন বজায় রাখবার আর কোন যুক্তি রইল না।

দৃষ্টি যাদের স্বচ্ছ, ভারতবর্ষে মোটামুটিভাবে শতবর্ষের প্রগতি যাদের চোখে পড়েছিল—এমন কি ১৯৩৯ সালেও তাদের এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না যে, ভারতবর্ষকে কালক্রমে স্বাধীনতা দান করতে বৃটেন বদ্ধপরিকর। কার্যত এ সিদ্ধান্ত ১৯১৭ সালেই গৃহীত হয়েছিল; একবার মেনে নিয়ে পরে তার বিরুদ্ধাচরণ করা আর সম্ভব ছিল না। কিন্তু শেষ পঁয়ত্রিশ বছরে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যে বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল, তার ফলে ১৯৩৯ সাল নাগাদ স্বচ্ছদৃষ্টিসম্পন্ন ভারতবাসীর খুবই অভাব দেখা গেল।

এর কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে মিঃ গাই উইন্ট[৩] সবিস্তারে

৩ 'দি বৃটিশ ইন এশিয়া

ও সুসম্বদ্ধভাবে আলোচনা করেছেন, এ গ্রন্থে তাহা করা সম্ভব হয়নি। মিঃ উইণ্ট দেখিয়েছেন যে, কি ভাবে বৃটিশ শাসনের প্রভাবে এক আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে, যারা আধুনিক পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ ক'রে হিন্দুসমাজের নৈতিক পথ পরিত্যাগ করেছে ; তাঁর মতে, 'মানুষের জীবন-যাত্রার পেছনে কোনরকম ধর্মগত অথবা নীতিগত সমর্থন থাকেনি।' ফলত যে বস্তুতান্ত্রিকতা ও আত্মপরতার সৃষ্টি হল, তাতে সামাজিক নৈরাশ্য ও শেষ পর্যন্ত সব কিছুতে অবিশ্বাস দেখা দিল। এ থেকেই উনিশ শতকের শেষ দশ বছরে হিন্দু পুনরভ্যুত্থান ও বিশ শতকের প্রথম দশ বছরে বাংলা ও পাঞ্জাবে অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষিত বিপ্লবীদের উদ্ভব ঘটে।

এ ছাড়া রাজনৈতিক ব্যর্থতাবোধও এর অন্যতম কারণ ছিল ; দ্বিতীয় অধ্যায়ে সে বিষয়ে আমি আলোচনা করেছি।[১] কালক্রমে ভারতবর্ষ স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকারী হবে, একথা মেনে নেওয়া হয়েছিল এবং গোড়ায় পরিষ্কারভাবে এ ব্যাপারে বৃটিশের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এর পর ভারতীয় সিপাহী বিদ্রোহের ফলে যে অনুচিন্তা এবং ভিক্টোরিয়ার আমলে যে বিশাল সাম্রাজ্যবাদী জাকজমক দেখা দেয়, তাতে সে উদ্দেশ্য টিম টিম করতে থাকে। নিয়মতান্ত্রিক অগ্রগতি অব্যাহত থাকল বটে, কিন্তু তার পরিষ্কার কোন লক্ষ্য রইল না ; প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে বোঝা গেল, সঙ্কট আসন্ন। উদার মতাবলম্বী রাষ্ট্রনায়কেরা দেখলেন : বড়লাটের পরিষদ্‌দের সম্পর্কে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে তারা দেশবাসীর প্রয়োজন ও মেজাজ বুঝে চলতে পারে। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমনভাবে মৌলিক সংস্কার সাধন করতে হবে যাতে স্বাধীনতার দাবি অবিলম্বে বিবেচ্য হতে পারে এবং ভারতীয়দের সম্পর্কে ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। ভারতবর্ষে যদি বৃটেন তার শরিকানা বজায় রাখতে চায়, তাহলে শেষোক্ত সামাজিক ব্যাপারটার ওপর সবচেয়ে বেশী জোর দিতে হবে। ইংলণ্ড তার বিধিবিধান, তার সভ্যতা ও তার সংস্কৃতি সবই দিয়েছে, দেয়নি শুধু তার সমাজ। রাজনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে যদি সামঞ্জস্য আনতে হয়, তাহলে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান ভারতবাসীর সঙ্গে ইউরোপীয় সম্প্রদায়কে সামাজিক জীবনে মিশে যেতে হবে।

১ ৩২ পৃঃ দ্রষ্টব্য

১৯৫২ সালে মালয়ে অনুরূপ সমস্যায় খোলা মন ও বিরাট সাহসের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু সেই আংশিক সাফল্যের পেছনে ছিল দীর্ঘ ত্রিশ বছরের বৃটিশ সামাজিক বিপ্লব। ১৯১৮ সালের ভারতবর্ষে সমানাধিকারের ভিত্তিতে ভারতীয়দের সঙ্গে সামাজিকভাবে মেলামেশা করা ইউরোপীয়দের পক্ষে শুধু অবাঞ্ছিত নয়, কল্পনাতীত ছিল: বর্ণবৈষম্যের ব্যাপারটা খুব সাবধানে প্রকাশ পেত, কিন্তু বৈষম্যের দেওয়ালটা ছিল শক্ত। এর পেছনে ছিল নানারকমের কারণ। ছিল মেজাজের তফাৎ; ছিল ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের একচেটিয়া অধিকারযুক্ত ক্লাব, যার গণ্ডীবদ্ধতা জাতিগত পার্থক্যের অকাট্য প্রমাণ হিসেবে গণ্য হত। এ ছাড়া আরও নানা সামাজিক কারণও ছিল—জাতিভেদ প্রথা ও ভারতীয় মেয়েদের পর্দানশিনতার ফলে একেই অবাধে মেলামেশা করা সম্ভব হত না, তার ওপর ইউরোপীয়দের মধ্যে কেউ কেউ বুর্জোয়া কুলোদ্ভব হওয়ায় তাদের কৌলিন্যে বাধত। তবে না মেশার প্রধান কারণ ছিল নানা রকমের ভয়: ভারতীয় সিপাহী বিদ্রোহের আকস্মিক বর্বরতার কথা মনে ক'রে এবং সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চোখের ওপর দেখে তাদের ছিল প্রাণের ভয়: রক্তে মিশ্রণ ঘটবার ভয়,[৫] ইউরোপীয়দের অধিকৃত উচ্চ পদে প্রতিযোগিতা দেখা দেওয়ার ভয়। মনের মধ্যে ভয়গুলো চাপা থাকত; তবে ভয় একেবারে যেত না। জাতি হিসেবে নিজেদের অহেতুক উচ্চ মনে করা এবং কৃষ্ণকায়দের সম্পর্কে ঘৃণার ভাব পোষণ করা, শ্বেতকায়দের সম্বন্ধে বড়াই করা অথবা এটা ধ'রে নেওয়া যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেতে গেলে যে অদম্য সাহসী নেতৃত্ব দরকার ভারতীয়দের মধ্যে তা কখনই দেখা যাবে না—এর ভেতর দিয়ে ইউরোপীয়দের মনের ভয় প্রকাশ পেত।

রাতারাতি এসব ভাঙা যাবে, এটা আশা করাই ভুল। হয়ত আস্তে আস্তে পরিবর্তন ঘটালে লোকে আপত্তি করত না। অন্তত বৃটিশের মতই অবস্থা উপলব্ধি করেছিল ব'লেই বোধহয় ভারতীয় জনমত চাপ সৃষ্টি করেনি—যদিও তারা প্রতিবাদ না জানিয়ে স্থির থাকতে পারেনি যখন মাঝে মাঝে এমন কি সংস্কৃতিবান ও উচ্চ সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন ভারতীয়দেরও অসম্মান পেতে দেখেছে। কিন্তু ১৯১৮ সালের যে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড প্রস্তাবে

৫ 'অ্যান এসে অন রেশিয়াল টেন্‌শন', ফিলিপ মেসন, ৮০ পৃঃ

সামাজিক পরিবর্তন দাবি করা হল, ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের কাছে তা চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়াল। রাউলাট রিপোর্ট তখন সবে বেরিয়েছে; সাম্প্রতিক কালে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ যে কত ব্যাপক আকার নিয়েছে, এই প্রথম তা প্রকাশ পেল। আগেকার মত আবার নিরাপত্তার অভাব অনুভূত হতে লাগল—ভাই-ভাই ভাব দেখাবার এটা সময় নয়; সুতরাং যাতে কোন অঘটন না ঘটে, তার জন্যে আগে থেকেই নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। ইংলণ্ড থেকে যারা সফরে আসে, এদেশে সপরিবারে যাদের সদাসর্বদা প্রাণ হাতে ক'রে থাকতে হয় না—বড় বড় আদর্শের বুলি তারাই আওড়াতে পারে: ওসব লোক এর মর্ম বুঝবে না এবং ওদের কখনই কর্তৃত্ব ফলাতে দেওয়া উচিত নয়। এই রকম একটা আবহাওয়ার মধ্যে ভারত সরকার চটপট রাউলাট বিল এনে উপস্থিত করল; এই বিল মারফৎ যুদ্ধের সময়ে ব্যবহৃত কিছু কিছু ক্ষমতা বেসামরিক জরুরী অবস্থায় ভারত সরকারের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা হল।

এ থেকে যে অন্ধ জাতিবিদ্বেষ ও জাতীয়তাবাদ ঘোরাল হয়ে উঠল, অমৃতসরের শোকাবহ ঘটনা এক হিসেবে তারই স্বাভাবিক পরিণতি। রাউলাট বিলের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের বিক্ষোভ যতই দানা বাঁধতে লাগল, ভারতবর্ষে বসবাসকারী ইউরোপীয়েরা ততই আত্মরক্ষার জন্যে ব্যস্তসমস্ত হয়ে পড়ল। ভারতীয়দের ধারণা হল, সংস্কারমূলক নতুন উদার ব্যবস্থাগুলি কাঁচিয়ে দেবার জন্যেই এই বিল আনা হয়েছে; অন্যদিকে ইউরোপীয়েরা মনে করল তাদের নিরাপত্তার জন্যে এই বিল চালু হওয়া নিতান্তই দরকার এবং একমাত্র তা'হলেই সংস্কারগুলো তারা কোন রকমে গা-সহা ক'রে নিতে পারবে। এদিকে পাঞ্জাবে রাজনৈতিক অসন্তোষ ক্রমবর্ধমান; তখন এই রকম একটা অবস্থার মধ্যে যারা বলছিল কড়া শাসন চাই ও 'উচিত শিক্ষা' দিতে হবে, তারা সহজেই আসর জমাতে সমর্থ হল—দুঃখের বিষয়, তাদের মধ্যে একজনের হাতে ছিল অমৃতসরের ভার; ভারতবর্ষে তার অধিকাংশ স্বদেশবাসীই যে সেই মতের সমর্থক এটা জানা থাকায় তার স্পর্ধা বেড়ে গিয়েছিল। একটি গোটা সম্প্রদায়ের ভয়ভীতি আর আতঙ্ক এই একটি লোকের ভেতর জমাট বেঁধেছিল।

ঐ ঘটনার ঠিক পরেই বৃটিশ পার্লামেণ্টের টনক নড়ল। জেনারেল

ডায়ারের নিন্দা করতে হল : 'ভয় পেয়ে কিছু ক'রে বসা একেবারেই বৃটিশের ধাতে' ছিল না।[৬] মণ্টেগু ও চেম্‌স্‌ফোর্ড সামাজিক সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার ও জাতিগত বিদ্বেষ দূরীকরণের প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু রাউলাট বিল প্রসঙ্গে কোন রকম হস্তক্ষেপ করা হয়নি।

কাজটা উচিত হয়েছিল কিনা ইতিহাসে এ প্রশ্ন উঠতে পারে। যে সাক্ষাৎভাবে আছে, এ রকম ক্ষেত্রে তার দাবিই হয়ত সর্বাগ্রে গণ্য হবে; কিন্তু সে লোক যত পক্ষপাত শূন্যই হোক, তার স্বজাতির স্বার্থ ও উদ্বেগের সঙ্গে সে জড়িত না হয়ে পারে না—তাতে মতামতের দিক থেকে বাস্তবনিষ্ঠ হওয়ার বদলে সে তখন সহজেই ভাবাবেগের দ্বারা চালিত হয়। আপাত স্বার্থটাই সে বড় ক'রে দেখে, দীর্ঘ মেয়াদী জাতীয় দায়িত্বটা চোখের আড়ালে চলে যায়। সব সময়েই সে মনে করবে সোজাসুজি চললেই বেশী কাজ হবে এবং বৃটেন থেকে কোন রকম হস্তক্ষেপ হলে তাতে সে বাদ সাধবে। দীর্ঘ মেয়াদী দায়িত্ব বৃটেনের এবং সেই বৃটেনকেই তার কাজের জন্যে প্রায়ই গুরুতর রকমের ধকল সইতে হবে। ভারতবর্ষে তার ফল হল সাতাশ বছর ব্যাপী জাতিগত বিরোধ—১৯১৯ সালে যারা ভারতে ছিল, তাদের সে ধাক্কা সইতে হয়নি—সইতে হয়েছে বৃটিশ জনসাধারণকে, যারা শেষ পর্যন্ত জ্বালাতন পোড়াতন হয়ে সে বিরোধের অবসান ঘটিয়েছে।

তা'হলে এই হল অমৃতসরের শিক্ষা, সুভাষচন্দ্র বসুর শিক্ষা, ভারতের শিক্ষা। জাতিগত বিরূপতা থেকে আসে জাতিগত ঘৃণা; জাতিগত ঘৃণা থেকে জন্মায় অন্ধ আক্রোশ ও জাতিগত বিরোধ। যদি জাতিগত বিরূপতা দূর করা যায়—এবং তার জন্যে দরকার বৃটেন থেকে অনবরত চাপ—তাহলে সহিষ্ণুতা ও শুভেচ্ছার ভেতর দিয়ে এমন এক অবাধ, অবিচলিত রাজনৈতিক অগ্রগতি দেখা দেবে যাতে সকলেরই স্বার্থ সাধিত হবে। এ শিক্ষা অবধারিত; আজও এ শিক্ষা গ্রহণ করা হয়নি।

৬ এ বিষয়ে কমন্স-এর বিতর্কপ্রসঙ্গে স্যার উইন্সটন চার্চিল-এর বক্তৃতা

পরিশিষ্ট ১

১৯৪২-এর দলিলপত্র

১. মেজর ফুজিহারা-কে লেখা ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের চিঠি

২. ব্যাঙ্কক প্রস্তাবসমূহ

১. যুদ্ধবন্দীদের চিঠি

তাইপিং, ১লা জানুয়ারী, ১৯৪২

১৯৪১-এর ৩০শে ও ৩১শে ডিসেম্বরে আমরা আপনার পত্র ও স্মারকলিপি * পেয়েছি ; লিখিত বিষয়গুলো আমরা মন দিয়ে পড়েছি এবং নীতিগত ভাবে আমরা তার সঙ্গে একমত। ছোটখাট কয়েকটি ব্যাপারে আমরা আমাদের ভিন্ন মত ও প্রস্তাব আপনার বিবেচনার্থে উপস্থিত করছি।

১. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতার ব্যাপারে আমাদের পরিবর্তিত মত।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও তাঁর বার্লিনস্থ দলের নেতৃত্ব কল্যাণকর, মূল্যবান ও শ্রদ্ধার্হ—সে নেতৃত্ব লাভ করতে পারলে আমরা কৃতার্থ বোধ করব। আমরা সবাই জানি তিনি চরমপন্থী ; বিপ্লব ও আমূল পরিবর্তনে বিশ্বাসী। ভারতের জনসাধারণের বড় আশা যে, শ্রীযুক্ত বসু আন্দোলন শুরু করবেন এবং তারা সে আন্দোলনে তাঁর পেছনে দাঁড়াবে। সমস্ত স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর মধ্যেই তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয়, তাঁর রাজনৈতিক শত্রুরাও তাঁকে শ্রদ্ধাভক্তি করে। ভারতবর্ষে প্রায় ঘরে ঘরে তাঁর ফটো দেখতে পাওয়া যাবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে লোকে তাঁকে দেবতার মত পূজো করে। তিনি এমন একজন নেতা, যাঁর নামের প্রভাবেই ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে বিরাট বিদ্রোহ জেগে উঠবে—ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে তার প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস মহলে তার ফলে ভাঙন ধরবে এবং কংগ্রেসের অধিকাংশ লোক সুভাষচন্দ্রের পক্ষ নেবে। আমরা আজাদ হিন্দ ফৌজের সভ্যেরা সুভাষচন্দ্র বসুর জন্যে দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু বিসর্জন করতে প্রস্তুত। তাঁর নাম আমাদের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করে।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে সহযোগিতার ব্যাপারে জাপ সরকারের প্রচেষ্টার আমরা আন্তরিকভাবে প্রশংসা করি। এতবড় একটি আন্দোলনে যাতে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর সমর্থন ও নেতৃত্ব পাওয়া যায় ; তার জন্যে জাপ

* অধুনালুপ্ত

সরকার যেন অনুগ্রহ ক'রে সমস্ত রকম রাজনৈতিক প্রভাব খাটান—এই আমাদের প্রার্থনা। জাপ সরকার এ ব্যাপারে যদি সমর্থ হন, তাহলে ভারতে সংগ্রাম অর্ধেক জয়যুক্ত হবে ব'লে আমরা মনে করি। যখন সুভাষ-চন্দ্রের নাম আমাদের কাছে এসেছে, আমরা কথা দিচ্ছি দরকার হলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে আমরা নিন্দা করব।

মালয়ে শ্রীযুক্ত প্রীতম সিং যে মূল্যবান কাজ করেছেন, আমরা তার প্রশংসা করি। তাঁকে আমরা শ্রদ্ধাভক্তি করি এবং তার প্রভাব প্রতিপত্তি যাতে বাড়ে তার জন্যে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আমরা সানন্দে তাঁকে সাহায্য করতে রাজী আছি।

২. সম-সমৃদ্ধি অঞ্চল সম্পর্কে আমাদের অভিমত হল, জাপ সরকার এ ব্যাপারে সরাসরি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে কথাবার্তা বলুন। জাপ সরকার ও শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু একমত হয়ে এ বিষয়ে যা সিদ্ধান্ত করবেন, আমরা তা মেনে নিতে প্রস্তুত। আমরা শুধু আমাদের জ্ঞাতার্থে সম-সমৃদ্ধির বিশদ বিবরণ পেতে চাই।

৩. মালয় ও বর্মায় আজাদ হিন্দ ফৌজের অংশ গ্রহণ।

এটা ঠিক যে, যে বাহিনী সামনে দাঁড়িয়ে লড়তে রাজী নয়, তারা বাহিনী নামের অযোগ্য। আমরা চাই না যে, জাপানীরা লড়বে আর আমরা শুধু নির্লিপ্তভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব। আমরা এও বুঝি যে, স্বদেশের মুক্তিরণে আমরা যদি সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ না করি, তা'হলে দুনিয়ার কাছে আমরা মুখ দেখাতে পারব না। পক্ষান্তরে, বিশ্ববিখ্যাত সুমহান্ জাপবাহিনীর পাশাপাশি লড়তে পারা আজাদ হিন্দ ফৌজের পক্ষে ভাগ্যের কথা। আজাদ হিন্দ ফৌজকে সম্মুখসমরে পাঠাবার আগে আমরা আশা করি নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করা হবে:

(ক) ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের কুড়িটি রেজিমেন্টের লোক

নিয়ে বর্তমান আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত। এর ফলে একটা জগাখিচুড়ি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন ভাষাভাষী। যে সৈন্যবাহিনী থেকে তারা এসেছে, তার বিরুদ্ধে নতুন নেতৃত্বের অধীনে নতুন ভাবধারা নিয়ে তাদের লড়াই করতে শিখাতে কিছুটা সময় লাগবে।

(খ) আজাদ হিন্দ ফৌজকে প্রথম যখন ব্যবহার করা হবে, তখন তার দিক থেকে সংগ্রামস্পৃহা ও মনোবলের পরাকাষ্ঠা দেখানো দরকার। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে তার পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া উচিত। যেহেতু এই ফৌজ জাপবাহিনীর সহযোদ্ধা হিসেবে লড়তে যাচ্ছে, সুতরাং তাদের যেন একই ভাবে সশস্ত্র ও সুসজ্জিত করা হয় এবং একই ভাবে তালিম দেওয়া হয়। আজ শুধু গোড়াপত্তন, আমরা আশা করি অদূর ভবিষ্যতে এই ফৌজ বিরাট বড় হয়ে উঠবে। অনুন্নত অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত ক'রে সামনে লড়তে পাঠানো মানে কশাইয়ের হাতে তুলে দেওয়া—ইংরেজরা যা করেছিল। এতে খারাপ নজির সৃষ্টি হবে এবং মনোবল ভেঙে যাবে।

(গ) মালয়ে যদি আজাদ হিন্দ ফৌজকে দিয়ে লড়ানো হয়, এটা ভুললে চলবে না যে, তা'হলে বহু ক্ষেত্রে নিজের নিজের ইউনিটের লোকদের বিরুদ্ধে তাদের লড়তে হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে মালয়ে সেই সব কিংবা অন্য ইউনিটে তাদের আপন ভাই ও নিকট আত্মীয়েরা রয়েছে। এ সব সত্ত্বেও আমাদের লোকজনেরা যাতে লড়ে, তার জন্যে তাদের তৈরি করতেও সময় নেবে।

(ঘ) এও মনে রাখতে হবে যে, আজাদ হিন্দ ফৌজে এমন একদল লোক আছে যারা যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র ত্যাগ করেছিল। যে সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র ত্যাগ করে, সে হয়ত :

(১) ভীরু, অতএব লড়তে ভয় পায়।

(২) অসন্তুষ্ট, অতএব লড়তে ইচ্ছুক নয়।

(৩) এ দেশে আসার পর থেকে ক্রমাগত দুঃখকষ্টে অবসন্ন। সে হয়ত মনে মনে ঠিক করেছে আর লড়বে না।

(৪) কোন কোন ক্ষেত্রে সে হয়ত নেহাৎ অবস্থাবিপর্যয়ে তার ইউনিট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, তা না হলে নিজের রেজিমেন্টের হয়েই সে লড়াই করত।

এই সব সৈনিকদের মনোবল ও সংগ্রামস্পৃহা গড়ে তুলতে হলে বাছা বাছা নেতা ও কঠোর শৃঙ্খলা দরকার।

(৬) বর্তমানে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যবল খুব কম। এর বলবৃদ্ধি এবং আরও প্রসারের জন্যে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ও ভারতস্থ ভারতীয়দের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হবে। সুতরাং এই ফৌজকে প্রধানত ভারতের মাটিতে ব্যবহার করা একান্ত দরকার ; তা'হলে বহু ভারতীয় সোৎসাহে এই ফৌজে যোগ দিয়ে দল ভারী করবে।

এই সব কারণে আমরা আশা করি, আজাদ হিন্দ ফৌজকে যেন প্রথমেই মালয়ে যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করা না হয়—তাদের প্রথম লড়াইয়ের ক্ষেত্র যেন হয় বর্মা, আরও ভাল হয় ভারতবর্ষ হলে। তাতে আমরা তৈরি হবার কিছুটা সময় পাবো। আমরা খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাই না।

৪. আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃত্বের প্রশ্ন নিয়ে ৩১শে ডিসেম্বর সকালে অ্যালর স্টারে যে বৈঠক হয়, তাতে সমস্ত অফিসার একবাক্যে 'মালয়' শব্দটিতে প্রবলভাবে আপত্তি জানায় এবং বাক্য থেকে 'মালয়' শব্দটি তুলে দেবার জন্যে অনুরোধ করে। *

২. ব্যাঙ্কক সম্মেলনের প্রস্তাব

১। বৃহত্তর পূর্ব-এশিয়ায় যুদ্ধের উদ্দেশ্য এশিয়ায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে খতম করা ; এবং

* মোহন সিং-এর এক্তিয়ারের সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্যে

এর ফলে ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বরাজলাভের সুযোগ পাচ্ছে ; এবং

এই সম্মেলন বিশ্বাস করে যে, এই যুদ্ধের ফলে নিশ্চয়ই এশিয়ায় নববলে বলীয়ান নতুন নতুন স্বাধীন দেশ মাথা তুলে দাঁড়াবে :

জাপানের সামরিক লক্ষ্য সম্পর্কে এই সম্মেলন আন্তরিকভাবে সন্তোষ প্রকাশ করছে এবং রাজকীয় জাপ সৈন্যবাহিনীর নিরবচ্ছিন্ন জয় কামনা ক'রে রাজসরকারের কাছে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

২। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সমস্ত শক্তিকে এই সম্মেলন আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছে এবং তাদের প্রচেষ্টা যাতে পুরোপুরি সার্থক হয় তার জন্যে প্রার্থনা করছে।

৩। স্বদেশের জাতীয়তাবাদী নেতারা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে চেষ্টা করছেন বৃটিশ ও তার মিত্রশক্তিগুলি যেন এই যুদ্ধে তাঁহাদের দলে টানতে না পারে এবং তাঁরা খোলাখুলি স্পষ্টভাবে দাবি করছেন বৃটিশেরা ভারত ছেড়ে চলে যাক—এই সম্মেলন তার জন্যে নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। সম্মেলনের মতে, বৃটিশ যদি ভারত ছেড়ে চলে না যায় এবং মিত্রশক্তি যদি যুদ্ধ পরিচালনা ও যুদ্ধায়োজনের ব্যাপারে ভারতবর্ষকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করবার পরিকল্পনা বলবৎ রাখে, তাহলে ভারতের জনগণের কপালে অবর্ণনীয় ও অপরিমেয় দুঃখ আছে।

৪। অবিলম্বে পূর্ণ স্বরাজলাভের আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যে এই সম্মেলন সংকল্প গ্রহণ করছে।

লক্ষ্য

৫। ১৯৪২-এর মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত টোকিও সম্মেলনে ঠিক হয়েছিল যে, এই আন্দোলনের লক্ষ্য হবে ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা—তাতে বিদেশীদের কোন রকম নিয়ন্ত্রণ, আধিপত্য ও হস্তক্ষেপ থাকবে না ; এই সম্মেলন এই মত সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, সেই লক্ষ্যসাধন করবার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের সময় এসে গেছে।

নীতি

৬। সম্মেলনের উদ্যোগে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন নিম্নোক্ত নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হবে :

(ক) ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নীতি হবে ঐক্য, বিশ্বাস ও আত্মত্যাগ।

(খ) ভারতবর্ষকে অখণ্ড ও অবিভাজ্য ব'লে গণ্য করতে হবে।

(গ) এই আন্দোলনের যাবতীয় কার্যকলাপ আংশিক সাম্প্রদায়িক কিংবা ধর্মগত ভিত্তিতে হবে না—হবে জাতীয় ভিত্তিতে।

(ঘ) যেহেতু ভারতের জাতীয় কংগ্রেসই একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যা ভারতীয় জনগণের প্রকৃত স্বার্থের প্রতিভু হিসেবে নিজেকে দাবি করতে পারে, এবং সেই হিসেবে ভারতের প্রতিনিধিত্বমূলক একমাত্র দলরূপে স্বীকৃতিলাভের যোগ্য—এই সম্মেলন মনে করে যে, এই আন্দোলনের কর্মসূচী ও কার্যধারা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হওয়া উচিত যাতে তা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য ও অভিপ্রায়ের সঙ্গে মেলে।

(ঙ) কেবলমাত্র ভারতের জনপ্রতিনিধিরাই ভারতের ভাবী সংবিধান রচনা করবে।

(চ) ভারতের স্বপক্ষে অক্ষশক্তির যুক্তভাবে গৃহীত নীতি ভারতের পক্ষে সুবিধাজনক হবে।

(ছ) এই আন্দোলনের লক্ষ্যসাধনের জন্যে, অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতার জন্যে জাপানের সহানুভূতি, সহযোগিতা ও সাহায্য একান্ত দরকার।

৭। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন চালাবার জন্যে একটি সংস্থা খাড়া করা হোক এবং এই সংস্থার নাম হোক ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ।

৮। ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের এই মুহূর্তের কাজ হবে আজাদ হিন্দ ফৌজ নামে একটি বাহিনী গড়ে তোলা ; ভারতীয় সৈনিকদের (যুদ্ধে নিযুক্ত ও যুদ্ধে নিযুক্ত নয়) ভেতর থেকে লোক নিয়ে এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্যে সামরিক কর্মে অতঃপর যে সব বেসামরিকদের ভর্তি করা হবে তাদের নিয়ে এই ফৌজ গড়ে উঠবে।

গঠনতন্ত্র

৯। এই সম্মেলন ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ সংগঠনের জন্যে নিম্নোক্ত গঠনতন্ত্র গ্রহণ করছে :

(১) (ক) একটি সংগ্রাম-পরিষদ

(খ) একটি প্রতিনিধি কমিটি

(গ) রাজ্য শাখা ও

(ঘ) স্থানীয় শাখা

—এই নিয়ে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ গঠিত হবে।

(২) (ক) যে কোন অঞ্চলে একমাত্র ভারতীয়দের জনসভায় স্থানীয় শাখা গঠন করা যাবে এবং সেখান থেকে একটি কমিটি ও একজন সভাপতি নির্বাচন করা হবে।

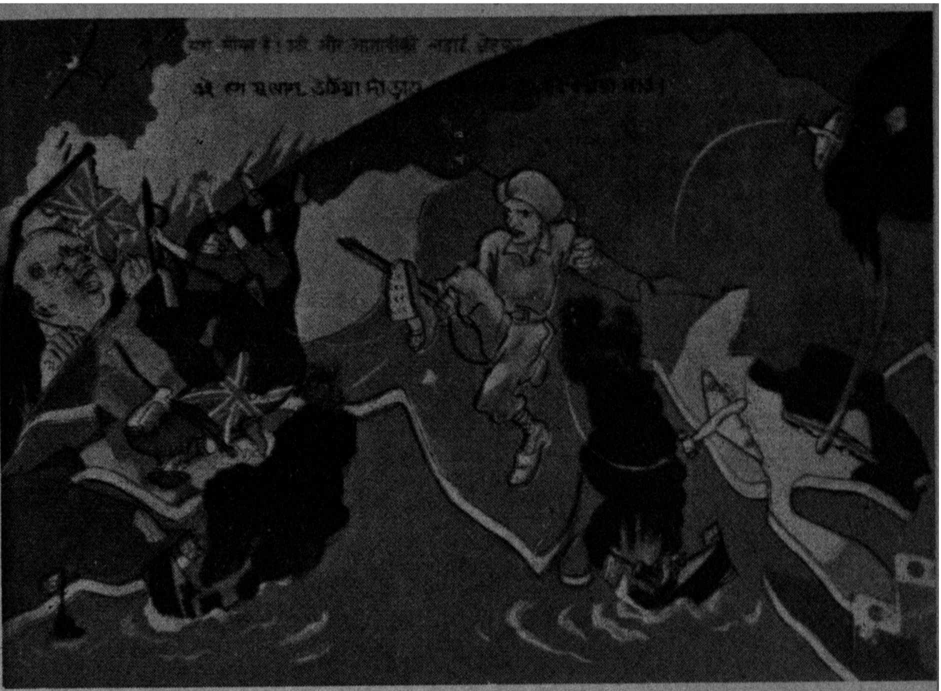
(খ) কমিটির শূন্যপদে অথবা সভাপতির আসনে কমিটি লোক নিতে পারবে।

(গ) শাখা সংগঠনের নিয়মাবলী মানলে আঠারো বছরের ঊর্ধ্ববয়স্ক যে কোন ভারতীয় শাখা-সংগঠনের সদস্য হতে পারবে।

(ঘ) রাজ্য কমিটি কি ভাবে গঠিত হবে পরে বলা হয়েছে। রাজ্য কমিটির স্বীকৃতি ব্যতিরেকে কোন শাখাই শাখা ব'লে গণ্য হবে না এবং শাখা হিসেবে থাকতে পারবে না, অবশ্য ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের বর্তমানে যে সমস্ত শাখা আছে ও (৬) নং ধারায় উল্লিখিত বিভিন্ন রাজ্যে যেসব শাখা স্বীকৃত, যতক্ষণ না অন্য কোন সিদ্ধান্ত হচ্ছে ততক্ষণ তারা এই আন্দোলন কর্তৃক স্বীকৃত হবে।

(৩) প্রত্যেক রাজ্যে স্থানীয় শাখা কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে রাজ্য কমিটি গঠিত হবে এবং রাজ্যের মধ্যে আন্দোলনের কাজ ভালভাবে চালাবার জন্যে রাজ্য কমিটি প্রয়োজন মত নিয়মকানুন রচনা করবে।

(৪) প্রত্যেক রাজ্যে সেই রাজ্যসীমানার মধ্যে রাজ্য কমিটি আন্দোলনের কাজ পরিচালনা, পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ করবে এবং প্রতিনিধি নির্বাচন করবে—প্রতিনিধি কমিটির কথা পরে বলা হয়েছে।



বর্মা রণাঙ্গনে আই-এন-এ
চরদের প্রচারিত ইস্তাহার

ARZI HAKUMAT-E-AZAD HIND
(PROVISIONAL GOVERNMENT OF AZAD HIND)

Tel: Nos. 5021, 5022, 5023.
Ref:

SYONAN.
Date, 16th August 1945

ORDER.

During my absence from Syonan, Majcr General M. Z. Kiani will represent the Provisional Government of Azad Hind.

Subhas Chandra Bose
HEAD OF THE STATE,
PROVISIONAL GOVERNMENT OF AZAD HIND.

সুভাষচন্দ্রের শেষ হুকুমনাম





ইউরোপের আজাদ হিন্দ কেন্দ্র থেকে
প্রস্তুত 'আজাদ হিন্দ' ডাক টিকিট
'আজাদ হিন্দ' পদক

(৫) প্রতিনিধি কমিটির রচিত নিয়মকানুনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাজ্য কমিটি ও তার অধীনস্থ স্থানীয় শাখা কমিটি নিয়মকানুন রচনা করবে ; স্থানীয় শাখার ক্ষেত্রে রাজ্য কমিটির নিয়মকানুনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে হবে।

(৬) (ক) নিম্নোক্ত রাজ্যগুলির রাজ্য কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত বেসামরিক প্রতিনিধিদের নিয়ে ও আজাদ হিন্দ ফৌজের বাছাই করা প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি প্রতিনিধি কমিটি গঠিত হবে :

জাপান ও মাঞ্চুকুও	৪
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ	২
থাইল্যাণ্ড	৬
মালয়	১৪
বর্মা	২১
বোর্ণিও ও সেলিবিস	১
হংকং, ক্যাণ্টন ও ম্যাকাও	২
সাংহাই সহ চীনের অন্যান্য অংশ	২
ইন্দো-চীন	১
জাভা	২
সুমাত্রা	১
আন্দামান	১
	৫৭
আজাদ হিন্দ ফৌজ	৩৩
	৯০

(খ) সংগ্রাম পরিষদ উপরোক্ত তালিকায় অন্য যে কোন রাজ্যের নাম যোগ করতে ও সেই রাজ্যের প্রতিনিধি সংখ্যা ঠিক করতে পারবে ; তবে সেই রাজ্যের প্রতিনিধি সংখ্যা যা হবে, আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিনিধি সংখ্যা তার দুই-তৃতীয়াংশ বেড়ে যাবে।

(৭) প্রতিনিধি কমিটির প্রত্যেক সদস্যকে কমিটিতে আসন গ্রহণের আগে নির্দিষ্ট পত্রে গোপনতা রক্ষাব শপথে সই করতে হবে।

(৮) ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাধারণ নীতি ও কর্মসূচীর ব্যাপারে প্রতিনিধি কমিটি দায়ী থাকবে এবং এই আন্দোলনের প্রত্যেক সদস্যের কাছে কমিটির সিদ্ধান্ত হবে চূড়ান্ত ও অবশ্য পালনীয়।

(৯) এই সম্মেলনে গৃহীত যে কোন সিদ্ধান্ত সহ, কমিটি কর্তৃক পূর্বে গৃহীত যে কোন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন ও পরিবর্জন করবার ক্ষমতা প্রতিনিধি কমিটির থাকবে।

(১০) কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি (নিজে থেকে অথবা আর কাউকে পাঠিয়ে) ছাড়া প্রতিনিধি কমিটির কোন সভাই বৈধ ব'লে বিবেচিত হবে না।

(১১) এই সম্মেলনে সমাগত প্রতিনিধিরা একজন সভাপতি ও চার (৪) জন সদস্য সমন্বিত একটি সংগ্রাম-পরিষদ নিয়োগ করবেন; তার মধ্যে অন্যূন অর্ধেক সদস্য নিতে হবে পূর্ব-এশিয়ার আজাদ হিন্দ ফৌজ থেকে। প্রথম সভাপতি হবেন শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসু ও চার জন সদস্য হবেন :

১. শ্রী এন, রাঘবন
২. ক্যাপ্টেন মোহন সিং
৩. শ্রী কে, পি, কে, মেনন
৪. কর্ণেল জি, কিউ, জিলানী

(১২) মৃত্যু, পদত্যাগ অথবা অন্য কারণে সংগ্রাম-পরিষদে একই সময়ে অনধিক দুটি সদস্যপদ খালি হ'লে পরিষদের অন্য সদস্যেরা তা পূরণ করতে পারবেন এবং একই সময়ে দুটির বেশী সদস্যপদ খালি হ'লে শূন্যপদে লোক নিয়োগের জন্যে সংগ্রাম-পরিষদ প্রতিনিধি কমিটির বৈঠক ডাকবে।

(১৩) এই সম্মেলন কর্তৃক এবং এর পর প্রতিনিধি কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত নীতি ও কর্মসূচী কাজে পরিণত করবার ব্যাপারে সংগ্রাম-পরিষদ দায়ী থাকবে এবং মাঝে মাঝে যখন নতুন সমস্যা দেখা দেবে তখন সে বিষয়ে কমিটির সিদ্ধান্ত না থাকলেও সংগ্রাম-পরিষদ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

(১৪) যথাবিহিতভাবে ও সুষ্ঠুভাবে কায পরিচালনার জন্য সংগ্রাম-পরিষদ আবশ্যক মত বহুবিধ বিভাগ সৃষ্টি করতে পারবে এবং প্রয়োজন হলে যখন-তখন প্রশাসনিক অফিসার ও কর্মচারী নিয়োগ ও বরখাস্ত করতে পারবে।

(১৫) প্রতিনিধি কমিটির অনুমোদন ছাড়া সংগ্রাম-পরিষদ এই সম্মেলনে গৃহীত নীতির পরিবতন কিংবা সংশোধন করতে পারবে না।

(১৬) সংগ্রাম-পরিষদ যে কোন সময়ে ও যে কোন স্থানে প্রতিনিধি কমিটির সভা আহ্বান করতে পারবে এই শর্তে যে, প্রতিনিধিদের যাতায়াতের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হবে এবং রাজ্য কমিটির সম্পাদকদের ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সদর দপ্তরে অন্যূন চার দিনের নোটিশ দেওয়া হবে। একাধিক বাজ্যের কুড়িজন (প্রতিনিধি) যদি অনুরূপ সভা দাবি করে, তাহলে সংগ্রাম-পরিষদ সভা আহ্বান করবে এবং উপযুক্ত নোটিশ দেবে ও যাতায়াতের সুবিধা ক'রে দেবো।

(১৭) কর্মপরিষদ (৬) নং ধারায় উল্লিখিত সমস্ত রাজ্যের ইণ্ডিয়ান ইণ্ডি-পেণ্ডেন্স লীগের শাখা ও আজাদ হিন্দ ফৌজের ওপর সাধারণভাবে খবরদারি ও কর্তৃত্ব করবে।

(১৮) সংগ্রাম-পরিষদ সমস্ত রাজ্য ও স্থানীয় সংগঠনের একটি তালিকা রাখার ব্যবস্থা করবে, তালিকা থেকে যে কোন সংগঠনের নাম কেটে দিতে পারবে এবং যে কোন সংগঠনের স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করতে অথবা স্বীকৃতি নাকচ করতে পারবে।

(১৯) সংগ্রাম-পরিষদ যৌথভাবে দায়ী থাকবে।

(২০) সংগ্রাম-পরিষদের সদস্যদের মধ্যে এবং সভাপতির ইচ্ছাক্রমে দপ্তর বণ্টন করা হবে।

(২১) ব্যাঙ্ককে অথবা এর পর প্রতিনিধি কমিটি কিংবা সংগ্রাম-পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত কোন জায়গায় আন্দোলনের সদরদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হবে।

(২২) প্রতিনিধি কমিটি ও সংগ্রাম-পরিষদের আলোচনার বিশেষ অধিকার থাকবে এবং সেই আলোচনার জন্যে কোন শাখা অথবা রাজ্যকমিটি অথবা আজাদ হিন্দ ফৌজ কোন সদস্যের বিরুদ্ধে কোন রকম শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে না।

(২৩) একমাত্র প্রতিনিধি কমিটির তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের ভোটে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন হতে পারবে।

১০. পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন রাজ্যে নিপ্পন সরকারের অধীন সমস্ত ভারতীয় সৈন্যকে অবিলম্বে এই আন্দোলনের জন্যে ছেড়ে দেওয়া হোক—এই মর্মে নিপ্পন সরকারকে অনুরোধ জানানো হবে।

১১. আজাদ হিন্দ ফৌজের গঠন, সেনাপত্য, কর্তৃত্ব ও সংগঠন ভারতীয়দের নিজেদের হাতে থাকবে।

১২. এই সম্মেলন একান্তভাবে আশা করে যে, সূচনা থেকেই আজাদ হিন্দ ফৌজকে স্বাধীন ভারতের স্বাধীন জাতীয় বাহিনী হিসেবে ক্ষমতা ও মর্যাদা দেওয়া হবে এবং জাপান ও অন্যান্য মিত্রশক্তির বাহিনীর সঙ্গে তাকে সমান ক'রে দেখা হবে।

১৩. আজাদ হিন্দ ফৌজকে কেবলমাত্র ব্যবহার করা যাবে:

(ক) ভারতে বৃটিশ অথবা অন্য কোন বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ কাজে।

(খ) ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা আদায় ও রক্ষার কাজে, এবং

(গ) ভারতের স্বাধীনতা: এই লক্ষ্য সাধনে সাহায্য হয় এমন কোন কাজে।

১৪. প্রস্তাবিত আজাদ হিন্দ ফৌজের সমস্ত অফিসার ও সৈনিককে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের সদস্য হতে হবে এবং লীগের প্রতি অনুগত থাকতে হবে।

১৫. আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগ্রাম-পরিষদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন হবে এবং সংগ্রাম-পরিষদের নির্দেশমত আজাদ হিন্দ ফৌজের জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং কর্তৃক এই বাহিনী সংগঠিত ও পরিচালিত হবে।

১৬. ভারতে বৃটিশ অথবা অন্য কোন বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে যখন সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, তখন উক্ত উদ্দেশ্যে সংগ্রাম-পরিষদ তার সামরিক সহায় সম্বল উক্ত সংগ্রাম-পরিষদের নির্দেশে ভারতীয় ও জাপানী সামরিক অফিসারদের যুক্ত কম্যাণ্ড-এর হাতে স্বেচ্ছায় তুলে দিতে পারবে।

১৭. ভারতে বৃটিশ অথবা অন্য কোন বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে কোন রকম সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবার আগে সংগ্রাম-পরিষদ এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে

নেবে যে, সেই সামরিক ব্যবস্থা স্পষ্টত অথবা প্রকারান্তরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অভিপ্রেত।

১৮. সংগ্রাম-পরিষদ সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে ভারতবর্ষে এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে, যাতে সেখানে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ও ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে বিপ্লব দেখা দেয় এবং কোন রকম সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবার আগে সংগ্রাম-পরিষদ এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে নেবে যে, ভারতবর্ষে তেমন আবহাওয়া সত্যিই রয়েছে।

১৯. এই আন্দোলনের অর্থ ও উদ্দেশ্য ভারত ও বহির্ভারতের স্বদেশবাসীকে ও সারা বিশ্বে ভারতের বন্ধুদের জানানো ও বোঝানো শুধু জরুরী নয় অপরিহার্য এবং ভারতে ও বহির্ভারতে প্রচার চালানো ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রকৃষ্টতম উপায়—সেই জন্যেই এই সম্মেলন অবিলম্বে বেতার, ইস্তাহার, বক্তৃতা ও যখন যেমন সম্ভবপর অন্যান্য পদ্ধতিতে পুরোদমে জোরালো প্রচার চালাবার সংকল্প নিচ্ছে।

২০. যে কোন রকমের বৈদেশিক সাহায্য নিতে গেলে সংগ্রাম-পরিষদই ঠিক করবে সেই সাহায্যের পরিমাণ ও ধরন কী হবে।

২১. স্বাধীনতা আন্দোলনের অর্থ-সংস্থানের জন্যে সংগ্রাম-পরিষদ পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয়দের কাছ থেকে টাকা তুলতে পারবে।

২২. জাপানের রাজসরকার এই আন্দোলনে যে ভাবে সাহায্য করেছে, তার জন্য এই সম্মেলন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে; সংগ্রাম-পরিষদকে এই অধিকার দেওয়া হোক যে, আন্দোলনের উদ্দেশ্য সফল করবার জন্যে প্রয়োজন হলে মাঝে মাঝে উক্ত সরকারের কাছ থেকে অর্থসাহায্য প্রার্থনা করা হবে; এই আর্থিক সাহায্য ঋণ হিসেবে গণ্য হবে এবং ভারতের জাতীয় সরকার পরে জাপানের রাজ সরকারকে ঐ ঋণ পরিশোধ করবে।

২৩. সংগ্রাম-পরিষদের চাহিদার ধরন ও পরিমাণ অনুযায়ী যাতে জাপানের রাজসরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় প্রচার, ভ্রমণ, যানবাহন ও যোগাযোগের সমস্তরকম সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায় এবং ভারতস্থ জাতীয় নেতৃবৃন্দ, কর্মীবৃন্দ ও সংগঠনগুলির সঙ্গে যাতে সর্বতোভাবে সম্পর্কস্থাপন করা যায় তার জন্যে জাপানের রাজসরকারকে অনুরোধ করা হোক।

২৪. যে সব প্রশাসনিক ব্যাপারে ভারতীয় সম্প্রদায় জড়িত, সেখানে স্থানীয়

ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের পরামর্শ এবং সেখানে লীগের কোন শাখা না থাকলে নিকটবর্তী শাখা-লীগের অনুমোদিত গণ্যমান্য নেতৃবৃন্দের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে—এই মর্মে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেবার জন্যে জাপানের রাজসরকারকে অনুরোধ জানানো হোক।

২৫. থাইল্যাণ্ডে ভারতীয় সম্প্রদায় যে সব প্রশাসনিক ব্যাপারে জড়িত, সেই সব ব্যাপারে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের (পূর্ব নাম ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কাউন্সিল ও ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ অব ইণ্ডিয়া) পরামর্শ গ্রহণের জন্যে থাইল্যাণ্ডের সরকারকে অনুরোধ জানানো হোক।

২৬. ভারতীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে নিপ্পন সরকারের পক্ষ থেকে অকুণ্ঠ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জাপানের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল তোজো যে সব ঘোষণা প্রকাশ করেছেন, তার জন্যে এই সম্মেলন কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে, এবং সেই সঙ্গে টোকিও সম্মেলনের যে প্রস্তাবে ভারতের প্রতি জাপানের মনোভাব নিম্নোক্ত মর্মে স্পষ্ট ক'রে ব্যক্ত করবার জন্যে রাজসরকারের কাছে বিধিবদ্ধ ঘোষণা দাবি করা হয়েছিল, সেই প্রস্তাব পুনরায় রাখা হচ্ছে :

(ক) বৃটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে জাপানের রাজসরকার ভারতের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডত্ব মেনে চলবে এবং ভারতের পূর্ণ সার্বভৌমত্ব স্বীকার ক'রে নেবে—রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ভারত হবে সমস্ত রকম বৈদেশিক প্রভাব, নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত।

(খ) জাপানের রাজসরকার ভারতের অন্যান্য দেশের ওপর প্রভাব খাটিয়ে তাদের দিয়ে ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা ও পূর্ণ সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়ে নেবে।

(গ) ভারতের ভাবী সংবিধান রচনার ভার সম্পূর্ণভাবে ভারতের জন-প্রতিনিধিদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে—তাতে কোন বৈদেশিক কর্তৃত্বের হস্তক্ষেপ থাকবে না।

২৭. জাপানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সুনির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী চলতে এই সম্মেলন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ; এবং 'বৃহত্তর পূর্ব-এশিয়া সম-সমৃদ্ধি অঞ্চল' কথাটি ও তার অন্তর্নিহিত অর্থ সম্পর্কে যদি এমন কোন সরকারী সংজ্ঞা পাওয়া যায়

যা এই আন্দোলনের পক্ষে গ্রহণযোগ্য, তা'হলে স্বাধীন ভারতকে রাজী করাবার চেষ্টা করতে হবে:

(ক) জাপানের সঙ্গে সমানাধিকারের ভিত্তিতে অনুরূপ অঞ্চলের সভ্য হতে অথবা এমন কোন আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের সভ্য হওয়া চাই জাপান যার অংশীদার এবং

(খ) পারস্পরিক ভিত্তিতে জাপানের সঙ্গে সর্বোচ্চ সুবিধাভোগী জাতি হিসেবে ব্যবহার করতে।

২৮. জাপানের রাজকীয় বাহিনী কর্তৃক অধুনা ইংরেজ ও তার মিত্রপক্ষের অধীন যে সব রাজ্য শত্রুকবল মুক্ত হচ্ছে, সেইসব রাজ্যে ভারতীয়দের প্রচুর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আছে ব'লে এই সম্মেলন জানতে পেরেছে; এবং

যুদ্ধ শুরু হওয়ায় দেখাশুনার কোন রকম ব্যবস্থা না ক'রেই বহু ভারতবাসীকে নিজেদের বিষয় সম্পত্তি ফেলে এই সব রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল; এবং

জাপানের রাজসরকার ভারতের স্বাধীনতার জন্যে অকুণ্ঠ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছে; এবং

পূর্ব-এশিয়ায় উক্ত আন্দোলনের লক্ষ্য রূপায়িত ও সার্থক করতে গেলে বিপুল পরিমাণ অর্থের দরকাব; এবং

উক্ত রাজ্যগুলিতে উক্ত বিষয় সম্পত্তি থেকে নিয়মিতভাবে বেশ কিছু রোজগার হতে পারে, এবং

এই সম্মেলনের মতে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ মারফৎ যদি অনুরূপ বিষয় ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের হাতে এই নির্দিষ্ট শর্তে তুলে দেওয়া হয় যে ন্যায্য অধিকারীরা এসে দাবি করলেই উক্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হবে—তাহলে তা থেকে এই আন্দোলন শুভেচ্ছা ও উৎসাহ পাবে।

সুতরাং এই সম্মেলন দাবি করে:

জাপানের রাজকীয় বাহিনী কর্তৃক অধুনা ইংরেজ ও তার মিত্রপক্ষের অধীন যে সব রাজ্য শত্রুকবলমুক্ত হচ্ছে, সেই সব রাজ্যের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জাপানের রাজসরকার এমন ব্যবস্থা করুক, যাতে ভারতীয়দের মালিকানাধীন (ভারতীয় কোম্পানী, ফার্ম ও পার্টনারশিপের মালিকানাধীন বিষয় সম্পত্তি সহ) ও যুদ্ধের দরুন তাদের পরিত্যক্ত বিষয় সম্পত্তি এই আন্দোলনরত সংগ্রাম

পরিষদের হাতে তুলে দেওয়া হয়; ন্যায্য অধিকারীদের অছি হিসাবে সংগ্রাম পরিষদ উক্ত বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করবে; সম্পত্তি থেকে যা আয় হবে তা আন্দোলনের কাজে ঋণস্বরূপ ব্যবহৃত হবে এবং উক্ত মালিকদের দাবিদাওয়া অনুযায়ী যথাসময়ে তা শোধ করা হবে।

২৯. অত্যন্ত দুঃখের কথা যে, জাপানের রাজকীয় বাহিনীর অধিকৃত কোন কোন দেশে স্থানীয় ভারতীয়দের প্রতি শত্রুর দেশের লোকের মত ব্যবহার করা হচ্ছে; ফলে তাদের খুবই লাঞ্ছনা ও ক্ষতি স্বীকার করতে হচ্ছে। কাজেই এই সম্মেলন দাবি করছে যে, জাপানের রাজ সরকার দয়া ক'রে নিম্নোক্ত মর্মে ঘোষণা জারি করুক :

(১) জাপানের রাজকীয় বাহিনীর অধিকৃত রাজ্যে বসবাসকারী ভারতীয়েরা যতক্ষণ পর্যন্ত আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকর অথবা জাপানের পক্ষে হানিকর কোন কাজে লিপ্ত না হচ্ছে, ততক্ষণ তাদের শত্রুপক্ষের লোক ব'লে গণ্য করা হবে না; এবং

(২) যে-সব ভারতীয় বর্তমানে ভারতে অথবা অন্যত্র গিয়ে বসবাস করছে, (ভারতীয় কোম্পানী, ফার্ম ও পার্টনারসিপের বিষয় সম্পত্তি সহ) তাদের সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার যতক্ষণ এক বা একাধিক এমন লোকের হাতে ন্যস্ত থাকছে, যে বা যারা জাপানে অথবা জাপানের রাজকীয় বাহিনীর অধিকৃত বা প্রভাবাধীন কোন দেশে বসবাস করছে—ততক্ষণ তাদের সম্পত্তিকে জাপান যেন শত্রুপক্ষের সম্পত্তি বলে গণ্য না করে এবং সেই সেই দেশে যেন যথাশীঘ্র এই মর্মে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে নির্দেশ পাঠানো হয়।

৩০. এই আন্দোলন ভারতের বর্তমান জাতীয় পতাকা গ্রহণ করছে এবং জাপানের রাজসরকার ও থাইল্যাণ্ডের রাজকীয় সরকার ও অন্যান্য মিত্র দেশের সরকারকে অনুরোধ করছে যে, তাঁরা যেন স্ব স্ব এলাকায় উক্ত পতাকাকে স্বীকৃতি দেন।

৩১. এই সম্মেলন শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে পূর্ব-এশিয়ায় নিয়ে ক'রে আসবার জন্যে অনুরোধ করছে এবং জাপানের রাজসরকারের কাছে এই ব'লে আবেদন জানাচ্ছে যে, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু যাতে নির্বিঘ্নে পূর্ব-এশিয়ায়

এসে পৌঁছুতে পারেন তার জন্যে জার্মানির সরকারের কাছ থেকে তাঁরা প্রয়োজনীয় অনুমতি ও সুযোগ সুবিধা আদায়ের ব্যবস্থা করুন।

৩২. এই সম্মেলনে গৃহীত কোন প্রস্তাব যেন অননুমোদিতভাবে প্রকাশ করা না হয়, অবশ্য এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও নীতি লিপিবদ্ধ ক'রে সম্মেলন থেকে একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হোক, তাতে শুধুমাত্র এমন সব সিদ্ধান্ত ও খুঁটিনাটি থাকবে যা সাধারণ্যে প্রকাশিত হওয়া যুক্তিযুক্ত ও কল্যাণকর।

৩৩. এই আন্দোলনে ও এর উদ্দেশ্য সাধনে জাপানের রাজ-সরকারের সহযোগিতা, সাহায্য ও সহায়তার জন্যে এই সম্মেলন আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

৩৪. জার্মানি ও ইতালির সরকার ও জনসাধারণ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে যে আন্তরিকতা ও বন্ধুত্বের মনোভাব দেখিয়েছেন, এই সম্মেলন কৃতজ্ঞচিত্তে তা স্মরণ করছে এবং এই আন্দোলনে তাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতির জন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

৩৫. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে থাইল্যাণ্ডের সরকার ও জনগণের কাছ থেকে আমরা যে সহানুভূতি ও সহযোগিতা পেয়েছি, ব্যাঙ্ককে সম্মেলন অনুষ্ঠানের যে সুযোগ পাওয়া গেছে এবং তাঁরা যে সহৃদয় আতিথেয়তা দেখিয়েছেন, তার জন্যে এই সম্মেলন আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে।

৩০শে জুন, ১৯৪২

রাসবিহারী বসু,
সভাপতি
ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ

পরিশিষ্ট ২

ঘোষণাপত্র, বিশেষ বাণী ও হুকুমনামা

১। আই-এন-এ'র প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব গ্রহণ উপলক্ষে বিশেষ হুকুমনামা - ২৫শে আগস্ট, ১৯৪৩

২। অস্থায়ী সরকারের ঘোষণাপত্র—২২শে অক্টোবর, ১৯৪৩

৩। রণাঙ্গন অভিমুখে আই-এন-এ'র যাত্রাদিবসে বিশেষ হুকুমনামা—৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪

৪। ভারতে পদার্পণকালে আই-এন-এ'র ঘোষণাপত্র—তারিখ নেই

৫। অস্থায়ী সরকারের ঘোষণাপত্র ২নং—৪ঠা এপ্রিল, ১৯৪৫

৬। ইম্ফলের পরাজয়ে বিশেষ হুকুমনামা—১৪ই আগস্ট ১৯৪৪

৭। ১৯৪৫-এর নববর্ষ দিবসে বিশেষ হুকুমনামা

৮। বিশেষ হুকুমনামা (দলত্যাগ সম্পর্কে)—১৩ই মার্চ, ১৯৪৫

৯। বিশেষ হুকুমনামা (দেশদ্রোহীদের সম্পর্কে)—১৩ই মার্চ, ১৯৪৫

১০। বর্মা ত্যাগের সময় বিশেষ হুকুমনামা—২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫

১১। বর্মাস্থ লীগের কাছে প্রেরিত বাণী—২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫

১২। বৃটিশ কর্তৃক আই-এন-এ বন্দীদের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে বিবৃতি- ৩০শে মে, ১৯৪৫

১৩। আত্মসমর্পণের গুজব সম্পর্কে বিশেষ হুকুমনামা—১৪ই আগস্ট, ১৯৪৫

১৪। জাপানীদের আত্মসমর্পণ প্রসঙ্গে বিশেষ হুকুমনামা—১৫ই আগস্ট, ১৯৪৫

১৫। পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয়দের উদ্দেশে বিশেষ বাণী—১৫ই আগস্ট, ১৯৪৫

১. ফৌজের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বগ্রহণ উপলক্ষে বিশেষ হুকুমনামা

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বার্থে আজ থেকে আমি আপনাদের ফৌজের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বভার গ্রহণ করছি।

এ আমার পক্ষে আনন্দ ও গৌরবের কথা—কেননা কোন ভারতীয়ের পক্ষে ভারতের মুক্তিফৌজের সেনাধিনায়ক হওয়ার চেয়ে বড সম্মান আর কিছুতে নেই। অবশ্য কাজটা যে বিরাট তা আমি জানি এবং আমার কাঁধে দায়িত্বের গুরুভার এসে পড়েছে। যত বড় ঝড ঝঞ্ঝাই আসুক না কেন, ভগবান যেন আমাকে যে কোন অবস্থায় কর্তব্যপালনের শক্তি দেন।

আমার দেশের নানা ধর্মাবলম্বী আটত্রিশ কোটি মানুষের সেবক ব'লে নিজেকে আমি মনে করি। এই আটত্রিশ কোটির স্বার্থ আমার হাতে যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, প্রত্যেকটি ভারতীয় যাতে আমার প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে পারে—সেইমত কর্তব্য সম্পাদন করতে আমি দৃঢপ্রতিজ্ঞ। একমাত্র খাঁটি জাতীয়তাবাদ এবং নিখুঁত ন্যায়নীতি ও নিরপেক্ষতার ভিত্তিতেই ভারতের মুক্তিফৌজ গডে উঠতে পারে।

আমাদের মাতৃভূমির শৃঙ্খলমোচনের জন্যে আটত্রিশ কোটি ভারতীয়ের শুভেচ্ছার ভিত্তিতে স্বাধীন ভারতের সরকার প্রতিষ্ঠার জন্যে এবং বরাবরের মত ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা করবে এমন এক স্থায়ী বাহিনী গঠনের জন্যে সামনে যে সংগ্রাম—তাতে আজাদ হিন্দ ফৌজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবার আছে। এই ভূমিকা পালন করতে হলে আমাদের এমন একটা বাহিনীর মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে, যার একটাই লক্ষ্য থাকবে—সে লক্ষ্য হল ভারতের স্বাধীনতা—এবং একটাই সংকল্প থাকবে—সে সংকল্প হল : ভারতের স্বাধীনতার জন্যে মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। আমরা উঠে দাঁড়ালে আজাদ হিন্দ ফৌজ হবে দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মত : আমরা এগিয়ে গেলে আজাদ হিন্দ ফৌজ হবে ষ্টীম-রোলারের মত।

আমাদের কাজ সহজ নয় : লড়াই হবে দীর্ঘ ও কঠিন, কিন্তু আমি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি যে, আমাদের আদর্শ ন্যায্য ও অপরাজেয়। যে আটত্রিশ কোটি জনসঙ্ঘ গোটা মানবজাতির এক-পঞ্চমাংশ—স্বাধীন হবার তাদের অধিকার আছে এবং স্বাধীনতার মূল্য দিতে তারা এখন প্রস্তুত। স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার ; পৃথিবীতে আজ আর এমন

কোন শক্তি নেই, সেই অধিকার থেকে যে আমাদের বঞ্চিত ক'রে রাখতে পারে।

অফিসার ও সৈনিক সাথী সব! তোমাদের অকুণ্ঠ সাহায্য ও অবিচলিত আনুগত্য পেলে আজাদ হিন্দ ফৌজ হবে ভারতের স্বাধীনতার হাতিয়ার। তোমাদের কথা দিচ্ছি, চূড়ান্ত জয় আমাদেরই।

আমাদের কাজ শুরু হয়ে গেছে। যতক্ষণ না নয়াদিল্লীর বড়লাট-ভবনে জাতীয় পতাকা উড়ছে, যতক্ষণ না ভারতের রাজধানীর বুকে প্রাচীন লালকেল্লার ভেতর আজাদ হিন্দ ফৌজের বিজয়সূচক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত না হচ্ছে—ততক্ষণ 'দিল্লী চলো' ধ্বনি দিয়ে এসো আমরা কাজে লাগি, এসো সংগ্রাম করি।

২৫শে আগস্ট, ১৯৪৩

সুভাষচন্দ্র বসু
সর্বোচ্চ সেনাধিনায়ক

২. অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের ঘোষণাপত্র

১৭৫৭ সালে বাংলাদেশে বৃটিশের হাতে ভারতীয় জনগণের প্রথম পরাজয়ের পর শতবর্ষ ধ'রে চলেছে দাঁতে দাঁত দিয়ে নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক কঠোর সংগ্রাম। এ যুগের ইতিহাসে আছে অদ্বিতীয় বীরত্ব ও আত্মত্যাগের অজস্র নজির। বাংলার সিরাজউদ্দৌলা আর মোহনলাল, দক্ষিণ ভারতের হায়দার আলি, টিপু সুলতান আর ভেলু তাম্পি, মহারাষ্ট্রের আপ্পা সাহেব ভোঁসলা আর পেশওয়া বাজিরাও, অযোধ্যার বেগমবৃন্দ, পাঞ্জাবের শ্যাম সিং আতরিওয়ালা এবং সেই সঙ্গে ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাই, তাঁতিয়া তোপী, ডুমরাওনের মহারাজ কুনওয়ার সিং আর নানা সাহেব—এমনি আরও বহু বীরের নাম এই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আমাদের বরাত খারাপ; আমাদের পূর্বপুরুষেরা গোড়ায় ঠিক বুঝে উঠতে পারেন নি যে, বৃটিশের হাতে সারা ভারতবর্ষ বিপন্ন—কাজেই তাঁরা শত্রুর বিরুদ্ধে একযোগে রুখে দাঁড়ান নি। শেষ পর্যন্ত যখন ভারতীয় জনসাধারণের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হল তাদের কী হাল হয়েছে, তখন তারা মিলিতভাবে উঠে দাঁড়াল—এবং ১৮৫৭ সালে বাহাদুর শাহের পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে তারা স্বাধীন জাতি হিসেবে শেষ বারের মত লড়াই করল। এই

যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে বারংবার চমকপ্রদভাবে জয়ী হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত দুরদৃষ্টক্রমে ও নেতৃত্বের দোষে চূড়ান্তভাবে তারা পরাজয় বরণ ক'রে পরাধীন হল। এ সত্ত্বেও ঝাঁসীর রাণী, তাঁতিয়া তোপী, কুনওয়ার সিং ও নানা সাহেবের মত বীর ও বীরাঙ্গনার দল জাতির স্মৃতিপটে চির ভাস্বর হয়ে থাকবে—আমাদের মহত্তর আত্মত্যাগ ও শৌর্যবীর্যের প্রেরণা দেবে।

বৃটিশ ১৮৫৭ সালের পর ভারতের জনসাধারণকে জোর ক'রে নিরস্ত্র করল এবং শুরু হল নিষ্ঠুর ভয়ত্রাসের রাজত্ব; ভারতবাসী কিছুদিন মাথা তুলতে পারল না—কিন্তু ১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন জাগরণ এল। ১৮৮৫ সাল থেকে শুরু করে বিগত বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত ভারতীয় জনসাধারণ হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্যে সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছে—আন্দোলন আর প্রচার, বিলিতি জিনিস বর্জন, সন্ত্রাসবাদ আর ধ্বংসকার্য—এবং শেষ পযন্ত সশস্ত্র বিপ্লব, কোন চেষ্টারই ত্রুটি হয়নি। ভারতবাসী যখন দেখেছে কিছুতেই কিছু হচ্ছে না, নতুন কোন উপায় দরকার—তখন ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আর সত্যাগ্রহের নতুন অস্ত্র হাতে এগিয়ে এলেন।

তারপর বিশ বছর ধ'রে ভারতের জনসাধারণ স্বদেশী কাজকর্মে একেবারে মেতে ওঠে। ভারতের ঘরে ঘরে স্বাধীনতার ডাক পৌঁছে গেল। লোকে দেখে দেখে শিখল স্বাধীনতার জন্যে দুঃখকষ্ট বরণ করতে, আত্মত্যাগ করতে, নিজেদের জীবন ডালি দিতে। কেন্দ্র থেকে সুদূর পল্লীতে লোকে একটি রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে একত্রে গ্রথিত হল। এইভাবে ভারতবাসী শুধু যে তাদের রাজনৈতিক চেতনা ফিরে পেল তাই নয়, সেই সঙ্গে নতুন ক'রে এক অখণ্ড রাজনৈতিক সত্তায় পরিণত হল। এখন তারা সমস্বরে কথা বলতে পারে, এক সম্মিলিত লক্ষ্যের জন্যে এক মন এক প্রাণ হয়ে কাজ করতে পারে। ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত আটটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলের কাজের ভেতর দিয়ে তারা প্রমাণ ক'রে দিল যে, নিজেদের শাসনকাজ তারা নিজেরা চালাতে প্রস্তুত ও সক্ষম।

এইভাবে বর্তমান বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে দেখা গেল ভারতের মুক্তির শেষ সংগ্রামের জন্যে জমি তৈরি। এই যুদ্ধে জার্মানি তার মিত্রদের সাহায্যে ইউরোপে আমাদের শত্রুর ওপর একের পর এক নিদারুণ আঘাত হেনেছে—

অন্যদিকে জাপান তার মিত্রদের সাহায্যে পূর্ব-এশিয়ায় আমাদের শত্রুকে মেরে পাট ক'রে ফেলেছে। এই মণিকাঞ্চন যোগ হওয়ার ফলে ভারতীয় জনসাধারণের সামনে আজ স্বাধীনতা লাভের এক পরম সুযোগ।

প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যেও রাজনৈতিক জগারণ এসেছে এবং তারা একটি সংগঠনের মধ্যে একজোট হয়েছে--সাম্প্রতিক ইতিহাসে এ ঘটনা এই প্রথম। স্বদেশের ভাইদের সঙ্গে তাদের মিল শুধু চিন্তায় আর অনুভূতিতে নয়, স্বাধীনতার পথে তাদেরই সঙ্গে সমান তালে তারা পা ফেলে চলেছে। বিশেষ ক'রে পূর্ব-এশিয়ায় বিশ লক্ষাধিক ভাবতীয় আজ সামগ্রিক যুদ্ধায়োজনের ধ্বনিতে অনুপ্রাণিত হয়ে একটি দৃঢবদ্ধ সংস্থার মধ্যে সংগঠিত হয়েছে। তাদের সামনে ভারতের মুক্তি ফৌজ 'দিল্লী চলো' ধ্বনি মুখে নিয়ে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে।

বৃটিশের কাছে প্রতারিত হয়ে হয়ে ভাবতীয়েরা আজ নাজেহাল, সেই সঙ্গে তার লুণ্ঠনের ফলে তাদের কপালে জুটেছে অনশন আর মৃত্যু—ভারতে তাই বৃটিশরাজের প্রতি ভারতের জনগণের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই এবং তার আজ টলায়মান অবস্থা। সেই হতচ্ছাড়া রাজত্বকে নির্মূল করতে হলে এখন দরকার শুধু আগুনের একটি শিখা। ভারতীয় মুক্তি ফৌজের কাজ সেই শিখা জ্বালিয়ে তোলা। স্বদেশে আজ বেসামরিক জনসাধারণেব ও বৃটিশের ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর একটি বড় অংশের সোৎসাহ সমর্থন এবং দেশের বাইরে আছে বীর অজেয় মিত্রদের সাহায্য, তবে আসলে দাঁড়াতে হবে নিজেদের শক্তির জোরে—ভারতের মুক্তি ফৌজের এ বিশ্বাস আছে যে, সে তার ঐতিহাসিক ব্রত সাধন করতে পারবে।

মুক্তির প্রভাত আসন্ন। ভারতবাসীর আজ উচিত নিজেদের অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করা এবং সেই সরকারের পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম শুরু করা। কিন্তু যেখানে সমস্ত ভারতীয় নেতা কারারুদ্ধ এবং স্বদেশের জনসাধারণ একেবারেই নিরস্ত্র— ভারতের অভ্যন্তরে অস্থায়ী সরকার গঠন কিংবা সেই সরকারের অধীনে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করা সম্ভব নয়। কাজেই পূর্ব-এশিয়ার ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের কর্তব্য হচ্ছে স্বদেশের ও বিদেশের সমস্ত দেশভক্ত ভারতীয়দের সমর্থনের জোরে এই কাজ হাতে দেওয়া —অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার গঠন ক'রে লীগ-সংগঠিত মুক্তি ফৌজের

(অর্থাৎ, আজাদ হিন্দ ফৌজের বা ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর) সাহায্যে শেষ সংগ্রাম পরিচালনা করা।

পূর্ব-এশিয়ার ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ কর্তৃক অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার হিসেবে নিযুক্ত হয়ে এবং আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্বন্ধে পুরোপুরি সচেতন হয়ে আমরা আমাদের কর্তব্য কাজে হাত দিচ্ছি। মাতৃ-ভূমির মুক্তিকল্পে আমাদের কাজ ও সংগ্রাম বিধাতার আশীর্বাদ লাভ করুক, এই আমাদের প্রার্থনা। এতদ্বারা আমরা শপথ গ্রহণ করছি যে, মাতৃভূমির মুক্তি, কল্যাণ ও জগৎসভায় উচ্চাসন লাভের চেষ্টায় আমরা আমাদের জীবন, আমাদের সহযোদ্ধাদের জীবন উৎসর্গ করব।

অস্থায়ী সরকারের কাজ হবে ভারতভূমি থেকে বৃটিশ ও তার মিত্রদের বিতাড়িত করবার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম চালানো। তারপর অস্থায়ী সরকারের কাজ হবে ভারতের জনসাধারণের ইচ্ছাক্রমে তাদের বিশ্বাসভাজন একটি স্থায়ী আজাদ হিন্দ জাতীয় সরকার গঠন করা। বৃটিশ ও তার মিত্রদের বিতাড়িত ক'রে ভারতভূমিতে স্থায়ী আজাদ হিন্দ জাতীয় সরকার পত্তন না হওয়া পর্যন্ত এই অস্থায়ী সরকার ভারতীয় জনগণের আস্থাভাজন হয়ে দেশ শাসন করবে।

অস্থায়ী সরকার প্রত্যেক ভারতীয়ের আনুগত্য লাভের যোগ্য এবং এতদ্বারা সেই আনুগত্য দাবি করছে। সর্বধর্মের স্বাধীনতা থাকবে ও সেই সঙ্গে সমস্ত নাগরিক সমান অধিকার ও সমান সুযোগ পাবে অস্থায়ী সরকার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। এই সরকার ঘোষণা করছে যে, জাতির সকল সন্তানকে সমান প্রীতির চোখে দেখে ধূর্ত বিদেশী সরকার-সৃষ্ট অতীতের সমস্ত বিভেদের পাঁচিল ডিঙিয়ে এই সরকার সমগ্র জাতির ও তার সকল অংশের সুখসমৃদ্ধি বিধান করতে কৃতসঙ্কল্প।

ঈশ্বরের নামে, ভারতীয় জনগণের জাতীয় ঐক্যবিধায়ক পূর্ব পুরুষদের নামে এবং যাঁরা আমাদের সামনে বীরত্ব ও আত্মত্যাগের আদর্শ রেখে গেছেন সেই মৃত বীরদের নামে আমরা ভারতবাসীকে আমাদের পতাকাতলে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতার লড়াই চালাবার জন্যে আহ্বান জানাচ্ছি। বৃটিশের বিরুদ্ধে ও ভারতে বৃটিশের যত মিত্র আছে তাদের সকলের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রাম শুরু করবার জন্যে এবং যতদিন ভারতভূমি থেকে শত্রুকে

বিতাড়িত ক'রে ভারতের জনগণ আবার স্বাধীন জাতি হিসেবে মাথা তুলে না দাঁড়ায় ততদিন চূড়ান্ত জয়ে আস্থা রেখে সাহস ও ধৈর্যের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাবার জন্যে দেশবাসীকে আমরা ডাক দিচ্ছি।

অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের পক্ষে স্বাক্ষরিত

সুভাষচন্দ্র বসু (রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং সমর ও পররাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী)

ক্যাপ্টেন শ্রীযুক্তা লক্ষ্মী (মহিলা প্রতিষ্ঠান)
এস. এ. আয়ার (প্রচার ও প্রোপাগাণ্ডা)
লেঃ-কর্নেল এ. সি. চ্যাটার্জী (অর্থদপ্তর)

লেঃ-কঃ আজিজ আহ্‌মদ, লেঃ-কঃ এন. এস. ভগৎ, লেঃ-কঃ জে. কে. ভোঁসলে, লেঃ-কঃ গুলজারা সিং, লেঃ কঃ এম. জেড. কিয়ানি. লেঃ কঃ এ. ডি. লোকনাথ, লেঃ-কঃ এহ্‌সান কাদির, লেঃ-কঃ শাহ্‌ নওয়াজ সৈন্যবাহিনীর প্রতিনিধি)

এ. এম. সহায়, সচিব (মন্ত্রীর পদমর্যাদা সহ)
রাসবিহারী বসু (সর্বোচ্চ উপদেষ্টা)

করিম গণি, দেবনাথ দাস, ডি. এম. খান, এ. ইয়েলাপ্পা, জে. থিভি,
সর্দার ঈশ্বর সিং (উপদেষ্টা)

এ. এন. সরকার (আইন উপদেষ্টা)
সায়োনান, ২১শে অক্টোবর, ১৯৪৩

৩. বিশেষ হুকুমনামা—৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪

সারা বিশ্বের দৃষ্টি আজ আরাকান রণাঙ্গনে নিবদ্ধ, সেখানে অনেক গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাবলী ঘটছে। রাজকীয় জাপবাহিনীর সঙ্গে একযোগে আজাদ হিন্দ ফৌজের সাহসী সৈন্যেরা যে বিরাট শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিয়েছে,

তার ফলে এই রণাঙ্গনে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর পাল্টা আক্রমণের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সৈনিকেরা যে যেখানেই থাকুক না কেন, আরাকান রণাঙ্গনে আমাদের সঙ্গীসাথীদের বীরত্বপূর্ণ কার্যাবলী তাদের মনে মহৎ প্রেরণা জাগাবে তাতে আমার সন্দেহ নেই। আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত দিল্লী অভিযান শুরু হয়েছে, আরাকান পাহাড়ে আজ যে ত্রিবর্ণ পতাকা উড়ছে, সেই পতাকা যতদিন না বড়লাট প্রাসাদে উত্তোলিত হচ্ছে, যতদিন না দিল্লীর সুপ্রাচীন লালকেল্লায় আমাদের বিজয়সূচক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে—ততদিন দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আমরা অভিযান চালিয়ে যাব।

ভারতের মুক্তিফৌজের অফিসার ও সৈনিক বন্ধুগণ! তোমাদের অন্তরের অন্তস্তলে এই সুগম্ভীর প্রতিজ্ঞা ধ্বনিত হোক—'হয় মুক্তি, নয়, মৃত্যু।' তোমাদের মুখে মুখে ধ্বনিত হোক একটিমাত্র আওয়াজ—'চলো দিল্লী।' দিল্লীর পথ মুক্তির পথ। সেই পথ দিয়ে আমাদের এগুতে হবে। আমাদের জয় ধ্রুব নিশ্চিত।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ! আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ!

সুভাষচন্দ্র বসু

৪. ভারতভূমিতে পদার্পণকালে আই-এন-এ ঘোষণাপত্র[১]

১. অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের অধিনায়কত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ বর্তমানে বিপুল সৈন্যবল নিয়ে আক্রমণের অগ্রমুখ হিসেবে পূর্ব-ভারতের একটি অঞ্চলে প্রবেশ করেছে।

পূর্ব-এশিয়ার সাধারণ শত্রু ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিকে চূর্ণবিচূর্ণ করা, স্বৈরাচারী শাসনাধীনে যুগ যুগ ধ'রে লাঞ্ছিত ভারতের বন্ধনদশা ঘুচিয়ে ভারতবর্ষে ভারতীয়ের প্রকৃত স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করা; স্বদেশের আটত্রিশ কোটি ভারতীয়ের জীবনে পূর্ণ স্বাধীনতা ও শান্তি শৃঙ্খলা আনা; আমাদের প্রতিবেশী দেশ—স্বাধীন বর্মার চতুঃসীমা থেকে ইঙ্গ-মার্কিন আপদ দূর করা,- এই

১ বিতরণের উদ্দেশ্যে ইস্তাহার আকারে রচিত

উদ্দেশ্য নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ রাজকীয় জাপবাহিনীর সাহায্যে ও সহযোগিতায় পূর্ব-ভারতে ঠেলে ঢুকেছে।

ভারতের ভাই ও বোনেরা!

নির্ভয়ে তোমরা তোমাদের নিত্যকার কাজ চালিয়ে যাও; অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার কর্তৃক উত্তোলিত মুক্তির ত্রিবর্ণ পতাকার নীচে সর্বান্তঃকরণে তোমরা সামিল হও; আমাদের শত্রু ইঙ্গ-মার্কিনদের হাত থেকে আমাদের মাতৃভূমিকে ছিনিয়ে নিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করবার জন্যে শক্ত হয়ে দাঁড়াও।

রাজকীয় জাপবাহিনীর প্রবল সহায়তায় ও স্থানীয় জনসাধারণের সাহায্যে আজাদ হিন্দ ফৌজ অগ্রসর হওয়ায় পূর্ব-ভারত অঞ্চল আজ ইঙ্গ-মার্কিন দাসত্বের শৃঙ্খলমুক্ত। ভারতভূমিতে এই অঞ্চলই প্রথম স্বাধীন ভারতীয় অঞ্চলে পরিণত হয়েছে এবং এই অঞ্চল আমাদের মাতৃভূমির মুক্তির ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হবে। রাজকীয় জাপবাহিনী নিজেদের সামরিক শাসন প্রবর্তন করবে না; বরং অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার যাতে পুরোপুরি শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারে, তার জন্যে সহযোগিতা করবে ও সর্বান্তঃকরণে সাহায্য করবে।

২. অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার ও আজাদ হিন্দ ফৌজের বিধিবদ্ধ অপরাধ-সংক্রান্ত আইন এবং জাপবাহিনীর সামরিক আইন বলবৎ করার ব্যাপারে দুই মিত্রবাহিনী অর্থাৎ, আজাদ হিন্দ ফৌজ ও তার মিত্র রাজকীয় জাপবাহিনী একমত; কেউ যদি অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার ও আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং আমাদের মিত্র জাপবাহিনীর অভিপ্রায় বুঝতে না পারে এবং ভারতের মুক্তিসাধনের পক্ষে বিঘ্নকর নিম্নোক্ত কোন কাজ করার স্পর্ধা দেখায়, তাহলে উপরোক্ত আইন অনুযায়ী তার মৃত্যুদণ্ড বা কোন কঠোর দণ্ড হবে।

দণ্ডনীয় কার্যাবলী

(১) অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার অথবা আজাদ হিন্দ ফৌজ অথবা আমাদের মিত্র জাপবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহমূলক কোন কাজ।

(২) গুপ্তচর বৃত্তি।

(৩) অস্থায়ী সরকারের অধিকারভুক্ত অথবা আমাদের মিত্র

জাপবাহিনীর মালিকানাধীন কোন যুদ্ধসামগ্রী চুরি ও বলপূর্বক আত্মসাৎ করা, ক্ষতিসাধন ও ধ্বংস করা।

(৪) অস্থায়ী সরকারের সঙ্গে পূর্ব-ব্যবস্থামত যে সব দামী সম্পদ অস্থায়ী সরকারের অথবা জাপবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে অথবা ব্যবহারে লাগে, তার ক্ষতিসাধন অথবা ধ্বংসসাধন।

(৫) অস্থায়ী সরকারের সঙ্গে পূর্ব-ব্যবস্থামত যানবাহন, যোগাযোগ, পরিবহন, বেতার প্রচার প্রভৃতি যে সব সংস্থা ও সাজসরঞ্জাম অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার ও আজাদ হিন্দ ফৌজ অথবা জাপ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে অথবা ব্যবহারে লাগে, তার ক্ষতিসাধন অথবা ধ্বংসসাধন, ঐ সব ব্যাপারে লোক নিয়োগ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন রকম ব্যাঘাত সৃষ্টি।

(৬) অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার ও আজাদ হিন্দ ফৌজ, অথবা আমাদের মিত্র জাপবাহিনীর সঙ্গে যারা যুক্ত, তাদের ওপর বল প্রয়োগ, ভীতি প্রদর্শন, হত্যা অথবা জখম করা অথবা অন্যভাবে অনিষ্টসাধন করা।

(৭) শত্রুপক্ষের বক্তব্য প্রচার করা অথবা মিথ্যা ও আজগুবী গুজব ছড়ানো এবং লোকমনে অন্য নানাভাবে চাঞ্চল্য ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা।

(৮) মুদ্রার প্রচলন ও অর্থনৈতিক সংগঠন ব্যাহত করা অথবা জিনিসের উৎপাদন ও অবাধ বিনিময়ে বিঘ্ন সৃষ্টি করা।

(৯) উপরোক্ত তালিকা বহির্ভূত এমন কোন কাজ যাতে শত্রু-পক্ষের সুবিধা হয় অথবা যা অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার ও আজাদ হিন্দ ফৌজ অথবা জাপবাহিনীর পক্ষে হানিকর ও শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ।

(১০) উপরোক্ত তালিকাভুক্ত কার্যাবলী অনুষ্ঠানের দিক থেকে চেষ্টা, প্ররোচনা ও সাহায্য।

এই সব অপরাধের বিচার ও শাস্তি সম্পূর্ণভাবে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের অভিপ্রায় অনুযায়ী হবে; কেবল যে ক্ষেত্রে যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার দরুন এমন অপরাধ যে, জাপবাহিনী কর্তৃক ব্যবস্থাবলম্বন অপরিহার্য, একমাত্র

সেই ক্ষেত্রে দুই মিত্রবাহিনীর পূর্বস্বীকৃতি অনুযায়ী জাপবাহিনী উক্ত অপরাধের শাস্তি দেবে।

৩. জাপবাহিনী যে অঞ্চলে প্রবেশ করেছে সে অঞ্চলে কঠোর শৃঙ্খলা রক্ষা করবে এবং ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে যারা শত্রুতামূলক কাজকর্মে লিপ্ত নয় তাদের ধনপ্রাণ রক্ষণাবেক্ষণ করবে; ভারতীয় জনসাধারণের ধর্ম, আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতির প্রতি যথাবিহিত সম্মান দেখাবে।

এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে যে, কোন জাপানী সৈন্য এই সুস্পষ্ট নির্দেশ অমান্য করলে রাজকীয় জাপবাহিনীর সামরিক আইন অনুযায়ী কঠোর শাস্তি পাবে।

আজাদ হিন্দ ফৌজ যে অঞ্চলে প্রবেশ করেছে সে অঞ্চলে কঠোর শৃঙ্খলা রক্ষা করবে এবং ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে যারা শত্রুতামূলক কাজকর্মে লিপ্ত নয় তাদের ধনপ্রাণ রক্ষণাবেক্ষণ করবে; এবং স্বদেশবাসীর ধর্ম, আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতির প্রতি যথাবিহিত সম্মান দেখাবে।

এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে যে, কোন ভারতীয় সৈন্য এই সুস্পষ্ট নির্দেশ অমান্য করলে আজাদ হিন্দ ফৌজের সামরিক আইন অনুযায়ী কঠোর শাস্তি পাবে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বোচ্চ সেনাধ্যক্ষ কর্তৃক ১৯৪৪ সালের···মাসে উপরোক্ত ঘোষণা জারী করা হল।

৫. **দ্বিতীয় ঘোষণাপত্র**—৪ঠা এপ্রিল, ১৯৪৪

পূর্ব-এশিয়ার ত্রিশ লক্ষ ভারতীয়ের সর্ববাদী সম্মত ইচ্ছানুযায়ী ১৯৪৩ এর ২১শে অক্টোবর সায়োনানে (পূর্ব নাম সিঙ্গাপুর) গঠিত অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের নেতৃত্বাধীনে আজাদ হিন্দ ফৌজ সীমান্ত অতিক্রম ক'রে ভারতীয় রাজ্যের অনেকখানি ভেতরে ঢুকে পড়েছে।

তোমাদের আপন সরকার অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার—এই সরকারের একটিই ব্রত। সে ব্রত হল: সশস্ত্র শক্তির সাহায্যে পবিত্র ভারত-ভূমি থেকে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীকে হটানো এবং ভারতীয় জনগণের ইচ্ছানুসারে একটি স্থায়ী আজাদ হিন্দ জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা।

ভারত থেকে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী নিশ্চিহ্ন অথবা বিতাড়িত না হওয়া পযন্ত অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।

একদিকে সশস্ত্র সংগ্রাম চলবে, ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণভাবে শত্রুকবল মুক্ত করবার জন্যে; অন্যদিকে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার মুক্ত অঞ্চলে পুনর্গঠনের কাজ চালিয়ে যাবে।

ভারতীয় জনসাধারণের একমাত্র বৈধ সরকার হল অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার। আজাদ হিন্দ ফৌজকে এবং অস্থায়ী সরকারের নিযুক্ত বেসামরিক কর্মচারীদের সর্বতোভাবে সাহায্য করবার জন্যে অস্থায়ী সরকার মুক্ত অঞ্চলের ভাবতীয় জনসাধারণকে আহ্বান জানাচ্ছে।

মুক্ত অঞ্চলের ভাবতীয় অধিবাসীদের ধনেপ্রাণে রক্ষা করা হবে—অস্থায়ী সরকার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন শত্রুদের ও তাদের মিত্রদের সাহায্যমূলক কোন কাজে যারা প্রকাশ্যে অথবা গোপনে লিপ্ত থাকবে অথবা অস্থায়ী সরকাবের আরব্ধ গঠনমূলক কাজে যারা বিঘ্ন সৃষ্টি করবে তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।

জাপবাহিনী আমাদের মিত্র, আমাদের শত্রু যাতে পরাস্ত হয় তার জন্যে তাবা আমাদের বিনা শর্তে অকাতরে সাহায্য করছে—ভারতীয় জনসাধারণ সর্বান্তঃকরণে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুক, এ মর্মে অস্থায়ী সরকার আবেদন জানাচ্ছে। আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, চুংকিং-চীন এবং পূর্ব ও পশ্চিম-আফ্রিকা থেকে সৈন্য আমদানি ক'রে গত তু'বছর ধ'রে বৃটিশেরা তাদের বলবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে। সুতরাং অস্থায়ী সরকার বাধ্য হয়েছে জাপানের সর্ববিধ সাহায্যের উদার প্রস্তাব গ্রহণ কবতে, তাছাড়া এই জাপানেরই সৈন্যবাহিনী পূর্ব-এশিয়ায় যুদ্ধ শুরু হওয়াব পব ইঙ্গ-মার্কিনদের পরের পর হারিয়ে অতুলনীয় বিজয় লাভ করেছে। অস্থায়ী আজাদ হিন্দ ফৌজ এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, আমাদের মিত্র জাপবাহিনার অপরাজেয় শক্তির সাহায্যে আজাদ হিন্দ ফৌজ ইঙ্গ-মার্কিনদের চূর্ণ ক'রে ভারতের পূর্ণ মুক্তি আনবে।

ভারতের প্রতি জাপানের আন্তরিকতা সম্পর্কে অস্থায়ী সরকারের কোন সন্দেহ নেই। অস্থায়ী সরকার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, ভারতে জাপানের কোন রকম রাজ্য দখল সংক্রান্ত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামরিক লোভ নেই। অস্থায়ী সবকার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, জাপানের

একমাত্র আগ্রহ ভারতে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিকে ধ্বংস করা ; ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি শুধু ভারতেরই দুশমন নয়, এশিয়ারও দুশমন। একমাত্র ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে খতম করতে পারলেই এ যুদ্ধ শেষ হবে এবং পৃথিবীতে শান্তি আসবে।

স্বাধীন সরকারের মর্যাদাবলে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার বিভিন্ন মূল্যমানের টাকার নোট সমন্বিত নিজস্ব মুদ্রাব্যবস্থা চালু করার বন্দোবস্ত করছে। কিন্তু দ্রুত সংঘটিত যুদ্ধ পরিস্থিতির দরুন ভারতে আমাদের তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসাতে আমরা যথাসময়ে ভারতবর্ষে অস্থায়ী সরকারের মুদ্রা সঙ্গে ক'রে আনতে পারিনি। কাজেই এ অবস্থায় অস্থায়ী সরকার জাপ সরকারের কাছ থেকে তার হেফাজতে-থাকা টাকা (সামরিক টাকার নোট) ধার করতে এবং সাময়িকভাবে ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছে। যে মুহূর্তে অস্থায়ী সরকার তার নিজস্ব মুদ্রা হাতে পাবে, জাপ সরকারের কাছ থেকে ধার করা মুদ্রা ক্রমশ বাজার থেকে তুলে নেওয়া হবে।

ভাই ও বোনেরা! আমাদের শত্রুরা আজ ভারতভূমি থেকে বিতাড়িত হচ্ছে আর তোমরা তোমাদের পূর্ব সত্তা ফিরে পাচ্ছ—অর্থাৎ তোমরা হচ্ছ স্বাধীন নরনারী। তোমাদের নিজস্ব সরকার অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারকে আশ্রয় ক'রে তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ হও—এবং তার ভেতর দিয়ে তোমরা তোমাদের নবলব্ধ স্বাধীনতা রক্ষা করো ও বজায় রাখো।

৪ঠা এপ্রিল, ১৯৪৪ সুভাষচন্দ্র বসু, রাষ্ট্রপতি

৬। ইম্ফল থেকে পশ্চাদপসরণকালে বিশেষ হুকুমনামা

আজাদ হিন্দ ফৌজের সাথীরা,

এই বছরে মার্চের মাঝামাঝি আজাদ হিন্দ ফৌজের অগ্রগামী সৈনিকেরা তাদের মিত্রপক্ষীয় রাজকীয় জাপবাহিনীর বীর সৈনিকদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ভারত-বর্মা সীমান্ত অতিক্রম করে এবং তারপর ভারতভূমিতে শুরু হয় ভারতের মুক্তিযুদ্ধ।

বৃটিশ কর্তৃপক্ষ শতাধিক বর্ষকাল ভারতবর্ষকে নিষ্ঠুরভাবে শোষণ ক'রে এবং তাদের হয়ে লড়াই করবার জন্যে বিদেশী সৈন্য এনে আমাদের বিরুদ্ধে প্রবল শক্তি নিয়োজিত করতে সমর্থ হয়েছে। নিজেদের আদর্শের

স্বাধ্যতায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা ভারত-বর্মা সীমান্ত লঙ্ঘন করেছিলাম; শত্রুপক্ষের সৈন্যবল ও অস্ত্রবল আমাদের চেয়ে বেশী হলেও তাদের মধ্যে ঐক্য ও মিল না থাকায় প্রত্যেকটি যুদ্ধে আমরা তাদের পরাস্ত করেছিলাম। আমাদের পল্টনদের ছিল উন্নততর শিক্ষা ও শৃঙ্খলা এবং ভারতবর্ষের পথে মৃত্যুপণ ক'রে লড়বার দৃঢ়তা; কাজেই তারা সহজেই শত্রুপক্ষকে দাবিয়ে দিতে পেরেছিল এবং প্রত্যেকটি পরাজয়ের ফলে তাদের মনোবল দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। অত্যন্ত কষ্টকর অবস্থার মধ্যে আমাদের অফিসার ও সৈনিকেরা যে রকম সাহস ও বীরত্ব দেখিয়েছে, তাতে তারা সকলেরই প্রশংসাভাজন হয়েছে। শরীরের রক্ত ঢেলে ও আত্মত্যাগ ক'রে এই বীরের দল যে ঐতিহ্য স্থাপন করেছে, স্বাধীন ভারতের ভাবী সৈনিকদের সে ঐতিহ্য অম্লান রাখতে হবে। ইম্ফলের ওপর আক্রমণ হবে, সমস্ত দিক থেকে সব তৈরি—হঠাৎ তুমুল বৃষ্টিতে আমরা আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম; তখন আর আক্রমণ করে ইম্ফল অধিকার করা রণকৌশলের দিক থেকে সম্ভব হল না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাদ সাধায় সাময়িকভাবে আমাদের আক্রমণ স্থগিত রাখতে হল। আক্রমণ স্থগিত রাখার পর দেখা গেল যেখানে আমরা ছিলাম সে জায়গায় আমাদের সৈন্যবাহিনীর থাকার নানা অসুবিধা। যাতে আরও ভালভাবে আত্মরক্ষা করা যায় তার জন্যে আমাদের সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদ-পসরণ যুক্তিযুক্ত ব'লে মনে করা হল। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমাদের সৈন্যবাহিনীকে আত্মরক্ষার দিক থেকে আরও সুবিধাজনক একটি জায়গায় সরিয়ে নিয়ে আসা হল। বর্তমানে যে শান্ত অবস্থা, তার মধ্যে আমরা প্রস্তুতি পর্ব সমাধা ক'রে ফেলব—যাতে অনুকূল আবহাওয়া দেখা দিতে শুরু করলেই আমরা আবার আক্রমণ আরম্ভ করতে পারি। রণাঙ্গনের বিভিন্ন দিকে শত্রুপক্ষকে একবার ক'রে হারিয়ে দিয়ে আমাদের চূড়ান্ত জয়ে ও ইঙ্গ-মার্কিনদের পররাজ্য আক্রমণকারী শক্তির ধ্বংসে আমাদের বিশ্বাস দশগুণ বেড়ে গেছে। যে মুহূর্তে আমাদের প্রস্তুতি পর্ব সম্পূর্ণ হবে, আমরা আমাদের শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে পুনর্বার প্রবল অভিযান চালনা করব। উন্নততর যুদ্ধক্ষমতা, অদম্য সাহস ও অবিচলিত কর্তব্যনিষ্ঠার অধিকারী আমাদের অফিসার ও সৈনিকেরা; আমরা অবশ্যই জয়ী হব।

• এই যুদ্ধাভিযানে যে বীরের দল প্রাণপাত করেছে, তাদের আত্মা

ভারতের মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে আরও বড় বীরত্ব ও সাহসিকতার কাজে আমাদের অনুপ্রাণিত করুক। জয় হিন্দ।

বর্মা, ১৪ই আগস্ট, ১৯৪৪ সুভাষচন্দ্র বসু

সর্বোচ্চ সেনাধ্যক্ষ

৭. বিশেষ হুকুমনামা—১৯৪৫-এর নববর্ষ দিবসে

আজাদ হিন্দ ফৌজের সাথীবৃন্দ,

আজ এই শুভ নববর্ষ দিবসে প্রথমে তোমরা আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের পর তোমাদের সাফল্য ও তোমাদের অগ্রগতির কথা একবার ভেবে দেখ। এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, বহু বাধাবিঘ্ন ও ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও তোমাদের সত্যিই উল্লেখযোগ্য সাফল্য ও অগ্রগতি ঘটেছে। আজ ভারতীয় জনগণের মধ্যে উদ্বুদ্ধ স্বাধীনতা লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, পূর্ব-এশিয়ায় আমাদের স্বদেশবাসীর বহুমুখী সাহায্য, আমাদের মিত্রদেশগুলির মূল্যবান সহায়তা এবং সর্বোপরি তোমাদের নিজেদের কঠোর পরিশ্রম ও আত্মত্যাগ—এরই ফলে এই সাফল্য ও অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে।

১৯৪৩ সাল শেষ হওয়ার আগেই আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যেরা দলে দলে ভারত-বর্মা সীমান্তের দিকে অগ্রসর হতে আরম্ভ করে। ১৯৪৪-এর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বর্মার আরাকান অঞ্চলে ভারতের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৪৪-এর ২১শে মার্চ আমরা সারা বিশ্বে ঘোষণা করতে সমর্থ হই যে, আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের পূর্ব-সীমান্ত অতিক্রম করেছে এবং এখন পবিত্র ভারতভূমিতে দাঁড়িয়ে লড়াই করছে। তারপর থেকে সমানে যুদ্ধ চলেছে এবং এই যুদ্ধ-অভিযানে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই ক'রে আমাদের বহু সহযোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন দিয়েছে।

ভারতের মুক্তিযুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সৈন্যেরা ইতিমধ্যেই তাদের শৌর্য, বীর্য ও আত্মত্যাগের ভেতর দিয়ে ভাবীকালের ভারতবর্ষের জন্যে এক অমূল্য ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছে—আর আজাদ হিন্দ ফৌজের দিক থেকেও তারা এক গৌরবময় অমর অবদান রেখে গেছে যা চিরদিন সবাইকে প্রেরণা দেবে।

কমরেডস্! আজ এই শুভদিনে তোমরা নীরবে এইসব মৃত্যুহীন বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাও এবং পূর্ণ জয়লাভ না হওয়া পর্যন্ত নব উদ্যমে লড়াই চালিয়ে যাবার পবিত্র শপথ গ্রহণ করো। ভারতবর্ষ আজ তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছে। সহযোদ্ধাদের আত্মা তোমাদের আরও বেশী সাহসের কাজে এগিয়ে যাবার জন্যে ব্যগ্রতা জানাচ্ছে। সামনে কঠোর সংগ্রাম, তোমরা কোমর বেঁধে এগিয়ে যাও। যতক্ষণ না ভারতের রাজধানীর শীর্ষে আমাদের ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা উড়ছে ততক্ষণ আমাদের শ্রান্তি ক্লান্তি নেই।

কমরেডস্! আমাদের অমর বীরের দল নিজেদের রক্ত দিয়ে ভারতের স্বাধীনতার মূল্য দিয়েছে। তাদের কথা মনে ক'রে আমরা গর্বিত। কিন্তু আমাদেরও চূড়ান্ত আত্মত্যাগের জন্যে তৈরি থাকতে হবে। দলের একজনও যতক্ষণ বেঁচে আছে ততক্ষণ প্রাণপণ ক'রে লড়বে—এই সংকল্পে অটল থাকলে তবেই আজাদ হিন্দ ফৌজের নাম সার্থক ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। আমরা নিজেদের রক্ত দেব এবং শত্রুপক্ষের রক্ত নেব। অতএব তোমরা আওয়াজ উঠাও—১৯৪৫ সালে তোমাদের রণধ্বনি হোক…'রক্ত, রক্ত, শুধু রক্ত।'

১লা জানুয়ারী, ১৯৪৫ সুভাষচন্দ্র বসু

৮. বিশেষ হুকুমনামা (দলত্যাগ সংক্রান্ত)

আজাদ হিন্দ ফৌজের সমস্ত অফিসার ও সৈনিকদের প্রতি—

কমরেডস্,

গত বছর যুদ্ধক্ষেত্রে আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সৈনিকেরা যে সাফল্য অর্জন করেছিল এবং শত্রুপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে দেশপ্রেম, সাহসিকতা ও আত্মত্যাগের জোরে যে বিজয়লাভ করেছিল জনকয়েক অফিসার ও সৈনিকের ভীরুতা ও বিশ্বাসঘাতকতার ফলে কতকাংশে তা নষ্ট হয়েছে তোমরা সকলেই তা জানো। আমরা আশা করছিলাম যে, নতুন বছরে কাপুরুষতা আর বিশ্বাসঘাতকতার সমস্ত চিহ্ন লুপ্ত হবে; এবং এ বছরের লড়াইতে আজাদ হিন্দ ফৌজ কলঙ্কলেশশূন্য বীরত্ব ও আত্মত্যাগ দেখাতে পারবে। কিন্তু তা হয়নি।• সম্প্রতি ২ নং ডিভিশনের সদর ঘাঁটির পাঁচজন অফিসারের বিশ্বাস-

ঘাতকতা আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে, আমাদের দলের মধ্যে গণ্ডগোল আছে এবং ভীরুতা ও বিশ্বাসঘাতকতার বীজ নির্মূল করা দরকার। আমরা এবার যদি ভীরুতা ও বিশ্বাসঘাতকতা চিরতরে দূর করতে সমর্থ হই, তাহলে ভগবানের দয়ায় এই জঘন্য লজ্জাকর ঘটনা শেষ পর্যন্ত শাপে বর হয়ে দেখা দিতে পারে। সুতরাং আমাদের সৈন্যবাহিনীকে কলুষমুক্ত করবার উদ্দেশ্যে সম্ভবপর সমস্ত জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্যে আমি এখন কৃতসঙ্কল্প। আমার বিশ্বাস আছে যে, এই কাজে আমি তোমাদের কাছ থেকে পরিপূর্ণ ও অকুণ্ঠ সাহায্য পাব। কাপুরুষতা ও বিশ্বাসঘাতকতা সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করবার জন্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করতে হবে :

১. আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রত্যেক সদস্য, অফিসার, এন-সি-ও অথবা সেপাই অতঃপর আজাদ হিন্দ ফৌজের যে কোনো পদমর্যাদাসম্পন্ন সদস্যকে কাপুরুষতার দরুন গ্রেপ্তার অথবা বিশ্বাসঘাতকতার দরুন গুলি ক'রে মারতে পারবে।

২. আজাদ হিন্দ ফৌজের যে সদস্যেরা মনে করবে যে তারা ভবিষ্যতে কর্তব্যনিষ্ঠভাবে কাজ করতে অথবা সাহসের সঙ্গে লড়াই করতে আগ্রহশীল নয়, আমি তাদের আজাদ হিন্দ ফৌজ ছেড়ে চলে যাবার সুযোগ দিচ্ছি। বিজ্ঞপ্তি প্রচারের এক সপ্তাহের মধ্যে এই সুযোগ গ্রহণ করতে হবে।

৩. একদিকে যেমন অনিচ্ছুক লোকদের স্বেচ্ছায় আজাদ হিন্দ ফৌজ ছেড়ে যাবার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, তেমনি আমি অন্যদিকে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে অবাঞ্ছিত লোকদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে চাই। এই বিতাড়নপর্বে যাদেরই ওপর সন্দেহ হবে যে, সংকট কালে তারা ভেঙ্গে পড়তে পারে অথবা আমাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে তাদের দল থেকে ভাগাতে হবে। এই বিশুদ্ধিকরণের ব্রত যাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় তার জন্যে আমি তোমাদের সহযোগিতা চাই পুরোপুরি ; এবং আমি চাই যে, আমাদের বাহিনীতে কাপুরুষ ও বিশ্বাসঘাতক লোক দেখলেই তোমরা আমাকে ও আমার বিশ্বস্ত অফিসারদের সে সম্পর্কে সমস্ত রকম খবরাখবর দেবে।

৪. বর্তমানে অবাঞ্ছিত লোকদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করলেও সমস্যা একেবারে মিটবে না। ভবিষ্যতেও সতর্কদৃষ্টি রাখতে হবে। ঠিক সময়ে যাতে ভীরুতা বা বিশ্বাসঘাতকতার দিকে ঝোঁক ধরা পড়ে, তার জন্যে ভবিষ্যতে আজাদ হিন্দ

ফৌজের কোন সদস্য যদি কারো মধ্যে কোনরকম কাপুরুষতা বা বিশ্বাস-ঘাতকতার ঝোঁক দেখে, তাহলে সে যেন তৎক্ষণাৎ আমাকে অথবা হাতের কাছে কোন অফিসারকে মৌখিকভাবে অথবা লিখিতভাবে জানায়। অর্থাৎ, এখন থেকে বরাবরের জন্যে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রত্যেক সদস্য যেন নিজেকে আজাদ হিন্দ ফৌজ ও ভারতীয় জাতির মানমর্যাদার রক্ষক ব'লে মনে করে।

৫. বিশুদ্ধিকরণের কাজ সমাধা হওয়ার পর এবং অনিচ্ছুক লোকদের আমাদের দল ছেড়ে চলে যাওয়ার সুযোগ দেওয়ার পর যদি কোন কাপুরুষতা বা বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপার ঘটে, তাহলে সে ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।

৬. আমাদের সেনাবাহিনীতে কাপুরুষতা ও বিশ্বাসঘাতকতা রোধ করতে হলে যে কোন রকমের কাপুরুষতা ও বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা জাগিয়ে তুলতে হবে। বাহিনীর প্রত্যেকটি সদস্যের মধ্যে এই রকমের একটি বলিষ্ঠ বোধ জাগাতে হবে যে, বিপ্লবী বাহিনীর যোদ্ধাদের মধ্যে ঘৃণ্য ও জঘন্যতম অপরাধ হল কাপুরুষ বা বেইমান হওয়া। কি ভাবে আমরা কাপুরুষতা ও বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে এমন তীব্র ঘৃণা জাগিয়ে তুলতে পারব যাতে আমাদের মধ্যে আর কেনো কাপুরুষ বা বেইমান থাকবে না—সে বিষয়ে পৃথকভাবে নির্দেশ জারী হচ্ছে।

৭. বিশুদ্ধিকরণের কাজ সমাধা হওয়ার পর আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রত্যেক সদস্যকে এই মর্মে নতুন ক'রে শপথ নিতে হবে যে, আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে লড়াই ক'রে যাবো। এই শপথের ধরন ও প্রকৃতি কি হবে, সে সম্পর্কে পৃথকভাবে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

৮. যারা কাপুরুষ ও বিশ্বাসঘাতক লোকদের সম্পর্কে খবরাখবর দেবে অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে কাপুরুষ ও বিশ্বাসঘাতকদের যারা গ্রেপ্তার করবে অথবা গুলি ক'রে মারবে, তাদের বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে।

বর্মা, ১৩ই মার্চ, ১৯৪৫ সুভাষচন্দ্র বসু, সর্বোচ্চ সেনাধ্যক্ষ
আজাদ হিন্দ ফৌজ

৯. বিশেষ হুকুমনামা (বিশ্বাসঘাতকদের সম্বন্ধে)
১৩ই মার্চ, ১৯৪৫

কমরেডস্,

কাপুরুষতা ও বেইমানির বিরুদ্ধে আমাদের ঘৃণা, বিরক্তি ও বিতৃষ্ণা প্রকাশ করবার জন্যে পূর্বনির্দিষ্ট একটি দিনে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রত্যেকটি শিবিরে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান পালিত হবে। সমস্ত অফিসার ও দলের সবাইকে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হবে। অনুষ্ঠানের পূর্ণ সাফল্যের জন্যে খুঁটিনাটি ঠিক করবার ব্যাপারে প্রত্যেক শিবির তার নিজস্ব কর্মসূচী নির্ধারণ করবে। তা সত্ত্বেও, এইসঙ্গে মোটামুটিভাবে কিছু নির্দেশ দেওয়া হল :

(ক) কাপুরুষতা ও বেইমানির বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা প্রকাশ ক'রে কবিতা বা প্রবন্ধ লেখা ও পড়া যেতে পারে।

(খ) কাপুরুষতা ও বেইমানির বিরুদ্ধে ঘৃণাব্যঞ্জক নাটক তৈরী ক'রে অভিনয় করা যেতে পারে।

(গ) কার্ডবোর্ড বা খড় বা মাটি বা অন্য কোন যুৎসই উপাদান দিয়ে মানুষ বা জন্তুর আকারে বেইমানদের (রিয়াজ, মদন, সারওয়ার, দে, মহম্মদ বকৃশ ও অন্যান্যদের) কুশপুত্তলিকা তৈরী করা উচিত এবং শিবিরের প্রত্যেকের উচিত বেইমানদের বিরুদ্ধে পুরোদমে ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা প্রকাশ করা।

(ঘ) অতীতের ভারতীয় বীরদের প্রশংসা করে ও বর্তমান মুক্তি-যুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্বগাথা গেয়ে বক্তৃতা দেওয়া উচিত।

(ঙ) জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে ও মিলিতভাবে ধ্বনি দিয়ে এই দিনের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হবে।

যে শিবিরে সবচেয়ে ভাল অনুষ্ঠান হবে, সেই শিবিরকে বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত করা হবে।

সুভাষচন্দ্র বসু, সর্বোচ্চ সেনাধ্যক্ষ
বর্মা, ১৩ই মার্চ, ১৯৪৫ আজাদ হিন্দ ফৌজ

১০. বর্মা ত্যাগের প্রাক্কালে বিশেষ হুকুমনামা

২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫

আজাদ হিন্দ ফৌজের সাহসী অফিসার ও সৈনিকবৃন্দ,

১৯৪৪-এর ফেব্রুয়ারীর পর থেকে যেখানে তোমরা বীরত্বের সঙ্গে বহু সংগ্রাম করেছ—সেই বর্মা আজ আমি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ছেড়ে চলেছি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দফায় ইম্ফলে আর বর্মায় আমাদের ভাগ্যবিড়ম্বনা ঘটেছে। কিন্তু এ তো শুধু প্রথম দফা। এখনও আমাদের দফায় দফায় লড়তে হবে। আমি আজন্ম আশাবাদী; কোন অবস্থাতেই আমি পরাজয় বরণ করব না। ইম্ফলের পাহাড়তলীতে, আরাকানের পাহাড়ে জঙ্গলে এবং বর্মার তৈলাঞ্চল ও অন্যান্য এলাকায় শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে তোমাদের বীরত্বপূর্ণ কীর্তিকলাপ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

কমরেডস্! এই সন্ধিক্ষণে তোমাদের কাছে একটি আদেশ মাত্র দেবার আছে, তা হল এই যে, সাময়িকভাবে যদি হেরে যেতেই হয়, জাতীয় ত্রিবর্ণ পতাকা উঁচু ক'রে ধ'রে লড়তে লড়তে হেরে যাও; পরাজিত হও। তোমাদের বিরাট আত্মত্যাগের ফলেই ভারতীয়দের ভাবী বংশধরেরা ক্রীতদাস হিসাবে নয়, স্বাধীন মানুষ হিসেবে জন্ম নেবে; তারা তোমাদের নাম গান করবে এবং সমগ্র বিশ্বের কাছে সগর্বে ঘোষণা করবে: তোমরা তাদের পূর্বপুরুষেরা, মণিপুর, আসাম আর বর্মার যুদ্ধে লড়াই ক'রে হেরে গিয়েছ বটে, কিন্তু সাময়িক পরাজয়ের ভেতর দিয়ে তোমরা চূড়ান্ত সফলতা ও গৌরবের পথ প্রশস্ত করেছ।

ভারতের মুক্তি হবে, এ বিশ্বাসে আজও আমি অটল। আমি তোমাদের হাতে সঁপে দিয়ে যাচ্ছি আমাদের জাতীয় ত্রিবর্ণ পতাকা, আমাদের জাতীয় সম্মান এবং ভারতের বীর যোদ্ধাদের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য। তোমরা ভারতের মুক্তি ফৌজের পুরোধা; অন্যত্র তোমাদের সহযোদ্ধারা তোমাদের চির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সামনে রেখে যাতে লড়াই চালিয়ে যায়, তার জন্যে ভারতের জাতীয় সম্মান উচ্চে তুলে ধরতে গিয়ে তোমরা যে সর্বস্ব পণ করবে, এমন কি জীবনও বলি দেবে—তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

যদি আমি নিজের খুশি মত চলতে পারতাম, তাহলে আমি দুঃখের দিনে তোমাদের সঙ্গেই থেকে যেতাম এবং সাময়িক পরাজয়ের বেদনা তোমাদের সঙ্গেই সমানভাবে ভাগ ক'রে নিতাম। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্যে আমার মন্ত্রিমণ্ডলী ও উচ্চপদস্থ অফিসারদের উপদেশে আমাকে বর্মা দেশ ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। পূর্ব-এশিয়া ও ভারতের অভ্যন্তরের স্বদেশ-বাসীরা আমার অজানা নয়—আমি তোমাদের এইটুকু ভরসা দিতে পারি যে, যে কোন অবস্থাই আসুক না কেন তারা লড়াই চালিয়ে যাবে এবং তোমাদের এত দুঃখকষ্ট, এত আত্মত্যাগ কিছুই বৃথা যাবে না। আমার দিক থেকে আমি বলতে পারি যে, আটত্রিশ কোটি স্বদেশবাসীর স্বার্থসাধন ও তাদের মুক্তির জন্যে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করবার যে সংকল্প ১৯৪৩-এর ২১শে অক্টোবর আমি গ্রহণ করেছি, সে সংকল্পে আমি অবিচলিত থাকব। পরিশেষে তোমাদের কাছে আমার আবেদন—আমার মত তোমরাও মনে মনে আশা আর বিশ্বাস রাখো, ঠিক রাত্রি প্রভাতের পূর্বক্ষণে থাকে ঘোর অন্ধকার। ভারত স্বাধীন হবেই—সেদিন দূরে নয়।

ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।

ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ! আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ!

'জয় হিন্দ'

সুভাষচন্দ্র বসু, সর্বোচ্চ সেনাধ্যক্ষ

২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫ আজাদ হিন্দ ফৌজ

১১. বর্মা ত্যাগের প্রাক্কালে বিশেষ বাণী, ২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫

বর্মাস্থ ভারতীয় ও বর্মী বন্ধুগণ,

ভাই ও ভগিনীবৃন্দ! ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি বর্মাদেশ ছেড়ে চলেছি। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দফায় আমরা পরাস্ত হয়েছি। কিন্তু আমরা হেরেছি শুধু প্রথম দফায়। এখনও বহুবার আমাদের লড়তে হবে। প্রথম বার হেরেছি ব'লে আমি হতাশ হওয়ার কোন কারণ দেখি না।

বর্মাস্থ আমার স্বদেশবাসীরা, যে ভাবে তোমরা তোমাদের মাতৃ-ভূমির প্রতি কর্তব্য পালন করেছ তা দেখে সারা বিশ্ব আজ মুগ্ধ। নিজেদের

ধন, জন ও জিনিসপত্র দিতে তোমরা কার্পণ্য করোনি। তোমরাই প্রথম সামগ্রিক যুদ্ধের আদর্শ স্থাপন করেছ। কিন্তু আমাদের সামনে এসেছে প্রবল বাধাবিঘ্ন এবং সাময়িকভাবে আমরা বর্মায় যুদ্ধে পরাস্ত হয়েছি।

বিশেষত বর্মায় আমার সদর দপ্তর উঠিয়ে আনবার পর যে নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের স্পৃহা তোমরা দেখিয়েছ, আমি তা চিরদিন মনে ক'রে রাখব।

আমি পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাস করি যে, সে স্পৃহা অদম্য। আমার একান্ত অনুরোধ যে, ভারতের স্বাধীনতার কথা মনে রেখে তোমরা মনের সেই ভাব বজায় রাখো, আমি চাই তোমরা মাথা উঁচু ক'রে রাখো এবং সেই শুভদিনের অপেক্ষা করো যেদিন আবার ভারতের মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার সুযোগ আসবে।

যখন ভারতের শেষ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লেখা হবে, তখন বর্মাস্থ ভারতীয়েরা সেই ইতিহাসে গৌরবময় স্থান পাবে।

আমি স্বেচ্ছায় বর্মাদেশ ছেড়ে যাচ্ছি না। এখানে থেকে তোমাদের সঙ্গে সাময়িক পরাজয়ের দুঃখে দুঃখী হতে পারলে আমি খুশিই হতেম। কিন্তু আমার মন্ত্রিমণ্ডলী ও উচ্চপদস্থ অফিসারদের উপদেশে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্যে আমাদের বাধ্য হয়ে বর্মাদেশ ছেড়ে যেতে হচ্ছে। আমি আজন্ম আশাবাদী; ভারতবর্ষ অচিরে মুক্তি পাবে—আজও আমার স্থির বিশ্বাস। আমি চাই তোমরাও সেই আশায় আশান্বিত হও।

আমি চিরদিনই ব'লে এসেছি যে, ঠিক রাত্রি প্রভাতের পূর্বক্ষণে থাকে ঘোর অন্ধকার। আজ আমাদের ঘিরে ঘোর অন্ধকার; সুতরাং রাত্রি প্রভাতের আর দেরি নেই।

ভারত স্বাধীন হবেই

সংগ্রাম পরিচালনার ব্যাপারে বর্মার সরকার ও জনসাধারণের কাছ থেকে আমি সর্বতোভাবে যে সাহায্য পেয়েছি, পরিশেষে তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার না করলে আমার এই বাণী অসমাপ্ত থেকে যাবে। ভবিষ্যতে সময় আসবে যখন স্বাধীন ভারত মুক্তহস্তে কৃতজ্ঞতার সেই ঋণ পরিশোধ করবে।

ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ! আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ!

'জয় হিন্দ'

সুভাষচন্দ্র বসু

১২. আই-এন-এ বন্দীদের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে বিবৃতি

৩০শে মে, ১৯৪৫

বর্মা থেকে বিশ্বস্তসূত্রে আমরা খবর পেয়েছি যে, আজাদ হিন্দ ফৌজের যে সমস্ত অফিসার ও সৈনিক বর্মায় ইঙ্গ-মার্কিনদের হাতে ধরা পড়েছে, তাদের প্রতি নিষ্ঠুর ও প্রতিহিংসামূলক ব্যবহার করা হচ্ছে। দুনিয়া শুদ্ধ সবাই জানে যে, ইঙ্গ-মার্কিনেরা—বিশেষত বৃটিশেরা—ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধবন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে ব'লে জার্মানি ও জাপানের ঘাড়ে সব সময় দোষ চাপিয়ে থাকে। কিন্তু আমি আজ জিজ্ঞেস করতে চাই যে, বর্মায় আজাদ হিন্দ ফৌজের যে সব লোকজন ধরা পড়েছে তাদের সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিনেরাই বা কী ধরনের আচরণ করেছে? বর্মায় মিত্রপক্ষে যদিও পাঁচ জাতের লোক আছে, তা'হলেও আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকজনদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের জন্যে একমাত্র দায়ী বৃটিশ কর্তৃপক্ষ। বৃটিশের যে সব সৈন্য আমাদের হাতে ধরা পড়েছিল, তাদের সঙ্গে আমরা খারাপ ব্যবহার করেছি, একথা বৃটিশ কর্তৃপক্ষের বানিয়ে বলবারও সাধ্য নেই। মিত্রপক্ষ থেকে যারা এসেছে তারা নিজে থেকে এসে আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে এবং আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়েছে। আর এমন কি দিল্লী বেতার পর্যন্ত দিন কয়েক আগে স্বীকার করেছে যে, আজাদ হিন্দ ফৌজে যারা যোগ দিয়েছে তারা সবাই ভাল ব্যবহার পেয়েছে।

হয়ত বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ভাবছে যে, আমাদের প্রতিশোধ নেবার ক্ষমতা নেই—সুতরাং, তারা আমাদের অফিসার ও সৈনিকদের নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারে। আমি তাদের হুঁসিয়ার ক'রে দিয়ে বলছি যে, সে কথা ভাবা ভুল। আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সৈন্যদের প্রতি দুর্ব্যবহার ও শাস্তিদান তারা যদি বন্ধ না করে, তাহলে আমরা যেমন ক'রে হোক প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবো। কিন্তু বাধ্য হয়ে প্রতিহিংসার পথে পা বাড়ানোর আগে প্রতিবিধানের একটি ফলপ্রদ ও সহজ পথ আমাদের সামনে খোলা আছে। যদি আমাদের স্বদেশবাসীরা এ ব্যাপারে অগ্রসর হয়ে ভারতবর্ষে তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করে, তা'হলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস—বৃটিশ কর্তৃপক্ষের টনক নড়বে এবং তারা তাদের ভুল বুঝতে

পারবে। ভারতবর্ষের জনমতের হয়ত এ ক্ষমতা নেই যে, ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়ার ব্যাপারে বৃটিশকে বাধ্য করতে পারে—কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজের যে সব লোকজন বৃটিশের হাতে যুদ্ধবন্দী হয়েছে, ভারতের জনমত নিশ্চয়ই তাদের দুর্ভোগ ও নির্যাতন বন্ধ করবার ক্ষমতা রাখে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সদস্যেরা সত্যিকার দেশভক্ত ও বিপ্লবী—তারা মাতৃভূমির মুক্তিসেনা। বৃটিশের বিরুদ্ধে তারা নিঃসন্দেহে সাহসে বুক বেঁধে দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়ছে; তাই ব'লে তারা অন্যায়ের আশ্রয় নেয়নি এবং বিবেক বিসর্জন দেয়নি। সুতরাং আন্তর্জাতিক রীতি ও প্রথা অনুযায়ী বন্দীদশায় তাদের ভাল ব্যবহার পাওয়া উচিত। ভারতের স্বাধীনতার জন্যে লড়াই ক'রে আজ যারা বৃটিশের হাতে নিষ্ঠুর ও প্রতিশোধমূলক ব্যবহার পাচ্ছে—যুদ্ধে বন্দী সেই আপনজনদের স্বপক্ষে দাঁড়াবার জন্যে আমি তাই আমার স্বদেশবাসীদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। আন্তর্জাতিক যুদ্ধের যে সব নিয়মকানুন ও নীতির কথা বলতে বৃটিশেরা অজ্ঞান, সে সব তারা নিজেরা কতটা পালন করে দুনিয়ার লোক যাতে তা বিচার করতে পারে, তার জন্যে আমি দেশবাসীকে এই আবেদন করছি যে, এই সব যুদ্ধবন্দীদের ভাগ্যে কী ঘটেছে তা প্রকাশ করতে বৃটিশ কর্তৃপক্ষকে তারা বাধ্য করুক।

ব্যাঙ্কক, ৩০শে মে, ১৯৪৫ সুভাষচন্দ্র বসু

১৩. আত্মসমর্পণের গুজব সম্পর্কে বিশেষ হুকুমনামা

কমরেডস্,

সায়োনান ও অন্যান্য জায়গায় যত রাজ্যের বাজে গুজব রটছে; তার একটা হল লড়াই নাকি খতম হয়ে গেছে। বেশির ভাগ রটনাই হয় মিথ্যা, নয় অতিরঞ্জিত। এই মুহূর্তেও সমস্ত রণাঙ্গনে যুদ্ধ চলেছে; শুধু বন্ধুমহলের খবরের ওপর নির্ভর ক'রে আমি একথা বলছি না, শত্রুপক্ষের রেডিওতেও একই কথা বলছে। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে কোনরকম ভাবান্তর ঘটলে আমিই প্রথম সে খবর তোমাদের দেব। সুতরাং আমি আশা করি, তোমরা সবাই শান্তচিত্তে অবিচলিতভাবে নিজের নিজের কাজ স্বাভাবিকভাবে চালিয়ে যাবে। সবচেয়ে বড় কথা, তোমরা যেন কোনমতেই বাজারের আজগুবি

গুজবে কান দিও না। যে কোন অবস্থা আসুক, মাতৃভূমির মুক্তিসংগ্রামে রত বীর সৈনিকের মত তার সঙ্গে আমাদের মোকাবেলা করতে হবে।

জয় হিন্দ

সুভাষচন্দ্র বসু, সর্বোচ্চ সেনাধ্যক্ষ

সায়োনান, ১৪ই আগস্ট, ১৯৪৫

১৪. জাপানীদের আত্মসমর্পণ প্রসঙ্গে বিশেষ হুকুমনামা

কমরেডস্,

আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা সংগ্রামে এমন বিপদ আসবে আমরা কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি। তোমাদের মনে হতে পারে ভারতবর্ষের বন্ধন মোচনের যে ব্রত তোমরা গ্রহণ করেছিলে তা ব্যর্থ হয়ে গেছে। আমি তোমাদের বলছি, এ ব্যর্থতা সাময়িক। অতীতে যে দস্তুরমত সাফল্য তোমরা অর্জন করেছ, কোন পরাজয়ে কোন আঘাতেই তা ঘুচে যাবে না। ভারত-বর্মা সীমান্ত বরাবর এবং ভারতের অভ্যন্তরেও লড়াইতে তোমরা অনেকে অংশ গ্রহণ করেছ, সমস্ত রকমের দুঃখকষ্ট তোমরা বরণ করেছ। তোমাদের বহু সঙ্গীসাথী যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন দিয়ে আজাদ হিন্দের অমর শহীদ হয়েছে। এই মহান আত্মত্যাগ কখনই ব্যর্থ হতে পারে না।

কমরেডস্, এই দুঃখের দিনে আমি তোমাদের ডেকে বলছি : তোমরা প্রকৃত বিপ্লবী বাহিনীর উপযোগী নিয়মানুবর্তিতা, মানসম্ভ্রম ও শক্তিসামর্থ্যের পরিচয় দাও। যুদ্ধক্ষেত্রে তোমরা ইতিমধ্যেই তোমাদের শৌর্য ও আত্মত্যাগের প্রমাণ দিয়েছ। সাময়িক পরাজয়ের সময় ভবিষ্যতে ভরসা ও অকম্পিত ইচ্ছাশক্তির পরিচয় দেওয়া এখন তোমাদের কর্তব্য। আমি তোমাদের যতটা জানি, তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, এই দারুণ দুর্দিনে তোমরা মাথা উঁচু ক'রে থাকবে এবং অন্তহীন আশাভরসা নিয়ে ভবিষ্যতের সম্মুখীন হবে।

কমরেডস্, আমরা ভারতের মুক্তিফৌজের সদস্য—আমি অনুভব করতে পারছি, স্বদেশের আটত্রিশ কোটি মানুষ আজ আমাদের মুখ চেয়ে এই সংকটকালে তাকিয়ে আছে। সুতরাং ভারতের প্রতি নিষ্ঠা অটুট

রাখো এবং ভারতের ভবিষ্যতের প্রতি এক মুহূর্তের জন্যেও বিশ্বাস হারিও না। দিল্লীর পথ অনেক এবং এখনও দিল্লী আমাদের গন্তব্যস্থল। তোমাদের মৃত্যুহীন সঙ্গীসাথীদের ও তোমাদের আত্মত্যাগ চরিতার্থ হবেই হবে। দুনিয়ার এমন কোন শক্তি নেই যা ভারতবর্ষকে পদানত রাখতে পারে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবেই হবে, সেদিন দূরে নয়।

জয় হিন্দ

১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৫ সুভাষচন্দ্র বস্থ

১৫. পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয়দের প্রতি বিশেষ বাণী

ভাই ও ভগিনীগণ,

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল অধ্যায় এই মাত্র শেষ হল এবং এই পর্বে পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয় সন্তান-সন্ততির নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে লোক, অর্থ ও সামগ্রী অকাতরে উৎসর্গ ক'রে তোমরা দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছ। যে রকম স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও সোৎসাহে তোমরা আমার 'সামগ্রিক যুদ্ধে'র আহ্বানে সাড়া দিয়েছ, তা আমি কখনই ভুলব না। আজাদ হিন্দ ফৌজ ও ঝাঁসীর রাণী বাহিনীতে সৈনিকের শিক্ষা গ্রহণ করবার জন্যে তোমরা নিরবচ্ছিন্নভাবে তোমাদের ছেলেমেয়েদের পাঠিয়েছ। অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের যুদ্ধভাণ্ডারে তোমরা মুক্তহস্তে দিয়েছ অর্থ ও সামগ্রী। এক কথায় বলতে গেলে, ভারতের প্রকৃত সন্তান-সন্ততির মতই তোমরা তোমাদের কর্তব্য করেছ। তোমাদের দুঃখ ভোগ ও আত্মত্যাগের ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়নি—তার জন্যে তোমাদের চেয়েও আমিই বেশী দুঃখিত। কিন্তু এই দুঃখভোগ ও আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি—কেন না তার ফলে আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা সুনিশ্চিত হয়েছে এবং সারা বিশ্বে সমস্ত ভারতবাসীর কাছে তা অমর প্রেরণা হয়ে থাকবে। উত্তর-পুরুষেরা কৃতজ্ঞচিত্তে তোমাদের নাম করবে এবং ভারতের স্বাধীনতার বেদীতে তোমাদের অর্ঘ্য ও তোমাদের রীতিমত সাফল্যের কথাও সগর্বে বলাবলি করবে।

আমাদের ইতিহাসের এই অভাবিতপূর্ব সংকটে আমার একটি কথাই বলবার আছে। আমাদের সাময়িক পরাজয়ে যেন তোমাদের আশা-ভঙ্গ না হয়। মুখে হাসি ফোটাও এবং উৎসাহ বজায় রাখো। সব চেয়ে বড় কথা, এক মুহূর্তের জন্যেও যেন ভারতের ভবিষ্যতে আস্থা হারিও না। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যে ভারতবর্ষকে শৃঙ্খল পরিয়ে রাখতে পারে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে, সেদিন দূরে নয়।

জয় হিন্দ

১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৫ সুভাষচন্দ্র বসু

পরিশিষ্ট ৩

ইয়ামামোতো বাহিনী ও আই-এন-এ ডিভিশন ১

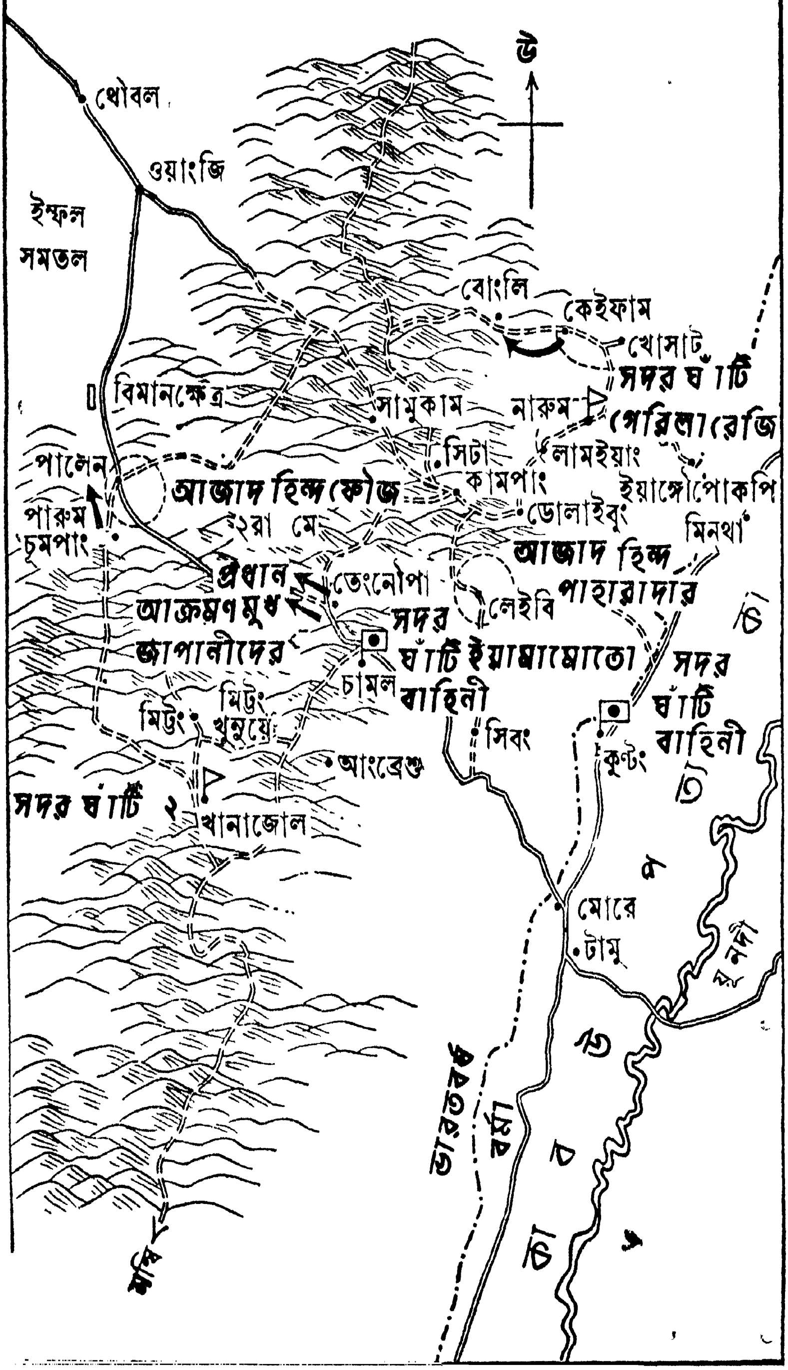
জাপানীদের পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৪৪-এর ১০ই এপ্রিল নাগাদ ইম্ফলের পতন হওয়ার কথা ছিল। আই-এন-এ'র ২য় ও ৩য় গেরিলা রেজিমেণ্ট রেঙ্গুণে পৌছোয় মার্চে; সুতরাং অত পরে তাদের পক্ষে যুদ্ধে কোন রকম অংশ গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু অন্ততঃ জাপানীদের পায়ে পায়ে যাতে তারা ইম্ফলে প্রবেশ করতে পারে, সুভাষচন্দ্র সে ব্যাপারে জেনারেল কাওয়াবেকে রাজী করান এবং ১নং আই-এন-এ ডিভিশনের হেডকোয়ার্টার্স সহ ২য় গেরিলা রেজিমেণ্ট ২৫শে মার্চ কালেমিও অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। তিন দিন পর ডিভিশনাল কমাণ্ডার কর্নেল মহম্মদ জামান কিয়ানি মেমিওতে পৌছুলে সেখানে মুতাগুচি তাঁকে পরম উৎসাহের সঙ্গে বললেন যে, কর্নেল কিয়ানি যদি ইম্ফল পতনের সময় উপস্থিত থাকতে চান তাহলে এখুনি যেন টামুতে গিয়ে ইয়ামামোতো বাহিনীর (৩৩ নং জাপানী ডিভিশনের অংশ) সঙ্গে যোগ দেন। কিয়ানি সাগ্রহে তাঁর ২য় রেজিমেণ্টের একটি ব্যাটালিয়ানকে ম্যাণ্ডালে থেকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিলেন এবং তাঁর আত্মীয় রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডার লেফটেনাণ্ট-কর্নেল ইনায়াৎ জান কিয়ানিকে সঙ্গে নিয়ে স্বয়ং তার অনুসরণ করলেন।

১৭ই এপ্রিল পার্বত্য পল্লী চামলে তাঁদের দু'জনের সঙ্গে জেনারেল ইয়ামামোতোর দেখা হল। সকলেই জোরের সঙ্গে বলল: এটা ধ্রুব সত্য যে, যে কোন দিন ইম্ফলের পতন হবে, তবে যে আই-এন-এ বাহিনীকে পাঠানো হয়েছে, ইয়ামামোতো এখনও তাকে কাজে লাগাতে পারবেন। তিনি নির্দেশ দিলেন যে, পালেল অভিমুখে যখন তিনি সদলে অগ্রসর হবেন তখন ২য় গেরিলা রেজিমেণ্ট চামলের দক্ষিণ-দক্ষিণ-পশ্চিমের পর্বতমালা বরাবর মোম্বির পথ আটক ক'রে তাঁর বাম পার্শ্ব রক্ষা করবে। যাবার জন্যে এত বেশী তাড়া করা হল এবং যুদ্ধজয়ের আশা এত বেশী প্রবল ছিল যে, রেজিমেণ্ট তার সমস্ত ভারী লটবহর, মর্টার আর ভারী কামান কালেওয়াতে ফেলে রেখে গেল, প্রত্যেক সৈন্যের সঙ্গে থাকল শুধু একটি কম্বল, একটি রাইফেল আর পঞ্চাশ রাউণ্ড গুলি। যে বিরাট কুণ্ডাকার জঙ্গলের ওপর দিয়ে চামল থেকে জাপানীরা লড়াই করতে করতে সামনে এগোচ্ছিল, তার দক্ষিণে পাহাড়ের উঁচু অংশে অবস্থিত খানজোল গ্রামে ২৮শে এপ্রিল রেজিমেণ্টের সদর ঘাঁটি স্থাপিত হল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রেজিমেণ্টকে হুকুম করা হল পালেল বিমান-ঘাঁটি আক্রমণে অংশ গ্রহণ করতে। জাপানীরা ১লা মে পুবদিক থেকে ঢুকে পড়বার পরিকল্পনা করেছিল। কথা ছিল, আই-এন-এ ঐ একই সময়ে দক্ষিণ দিক থেকে একটি ব্যাটালিয়ান নিয়ে আক্রমণ করবে।

কাজটা সহজ ছিল না: সমস্ত ব্যাটালিয়ানেই বেসামরিক লোক-জনেরা সংখ্যায় ছিল প্রচুর এবং অনেকেই ইতিমধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। জাপানীরা নিশ্চিন্ত থাকলেও আই-এন-এ কমাণ্ডার বুঝেছিলেন যে, বৃটিশেরা যেহেতু ১৮ই এপ্রিলের পর থেকে বিমানযোগে সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে, সেই হেতু তারা বিমানঘাঁটি প্রাণপণে রক্ষা করবে। গোটা রেজিমেণ্ট থেকে প্রাক্তন ভারতীয় বাহিনীর ৩০০ জন লোককে নিয়ে একটি বিশেষ দল তৈরি করা এবং ডিভিশনাল ষ্টাফ অফিসার মেজর প্রীতম সিং স্বেচ্ছায় নেতৃত্ব করতে যখন রাজী, তখন ঐ দলটিকে তাঁর পরিচালনাধীনে ছেড়ে দেওয়া—আই-এন-এ কমাণ্ডার দেখলেন, এ ধরনের যুদ্ধে এর বেশী কিছু করা সম্ভব নয়। মালপত্র আনতে পাঠাবার এখন আর সময় নেই: নিয়মিত ভাবে রসদ আসছে না, তিন দিন ধ'রে সেপাইরা পেট ভ'রে খেতে পায়নি—এ সত্ত্বেও ৩০শে এপ্রিল রাত্রে প্রীতম সিং সদলে খানজোল থেকে জঙ্গলের

ইয়ামামোতো বাহিনী ও আজাদ হিন্দ ডিভিশন ১

এপ্রিল-জুলাই, ১৯৪৪



খাড়া পথ ধরে নামতে নামতে গহন উপত্যকায় এসে পৌছুলেন—সেখান থেকে পশ্চিমে খানিকটা হেঁটে তারপর উত্তর দিকে গেলে পালেল পড়বে। মানচিত্রে এর দূরত্ব খুব বেশী তো মাইল বারো, কিন্তু ঘাঁটি হিসেবে নির্বাচিত পুরুম চুম্‌পাঙ্‌ গ্রামে পৌছুতে সৈন্যদের দু' রাত্রি লেগে গেল—সৈন্যেরা পথশ্রমে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ততক্ষণে দিনের বেলায় জাপানীদের আক্রমণের পালা শেষ, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রীতম সিং ২রা মে রাত্রে তাঁর পক্ষ থেকে আক্রমণের পালা শুরু করবার জন্যে তৈরি হলেন।

সাধারণ সৈন্যদের তখনও পুরোপুরি আত্মবিশ্বাস রয়েছে—কেন না তারা বরাবর শুনে এসেছে যে, যখন তারা কালক্রমে বৃটিশ-ভারতীয় বাহিনীর সম্মুখীন হবে তখন বৃটিশেরা কিংবা ভারতীয়েরা কেউই তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে না। সেদিন রাত সাড়ে দশটা নাগাদ আগুয়ান সৈন্যদল তাদের লক্ষ্যস্থলের মাইল পাঁচেক আগে একটি বিস্তীর্ণ শৈলশিরার ওপর দিয়ে যেতে যেতে একটি গুর্খা প্লেটুনের নজরে পড়ে। ৪/১০ গুর্খা রাইফেল্‌স্‌ বাহিনীর 'বি' কোম্পানীর ১১নং প্লেটুনের গুর্খারা চন্দ্রালোকে তাদের দেখতে পায়—জ্বলন্ত সিগারেট হাতে কথা বলতে বলতে তারা আসছিল, শৃঙ্খলার কোন বালাই ছিল না। গুর্খারা একটা যুতসই জায়গায় আসতে দিয়ে তারপর তাদের ওপর গুলিবর্ষণ শুরু করে।

আই-এন-এ সৈন্যেরা ভয় পেয়ে ইতস্তত পালিয়ে যায়। কিন্তু কিছু সময় যাবার পর প্রীতম সিং দলের কিছু লোককে জড়ো ক'রে সাবধানে আবার এগোতে থাকেন। আই-এন-এ নেতা কথাবার্তা ব'লে গুর্খাদের গুলি ছোঁড়া বন্ধ করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে ফল না হওয়ায় 'চলো দিল্লী' আওয়াজ তুলে গুর্খাদের ফাঁড়ির ওপর হামলা করা হয়। প্রীতম সিং ও অন্য একজন অফিসার যথেষ্ট বীরত্ব দেখিয়ে একজন গুর্খা ব্রেনগান চালককে জখম করলেও তাঁদের পিছু হটে আসতে হল। এর পর সাতবার আক্রমণ হয়, কিন্তু প্রত্যেকটি আক্রমণই ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত আজাদ হিন্দ ফৌজকে স'রে আসতে হল। দু'জন আই-এন-এ অফিসার ও বহু সৈন্য নিহত হল; এর ওপর পঁয়ত্রিশ জনের মত হয় ধরা দিল, নয় ধরা পড়ল। গুর্খাদের মধ্যে নিহত হল দু'জন।

প্রীতম সিং পুরুম চুম্‌পাঙ্গে পিছু হটে এসে একটি বাহাদুর দলকে

পাঠিয়ে দিলেন নতুন আক্রমণের উদ্দেশ্যে শত্রুপক্ষের খবরাখবর নিতে ; সেই সঙ্গে তিনি রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডারের কাছে অবিলম্বে সাহায্যের জন্যে অনুরোধ জানালেন। কিয়ানি তখন কয়েক মাইল পিছনে সৈন্যদল চালনা করছিলেন ; তাঁর কাছে খবর পৌছুতে না পৌছুতে ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রাইফেল্‌স্‌-এর একটি কোম্পানির দ্বারা তিনি নিজেই আক্রান্ত হলেন। এই পদাতিক বাহিনীর আক্রমণ খুব জোরালো ছিল না, তবে তার ঠিক পরেই বিমান আক্রমণ শুরু হল ; তার ফলে আই-এন-এর পঞ্চাশ জন নিহত ও প্রায় অনুরূপ সংখ্যক আহত হল এবং প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের ফলে বাকি সকলে রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। খান্‌জোলে ফিরে যাবার জন্যে কিয়ানি ঢালাওভাবে হুকুম দিলেন এবং দুটি বাহিনী দলের বহু লোককে হারিয়ে ৪ঠা মে নিজেদের ঘাঁটিতে গিয়ে পৌছুল। প্রীতম সিং-এর টহলদার বাহাদুরদল আত্মসমর্পণ করেছিল।

দূর প্রাচ্যে সুভাষচন্দ্রের আগমনের পর আই-এন-এ'র ইতিহাসে সম্ভবত সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল পালেলের ব্যর্থতা ও পরে কিয়ানির ফৌজের ক্ষয়ক্ষতি। সুভাষচন্দ্র আশা করেছিলেন যে, পুরোদস্তুর আজাদ হিন্দ ফৌজ যখন যুদ্ধক্ষেত্রে বৃটিশ-ভারতীয় বাহিনীর সম্মুখীন হবে তখন গোলাগুলির দরকার হবে না, শুধু প্রচারেই কেল্লা ফতে হবে তাঁর সেই আশা আই-এন-এ'র প্রচারে স্বতঃসিদ্ধ সত্য হিসেবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আরাকানের যুদ্ধে একটি বিচ্ছিন্ন প্রহরীদলকে মিশ্র সহজেই দল ভাঙ্গিয়ে আনায় এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়, এবং মার্চ মাসে রেঙ্গুণে নবাগত রেজিমেণ্টগুলির কাছে মিশ্র নিজেই বলেছিল যে, ভারতীয় বাহিনীর মনোবলের খুবই অভাব এবং আই-এন-এ'র দৃঢ়চিত্ততার কাছে তারা দাঁড়াতেই পারবে না। তাদের এতদিনকার এই সযত্নপোষিত মোহ ভেঙ্গে খান খান হল ; ভারতীয় বাহিনীতে পূর্বেকার সঙ্গীসাথীরা এখন তাদের দেশদ্রোহী ব'লে মনে করে, এটা হঠাৎ সকলের কাছে স্পষ্ট হল। এক সময়ে যারা সঙ্গীসাথী ছিল—কোন কোন ক্ষেত্রে আত্মীয়স্বজন—তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করা জনকয়েক অত্যুৎসাহী ছাড়া আর কারো পক্ষে সহজ ছিল না ; যুদ্ধযাত্রা আদৌ যে সম্ভব হয়েছিল, তার কারণ অনেকেই ভেবেছিল সংগ্রামটা হবে নামমাত্র। ভাবা গিয়েছিল, এক ডাকেই কেল্লা ফতে হয়ে যাবে ; কিন্তু দেখা গেল তা যেমন সুরক্ষিত তেমনি দুর্ভেদ্য—এবং জয়ের স্বপ্নে মশগুল হয়ে

অসাবধানে রাস্তা চলতে গিয়ে নিজেদের ভুলের জন্যে তাদের প্রচুর মাশুল দিতে হল।

লেফটেনাণ্ট-কর্নেল ইনায়াৎ জান কিয়ানি এতে খুব মর্মাহত হলেও পরাজয়ের প্রধান কারণ হিসেবে সরবরাহ ও সাহায্যের ব্যাপারে জাপানীদের অক্ষমতাকে দায়ী করলেন; অবশ্য জাপানীদের আক্রমণের নির্দিষ্ট তারিখ যেখানে ছিল ১লা মে, সেখানে তাঁর সৈন্যেরা ২ রা মে যদি জাপানীদের তরফ থেকে কোন আক্রমণ না দেখে থাকে, তা'হলে অবাক হবার কিছু নেই। প্রকৃতপক্ষে জাপানীদের নিজেদেরই তখন গোলাগুলি ও অন্যান্য জিনিসপত্রের সাংঘাতিক অভাব; তাদের ভরসা ছিল এপ্রিলের মাঝামাঝি বৃটিশ-ভারতীয় মালগুদামগুলো তাদের হাতে এসে যাবে। হিকারি-কিকানের সংযোগকারী অফিসাররা খোদ জাপানীদের বঞ্চিত ক'রে আই-এন-এ'কে জিনিসপত্রের যোগান দিতে রাজী থাকলেও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র জোটাতে পারছিল না। চামলস্থিত আই-এন-এ'র ডিভিশনাল কমাণ্ডারের এ ব্যাপারে কোনই হাত ছিল না; স্থানীয় বাজারেও এতটুকু কোন জিনিস পাওয়া যাচ্ছিল না। সুতরা' আজাদ হিন্দ ফৌজের দুর্দশার কোন লাঘব হল না; এর ফলে সর্বনাশ হবে, এ কথা চ্যাটার্জী তাড়াতাড়ি বুঝতে পারায় এবং সুভাষচন্দ্রের তহবিল দু'হাতে খরচ করায় জুনের প্রথম দিকের পর থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজকে যুদ্ধক্ষেত্রে ধ'রে রাখা সম্ভব হল।

পালেল বিমানঘাঁটির উপর যখন আক্রমণের চেষ্টা হয়, তখনই ইয়ামামোতো বাহিনীর অভিযান আর চূড়ান্ত পর্যায়ে নেই। ২৩ নং বৃটিশ-ভারতীয় ডিভিশন পালেলের দক্ষিণ-পূর্বস্থিত পাহাড় অঞ্চলে তখনই নতুন ক'রে আবার ঘাঁটি গাড়তে শুরু করেছে এবং ৭ই মে নাগাদ আই-এন-এ'কে খান্‌জোলে পিছু হটতে বাধ্য করেছে। পরদিন ঐ গ্রাম পুনরধিকৃত হয়; বারংবার আক্রমণ ও সামরিক পশ্চাদপসরণ সত্ত্বেও ২ নং আই-এন-এ রেজিমেণ্ট সেখানে এবং চামলের রাস্তায় পরবর্তী পাহাড়ের ওপর মিটং খুনুয়ে নামক গ্রামটিতে সারা মে মাস নিজেদের ঘাঁটি বজায় রাখে। ইতিমধ্যে অসুখবিসুখ ও লড়াইয়ের ক্ষয়ক্ষতির ফলে রেজিমেণ্টটি দুর্বল হয়ে পড়ছিল এবং মনোবলের অভাব দেখা যাচ্ছিল। ২৬শে মে তারিখে কিয়ানি যখন সরবরাহের ব্যাপারে আবার সলাকওয়া করতে চামলে গেলেন তখন

তিনি জানালেন যে, তাঁর দলের পঁচিশ জন লোক নিজেরা নিজেদের জখম করেছে। রেজিমেণ্টের বেশির ভাগ লোককে এখন রসদ বইবার কাজে লাগাতে হবে ঃ পাহাড়ের শৈলশিরা ও মোম্বিপথ রক্ষার কাজে মাত্র তিনটি কোম্পানিকে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে।

সারা জুন মাস বৃষ্টির ফলে উভয় পক্ষের কাজ দাঁড়াল শুধু টহল দেওয়া ; ২য় গেরিলা রেজিমেণ্টকে আর বড় রকমের কোন লড়াই করতে হল না। কিন্তু খারাপ জল হাওয়া, খাদ্যাভাব আর ম্যালেরিয়ার ফলে ১৫ই জুন নাগাদ রেজিমেণ্টের সৈন্যসংখ্যা এক হাজারেরও কম হয়ে পড়ল, প্রতিবিধানের ব্যবস্থা থাকায় ১৯৪৪ সালে ভারতীয় বাহিনীকে এ সংস্তু সমস্যায় পড়তে হয়নি, কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজ ছিল এদিক থেকে একেবারে অসহায়। মোম্বি পথে রক্ষীবাহিনীর সংখ্যা কমে প্রথমে দু কোম্পানি, পরে এক কোম্পানিতে এসে ঠেকল। জুলাইয়ের গোড়ার দিকে এসে দেখা গেল দলত্যাগীর সংখ্যাও কম নয়। রেজিমেণ্টে কমাণ্ডারের পরেই যার স্থান, চামলের হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে দলত্যাগ করে। অল্পদিনের মধ্যেই আই-এন-এ অঞ্চলে তার স্বাক্ষরিত 'নিরাপদে পৌছুবার ছাড়পত্র' ও ইস্তাহার বিমান থেকে বিলি করা হল, তাতে আই-এন-এ'র সভ্যদের তার মত নির্ভয়ে ভারতীয় বাহিনীতে ফিরে যেতে বলা হয়েছে। অন্য একজন দলত্যাগী অফিসার আই-এন-এ সৈন্যদের এই সময়কার মনোভাব সম্পর্কে বলেছিল ঃ

> ধরা পড়লে গুলি ক'রে মারা হবে, এই সন্দেহ প্রবল হওয়ার ফলে তাদের মধ্যে একটা আশাহত অবস্থা দেখা যায়, অর্থাৎ—জাপানীদের সম্পর্কে বিতৃষ্ণা, ঘরে ফেরবার আকাঙ্ক্ষা এবং সে চেষ্টা করলে গুলিবিদ্ধ হয়ে মরবার ভয়।…(টিকটিকির দল থাকায়) পালাবার উপায় নিয়ে আলোচনা অসম্ভব।

এই রকম মানসিক অবস্থায় ইস্তাহার আর ছাড়পত্র বিলি ক'রে চমৎকার ফল পাওয়া গেল। পাঞ্জাবী মুসলমানেরা কিছু কিছু ক'রে সব ব্যাটালিয়ানেই ছিল, তারা দলে দলে এমনভাবে পালাতে লাগল যে, আশী জন পাঞ্জাবী

মুসলমানকে নিরস্ত্র ক'রে পশ্চাদ্ভাগে পাঠিয়ে দিতে হল। কর্নেল মহম্মদ জামান কিয়ানি হাল ছেড়ে দিয়ে সুভাষচন্দ্রের কাছে চিঠি লিখলেন, তবে গোড়ায় জাপানীদের কাছে দলত্যাগের খবর চেপে গিয়ে লোকজন 'নিখোঁজ' হয়েছে ব'লে জানালেন। জাপানীরা যখন ব্যাপার জানতে পারল, তখন তারা এই ব'লে বায়না ধরল যে, এরপর থেকে কিয়ানিরা সুভাষচন্দ্রকে যা কিছু লিখবেন তা জাপানীদের হাত দিয়ে পাঠাতে হবে। এমন কি নিজেদের অক্ষমতার জন্যেও তারা আংশিকভাবে আই-এন-এ'কে দায়ী করল।

জুলাইয়ের গোড়ায় ২ নং আই-এন-এ রেজিমেণ্টের সৈন্যসংখ্যা দাঁড়াল মাত্র সাতশো পঞ্চাশ, এদের নিয়ে চারটি নতুন কোম্পানী তৈরি ক'রে আবার খান্‌জোল, মিটং খুনুয়ে ও মোম্বি পথ রক্ষার জন্যে পাঠানো হ'ল। ৩রা ও ৪ঠা জুলাই চতুর্দশ বাহিনীর একটি ভারতীয় ব্যাটালিয়ান (৪র্থ ব্যাটালিয়ান, মারাঠা লাইট ইনফ্যান্ট্রি) খানজোল আক্রমণ ক'রে শত্রুপক্ষকে বিতাড়িত করে; খান্‌জোল রক্ষা করছিল পঞ্চাশ জনেরও কম আই-এন-এ সৈন্য; তারপর তারা মিটং খুনুয়ে এবং তার পূবে পাহাড়ের ওপর একটি মোক্ষম জায়গা দখল ক'রে বসে। কিন্তু এই ব্যাটালিয়ান আর অগ্রসর হয় না এবং শেষ পর্যন্ত পশ্চাদপসরণ না করা পর্যন্ত আই-এন-এ রেজিমেণ্ট অনিশ্চিতভাবে মোম্বি পথের শেষ প্রান্ত কোনরকমে ধ'রে ব'সে থাকে।

৩য় গেরিলা রেজিমেণ্ট সম্পর্কে বলবার খুব বেশী নেই; অবশ্য এই রেজিমেণ্টের বিরুদ্ধে যারা লড়েছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছে যে, এই রেজিমেণ্ট রণাঙ্গনে সামান্য যে কয়েক সপ্তাহ ছিল তার মধ্যে অন্য দুটি আই-এন-এ রেজিমেণ্টের চেয়ে ঢের বেশী উৎসাহ ও সংগ্রামস্পৃহার পরিচয় দিয়েছে। লেফটেনাণ্ট-কর্নেল গুলজারা সিং-এর অধিনায়কত্বে ৩য় রেজিমেণ্ট বর্ষার মরশুম শুরু হওয়ার পর ২৬ শে মে টামুতে পৌঁছোয়। সিটা পাহাড়ের শীর্ষদেশ তখন আবার ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর হাতে; এই পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামা পুবমুখের রাস্তাগুলো আটকাবার জন্যে ইয়ামামোতো ৩য় রেজিমেণ্টকে নারুমের চারদিকে আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামের উদ্দেশ্যে স্থান গ্রহণ করবার নির্দেশ দিলেন। ইম্ফলের প্রান্তশায়ী ওয়াংজিং থেকে সিটা পাহাড় পর্যন্ত বৃটিশের যে সরবরাহ পথ, এখান থেকে সেই পথের ওপরও হামলা করা যেতে পারবে—এটা ইয়ামামোতো আশা করেছিলেন। ১নং ব্যাটালিয়ানের ওপর

যানবাহনের ভার দিয়ে এবং অন্য দুটি ব্যাটালিয়ানকে লাম্বইয়াং, কেইফাম আর খোসাট গ্রাম দখল করতে ব'লে গুলজারা সিং জুন মাসের গোড়ার দিকে নারুমে তাঁর সদর ঘাঁটি স্থাপন করলেন।

যুদ্ধ এলাকায় পদার্পণ করবার সময়েই দেখা গেল রোগ-ভোগের জন্যে রেজিমেণ্টের বলক্ষয় হয়েছে। যেমন, সিটা পাহাড়ের প্রধান ঘাঁটির ওপর আক্রমণের জন্যে লেইবি গ্রাম এলাকায় টহলদারির ভার পড়েছিল ২য় ব্যাটালিয়ানের যে কোম্পানির ওপর, গোড়ায় সেই কোম্পানিতে সৈন্যসংখ্যা ছিল একশো পঞ্চাশ—কিন্তু এই সময় কার্যক্ষম লোক সত্তর জনের বেশী পাওয়া গেল না। বর্ষা শুরু হওয়ায় অসুস্থ লোকের সংখ্যা বেড়ে গেল। ১৮ই জুন দ্বিতীয় একটি কোম্পানিকে এবং জুনের শেষে তৃতীয় একটি কোম্পানিকে ব্যাটালিয়ান থেকে লেইবি গ্রামে কাজ চালু রাখার জন্যে পাঠাতে হল। ইতিমধ্যে ব্যাটালিয়ানের সৈন্যবল প্রায় ছ'শো থেকে কমে ৩৩২ এসে দাঁড়িয়েছে; কারণ ২৪৭ জন অসুস্থ, বারো জন দলত্যাগ করেছে, তিন জন যুদ্ধে নিহত এবং তিন জন আত্মহত্যা করেছে। বর্ষা সত্ত্বেও লেইবিতে পাহারা দেবার কাজ বেড়ে গিয়েছিল; শুকনো পাহাড়ী পথগুলো তখন ঘোলাজলের নদীতে পরিণত হয়েছিল।

জুনের শেষে ও জুলাই-এর গোড়ায় বোংলি গ্রামের চতুর্দিকে ৩য় ব্যাটালিয়ানও তখন খুবই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ২য় গেরিলা রেজিমেণ্ট অশক্ত হওয়ায় এই ব্যাটালিয়ান থেকে দুটি কোম্পানিকে বলবৃদ্ধির জন্যে ৬ই জুন টামুতে পাঠানো হয় কিন্তু পক্ষকাল পরে তারা ব্যাটালিয়ানের সদর ঘাঁটি বোংলিতে ফিরে আসে। শত্রুপক্ষ তখন উত্তরদিকে ঠেলে নামছিল; ব্যাটালিয়ান ঠেকাবার চেষ্টা করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের ওপর পিছু হটবার হুকুম হয়।

দুটি রেজিমেণ্টই এবং সুভাষ রেজিমেণ্টের ২য় ও ৩য় ব্যাটালিয়ান ১৯৪৪-এর ১৮ই জুলাই তারিখে পিছু হটতে শুরু করে।